প্রতীক্ষিতা শর্বরী

অচ্যুত গোস্বামী

দি নিউ বুক এম্পোরিয়াম
২২/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশিকা : শ্রীমতী গৌরী দেবী
২৩ সিমলা রোড, কলিকাতা-৬

মূল্য—৮·৫০
আশ্বিন, ১৩৭০ সাল

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত
মুদ্রণ—রয়েল হাফ-টোন কোম্পানী

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর

শ্রীচরণোদ্দেশে

—এই লেখকের—

উপন্যাস :

মৎস্যগন্ধা

রাজ্যচ্যুত ঈশ্বর

আলোচনা :

বাংলা উপন্যাসের ধারা

ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এই বইখানি কিছুকাল আগে 'কানাগলির কাহিনী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় যাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বন করে কাহিনীটি রচিত, তাঁদের অনেকে এই নাম-করণে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, আপাততঃ তাঁরা কানাগলিতে বাস করছেন বটে, কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করেন যে একদিন তাঁরা রাজপথের ধারে স্থান পাবেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের এই আস্থার মূল্য না থাকলে তাঁদের মহৎ সংগ্রামেরও কোন মূল্য থাকে না। তাঁদের আপত্তির যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি বলেই সুযোগ পেয়ে বইয়ের নামটি পরিবর্তন করলাম। তাঁরা কৃষ্ণরাত্রি যাপন করছেন প্রদীপ্ত প্রভাতের প্রতীক্ষায়; এই জন্যই তাঁদের দুঃখ-বরণ সার্থক।

আগের বইটিতে অনেক পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছি। তার ফলে অনেক বর্ধিত-কলেবর এই বইখানি প্রকৃতই একখানি নতুন বই হয়ে উঠেছে। আমি এতখানি কষ্ট স্বীকার করেছি প্রধানত পূর্ববর্তী বইয়ের শিল্পগত অপূর্ণতাকে দূর করার জন্য। কতখানি সার্থক হয়েছি তা পাঠক-সমাজ বিচার করবেন।

—লেখক

মাত্র দোতলা হলে কী হয়—বাড়িটা কী প্রকাণ্ড! যেন সারা পাড়াটাকে দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করছে! বাড়িটা শুধু যদি আকারে বড় হত তাও চোখে সইত। কিন্তু এই ঘিঞ্জি ঘেঁষাঘেঁষি-ভীড় কলকাতা সহরের মধ্যে বাড়িটার সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে অন্তত বিঘা আট দশ জায়গা। পিছনের বাঁধানো পুকুরটাই তো অন্তত বিঘে দুয়েকের হবে। পুকুর পাড়ের বিস্তীর্ণ জায়গায় আম নারকেল সুপুরির বাগান। একটা টিনের ঘরও আছে—ভাঙ্গা বলে গাছপালার আড়ালে যথাসাধ্য নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। সামনের জায়গাটুকু আরও প্রশস্ত। বড় রাস্তার ওপরে যে বাড়ীর গেট, সেই গেট বরাবর যে চওড়া কাঁকড় বিছানো রাস্তাটা চলে এসেছে বাড়ি অবধি, তার দু'পাশে দুটো টিনের সেড। নিশ্চয় বাড়ী তৈরীর সময়ে ছিল না, পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কারখানা করা চলে এমন বড় বড় দুটো সেডও সামনের বিস্তীর্ণ জায়গার সামান্য অংশই আবৃত করেছে। বাড়ির সামনেটা আবার সান বাঁধানো। কর্তারা কী মনে করে বাঁধানো চত্বরটা তৈরী করিয়াছিলেন কে জানে? হয়তো সভা-টভা করতে হতে পারে কোন সময় এই ভেবে।

বাড়িটার দিকে যে তাকায় তারই চোখ জ্বালা করে। কলকাতা সহরে এক ইঞ্চি জায়গার জন্য লোকে হা-পিত্যেশে ছুটোছুটি করছে—আর এখানে জায়গার এত অপচয়! এত দম্ভ বাড়িটার! হোক মাণিকতলা গরীবদের পাড়া, তাই বলে গা বাঁচিয়ে চলার জন্য এত আয়োজন!

বোধকরি এতদিনে বাড়িটার উপর লোকের অভিশাপের ফল ফলতে সুরু করেছে। এত বড় বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে, ছাদের কার্ণিশে, গোল গোল থামগুলিতে শ্যাওলা জমেছে। বাড়ির দোতলায় লম্বা করে দড়ি টাঙিয়ে ছোট বাচ্চাদের ছেঁড়া কাঁথা মেলে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা থেকেই দেখা যায়। রাস্তা দিয়ে দ্রুত পায়ে যেতে যেতে অন্যমনস্ক পথিকও একবার না ভেবে পারে না—বাড়িটা অভিজাত বটে, কিন্তু বাড়িতে যারা থাকে তারা অভিজাত নয়।

এই বাড়িতে নাকি বাস করবেন কল্যাণবাবু। ভাবতে গিয়ে একটু অবাক লেগেছিল বৈকি? আর যারা যারা বাস করবে বলে এ বাড়িতে এসেছিল তারাও অবাক হয়েছিল। কিন্তু সাতদিন অনেক সময়। সাতদিনের মধ্যে বাড়িটা তাদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। বিস্ময়ের বদলে এখন এসেছে বিরক্তি। এতদিন পরে কল্যাণবাবু আবার নতুন করে বিস্মিত হচ্ছেন দেখে তারা বিস্মিত হয়েছে।

ক দিন থেকে দেখুন না বাড়িতে। মজাটা টের পাবেন। —কল্যাণবাবুর মুখের উপর বলে দিয়েছে একজন।

কিন্তু অবাক না হয়ে কি পারা যায়? একখানা মাত্র ঘর যদিও কল্যাণবাবুর ভাগে পড়েছে, এবং সে ঘরেও ঢুকতে হয় অপরের দখলের আর একখানা ঘর পেরিয়ে, তবু সে কি ঘর! সাধারণ মাপের চারখানা ঘর এঁটে যাবে সেই একখানা ঘরে। মার্বেল পাথরের মেঝেতে রক্তবর্ণ পদ্মফুল আঁকা। দেওয়ালের নিচের অংশে তেমনি ফুল-লতা-পাতা আঁকা মার্বেল পাথর। উপরের অংশে বিচিত্রিত মনোহারিনী কার্পেট। কতদিন অযত্নে পড়েছিল ঘরখানা, শুধু একটু জল দিয়ে ঘষতেই অমলিন হাস্যে হেসে উঠল। যেন এতদিনের মধ্যে পৃথিবীতে কিছুই ঘটেনি। যেন অনেক ঝড় পেরিয়ে আজ ভারতবর্ষ উনিশশ সাতচল্লিশের শেষ পাদে পা দেয় নি।

এই ঘরে হয়তো একদিন রঙীন নেশার বান মানুষের গালে গোলাপী আভা ছড়িয়েছে। হয়তো সুন্দরী রমণীর নূপুর নিক্কন তার অন্তরের দীর্ঘ নিশ্বাসকে ঢেকে রেখেছে।

হোক না মাণিকতলা—তবু তো কলকাতা—কলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে। কল্যাণবাবু খুশি হয়েছেন এমন বাড়িতে জায়গা পেয়ে।

বারুইপুর থেকে কলকাতা অনেক দূর। মাইলের হিসাবে না হোক মনের হিসাবে তো নিশ্চয়ই। বারুইপুরে তিনি ছিলেন শ্যালকের আশ্রয়ে। এখানকার এ আস্তানাটা তাঁর নিজস্ব। যেমন তেমন আস্তানা নয়। রূপকথার রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে শুয়ে থাকতে পারে এমন আস্তানা।

এ যেন নতুন করে জীবন আরম্ভ করা! এ বাড়ি নতুন, এ দেশ নতুন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়ে নতুন কালে পদার্পণ করেছে। তবু কি পুরানো মনের অধিকারী পুরানো মানুষ কল্যাণবাবু পারবেন সত্যি সত্যি নতুন জীবন আরম্ভ করতে?

নতুন আস্তানাটার সামনে দাঁড়িয়ে পুরোন দিনের অন্তত বিশখানা পুরোন আস্তানার ছবি ছায়া-ছবির মত ভেসে গিয়েছিল কল্যাণবাবুর চোখের সামনে। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার মানুষ কল্যাণবাবু নন। কত কাজে হাত দিয়েছেন তিনি; আর কাজটাকে অবলম্বন করে কত নতুন নতুন সহরে তিনি সাময়িক আস্তানা পেতেছেন! পূর্ববঙ্গের কোন সহরকেই প্রায় তিনি বাদ দেননি। ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, মালদা, রংপুর। বারবার করে পাততাড়ি গুটোনো আর পাততাড়ি পাতা। কিন্তু কি-বা লাভ হয়েছে তাতে! জায়গাই শুধু বদলিয়েছে। মানুষটা বদলায়নি। চিরকালের চিরপুরাতন কল্যাণবাবু যা ছিলেন তাই রয়ে গিয়েছেন বরাবর। সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষও মাত্র দু' একদিনের পরিচয়েই তাঁকে চিনতে পেরেছে। তারপরই কল্যাণবাবু কল্যাণদা হয়ে যেতে দেরী হয়নি। আর তাই কল্যাণবাবু যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই একদল লোক তার চারপাশে জড়ো হয়েছে। এ লোকগুলো বদলায় না, চিরপুরাতন। এ লোকগুলোর চেহারায় তফাৎ হয়, ভাষা আলাদা হয়, আসল মানুষ একই থাকে। কালের চাকার সঙ্গে তারা শুধু ঘুরে ঘুরে মরে; শিকড় ছড়ায় না। ফসল ফলায় না।

এই একঘেয়েমীটা আর ভাল লাগছে না। অনেকদিন থেকেই লাগছে না। অনেকদিন থেকেই কল্যাণবাবুর ইচ্ছা তিনি আর এক রকমের মানুষ হবেন। জীবনে তাঁর শ্রী থাকবে, সমাজে তাঁর ভার থাকবে। তাঁর প্রসঙ্গ উঠতেই একজন আর একজনকে বলবে, 'ও কল্যাণবাবু? তিনি তো অমুক জায়গার অমুক।' আর কল্যাণবাবুকে না চিনলেও তাঁর পরিচয় জেনেই শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে।

কিন্তু এমনি কপাল! এমন ঘটনাটা তাঁর জীবনে আজ পর্যন্তও ঘটল না। যা তিনি শুনলে খুশি হতে পারতেন তা তাঁর সম্পর্কে কেউ বলে না। বরং কোন বন্ধুর তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি অবধারিতভাবে সোল্লাশে বলে উঠবেন: হ্যাল্লো কল্যাণ! দি আদি এণ্ড দি অকৃত্রিম!' —তারপর হয়তো তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যোগ করবেন: 'তোমার আর কি কল্যাণ! তুমি তো ইচ্ছে করলেই সমাজে একটা কেউ-কেটা হতে পারতে! ইচ্ছে করনি বলেই তো তেমন কিছু হয়ে উঠলে না।

এ জাতীয় কথা শুনলে কী যে রাগ হয় কল্যাণবাবুর! ইচ্ছে করে বন্ধুর গালে একটা চড় কষিয়ে দেন। কাজের বেলায় অবিশ্যি তিনি তা কোনদিন পেরে ওঠেন নি। তিনি যে বন্ধুবৎসল—অন্ততঃ লোকে যে তাই জানে!

কিন্তু বন্ধুদের কথা যে কত মিথ্যা এ কথা তাঁর চেয়ে বেশী করে আর কেউ জানে না। জীবনে তিনি ইচ্ছে করে বড় হতে চাননি এ কি একটা কথা! তবে হয়তো যে-ভাবে চললে বড় হওয়া যায় সে-ভাবে চলার চেষ্টা তিনি করেন নি। সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তিনি কত সময় আপন মনে আর এক রকমের কল্যাণ সেনের মূর্তি কল্পনায় অঙ্কিত করেছেন। যে কল্যাণ সেন ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় না, যে কল্যাণ সেন জীবনকে শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে জীবনের সোপান শ্রেণী একে একে পার হয়ে উপরের দিকে এগিয়ে যায়। এমন তিনি অনায়াসে কল্পনা করতে পারেন যে আর এক তরুণ বয়সী কল্যাণ সেন এক থানায় সামান্য সাবডেপুটি হিসাবে নিযুক্ত হ'য়ে এসেছেন। তারপর প্রতিবার বদলীর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে প্রমোশন। সাবডেপুটি থেকে ডেপুটি: ডেপুটি থেকে এস্‌-ডি. ও। এস্‌-ডি. ও. থেকে জিলা শাসক।

নিজেকে তিনি সরকারী চাকুরে হিসাবে দেখতে পছন্দ করেন না! তা হলেই বা অসুবিধের কি ছিল! আর এক রাস্তা ধরে তিনি এগিয়ে যেতে পারতেন। আজ মহকুমা কংগ্রেস কমিটিতে, কাল জিলা কমিটিতে, পরশু প্রাদেশিক কমিটিতে, তার পরদিন এ আই-সি-সি-তে। আজ এক প্রদেশের আইন সভার সদস্য, কাল আর এক প্রদেশের মন্ত্রী, পরশু অন্য কোন প্রদেশের গবর্ণর বা মুখ্যমন্ত্রী, তরশু—। কিন্তু তরশুর আর দরকার কি?

এমনটা কি কিছুতেই হওয়া সম্ভব ছিল না? ছিল বৈকি! কল্যাণবাবুর

জীবন অনায়াসে হয়ে উঠতে পারত একটা ছন্দোবদ্ধ কবিতা। তার লাইনে লাইনে নতুন অর্থ। স্তবকে স্তবকে নতুন বিস্ময়। কল্যাণবাবু নিত্য নতুন হয়ে উঠছেন। প্রতিদিন নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

সেই আশ্চর্য ঘটনাটি কল্যাণবাবুর জীবনে যে ঘটলো না সে জন্য দায়ী কে? ভাগ্য? কিন্তু পুরুষকারে বিশ্বাসী কল্যাণবাবু ভাগ্য বিশ্বাস করেন না। পারিপার্শ্বিক? কিন্তু কল্যাণবাবু যেখানেই গিয়াছেন সেখানকার পারিপার্শ্বিক যে তিনি নিজেই তৈরী করে নিয়েছেন। তবে কি তিনি নিজেই দায়ী? হয়তো তাই; কিন্তু কোথায় যে তাঁর দোষ তা তিনি নিজেই জানেন না। কিংবা হয়তো জানেন।

সেই বিরাট রহস্যঘেরা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কল্যাণবাবুর মনে হল এখনো এমন কিছু দেরী হয়নি। এখনো তিনি নিজেকে সংশোধন করতে পারবেন। তাঁর যৌবন হয়তো পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর বেঁটে শরীরে এখনো সামর্থ্যের অভাব নেই। হাত মুঠ করলে এখনো তাঁর বাহুতে কালো কালো মাংসপেশী ফুলে ওঠে। তিনি আজন্ম আশাবাদী। এবার তিনি জীবনের মাটীতে শিকড় ছড়াবেন। ভালই হয়েছে এ নতুন দেশে তাঁকে কেউ চেনে না। এখানে তাঁর সম্পর্কে কারও কোন প্রত্যাশা নেই। এক নতুন কল্যাণ সেনকে গড়ে তোলার এবার তিনি অখণ্ড অবকাশ পাবেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের আজীবনের আপশোষ তিনি মিটিয়ে দেবেন উপচীয়মান সম্পদের বন্যায়।

আর একটা বাড়ীর দরজা জানালা দিয়ে নতুন সকাল উঁকি ঝুঁকি মারছে। কল্যাণবাবু এখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। কালকে জায়গা বদলানোর অত টানা-হ্যাচড়া করে আজ একটু বেলা অবধি বিছানায় থাকার অধিকার নিশ্চয়ই তিনি অর্জন করেছেন। শুয়ে শুয়ে দেখতে পাচ্ছেন দরজা দিয়ে বারান্দার ওপারে আর এক আকাশ থেকে তামার থালার মত আর এক লাল সূর্য মিষ্টি আমন্ত্রণ লিপি পাঠাচ্ছে।

দিন! এ আর এক ধরণের সোনালী দিন। আর শুয়ে থাকা যায় না। উঠে বসলেন কল্যাণবাবু। পাশে জেগে অথচ দুষ্টু চোখ বুজে শুয়ে আছে ছোট্ট মেয়ে টুনটুনি। তাকে টেনে তুলে নিলেন কল্যাণবাবু।

গাও তো, মা টুনি, আমার সংগে—বলে শুরু করলেন আগামী দিনের গান :

'রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম।'

বাধা পড়ল। ঘরটার সামনে একখানা ঘর, সেটা অপরের দখলে। তারপর বারান্দা। আর এ ঘরের পিছনে আর একখানে ঘর—কোন এক কালে হয়তো বা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাথরুম ছিল, আজকে কল্যাণ বাবুর রান্নাঘর। দু'ঘরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে একটি দরজা। সেই দরজা দিয়ে একখানা মুখ দেখা গেল। আর শোনা গেল কয়েককটি ঝাঁঝালো শব্দ :

অবাক করলে গো তুমি! এত কাজ পড়ে রয়েছে। কত কি কেনা কাটা পড়ে রয়েছে! আর বেলা আড়াই পউরের সময় মেয়েকে নিয়ে পরমানন্দে গান ধরেছ?

এ-মুখ কল্যাণবাবু চেনেন। এ-মুখ নতুন জায়গার অপরিচিত আর এক মুখ নয়। এ তাঁর অনেককালের চেনা অনেক পুরানো সেই মুখখানা। এই মুখের মালিককে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন চরকীর মত ঘুরপাক খাচ্ছে। কৃতজ্ঞতার খুশীর সমুদ্র উথলে উঠছে না যদিও তাতে।

কল্যাণবাবু দরজার দিকে তাকালেন। না, জবাব দেওয়ার দরকার নেই, সেই মুখখানি অদৃশ্য হয়েছে। নিশ্বাস ফেলে কল্যাণবাবু উঠলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ফিরে এলেন তাড়াতাড়ি। ভাবছিলেন, এ বাড়ীর কেউ তাঁকে চেনে না। জানে না অতীত কল্যাণবাবুর কেমন ছিল স্বভাব, কেমন বা চরিত্র। কল্যাণবাবু এইভাবে চলবেন, এই ধরণের কথা বলবেন কেউ তা আশা করবে না। যেমন নতুন এই বাড়ী তেমনি নতুন এই দেশ। দেশের জীবনেও এবার ঘটেছে কল্পান্ত। দেশ এবার নতুনের পথে পা বাড়াবে। নতুন বাড়ী, নতুন দেশ, নতুন লোকজন। জীবনকে মনের মত করে ঢেলে সাজাবার এমন অখণ্ড অবকাশ কল্যাণবাবু আর পাননি ইতিপূর্বে। এ সুযোগের তিনি সদ্‌ব্যবহার করবেন। করবেনই।

চা আন, সুনন্দা,—অভ্যাস-চালিত কল্যাণবাবু নির্দেশ দিলেন মেয়েকে। সুনন্দা তাঁর বড় মেয়ে, জ্যেষ্ঠ সন্তান।

রান্না ঘরের দরজার গোড়ায় সুনন্দার মূর্তি দেখা গেল।

চা আজকে হবে না বাবা। দুধ নেই। রুটি দিচ্ছি শুধু।'

চিন্তায় বাধা পড়ল কল্যাণবাবুর। তৎক্ষণাৎ রেগে গেলেন! দুধ নেই? কেন দুধ থাকবে না শুনি? তিন দিন আগে পুরো এক কৌটো দুধ কিনে দিয়েছি। মার কাছে জিজ্ঞেস কর্ তো।

আসার সময় ও-বাড়ী থেকে কৌটা আনা হয়নি বাবা। —সুনন্দা জানালো নিস্তেজ গলায়।

কল্যাণবাবু বললেন: সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করে আয় তোর মার কাছে। কথায় কথায় অত ভুল হয় কিসের জন্য? কার বাপ কত পয়সা রেখে গেছে যে অমন বে-হিসাবী খরচ করা চলবে?

কথাটা গিয়ে জানিয়ে আসতে হ'ল না। মনোরমার কান আছে—রান্নাঘর এমন কিছু দূরে নয়। তৎক্ষণাৎ এ ঘরে এসে বললেন:

তোমার আক্কেল হবে মরলে? দু'মাস ধরে একজনের ঘাড়ের ওপর বসে বসে খেয়েছো। সামান্য এক কৌটো দুধ কিনেছিলে, তা নিয়ে আসা যায় কখনো তাঁর বাড়ী থেকে? কৃতজ্ঞতা নেই—না থাকুক। একটু চক্ষু-লজ্জাও কি থাকতে নেই নাকি? স্বদেশী করলে মানুষের নজর কি এমনি ছোট হয়?

কল্যাণবাবুর মুখের মাংসপেশীগুলো রুক্ষ কঠিন হয়ে এল। মুহূর্তের মধ্যে এ বাড়ীর, এ ঘরের চেহারা যেন বদ্‌লে গেল মনে হচ্ছে। তেমন আর নতুন, অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে না তো বাড়ীটাকে। ঐ আকাশ তো আর-একটা আকাশ নয়। ঐ সূর্য, আরও উঁচুতে উঠে যে এখন চোখের আড়ালে চলে গিয়েছে, তো আর এক সূর্য নয়। সব কিছু পুরানো পচা, আদ্দিকালের। আর সব কিছুর সাম্‌নে রয়েছে সবচেয়ে পুরানো একখানা মুখ—যে কোনদিন তাঁর কোন কাজে ভুল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না, কোন কথায় ত্রুটি ছাড়া আর কিছুর সন্ধান পেল না। চায়ের কৌটো আনার সঙ্গে শোভনতার প্রশ্নটা যে জড়িত—না হয় কল্যাণবাবু না-ই খেয়াল করেছেন সেটা। এড়িয়ে যাওয়া যায় না তাই বলে প্রসঙ্গটা? অত বড় কথাটা বলতে হবে নিজের স্বামীকে তা-ই বলে?

দারোগার মেয়ে হয়ে তুমি আমার নজরের খোঁটা দাও? —বললেন কল্যাণবাবু থম্‌থমে, ভারী গলায়।

ভাব-গতিক দেখে সুনন্দা একপা একপা করে সরে পড়ল। বাবা-মার এই ঝগড়া এখন কিছুক্ষণ চলবে। উভয়েই উভয়ের মোক্ষম অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। তাতে উভয়েই যথেষ্ট আহত হয়েছেন। সেই পরিমাণে রাগও গিয়েছে বেড়ে। ঝগড়া দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পথে আর কোন অন্তরায়ই এখন দেখা যায় না। আর এই ধরণের ঝগড়ার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকতে সুনন্দার ভাল লাগে না।

আঠারো বছর বয়সের শ্যামবর্ণা মেয়ে সুনন্দা। বাবার মতই বেঁটে-খাটো মোটা-সোটা গড়নের। বাবার মতই মুখটা একটু চৌকোনা, চোয়ালের হাড় একটু উঁচু। নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট পুরু, একটু পুরুষালী ধরণের মেয়ে। তবু একধরণের চঞ্চল বুদ্ধির দীপ্তিতে মুখখানি আকর্ষনীয়।

সুনন্দা রান্নাঘরে এসে দাঁড়াল। ঘরটা আসলে ছিল বাথরুম। ওরা সেটাকে রান্নাঘর করে নিয়েছে। বাবা-মার কথাই ভাবছিল সুনন্দা। ও জানে এই-সব বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে পিতার সম্পর্কে মা যে সব অভিযোগ করেন তার সবই বর্ণে বর্ণে সত্যি। মেয়ে হয়ে তার হয়তো এরকম মন্তব্য করা ঠিক নয়। কিন্তু সত্য কি তাই বলে কখনো চাপা থাকে? তার বাবা টেরোরিজ্‌মের হুজুগ ক'রে [সত্যিকারের কাজ কিছু করেছিলেন বলে সে বিশ্বাস করে না] কোন্‌ এক ষড়যন্ত্র মামলার মধ্যে পড়ে বছর দশেক জেল খেটেছিলেন। সেই অহঙ্কারেই বাবা গেলেন! তার ওপর আশে-পাশের লোকেরা দিনরাত বাবার স্তুতি করে করে তাঁর মাথাটা একেবারে বিগড়ে দিয়েছে। আঠারো বছরের সবে ম্যাট্রিক পাশ-করা ছেলে গিয়েছিলেন জেলে। বেরিয়ে এলেন আটাশ বছরের ধারি যুবক। সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। অর্থাৎ আড্ডা দেওয়ার একটা আস্তানা তো চাই। এদিকে বিদ্যে তো সেই ম্যাট্রিক অবধি। আর কিছু করার যোগ্যতা ছিল না, অতএব সাত তাড়াতাড়ি করলেন এক বিয়ে। সুনন্দা আজও ভেবে পায় না কী ক'রে বাবার সঙ্গে মার বিয়ে হতে পারল। স্বদেশীওয়ালারা দারোগাকে দেখতে পারে না; আর দারোগার কাছে স্বদেশীওয়ালারা শত্রুতুল্য! অথচ দারোগার মেয়ের সঙ্গে স্বদেশীওয়ালা বাবার অনায়াসে বিয়ে হয়ে গেল।

শুনেছে, যে রাধেশমামার জন্যই বিয়েটা হতে পেরেছিল, অথচ রাধেশ মামাও তো দারোগা। তবে খুব ভালো লোক। বাবা নাকি মাকে দেখে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে গিয়েছিলেন। [কী জানি, মার চেহারা কি এতই ভাল ?] সেই বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এই এত বছরের মধ্যেও বাবা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেন না। সুনন্দার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সে-ই তো দেখল কতবার বাবা কত চাকরীতে ঢুকলেন, কত ব্যবসায়ে হাত দিলেন ; কোন জায়গাতেই টিকতে পারলেন না। যখন আর সংসার চালাতে পারেন না, তখন বৌ-ছেলে-মেয়েকে রাধেশ মামার ঘাড়ে ফেলে রেখে ভদ্রলোক অনায়াসে জেল জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় মেতে ওঠেন সাঙ্গ-পাঙ্গদের সঙ্গে। সম্প্রতি বছর তিনেক ধরে এক কণ্ট্রাক্টরের সংগে থেকে বাবার তবু যা হোক কিছু হচ্ছিল। তাও তো পাকিস্তান হয়ে শেষ হয়েছে। না, সত্যি কথার মার নেই, নিতান্ত অকর্মণ্য মানুষ বাবা—মা অতি বুদ্ধিমতী বলে কোনরকমে এই বৃদ্ধ শিশুকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তবে মা-ও মাঝে মাঝে রেগে যান। এই যেমন এখন রেগে গিয়েছেন বাবার নির্বুদ্ধিতা দেখে। কী করবেন, মা-ও তো মানুষ ! অবিশ্যি সুনন্দার বাবার উপর রাগও হয় না। বরং অনুকম্পা হয়।

বাবা মা ও-ঘরে বসে ঝগড়া করুন ; ততক্ষণে সুনন্দা ভাই বোনদের সকাল বেলাকার পাট মিটিয়ে ফেলতে পারে। টুনিকে কাছেই পাওয়া গেল। সে রান্নাঘরের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে নির্বোধের দৃষ্টিতে বাবা মার কাণ্ড দেখছে। কিন্তু ন' বছরের ভাই দেবব্রত সকাল থেকে নিরুদ্দিষ্ট। একটু আগে একবার সুধীন জ্যাঠামশাই-এর ঘরের দরজা থেকে উঁকি মেরেছিল বটে, কিন্তু বাবা মার চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ সরে পড়েছে। বোধ করি পারি-পার্শ্বিক সম্বন্ধে আরও জ্ঞান-বৃদ্ধি করা যায় কিনা সেই চেষ্টায়।

রান্নাঘরের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পশ্চিমের রারান্দা ধরে ঘুরে গিয়ে সামনের বারান্দায় এসে দেবুকে পাওয়া গেল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের রোগা ছেলেটি ম্লান মুখে দাঁড়িয়েছিল। কল্যাণবাবু শ্যাববর্ণের, মনোরমাও খুব কিছু ফরসা নন, কিন্তু কী করে কে জানে দেবব্রত হয়েছিল অদ্ভুত রকমের ফরসা। সুনন্দা দেবব্রতর কাঁধে হাত রেখে আকর্ষণ ক'রে বলল : চল্ দেবু, খেয়ে নিবি।

চলতে চলতে দেবব্রত চাপা গলায় যেন খুব একটা গোপনীয় কথা বলছে এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করল : মা খুব রেগেছেন নাকিরে দিদি?

সুনন্দা বুঝল, সকাল বেলার দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য মা তার উপর রেগেছেন কিনা সেইটে জেনে নেওয়াই ভাইটির উদ্দেশ্য। হেসে বলল : রেগেছেন, তবে তোর ভয় নেই, তোর ওপর নয়।

নিজের ব্যক্তিত্ব সপ্রমাণের জন্য দেবু ঠোঁঠ উল্টিয়ে মন্তব্য করল : আমার উপর রাগলেই বা কি? ভারী বয়েই গেল আমার!

রান্নাঘরে এসে দেবু দেখল, শুক্‌নো চিনির সংগে শুক্‌নো রুটির ব্যবস্থা। চা-ও অনুপস্থিত। তৎক্ষণাৎ বিগড়ে গিয়ে বলল : চা না হলে খামু না।

বোনেদের মত দেবু সব সময়েই ভাষার আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে না। বিশেষ ক'রে রাগের সময়।

ভাই বোনেদের ঝামেলা সামলাতে সামলাতে সুনন্দা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। বাবা মার ঝগড়ার অগ্রগতির দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারে নি। হঠাৎ কল্যাণবাবুর একটা কথা কানে আসায় মনটা সেদিকে আকৃষ্ট হল।

কল্যাণবাবু বলছিলেন : এক্ষুনি চললাম আমি বাইরে। আগে দুধ কিনে আনব। সেই দুধে চা তৈরী হবে। সেই চা খেয়ে তারপর আর কাজ কি আছে চিন্তা করে দেখব।

রান্না ঘর থেকেই সুনন্দা অনুমান করতে পারল পরনে যা আছে তার উপরই ইতিমধ্যে কল্যাণবাবু গায়ে একটা জামা চাপিয়ে নিয়েছেন। কাব্‌লী স্যাণ্ডেলের সপ্‌ সপ্‌ শব্দ শুনে অনুমান করতে পারল কল্যাণবাবু এবার বেরিয়ে যাচ্ছেন বীর পদক্ষেপে। বাঙালীর যত বীরত্ব বৌয়ের কাছে, ভাবল সুনন্দা। আর নিজের বাবার সম্পর্কে এমন একটা কথা মনে আসায় লজ্জিত হয়ে একটু হাসল।

কল্যাণবাবুর কিন্তু দুধ আনতে যাওয়া হ'ল না। বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই তাঁকে পাকড়াও করলেন এ-বাড়ীর চার-পাঁচ জন ভদ্রলোক। তাঁদের মধ্যে একমাত্র সুধীনবাবু তাঁর চেনা। সুধীনবাবুই তাঁকে খবর দিয়ে এনেছেন এ-বাড়ীতে। ফরিদপুরের লোক। কল্যাণবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয় গোয়ালন্দ স্টেশনে। দু'জনেই, বরং বলা চলে, দুই পরিবারই,

আসছিলেন কলকাতার দিকে। পথের আলাপ। কিন্তু দু'জনের আন্তরিকতার কাছে দু'জনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন। কথায় কথায় আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা আত্মীয়ও বটে; অবিশ্যি আত্মীয়তার সূত্রটা অত লম্বা ক'রে বৈশ্য বলেই তাঁরা টানতে পেরেছিলেন।

সুধীনবাবু সোৎসাহে তাঁর হাত ধরলেন।

এই যে কল্যাণবাবু। আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম যে। আসুন পরিচয় করে দি। ইনি কল্যাণ সেন। আর ইনি মনোরমবাবু, ইনি দীপংকরবাবু ইনি কালীকান্তবাবু আর ইনি সুধীরবাবু।

নমস্কার বিনিময় হ'ল।

প্রথম কথা বললেন মনোরমবাবু। তিনি ঢাকার মানুষ। কিন্তু ইনসিওরেন্সের ইন্‌সপেক্টর বলে ভুলেও দেশের ভাষায় কথা বলেন না। সরু গলা, কিন্তু একটু ভাঙা-ভাঙা।

জানেন কল্যাণবাবু, আপনি আসবেন বলে আমরা ক'দিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।

কল্যাণবাবু সলজ্জভাবে বললেন: 'কী যে বলছেন! আমার মত সামান্য মানুষের জন্য আবার কেউ অপেক্ষা করে?

ওসব কথায় নিজেকে লুকোতে পারবেন না। কালীকান্তবাবু বললেন।

আপনি কি দরের লোক তা আমরা জানি। বললেন সুধীরবাবু।

সুধীনবাবু আর একটু পরিষ্কার করে বললেন: বুঝেছেন কল্যাণবাবু, এমনি এমনি যে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি তা নয়। আমাদের সামনে গুরুতর সমস্যা,—আপনি ছাড়া পার পাওয়ার পথ দেখছি না।

সমস্যা? কিসের সমস্যা বলুন তো। এতক্ষণে কল্যাণবাবু কথা বলার ফুরসুত পেলেন।

কালীকান্তবাবুর প্রশ্ন: সমস্যা এই বাড়ী। বাড়ীর ব্যাপার নিয়ে যা যা ঘটেছে সবটা জানেন তো?

কল্যাণবাবুর উত্তর: না! কেবল জানি বাড়ী আমরা জোর করে দখল নিয়েছি।

মনোরমবাবুর ব্যাখ্যা: ও-কথা বলবেন না—জোর করে কেন? বরং বলুন বে-ওয়ারিশ বাসা পেয়ে আমরা আশ্রয় নিয়েছি। কলকাতায় আরও

অনেক উদ্বাস্তু অনেক বাড়ীতে এমনি ভাবে আশ্রয় নিয়েছে। উদ্বাস্তুদের এ ছাড়া বাড়ী পাওয়ার আর কোন পথ নেই। অন্য পথটা হ'ল দু'হাজার থেকে পাঁচ হাজার অবধি সেলামি দিয়ে বাড়ী ভাড়া করা—তা আর ক'জনে পারে বলুন? তা ছাড়া এ ব্যবস্থা অন্যায়ই বা কি? লোকের অভাবে বাড়ী খালি পড়ে থাকবে, আর বাড়ীর অভাবে লোক ফুটপাথে থাকবে—এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত নয় [সকলের সমবেত ভাবে 'নয়ই তো' 'নয়ই তো' বলে সমর্থন]। কিন্তু আমাদের হিসাবে একটু ভুল হয়ে গেছে। আমাদের ধারণা ছিল এটা মুসলমানের বাড়ী, তাতে আমাদের একটু সুবিধে হতে পারতো। কিন্তু এখন জানা গেছে এটা হিন্দুর বাড়ী—এক রাজা বাহাদুরের বাগান বাড়ী। আসল রাজা নন, উপাধিতে রাজা। পাড়ার লোকেরা তাই বলে পোষ্যপুত্রের বাগান বাড়ী।

কল্যাণবাবু দৃঢ় স্বরে বল্‌লেন: যার বাড়ীই হোক না—আমরা এ-বাড়ী ছাড়ব না। ছাড়তে পারি যদি সকলের জন্য আর কোন জায়গা বা বাড়ীর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

সুধীনবাবু গর্বিত ভাবে সকলের মুখের দিকে তাকালেন, ভাবটা এই, দেখ্‌লে হে, আমি নেহাৎ খারাপ লোক আবিষ্কার করিনি। মুখে বললেন: আপনার থেকে এই কথাটাই আশা করছিলাম।

এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হয় না। সকলে মিলে সামনে পেয়ে ঢুকলেন কালীকান্তবাবুর ঘরে। এ-বাড়ীর এক একটি ঘর এক এক পরিবারের দখলে। ঘরগুলো খুব বড় বড় আর জমকালো; মেঝে মোজেইক করা, চার পাশের দেওয়াল সুদৃশ্য ওয়াল পেপারে মোড়া। একটা পরিবারের থাকার পক্ষে জায়গা কম নয়, কিন্তু একটা ঘর বলেই অসুবিধে। আর অসুবিধে রান্না ঘরের—এক ঘরেই রান্নাও করতে হয়! কল্যাণবাবুর মত বাথরুমের সুবিধা অনেকেই পায় নি। তবে কল্যাণবাবুর শোবার ঘরখানা অনেক ছোট।

কালীকান্তবাবুর ঘরে মাদুর পেতে আলোচনা বৈঠক বসল। একই ঘরে বাড়ীর মেয়েরা কাজ কর্ম করছে। ছোটরা পড়ছে। এ সব ছোট খাটো অসুবিধের কথা ভাবতে গেলে উদ্বাস্তুদের চলে না। আলোচনা এগিয়ে চলল বাড়ী সমস্যার থেকে উদ্বাস্তু সমস্যার দিকে, সেখান থেকে সরকারী

উদ্বাস্তু-নীতির দিকে। কল্যাণবাবু মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের সমর্থক জেনে সবাই আলগোছে সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। আলোচনা গড়িয়ে গেল পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থার দিকে, হিন্দুরা কি করে দলে দলে পালিয়ে আসছে সেই প্রসঙ্গে। দু'তিনবার চা সরবরাহ করলেন বাড়ীর বিবেচক গৃহিনী।

কল্যাণবাবুর ঘরে মনোরমা গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। বাজার না হলে রান্না হওয়ার উপায় নেই। কাজেই আপাতত তাঁর কিছু করার নেই। কল্যাণবাবুর দেরী দেখে মনে হচ্ছে শুধু দুধ নয়, তিনি হয়তো একেবারে বাজার নিয়ে ফিরবেন। কিন্তু মনোরমার কাছ থেকে ফর্দটি না নিয়ে যাওয়ার ফলে নিশ্চয়ই অনেক দরকারী জিনিস কেনা হবে না। সেইটেই বিশেষ আতঙ্কের কারণ মনোরমার কাছে।

কিন্তু বাজার করে আনতেই কি একটা মানুষের এত দেরী হয়? মনোরমা চিন্তিত হয়ে মেয়েকে বললেন: দেখে আয় তো সুনন্দা ও-ঘরে গিয়ে কটা বেজেছে।

সুনন্দা ও-ঘরে না গিয়েই আন্দাজে বলল: 'সাড়ে বারটা।

এমনি করে নতুন জায়গায় কল্যাণবাবুর প্রথম সকালটি শুরু হল। জায়গা নতুন বটে; কিন্তু ঠিক এমন ঘটনাই ঘটতে পারতো কল্যাণবাবুর জীবনে ঢাকাতে বা চট্টগ্রামে বা পাবনাতে।

কল্যাণবাবু যা আশা করেছিলেন তা হ'ল না। তিনি ঠিক করেছিলেন, এ-বাড়ীতে অপরিচিত এসে অপরিচিতই থেকে যাবেন। অন্ততঃ অনেকদিন অবধি। তিনি মিশবেন না পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে; জুটবে তাঁর কোন সাঙ্গ-পাঙ্গ; জমবে না কোন আড্ডা। একাকী ঘুরবেন তিনি বড় শহরের বড়দের মহলে—পুরানো কংগ্রেস কর্মী হিসাবে তাঁর চেনা-জানার অন্ত নেই। মনোরমাকে তিনি দেখিয়ে দেবেন, কল্যাণ সেন ইচ্ছা করলে ভিন্ন ধরণের জীবন যাপন করতেও পারেন। পারেন অর্থ-উপার্জন করতে; পারেন দিতে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তা।

সুধীনবাবুর সংগে তাঁর সামান্য সময়ের আলাপ। কে জানত তার মধ্যেই তিনি মানুষটিকে চিনে নিয়েছিলেন! এ-বাড়ীতে কল্যাণবাবু আসার আগেই তিনি তাঁর জনপ্রিয়তার অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সবাই জেনে গিয়েছিলেন, কল্যাণবাবু কংগ্রেস নেতা। এই সদ্য-স্বাধীনতা-পাওয়া

ভারতবর্ষে, এই সন্ত-বিভক্ত বাংলা দেশে কল্যাণবাবুই একমাত্র লোক যিনি অসহায় উদ্বাস্তুদের কর্ণ ধারণ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

তবে হ্যাঁ, কল্যাণবাবু নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, বাড়ী সমস্যার মীমাংসাটা তাঁর পক্ষেও দরকারী। আবার হা-বাড়ী, হা-বাড়ী করে করে যদি পথে পথে ঘুরতে হয়, তবে অন্য কাজে মন দেবেন কখন?

পরদিন বাড়ীর বাসিন্দাদের একটা সভা হওয়ার কথা। কল্যাণবাবু তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। পটল এসে ডাকল: কল্যাণদা।

এক কম্পাউণ্ডারের ছেলে পটল, বছর চব্বিশ পঁচিশ বয়স। নিটোল স্বাস্থ্যবান শ্যামবর্ণ চেহারা তাকিয়ে দেখার মত। মুখখানা চক্‌চকে আর চঞ্চল: কিন্তু তাতে মাধুর্য আছে। মাত্র পাঁচ সাত দিনের মধ্যে সে এ-বাড়ীর ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে গেছে। নিজে যেচে যেচে সকলের ফাই-ফরমায়েস খাটে। খাটে এত অনায়াসে যে কৃতজ্ঞতা-বোধ বা প্রকাশের সুযোগটুকুও থাকে না।

ডাক শুনে কল্যাণবাবু চমকে উঠলেন। একেবারে আনকোরা নতুন জায়গায় এতটা তিনি আশা করেননি। এর আগে যেখানেই তিনি গিয়েছেন, তরুণমহলে তাঁর নামের সংগে 'দা' শব্দটা ধূমকেতুর পুচ্ছের মতই জড়িত হয়ে গেছে। এখানেও কি তাই হবে? এই কলকাতা শহরে?

তৈরী হয়ে নিয়ে কল্যাণবাবু বেরুতে যাবেন, রান্নাঘর থেকে সুনন্দা এসে জানালো: বাবা, মা বললেন, তুমি এখন চলে গেলে এবেলা রান্না হবে না। ঘরে ঘুঁটে নেই।

এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যাচ্ছেন আর এমন তুচ্ছ একটা সাংসারিক প্রয়োজনের কথা এমনি সময়ে—একজন স্বল্প পরিচিতের সামানে? কল্যাণবাবু একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

অবস্থাটা সহজ করে দিল পটল। বলল: এই সামান্য কাজের জন্য কল্যাণদা আটকে থাকবেন নাকি? না, কল্যাণদা আপনি মীটিংএ চলুন। ঘুঁটের ব্যবস্থা আমি এক্ষুনি করে দিচ্ছি।

কল্যাণবাবু সোৎসাহে পটলের পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বললেন: কর্মী যুবক আমি খুব ভালবাসি।

মীটিং বসেছিল পূর্ব প্রান্তের ছোট্ট বারান্দায়। ওদিকটা তখন রুদ্দুরে ভরে গেছে। শীতকালের দিনে সেইটেই আকর্ষণ।

স্থধীনবাবু, কালীকান্তবাবু, ইন্সিওরেন্সের ইন্‌সপেক্টর মনোরমবাবু, কেষ্টবাবু, তরুণদের মধ্যে স্থধীনবাবুর চাকুরে বড় ছেলে তপন, দীনেশ, রবি, শচীন ইত্যাদি বাড়ীর পনেরো কুড়িজন বাসিন্দা জড়ো হয়েছিল। এ-বাড়ীর নীচের তলাটা ধোবাদের দখলে। তাদের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছে লক্ষ্মণ।

সভায় স্থধীনবাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী বিস্মিত কল্যাণবাবুকে সভাপতি নির্বাচিত ক'রে একটি হাউস কমিটি গঠন করা হল। কল্যাণবাবু অবিশ্যি নিস্ফল আপত্তি জানিয়েছিলেন।

সেক্রেটারী নির্বাচিত হলেন মনোরমবাবু।

অতঃপর আসল প্রশ্ন উঠল। বাড়ীর দখল বজায় রাখার জন্য কী করা যায়?

কল্যাণবাবু বললেন: জানেন বোধ হয়, ঘোষ মশাই একটা নতুন অর্ডিন্যান্স পাশ করেছেন। পোড়ো-বাড়ী রিকুইজিশান করবেন গবর্ণমেণ্ট। আইনটা আমাদের উদ্বাস্তদের জন্য। আমার প্রস্তাব এই যে সরকারকে ধরে এ বাড়ীটা রিকুইজিশান করানোর চেষ্টা করা যাক। সরকার তো এখন বলতে গেলে আমাদের।

এ যুক্তি মন্দ নয়, বললেন দু' তিনজন।

স্থধীনবাবুর ছেলে তপন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলল: শেষটায় যদি গবর্মেণ্ট আমাদেরও উচ্ছেদ করে?

তবে আর কল্যাণবাবু আছেন কেন আমাদের সঙ্গে?—জবাব দিলেন স্থধীনবাবু।

এমন সময় নীচের তলার লক্ষ্মণ হঠাৎ দু' হাত জোড় করে কল্যাণবাবুর কাছে এগিয়ে এল।

আজ্ঞে আমার এগ্‌গা নিবেদন আছে।

কল্যাণবাবু তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বললেন: ছি ছি। ওরকম করে কথা বলে নাকি? এখানে আমরা সব সমান। বল, কী বলার আছে তোমার।

লক্ষ্মণ বলল: কই কি, সরকারকে অত বিশ্বাস করনডা ভাল না। তক্কাগা বড্ড খারাপ। তার চেয়ে বাড়ীওলার লগে আগে কথা কয়ে ছাখনডা মন্দ না। যদি ভাড়া দেয়।

নিজের যুক্তির প্রমাণে লক্ষ্মণ অনেক উদাহরণ দিল। ওদেরই এক বৌ রুক্মিণী। চোরাবাজারের সোডা কিনে আনছিল র‍্যাশন ব্যাগে করে। সোডার উপর কন্‌ট্রোল কিনা, অথচ ওরা অনেক চেষ্টা করেও পারমিট পায়নি এখনো। চোরাবাজারের সোডাই ভরসা। অথচ সরকারের কি মহিমা! এই নিয়ে পুলিশ রাতদিন জুলুম করছে। সেদিন রুক্মিণীকে এক পুলিশ আটকিয়ে একেবারে তার ব্যাগ চেপে ধরেছিল। রুক্মিণীও তেমনি মেয়ে। এমন কামড় দিয়েছিল পুলিসের হাতে যে সে প্রায় কাঁদে আর কি! ছাড়া পেয়ে রুক্মিণীও সোজা দৌড়। সেই থেকে সবাই ওকে পুলিশবিজয়িনী বলে ডাকে। কাজেই এ হেন সরকারকে না ঘাঁটানোই ভালো।

ছোট খাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেলল লক্ষ্মণ। হাত পা নেড়ে সুন্দর করে গুছিয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট করার মত করে কথা বলতে পারে সে। মানুষটা লম্বা গড়নের; কালো মুখখানা তেল চকচকে। চোখ দুটিতে বুদ্ধির ছাপ।

আশ্চর্য! লক্ষ্মণের কথা সবারই খুব মনে লেগে গেল। কল্যাণবাবু সবার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারলেন না। তার কথা মত কর্ম-পন্থা ঠিক করা হ'ল।

মীটিং শুরু হয়ে যাওয়ার পর পটল আস্তে আস্তে সরে পড়ল।

এখন আর তার এখানে কোন কাজ নেই। তার যত কাজ সব মীটিং শুরু হওয়ার আগে। খবরাখবর করা, ভদ্রলোকদের ডেকে এনে বসানো, এ সব কাজে সে অপরিহার্য।

এক ঘুঁটেউলীকে সন্ধান করে তাকে নিয়ে পটল এল মনোরমার ঘরে।

ঘুঁটে রাখুন বৌদি।

বাঁচালে ভাই তুমি! না-হলে, তোমার দাদাটি যে চরিত্রের লোক তাতে সত্যিই এ বেলা হাঁড়ী চড়ত কিনা সন্দেহ।

মনোরমা ঘুঁটে রাখার জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

পটল হেসে বলল: উপকার যখন স্বীকার করলেন তখন আর আপনার রক্ষে নেই বৌদি। এবার আপনাকে চা করে খাওয়াতে হবে।

'অরে একটু বোস ভাই। ঘুঁটেটা ধরিয়েনি।'

মনোরমার মেজাজ খারাপ থাকা আজকাল পুরোনো রোগে দাঁড়িয়েছে এসব ঝামেলা স্বামীর কল্যাণে তাঁকে অনেক সইতে হয়েছে। এখন আর ভাল লাগে না। কিন্তু ছেলেটার এমন আশ্চর্য স্বাভাবিক অনায়াস ব্যবহারকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

ঘুঁটেতে আগুন দিতে দিতে মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন: আচ্ছা লক্ষ্মী ভাইটি, তুমি কিছু কোরছ তো এখন?

সুনন্দা বঁটি নিয়ে তরকারী কুটছিল। পটলের উপস্থিতির প্রতি তার চরম ঔদাসীন্য! মায়ের মন্তব্যে বোধকরি একটু নারী-সুলভ কৌতুহল জাগায় লক্ষ্মীমন্তের মুখখানা এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল। কিন্তু তাইতেই পটলের কৌতুকোজ্জ্বল চোখের সঙ্গে তার চোখ মিলে গেল। পটল এইটুকুনই চাইছিল। তার বয়সের ছেলেরা কুমারী মেয়েদের দেখলে তাদের পিছনে লাগার একটা দুর্বার প্রয়োজন বোধ করে।

মনোরামার প্রশ্নের জবাবে পটল বলল: না বৌদি! প্রায় এক মাস হ'ল কলকাতা এসেছি। খোঁজাখুঁজির আর বাকি রাখিনি। কিন্তু কাজ পাচ্ছি না। তারপর এই খুকীটিই বুঝি আপনার বড় মেয়ে?

হাঁ,—মনোরমা বললেন, তারপর সুনন্দার দিকে তাকিয়ে: নে তো সুনন্দা। কেতলীটা নে। জল গরম হয়েছে। চা-টা করে ফেল্।

সুনন্দা চা করায় মনোযোগ দিল। পটল বলল: আপনার খুকীকে যদি ইস্কুলে দেন তো আমাকে বলবেন। ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।

ইস্কুলে দেব কিনা ঠিক নেই। খুকী তো সত্যিই আর নেই; ভাল ছেলে পেলে এবার ওকে বিয়ে দেব।

তা দিন বৌদি, কিন্তু ও এখনো নেহাৎ খুকী। নাক টিপলে দুধ বেরুবে।

সুনন্দার আর সহ্য হচ্ছিল না। এবার ফোরন কেটে বলল: আপনার যে কান টিপলেও দুধ বেরুবে মশাই।

পটল প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বীকার করে বলল: টিপেই দ্যাখ না! কিন্তু দুধ না বেরুলে কী দেবে?

তবে দু' কাপ চা দেব।

পটল পরম পরিতৃপ্তি সহকারে হেসে বলল: রাজী আছি।

মনোরমা কন্যাকে ধমক দিলেন: হাতের কাজ করতো দেখি, বোকা মেয়ে!

কী করা যায়! পরের ছেলে, মানুষটা অমায়িক। তার গ্রাম্য কৌতুক-গুলো গায়ে মাখার উপায় নেই।

বাড়ীর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় আসার জন্য এ বাড়ীর লোকের আগ্রহের অন্ত ছিল না। গবজ বড় বালাই। কিন্তু এত তোড়জোড় সব বৃথা গেল।

হাউস্ কমিটী তৈরী হওয়ার পরদিনই কল্যাণবাবু সকালবেলা রাজা-বাহাদুরের কাছে গেলেন। দেব-দর্শনের অনুমতি মিলল না। যার তার সঙ্গে দেখা করার মত অত সময় নেই তাঁর। তবে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হ'ল, কথাও হ'ল। নিখুঁত সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোকটি অমায়িক। জানালেন, উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাঁর কিছু করার নেই। বাড়ীটা অনেক ভাড়ায় নেওয়ার জন্য বিড়লা গোয়েঙ্কারা নাকি ঝুলোঝুলি কোরছে। এ সব বনেদী ব্যাপারের মধ্যে সাধারণ মানুষের নাক না গলানই ভাল। অপমানিত হওয়ার আগেই তাঁরা যদি অন্য বাড়ী খুঁজে নেন তো বুদ্ধিমানের কাজ হবে

দুই

এবার ঘরে ঘাইরে, পথে-ঘাটে ছোট বৈঠকে, বড় বৈঠকে, সর্বত্র রাতদিন বাড়ী-সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলল। কত যে প্রস্তাব উঠল তার ঠিক নেই। কিন্তু কোন প্রস্তাবই মনঃপূত হ'ল না। নতুন কোন কার্যক্রম আর নেওয়া গেল না। কাজেই যা স্বাভাবিক, বাড়ী নিয়ে দুশ্চিন্তা আস্তে আস্তে থিতিয়ে এল। এতগুলো বাড়ী উদ্বাস্তুরা দখল করে রয়েছে। সরকার কি আর হঠাৎই কিছু একটা করে বসবেন?

বাড়ী-সমস্যার কোন সুরাহা হ'ল না। তাই বলে কল্যাণবাবুও রেহাই পেলেন না। আড্ডায় পেয়ে বসল তাঁকে। সকালবেলা কল্যাণবাবু হয়তো ঘর থেকে বেরুলেন একা। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে যখন নীচে নামছেন তখন তাঁর সঙ্গে অন্ততঃ আধ ডজন সঙ্গী। এই সচল আড্ডাটি নিয়ে কল্যাণবাবু মিনিট তিনেক হেঁটে আসেন নিরুপদ্রবে। তারপর আসে ঘোষাল মশাইয়ের হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী। ঘোষাল মশাই কল্যাণবাবুর দেশের মানুষ। দেশে হেডমাষ্টার ছিলেন এক ইস্কুলের; এখানে আর কোন পথ না দেখতে পেয়ে হোমিওপ্যাথ্ হয়ে বসেছেন। বিদ্যাটা জানা ছিল আগেই। এককালে কংগ্রেস করেছেন কল্যাণবাবুর সঙ্গে। এ হেন ঘোষাল মশাইএর সাগ্রহ আহ্বান কল্যাণবাবু এড়িয়ে যাবেন কী করে? কাজেই সচল আড্ডাটি এখানে এসে অচল হয়।

বাড়ী থেকেই কল্যাণবাবু ঠিক করে আসেন ঘোষাল মশাইয়ের ওখানে পাঁচ মিনিটের বেশী বসবেন না। কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উঠবেই। সেটা ফেলে রেখে তো আর উঠে যেতে পারেন না চিন্তাশীল মানুষ কল্যাণবাবু। লোকে তা হলে ভাববে জবাব দিতে না পেরে পালিয়ে গেলেন।

কল্যাণবাবু এখনো অবশ্য নতুন করে জীবন আরম্ভের সঙ্কল্প ভোলেননি পাঁচজনের হুজুগে আর তিনি জড়াবেন না নিজেকে। সভা সমিতি, এ-

আন্দোলন সে-আন্দোলন অনেক হয়েছে, আর না। নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে হবে এবার। যদিও কী করবেন, চাকরী না ব্যবসা, তাও ঠিক হয়নি এখনো।

তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধু-ব্যবসায়ী বোস সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন বলে চিঠি দিয়েছিলেন একখানা। উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা। আলাপের নির্ধারিত তারিখটা আজকে। তবু ঘোষাল মশাইয়ের ডিস্পেন্সারীতে যথারীতি আটকে পড়তে হ'ল। ডিস্পেন্সারীতে আরও রয়েছে একজন অপরিচিত যুবক।

পাকা দেওয়াল টিনের ছাউনিযুক্ত একটি মলিন চেহারার ছোট্ট ঘরে ঘোষাল মশাইয়ের গরীবের ডাক্তারখানা। একটি টেবিল, পাশে রয়েছে খান দুই চেয়ার আর একটা লম্বা বেঞ্চি। গোটা দুই ওষুধের আলমারী রয়েছে দেওয়াল ঘেঁষে।

রজতকে তো চেনেন না বোধকরি কল্যাণবাবু? বললেন ঘোষাল মশাই: আসুন আলাপ করিয়ে দি। রজত বাগচী আর কল্যাণ সেন। রজতকে কিন্তু সাবধান। ওর শিং আছে—মানে ও বামপন্থী।

উৎসাহের আতিশয্যে কল্যাণবাবু রজতের হাত ধরলেন: তাই তো চাই আমি ঘোষাল মশাই। আমাদের এত বড় দেশ। সব লোক কি একই ছাঁচে ঢালা হবে? নানা মত থাকবে, নানা পথ থাকবে—তবে না জীবন বৈচিত্র্য।

রজত বলল: কল্যাণদা, আপনার কথা আগেই শুনেছি। আমাদের নিয়ে এবার একটা কিছু করুন।

লম্বা ঢ্যাঙা চেহারা ঘোষাল মশাইয়ের। পরনে আগাগোড়া খদ্দর। মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর আধময়লা পোষাক দেখে বোঝা যায় দেহের পারিপাট্যের দিকে তাঁর নজর নেই। তবু তাঁকে দেখলে আর তাঁর মুখের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা শুনলে মনে সম্ভ্রম জাগে। পক্ষান্তরে অল্পবয়সী রজত মানুষটি বেঁটেখাটো হলেও পোষাক পরিচ্ছদে একেবারে একটি নিখুঁত শহুরে ছোকরা।

তিনজনের মধ্যে অনেকক্ষণ কথা হল।

প্রথমে রাজনৈতিক তর্ক। শেষে সংস্কৃতি চক্র গড়ার প্রস্তাব।

আপনার মত লোক যখন পেয়েছি কল্যাণদা, তখন সহজে ছাড়ছি না। আসুন, এই পাড়াটাকে একটি আদর্শ উদ্বাস্তু পাড়া হিসেবে গড়ে তুলি আমরা। —রজতের কথা।

রজতের সঙ্গে আলাপ করে ভারী ভাল লাগল কল্যাণবাবুর। গল্পে গল্পে একটা বাজল। বোস সাহেবের কাছে যাওয়ার সময় পার হয়ে গিয়েছে।

এমনি করে কল্যাণবাবুর দিন কাটছে। ভাগ্যিস বাড়ীর ছেলেরা আছে,—ফাই ফরমাস খাটার জন্য সব সময় তৈরী,—তাই কল্যাণবাবুর বাড়ীর বাজারটা আসে নিয়মিত। না হ'লে তাও হ'ত না হয়তো।

সেদিন ঘোষাল মশাই বললেন : একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন কল্যাণবাবু! গভর্নমেণ্ট আজকাল কো-অপারেটিভ আন্দোলনের উপর খুব জোর দিয়েছেন।

চোখে আমার সবই পড়ে ঘোষাল মশাই।

তবে আসুননা, একটা কো-অপারেটিভ আমরা শুরু করি এ পাড়ায়। দেখছেন না, কলকাতায় এমন পাড়া নেই যেখানে একটা কো-অপারেটিভ নেই।

কল্যাণবাবু তবু উৎসাহ দেখান না।

পাঁচজনের ঝামেলার মধ্যে আমাকে আর জড়াবেন না ঘোষাল মশাই। দিন কতক একটু তফাতে থাকব ঠিক করেছি।

যেমন করে সংস্কৃতি-চক্রের কথা, গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রস্তাব কল্যাণবাবু চাপা দিয়েছেন, তেমনি করে এ প্রস্তাবটাও এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

সেদিন পটল-রবি-দীনেশের দল বাড়ীতেই পাকড়াও করল কল্যাণবাবুকে।

কতকাল আর বেকার থাকব বলুন তো কল্যাণদা?—পটল জিজ্ঞেস করল।

তাই তো হে, ঘোরা ফেরা করে মোটেই সময় পাচ্ছি না। কী যে করি তোমাদের জন্য!

ঘোরাফেরা থাক কল্যাণদা। আসুন আমরা একটা কো-অপারেটিভ করি।

ভাবতে দাও পটল। হুজুগে মেতে ওঠা ভাল নয়।

শেষটায় দেখা গেল, আড্ডায়, আলোচনায়, বৈঠকে সব জায়গাতেই কথা শেষ হয় সমবায় সমিতির প্রসঙ্গে এসে। হয়তো কথা উঠল, পাড়ায় একটা পঞ্চায়েত গড়ে তুললে কেমন হয়? নিশ্চয়ই ভাল হয়, কংগ্রেসী

শাসনের মূল নীতিই তো পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। কিন্তু তার আগে আসুন না, কল্যাণদা, আমরা একটা কো-অপারেটিভ করে হাত মক্স করি।

একদিন রজতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সংস্কৃতি চক্র নিয়ে। মাঝখানে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে হঠাৎ রজত প্রশ্ন করে বসল :

আচ্ছা, আপনি কংগ্রেসের এত ভক্ত, তবে একটা সমবায় সমিতি করছেন না কি জন্য এ পাড়ায়? ফল কি হবে জানি না—তবে চেষ্টা করে দেখায় দোষ কি?

এমনি সমবেত আক্রমণের মুখে কল্যাণবাবু একদিন হঠাৎ সমবায় সমিতিতে মত দিয়ে বসলেন।

তবে আসুন ঘোষাল মশাই। সমবায় সমিতিই একটা গড়ে তোলা যাক।

সেদিন কী যে মন খারাপ হয়ে গেল কল্যাণবাবুর! নতুন জায়গায় এসেছিলেন নতুন ভাবে নতুন করে জীবন আরম্ভ করার সংকল্প নিয়ে। কোথায় গেল সেই সংকল্প!—'দশ চক্রে ভগবান ভূত' যে কথায় বলে তাই হয়ে দাঁড়াল কল্যাণবাবুর ভাগ্যলিপি শেষ পর্যন্ত। মানুষ তাঁকে কেন এত ভালবাসে? কেন এমন করে টানে? এরা কো-অপারেটিভ করবে—বেশতো—তার জন্য কল্যাণবাবুকে এত টানাটানি করা কেন?

মানুষ তাঁকে এত ভালবাসে! তাদের দাবী উপেক্ষা করার শক্তি তাঁর নেই। কিন্তু তাঁরও যে সংসার আছে, স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে। কত কাল, আর কতকাল তিনি এঁদের নিয়ে ভেসে ভেসে বেড়াবেন?

তারপর কুড়ি পঁচিশ দিন ধরে কো-অপারেটিভ নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ঘোরা ফেরা করতে করতে কল্যাণবাবু একসময় ভুলে গেলেন যে কো-অপারেটিভটা তাঁর নিজস্ব ব্যবসা নয়। কাজের মধ্যে তিনি ডুবে গেলেন, নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। সভ্য সংগ্রহ করা, চাঁদা আদায় করা, রেজিষ্ট্রীর জন্য অফিসে অফিসে ঘোরা—কাজ নেহাৎ সোজা নয়। পটল ঘুরছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত। রজত, ঘোষাল মশাই, সুধীনবাবু, কালীকান্তবাবু, মনোরমবাবু সবাই তাঁকে সাহায্য করছেন যার যার অবকাশ অনুযায়ী।

অন্যান্য কাজ এগুচ্ছিল মন্দ নয়। কিন্তু কো-অপারেটিভ রেজিষ্ট্রীর সামান্য কাজ নিয়ে কল্যাণবাবু নাজেহাল হয়ে গেলেন। কী যে দীর্ঘ-সূত্রতা সরকারী অফিসের! দেশ স্বাধীন হওয়াতেও কোন উন্নতি নেই।।

রাগ করে মন্ত্রীর সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলেন কল্যাণবাবু। একখানা স্মারক-লিপি পেশ করলেন তাঁর হাতে অনেকগুলো শিল্প বিস্তারের পরিকল্পনা দিয়ে।

মন্ত্রী মশাই মিষ্টি করে হেসে বললেন: আপনাদের সহযোগিতার উপরেই তো জাতীয় সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। খুব খুশী হলাম আপনার স্মারক-লিপি পেয়ে।

কো-অপারেটিভের জন্য ঋণ পাব তো সরকার থেকে? কল্যাণবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে। এখন কিছু বলা যায় না।

মন্ত্রী মশাইয়ের অমায়িক ব্যবহারে ভারী খুশী হয়েছিলেন কল্যাণবাবুরা। এমন কি সমালোচনা-পটু রজত পর্যন্ত। কো-অপারেটিভ যাতে তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রি হয় সেজন্য একখানা চিঠিও লিখে দিয়েছেন তিনি।

কল্যাণবাবু ধরেই নিয়েছিলেন, কো-অপারেটিভ্ রেজিস্ট্রেসনের হাঙ্গামাটা মিটল এতদিনে। সংশ্লিষ্ট অফিস অবধি পৌছুতে যা দেরী। মন্ত্রী মশাইয়ের চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হবে চশমা-আঁটা হাঁড়িমুখোটার মুখের ওপর। তারপর বাকী থাকবে সেনট্রাল কোঅপারেটিভ থেকে কাপড়ের কোটা সংগ্রহ। সেজন্য ভাবনা নেই। সে-অফিসের কর্ণধারটি কল্যাণবাবুর বিশেষ পরিচিত। প্রাথমিক আশ্বাস তিনি দিয়েই রেখেছেন।

পরদিন কল্যাণবাবুরা সংশ্লিষ্ট অফিসে গেলেন। মন্ত্রীর চিঠিখানা দিতেই কেরাণীটি দস্তুর মত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এ-ফাইল ঘেঁটে, সে-টেবিল দেখে বেয়ারাকে ধম্‌কিয়ে ভূত ছাড়া করল। অবশেষে তাদের দরখাস্তখানা খোঁজ করে আনতে পারল সে।

বাবা! গভর্ণমেণ্ট অফিস এর নাম! সুঁচটিও হারাবার জো নেই। তবে ঐ যা মুস্কিল! কে যে কোথায় কী নিয়ে রাখে খুঁজে পাওয়া শক্ত। ঠিক আছে। কাল আসবেন আপনারা।'

আবার দেরী! কল্যাণবাবু শঙ্কিত হলেন!

কালকের জন্য আর ফেলে রাখবেন না স্যার! আজকেই চুকিয়ে দিন ঝামেলা। আমরা বরং অপেক্ষা করছি।

ঐ করেই তো কাজ খারাপ করেন আপনানারা।—স্বভাব সুলভ গভীর

বিয়ক্তির সঙ্গে ভদ্রলোক দরখাস্তখানার দিকে মনোযোগ দিলেন। এবারে মুখ তুলে একেবারে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন :

এ কী করেছেন আপনারা? ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের সার্টিফিকেট কোথায় দিয়েছেন মশাইরা? যান। যত সব অর্বাচীন বাঙালের পাল্লাই পড়েছি!

তাও লাগবে নাকি আবার?' কল্যাণবাবু শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, ওটা লাগবে বৈকি? ফোকটের কারবার নয়তো কো-অপারেটিভ! পয়সার ব্যাপার, পয়সার প্রমাণ দেখাতে হবে! বলে বলে যে শ্যাওলা পড়ে গেল ভদ্রলোকের মুখে! বুদ্ধি-সুদ্ধি কি সব পাকিস্তানে গচ্ছিত রেখে এসেছেন নাকি কল্যাণবাবুরা? কেবল হয়রাণ করা কাজের লোকদের! আড্ডাখানা বলে মনে করেন নাকি কল্যাবাবুরা সরকারী অফিসকে?

আশ্চর্য, এরা একবারে সব কথা বলবে না! একটা একটা করে বলবে, আর কথার ফোয়ারা ছোটাবে! সিঁড়ির উপর বিমর্ষ মুখে তাঁরা দাঁড়ালেন। কল্যাণবাবু আর রজত।

পিছন থেকে কল্যাবাবুর কাঁধে হাত রাখলেন কে। আগন্তুককে দেখেই কল্যাণবাবু সোৎসাহে তাঁর হাত চেপে ধরলেন।

'আরে সন্তোষ যে! আকাশ থেকে নাকি!

সন্তোষবাবু হাসলেন। আগাগোড়া শুভ্র খদ্দর মণ্ডিত, একেবারে ষ্ট্যাম্প মারা কংগ্রেস কর্মী। দীর্ঘ মাংসল চেহারায় প্রাচুর্যবানের ছাপ। সোনার ফ্রেমের চশমা চোখে।

রজতকে বুঝিয়ে দিলেন কল্যাণবাবু।

সন্তোষ মিত্র, রজত। ঢাকার নাম করা নেতা। আমাদের সহকর্মী সেই টেরোরিষ্ট আমল থেকে।

কল্যাণবাবুদের এ-অফিসে আসার উদ্দেশ্য শুনে সন্তোষবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আরে রাম! রেজিষ্ট্রেসনের জন্য একমাস ধরে ঘুরছ? এক দিনেরও তো কাজ নয় হে! কী নাম বললে তোমার সমিতির?

জনকল্যাণ।

আচ্ছা দাঁড়াও। এক মিনিট। তামাসাটা ছাখো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

লঘু ক্ষিপ্র পদে সন্তোষবাবু অফিসের মধ্যে ঢুকলেন। অনেক টেবিল

অবহেলায় পার হয়ে তিনি একটি কাঠের ফ্রেমে-ঘেরা কামরার ভিতরে অদৃশ্য হলেন। খানিক পরে দেখা গেল তাঁদের সেই কেরাণীটি হন্তদন্ত হয়ে সেইদিকে ছুটছে।

কল্যাণবাবুদের কাজ মিটতে আধ ঘণ্টাও লাগল না। সন্তোষবাবু তখুনি ছাড়লেন না কল্যাণবাবুকে। টানতে টানতে নিয়ে গেলেন নিকটবর্তী রেষ্টু-রেণ্টে। কী প্রতিপত্তি সন্তোষবাবুর সেখানে! স্বয়ং ম্যানেজার ছুটে এলেন অর্ডার নিতে।

ডবল ডিমের মামলেট আর চা—। সন্তোষবাবু অর্ডার দিলেন।

ভাল খেতে কল্যাণবাবু চিরদিনই ভালবাসেন। যদিও জোটে না আজকাল। খুশী হলেন তিনি।

সন্তোষবাবু গল্পের থলি খুলে বসলেন।

আমার সঙ্গে দু'চার দিন ঘোর কল্যাণ। প্রপার চ্যানেলগুলো চিনে নাও। কেরাণী ফেরাণীর কাছে গেলে একটা কাজের জন্য এক যুগ চলে যাবে হে। ...বলতে কি ভাই, এই করেই বেঁচে আছি। পারমিট বার করা আর বেচা! ব্যাস! অস্বীকার করব না, সংসার ভালই চলে যাচ্ছে।

কল্যাণবাবু এটা আগেই অনুমান করেছিলেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন। তোমার কাজের প্রশংসা করা যায় না হে সন্তোষ। এই সবের জন্যই আমাদের বদনাম হচ্ছে।

সন্তোষবাবু পকেট থেকে 'ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট'এর একটা টিন বের করলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে কৌটোটা দিলেন রজতের সামনে। কল্যাণবাবু সিগারেট-রসে বঞ্চিত।

ঠিক কথা বলেছ কল্যাণ। কিন্তু কী জানো, আমাদেরও স্ত্রীপুত্র আছে। এতকাল বাপ-দাদাদের উপর ফেলে রেখে জেলে গিয়ে পড়ে থেকেছি। সে-পথ এখন বন্ধ। রোজগার করতে হবে। অবশ্যি একেবারে অকর্মণ্য লোক আমরা নই। দেশের মানুষের নাড়ীর সঙ্গে আমাদের যোগ। বিদ্যা বুদ্ধিও একেবারে নেই একথা কেউ বলবে না। একটা জেলা-শাসনের ভার নেওয়ার যোগ্যতা আমরা অনেকেই রাখি। দুঃখের বিষয় আমাদের সরকার সব থেকে কম বিশ্বাস করেন আমাদের। সদ্য পাশ করে বার হয়েছে যে কুড়ি কুছরের ছোকরা—নাক টিপলে দুধ গলে—সে ভাখোগে আই-এ-এস্ হয়ে যাচ্ছে। তুমি

আমি নাকি সামান্য কেরাণীগিরিও পারি না! কি করব বল। চেনা জানা দশ-পাঁচ জন আছে। তাই ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি।

নীরবে শুনলেন কল্যাণবাবু। জবাব দিলেন না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই এ সব লোকের সঙ্গে। অধঃপতিত মানুষ অধঃপতনের সপক্ষে অনেক যুক্তি দিতে পারে। কল্যাণবাবুর পথ আলাদা।

অফিস থেকে যখন বেরিয়ে এলেন দু'জনেরই মনটা ভাল ছিল। যে ভাবেই হোক তবু তো কার্যোদ্ধার হয়েছে।

রজত বলল: চলুন না একবার কল্যাণদা, অমলেন্দুবাবুর কাছে।

রজতের কাছে অমলেন্দুর নাম বলেছিলেন কল্যাণবাবুই রজতদের সংস্কৃতি-চক্রের আলোচনা প্রসঙ্গে। কল্যাণবাবু জিনিসটাকে আমল দিতে চান না, তারাও ছাড়বে না। সংস্কৃতি-চক্রের সব প্রোগ্রাম এক সঙ্গে শুরু করা না যাক্ তো অন্ততঃ একটা মাসিক পত্রিকা তো বের করা যায় আপাততঃ।

এ সব হৈ চৈ-এ কল্যাণবাবু নিজেও ইতিপূর্বে অনেকবার জড়িয়ে গিয়েছেন। এর কোন ভবিষ্যৎ না থাক, উৎসাহটারও কি কোন দাম নেই তাই বলে? উৎসাহের সংক্রমণ থেকে কষ্টে আত্মরক্ষা করেছিলেন কল্যাণবাবু। সাংবাদিক বন্ধু অমলেন্দুর নামটা উল্লেখ করেছিলেন সেই সময়েই।

কল্যাণবাবু বললেন: পত্রিকার ভূত তোমার ঘাড় থেকে নামবে না দেখছি রজত। আচ্ছা, চল তবে।

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের একটি স্যাঁৎসেঁতে মেসের দোতলায় অমলেন্দুকে পাওয়া গেল। ছোট্ট লম্বা আকারের একটি ঘরে অমলেন্দু একা থাকেন। এ-মেসের পুরানো খদ্দের তিনি। ঘরে একখানি তক্তোপোষ পাতা। তা ছাড়া আছে একটি টেবিল আর একখানা চেয়ার। টেবিলটাও পড়ার জন্য নয়, চেয়ারটাও বসবার জন্য নয়। অনেকগুলো নানা সাইজের বই সেগুলোর উপর চাপানো রয়েছে। শুধু তাই নয়। অবশিষ্ট সামান্য খালি মেঝেটুকুর উপর মাদুর বিছিয়ে বইয়ের আস্তানা করে দেওয়া হয়েছে। থরে থরে বই অনেক দূর অবধি উঁচু হ'য়ে উঠেছে। কত বইকে আঁটানো যায় এ'টুকু ঘরের মধ্যে তাঁরই যেন পরীক্ষা করছেন অমলেন্দুবাবু।

কলহাস্যে কল্যাণবাবুকে অভ্যর্থনা করলেন অমলেন্দুবাবু। চৌকির উপরেই বসলেন দু'জনে।

কার মুখ দেখছি? এত ভাগ্য কপালে সইবে তো?—একেবারে সশরীরে কল্যাণের আবির্ভাব গরীবের ঘরে?—অমলেন্দু প্রগলভ হ'য়ে উঠলেন প্রায়।

কল্যাণবাবু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন: যাও! যাও! অত আর বলতে হবে না! একবার খোঁজ নাও না বেঁচে আছি কি নেই, তার আবার কথা!

কংগ্রেসী রাজনীতি যারা করে তাদের তো এখন আর মরার কথা নেই। শুধু বাঁচবার কথা।

আর যায় কোথায়? মুহূর্তের মধ্যে দুই বন্ধুতে তুমুল রাজনৈতিক তর্ক শুরু হ'য়ে গেল। এটা তাঁদের চিরকালের অভ্যাস। দেখা হলেই অন্তর্বর্তী-কালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে এক চোট বাক-যুদ্ধ তাঁদের মধ্যে হবেই। রণক্ষেত্রে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেন না তাঁরা। বাছা বাছা সুবিন্যস্ত বাক্য জালে তাঁরা পরস্পরকে বিদ্ধ করেন। আশ্চয, বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না তাতে। নষ্ট হয় না পারস্পরিক শুভ কামনা।

ঘোষ মন্ত্রীসভার ফেরিওয়ালা-উচ্ছেদ আর বাড়ী-দখল অর্ডিন্যান্স থেকে শুরু করে নিতান্ত হালের বিনা-বিচারে আটক আইনের বিল অবধি কোন প্রসঙ্গই বাদ গেল না। তৃতীয় ব্যক্তি রজতের কথা প্রায় ভুলেই গেলেন তাঁরা। ভাগ্যিস ভালই লাগছিল রজতের এ আলোচনা!

শেষটায় অমলেন্দুই প্রসঙ্গান্তরে এলেন: বাজে কথা থাক, কল্যাণ। তারপর কী করছ? মানে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কী করছ?

অনুমান কর, বন্ধু।

ঐ ক্ষমতাটাই যে নেই। থাকলে তবু তো কবি হতে পারতাম।

কবি-কল্পনা লাগবে কি জন্য? আজকাল মানুষের একটা কাজই করার আছে। কো-অপারেটিভ।

সে কী? কো-অপারেটিভ করে তুমি জীবিকার সংস্থান করবে?

নয় কেন?

চুরি-টুরির মতলব আছে নাকি?

কল্যাণবাবুর চোখে অগ্ন্যুৎপাতের আশঙ্কা প্রকাশ পেল। অমলেন্দু তাড়াতাড়ি আবার বললেন:

সে তুমি পারবে না জানি। সেই জন্যই আশঙ্কা। চুরি ছাড়া কোন সুবিধে হবে না তো কো-অপারেটিভে।

না বললে যখন ছাড়বে না তখন শোনো। কো-অপারেটিভ হল এমন এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার যার ভিতর দিয়ে তোমাদের বহুল প্রচারিত সাম্যবাদ পত্তন হবে দেশে। একেবারে গান্ধীয়ান্ মেথড্! বিনা রক্তপাতে কার্যোদ্ধার! দেশের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানার মালিকানা আস্তে আস্তে জনসাধারণের হাতে চলে যাবে। ব্যক্তিগত পুঁজির আর কোন পাত্তাই থাকবে না।

তুমি বিশ্বাস করো এমন আরব্যোপন্যাস?

করি।

তবে শোন, কল্যাণ। পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মত অনেক কো-অপারেটিভ গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি লিখে দিচ্ছি, আর ছ'মাস পরে এদের একটিরও অস্তিত্ব থাকবে না। কাপড়ের কোটার আবার ভবিষ্যৎ! আমার কথা শোন কল্যাণ, এ সব হুজুগ করো আপত্তি নেই। কিন্তু পেটের জন্য সময় থাকতে একটা কিছু জুটিয়ে নাও।

অর্বাচীনের সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি? কল্যাণবাবু নিঃশব্দে প্রসঙ্গান্তরে গেলেন।

আসল কথাই ভুলে বসে আছি অমলেন্দু। এই বন্ধুটির জন্যেই তোমার কাছে আসা। এঁর নাম রজত বাগচী। (রজত এবং অমলেন্দু নমস্কার বিনিময় করলেন)। এঁদের একটা পত্রিকা বার করার শখ। তোমার থেকে কদ্দুর কী সাহায্য পাওয়া সম্ভব একটু বলে দাও।

অমলেন্দুবাবু রজতকে প্রশ্ন করলেন: পত্রিকা বের করবেন? কী ধরণের পত্রিক?

একেবারে নির্ভেজাল সাহিত্যের কাগজ।

সরকারের পক্ষের, না, বিপক্ষের?

সাহিত্যের বেলায় সে-প্রশ্ন ওঠে কি?

ওঠে বলেই তো জিজ্ঞেস করছি। রজতবাবু রূপকথার গল্প লিখলে বা আকবর বাদশার হারেমের গল্প লিখলে প্রশ্ন না-ও উঠতে পারে। কিন্তু ১৯৪৭-এর গল্প লিখতে গেলে প্রশ্ন উঠবে। খাওয়ার মধ্যেও যে আজকাল

রাজনীতি রজতবাবু। সেইখানেই মুস্কিল। যদি সরকারের পক্ষে লেখেন তবে তা অনাবশ্যক ; যদি বিপক্ষে লেখেন তবে তা বিপজ্জনক। আটক আইনের শিকার হয়ে লাভ কি রজতবাবু?

সংক্ষিপ্ত ধারালো যুক্তি। কি বলা যায়—রজত মনে মনে ভাবতে লাগল। আসলে লোকটিকে রজতের খুব ভাল লেগেছে। যুক্তিটাও। কিন্তু পরিত্রাণের পথও তো চাই।

ইত্যবসরে কল্যাণবাবু এক কাজ করে বসলেন। রজতের হাত ধরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন : ও ব্যাটা সীনিকের কথা তুমি শোন রজত? চলে এস আমার সঙ্গে। তোমার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

রজতকে টানতে টানতে কল্যাণবাবু দরজা পার হলেন। পিছন থেকে দীর্ঘ-দেহ অমলেন্দু লম্বা মুখে হাসলেন।

কিন্তু কল্যাণবাবু মনের মধ্যে অভিযোগ নিয়ে ফিরে যাবেন তা কি ভাল হয়? অমলেন্দুকে উঠতে হল। কল্যাণবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে বিদায় দেবার সময় বললেন : আর একদিন এস কল্যাণ। পত্রিকার বিষয়টা আর একটু ভাল করে ভেবে দেখা যাবে।

এটা যে নেহাৎ মন-রাখা কথা অমলেন্দু তা জেনে শুনেই বললেন। কল্যাণও আশা করা যায় তা বুঝতে দেরী করবে না। তবু কল্যাণ নিশ্চয়ই একটু খুশী হ'ল কথাটা শুনে। আমরা সবাই সময় সময় মন-রাখা কথা শুনতে ভালবাসি। চাঁচা ছোলা সত্যি কথা দিয়ে দৈনন্দিন জীবন চলে না।

অমলেন্দুবাবু ঘরে ফিরে এসে যখন তক্তোপোশের উপর তাঁর অভ্যস্ত জায়গাতে বসলেন তখন তিনি গুণ গুণ করে একটা হারনো রোমান্টিক গানের কলি ভাজছেন। সচেতন হয়ে হাসলেন একটু মনে মনে। বিপ্লব যাঁর পেশা তাঁর মুখে আবার বসন্ত রাত্রির গান জাগে কেন? আসলে মানুষের মন এক আজব কারখানা। এ-কারখানার বাই-প্রোডাক্ট এত বেশী, যে আসল প্রোডাক্ট যে কী তা খুঁজে বের করাই মুস্কিল।

তা যদি না হত তা হলে এই সময়ে তাঁর মনে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করা উচিত ছিল। অথচ চেষ্টা করেও বিরক্তি বোধটাকে মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যাচ্ছে না।' কল্যাণ এসে মিছিমিছি তাঁর দেড় ঘণ্টা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেল। অথচ একটা জরুরী লেখা তাঁকে আজকেই শেষ করতে হবে।

কালকেই পত্রিকার অফিসে দিয়ে আসতে হবে। এমন একটা বিষয় যা নিয়ে লিখতে হ'লে দু-একখানা বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। যে সময়ে সময় এতটা মূল্যবান সে সময়ে সময় নষ্ট হ'ল বলে বিরক্তি বোধ হচ্ছে না এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

অথচ কল্যাণের সঙ্গে রাজনৈতিক তর্ক করার চেয়ে অর্থহীন কাজ আর কী হতে পারে! তিনি ভাল করেই জানেন কল্যাণ জীবনে কোনদিন বদলাবে না। ও জাতের মানুষ সুযুক্তি স্বীকার করে না, অভিজ্ঞতা থেকে শেখে না। তথাপি কেন কল্যাণবাবুর সঙ্গে তর্ক করা? যে লোকটিকে দেখলে অত সজীব আর জীবনীশক্তি পূর্ণ বলে মনে হয়, সে লোকটির চিন্তার মধ্যে কী পরিমাণে শিশু-সুলভ অজ্ঞতা রয়েছে তা দেখতে মজা লাগে বলে? যুক্তির জবাব দিতে না পেরে কল্যাণ যখন রেগে যায় তখন দৃশ্যটা খুব উপভোগ্য হয় বলে?

হয়তো তাই। এমন-সব ঘটনা ও চরিত্র অমলেন্দুর মনের অনেকখানি জুড়ে বসে থকে বিপ্লবী হিসাবে তাঁর কাছে যে-সবের কোন দাম নেই। কোনদিন যদি দেশে সত্যিই সমাজতন্ত্রবাদ আসে তবে এ-সব নিয়ে অমলেন্দু একখানা বই লিখতে পারবেন। আজ এ-সবের কোন প্রয়োজন নেই। আজ এমন দিন যে প্রয়োজনের বাইরে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ নেই।

মনে মনে হাসলেন অমলেন্দুবাবু। এ নিয়ে আত্ম সমালোচনা করে তিনি নিজেকে পীড়িত করেন না। তিনি জানেন এটা তাঁর প্রকৃতি।

সেই জন্যই বোধ করি তাঁর উপর সাংবাদিকতার ভার পড়েছে। যে মানুষ একদিন বোমা পিস্তল নিয়ে ঘুরেছে, পলাতক অবস্থায় থেকে অনায়াসে পুলিসের চোখের উপর দিয়ে কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট পরিচালনা করেছে, সে মানুষ আজ কলম হাতে নিয়ে ভদ্দর লোকের পেশা ধরেছে।

সাংবাদিকতায় রোমাঞ্চ নেই। মনে হয় আসল কাজ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তবু তাই ভাল। কোন আপশোস নেই অমলেন্দুর মনে।

মাণিকতলা ব্রীজটা পেরিয়ে প্রথম যে স্টপে বাসটা থামে সেইখানে নেমে পড়লেন কল্যাণবাবু রজতকে নিয়ে। তাঁরা বাঁদিকের রাস্তা ধরলেন। রাস্তাটা

চওড়া : কিন্তু অযত্ন আর লড়ির উৎপাতে মাঝে মাঝে খাদ খন্দ তৈরী হয়েছে। অসতর্ক পথিক না দেখে শুনে পা ফেললে পা মচকে যাওয়ার আশঙ্কা। তবে এটা যে পীচের রাস্তা তা মাঝে মাঝে কালো দাগ দেখে অনুমান করা যায়। রাত আটটা বেজে গিয়েছে। গলির মধ্যে রাস্তার আলোর তেজ কম বলে আর দোকানপাটের বিশেষ জৌলুষ নেই বলে চাঁদের আলোকে চিনতে পারা যাচ্ছে। চাঁদের আলো পড়েছে মুসলমান-বস্তির খোলার ঘরগুলোর ছাদে। বড় বড় কারখানার শেডগুলোর টিনের চাল থেকে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এটা কারখানা অঞ্চল। সাবান আর কেমিক্যালসের কারখানাই অবশ্য বেশী।

শীতের আকাশে কুয়াশার পুরু আস্তরণ। দূরের লাইট পোষ্টগুলোকে ঘিরে কুয়াশারা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। শীত পড়েছে বেশ। খদ্দরের মোটা চাদরখানা গায়ে জড়িয়েও কল্যাণবাবুর শীত শীত করছে।

মনটা আজ ভাল আছে। কাজ কিছু এগিয়েছে। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। রজত নিশ্চয়ই বুঝেছে কল্যাণদা একেবারে বাজে লোক নয়, কিছু কিছু লোক ওঁকে চেনে।

তবু একটু অপরাধ-বোধের কাঁটা মনের একটা দুর্বল জায়গায় খচ্ খচ্ করে বিঁধছে। কেমন একটা বিশ্রী অনুভূতি—যেন পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখে এসেছেন! সকলের মুক্তির মাঝে নিজের মুক্তি খুব ভাল জিনিস। কিন্তু যদি সে মুক্তি আসতে দেরী হয়? দেরী হলেও সকলে কোন অভিযোগ জানাবে না। কিন্তু বাড়িতে যারা আছে তারা মুখে কিছু না বললেও, ক্ষুধা-রাক্ষুসী কলরব করে তা জানিয়ে দিতে ছাড়বে না।

বোধ করি মনের এই কাঁটাটাকে বার করে ফেলার জন্যই কল্যাণবাবু বললেন : সামনে কঠিন সংগ্রাম। কিন্তু আসবে, নিশ্চয় আসবে। এ বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ রেখ না রজত।

কী আসবে?

উন্নতি। দেশের উন্নতি।

•

দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন কল্যাণবাবু। ফিরলেন রাত আটটার পরে।

সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমাদের কো-অপারেটিভ বুঝি আজ রেজিষ্ট্রি হ'ল?

শুনেছ যখন তখন আর জিজ্ঞেস করছ কেন?

গরজ কিনা আমার, তাই মুখ পুড়লেও জিজ্ঞেস না করে পারি না। তা হলে ছেলে মেয়ে নিয়ে এবার কোন্ গাছতলায় দাঁড়াব দেখিয়ে দাও।

মৃদু, কিন্তু থমথমে, রূঢ় গলা মনোরমার। কল্যাণবাবু বুঝলেন, মনোরমা আজকে সহজে ক্ষ্যান্ত হবে না। কী যে বিরক্তিকর লাগে স্ত্রীর সঙ্গে এই কথা কাটাকাটি। তবু ভাবলেন, স্ত্রীকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্য। স্ত্রী হলেও তো মেয়েমানুষ,—বুঝিয়ে না দিলে বুঝবে কী করে জটিল বিষয়?

শোন রমা, কো-অপারেটিভ কি জিনিস জান না; তাই এসব বলছ। এটা হচ্ছে এখন কংগ্রেসের প্রধান প্রোগ্রাম। কালে কালে এই কো-অপারেটিভ দোকান চালাবে, আমদানি রপ্তানি করবে, কল-কারখানা বসাবে। দেশের সরকার পেছনে থাকলে সবই সম্ভব। আর তখন ব্যক্তিগত ব্যবসা বলে কিছু থাকবে না, কো-অপারেটিভের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফেল পড়ে যাবে সব। কাজেই ভেবে ছ্যাখ, আমি যদি নিজে কোন কারবার দিই, তার আয়ু বড় জোর পাঁচ বছর। কিন্তু সমবায় সমিতি চিরকাল থাকবে।

গম্ভীর, ভারিক্কি গলায় বললেন কল্যাণবাবু। এ-বাড়ীর যে-কোন লোক মুগ্ধ হয়ে শুনত। অথচ তাঁর নিজের স্ত্রী মনোরমা, আশ্চর্য, হাসল ঠোঁট বেঁকিয়ে! পিত্তি জ্বলে গেল কল্যাণবাবুর।

তুমি হাসছ রমা? আমি হাসির কথা বললাম তোমাকে?

মনোরমা তৎক্ষণাৎ মিথ্যে কথা বললেন: না হাসব কেন? নতুন কথা তো নয়, সমিতি তো আজ নতুন করবে না তুমি। বন্যা-ত্রাণ, অবলা-বান্ধব, শিশু-তোষিনী, হরিজন-উন্নয়ন—তার সঙ্গে আজ যোগ হ'ল সমবায়। কিন্তু তাতে আমাদের কি?

ভুলে যেও না রমা, তখন দেশ ছিল বিদেশীর হাতে। আর এখন? এখন সরকার আমাদের হাতে। সমবায় আন্দোলনে সকলের উপকার হবে।

পাঁচজনের উপকার হলেও হতে পারে; কিন্তু তাতে আমাদের কি?

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না কল্যাণবাবু। কী নীচ

পাগলামী জীবনে অনেক চলেছে; আরও চলতে দিলে বর্তমান দুনিয়া তা সহ্য করবে না। তাই এত কথা বলা!

মনোরমার উত্তপ্ত হিংস্র চোখ-দুটো আস্তে আস্তে শান্ত নিস্তেজ হয়ে এল। চোখের কোণে চিক্-চিক্ করে উঠল এক ফোঁটা জল। মনোরমার জীবনে এটা অভাবনীয়। ভারী শক্ত মেয়ে তিনি। অনেক ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও ছেলে-মেয়েরা মনোরমাকে কোন দিন কাঁদতে, এমন কি ফুঁপিয়ে কথা বলতে দেখেনি।

দেবু মেঝেয় শুয়ে ছিল। উঠে মার দিকে তাকিয়ে হা করে ফেলল। সুনন্দা লণ্ঠনের সামনে বসে শশধর দত্তের মোহন সিরিজের একখানা বই পড়ছিল। বাবার কথায় চমকে উঠে মার দিকে তাকালো। মার চোখে জল! মোহন তার অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে গেল মনের আকাশ থেকে। কী যেন একটা ডেলা গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে বেরিয়ে আসার জন্য আঁকুপাঁকু করতে লাগল সুনন্দার! আর টুনি কাগজ ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঘরের এই আকস্মিক নিস্তব্ধতায় কী ভাবল সে-ই জানে—হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।

পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে সুধীনবাবুর ঘর পেরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল সুনন্দা। রাত অনেক হয়েছে। অধিকাংশ ঘরে আলো নিবে গিয়েছে, নয়তো দরজা বন্ধ হয়েছে। চাঁদহীন আকাশে তারার সমারোহ। আসন্ন বসন্ত রাতের হাল্কা কুয়াসায় ম্রিয়মাণ।

এত খারাপ লাগে মা আর বাবার এই ঝগড়া! কি রূঢ় কর্কশ ভাষায় কথা বলেন সংসার-জ্ঞানহীন বাবা! কী করে যে সংসার চলবে, কীভাবে যে দিন যাবে, কোনদিন ভেবে দেখলেন না। শুয়োরের মত গোঁ ধরে ছুটে চলেছেন ঠিক যেখানটায় কাঁটা ঝোঁপ আছে। অথচ সদ্‌বুদ্ধি দিতে গেলে নেবেন না বরং রেগে আত্মহারা হয়ে যা নয় তাই বলবেন। অসীম সহিষ্ণুতা মার, তাই আজও সামলিয়ে চলছেন এই বৃদ্ধ শিশুটিকে।

সুনন্দা ছাদে উঠে এল। তারার অস্পষ্ট আলোয় প্রকাণ্ড ছাদটার সবুজ অমসৃণ মেঝেটাকে মনে হচ্ছে যেন এক অতিকায় ঘুমন্ত পুরুষের অনাবৃত রোমশ বুক। আকাশে স্থানে স্থানে শাদা নির্জল মেঘের অতি সূক্ষ্ম আস্তরণ। স্বপ্নের কুয়াশার মত পাতলা। পাখীর পালকের মত শাদা। আর

তারই আড়াল থেকে মুখবন্ধ মুক্তার বোতামের মত তারাগুলো মিটমিট করে হাসছে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পৃথিবীর মানুষদের। কিন্তু সেই অপরূপ তারাদের দিকে এক নজর তাকিয়েই সুনন্দা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে আনল। আকাশের ঐ অপরূপ লুডোর গুটিগুলোর মত সুন্দর কোন জিনিস নেই এ পৃথিবীতে। তথাপি সুনন্দা ভাল করেই জানে ঐ তারাগুলোকে পাওয়া যায় না। আমাদের মাটির বাড়িতে পিলসুজের উপরে যে মাটির প্রদীপটি জ্বলে তার কালো ধোঁয়ায় জড়ানো লালচে আলো তারাগুলোর সঙ্গে তুলনায় একটুও সুন্দর নয়। কিন্তু প্রদীপের আলো মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। ঐ আলো দিয়ে আমরা আমাদের ছোট্ট ঘরের অন্ধকার দূর করতে পারি।

মানুষের যত আদর্শবাদ সমস্ত ঐ তারাগুলোর মত স্বপ্নিল কুয়াশা। সংসারের বাস্তব প্রয়োজনগুলো নিষ্ঠুর রূঢ় সত্য। মানুষের অস্তিত্ব যেখানে সত্য, সেখানে ঐ তারাগুলো নয়, মাটির প্রদীপটাই সত্য। ছোটবেলা থেকেই বাবা আর মার মধ্যেকার নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব দেখে সুনন্দা এই কথাগুলো শিখেছে। সে দেখেছে, বাবা যখন দেশ আর জাতির বড় বড় চিন্তা নিয়ে ব্যাপৃত, তখন কী অনিশ্চয়তা আর দুশ্চিন্তার মধ্যেই না মার দিনরাতগুলো কেটেছে। সেই দুশ্চিন্তা, সেই লজ্জার ভাগ নিতে হয়েছে সুনন্দাকেও। টাকা ধারের অনুরোধ জানিয়ে মা চিঠি দিয়েছেন, আর সেই চিঠি বহন করে সুনন্দা যখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়েছে, তখন তার সেই কালো মুখখানা দেখে সুনন্দা গভীর লজ্জার সঙ্গে অনুভব করেছে এই সব সংসারী লোকগুলোর তুলনায় বাবা কত অন্তঃসার শূন্য। এইভাবে ধীরে ধীরে এক সঙ্কীর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, সমস্ত ভাবালুতার বিরুদ্ধে এক তীব্র বিজাতীয় বিদ্বেষ সুনন্দার চিত্তে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে।

কী নিদারুণ অবিচার বিধাতার। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি আর বিবেচনার অধিকারিণী হ'ল যারা, নিষ্ঠুর আবয়বিক ষড়যন্ত্রে তারা হ'ল কিনা বর্বর পুরুষের অধীন! সুনন্দা জানে, সন্দেহাতীতভাবে জানে, মার জীবন-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তারও ভবিষ্যৎ জীবনের বিধিলিপি। তারও বিয়ে হলে হয়তো হবে পটলেরই মত কোন এক আকাট মূর্খ ছেলের সঙ্গে। (লেখাপড়া শিখলেই মূর্খামি ঘোচে না।) তারপর সারাজীবন আঁচল দিয়ে আগ্‌লিয়ে চলো

সেই ছেলের পর্বত-প্রমাণ ভুল ভ্রান্তি! নিজের কাজ নেই, সারা বাড়ীর লোকের কাজ করে চলেছে পটলদা। পরোপকার? না, অর্বাচীনতা! একই বিধাতা বাবা আর ঐ পটলদাকে গড়েছিলেন একই ছাঁচে ঢেলে। ভাবতে গেলেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে! না, পটলের মত ছেলেকে সুনন্দা কখনো বিয়ে করবে না। বিয়ে না হলেও না। মায়ের ভুলের পুনরাবৃত্তি সে করবে না।

তিন

এ বাড়ীতে উপরতলা আর নীচতলার বাসিন্দাদের মধ্যে কোন দিনই খুব নিবিড় যোগাযোগ হয়নি। এক এক সময়ে সাধারণ সমস্যার চাপে তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসেছে, আবার যথাসময়ে দূরে সরে গেছে। উপরতলার লোকেরা ভাবে, নীচতলার ধোবারা খুব সুখী। তাদের খরচ কম, জরিমানার বালাই নেই; অথচ কাপড় ধোয়ার আয় কলকাতায় ভাল। আবার নীচতলার লোকেরা ভাবে, বেশ আছে উপরতলার বাবুরা। পৈতৃক বিত্ত আছে সম্বল; তা ছাড়া মাস গেলে বাঁধা মাইনে।

কলকাতায় ধোবাদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল হলেও পাকিস্তান থেকে যারা এসেছিল, তারা সেই অনায়াস জীবন-যাত্রার সন্ধান পায়নি এখনো। তাদের অনেক সমস্যা। অজানা অচেনা দেশে এসে জায়গা নির্বাচন করতে করতেই হিম্-সিম্ খেয়ে গেছে অনেকে। কাপড় কাচার জন্য পুকুর, কাপড় মেলে দেওয়ার জন্য খোলা জায়গা, আর এ-সবের লাগালাগি বসত বাড়ী—এ তিনের যোগাযোগ সোজা নয়! তারপর আছে ব্যবসায় আরম্ভের প্রাথমিক প্রস্তুতির টুকিটাকি প্রয়োজন, কাপড় আছ্ড়ানোর তক্তা, গোটাকয়েক বড় গামলা, ইস্ত্রি ইত্যাদি। সোডা সংগ্রহ একটা বড় সমস্যা। সোডা সরকারের কন্ট্রোলভুক্ত, নবাগন্তুক বলে পার্মিট ওরা সহজে পায় না। চোরাবাজারে সোডা সংগ্রহ করার ঝামেলা অনেক। সর্বোপরি রয়েছে খদ্দেরের প্রশ্ন। পাকিস্তানের নবাগন্তুক ভদ্রলোকেরাই ওদের সম্ভাব্য খদ্দের। পুরোনো বাসিন্দাদের তো পুরোনো ধোবা রয়েছেই। প্রতিযোগিতায় দাম কমাতে হয়। এতদূর এগিয়েও তবু সমস্যার হাত থেকে রেহাই নেই। মাস-কাবার না হলে কাপড় ধোয়ার দাম পাওয়া যায় না; মাস কাবারেও সবাই ষোল আনা মিটিয়ে দেয় না। পাকিস্তানের ভদ্রলোকদের রোজগার অনিশ্চিত, বসবাস অস্থায়ী; ধোবার প্রাপ্য ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েন অনেকে। কঠোর কায়িক পরিশ্রমের টাকা খরচা সুদ্ধ মারা যায় অনায়াসে।

অথচ যতদিন পর্যন্ত না নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ঘরে ফিরে আসছে, ততদিন পর্যন্ত ঘরের টাকায় সংসার চালিয়ে যেতে হবে। ব্যবসা আরম্ভের পর এই সময়ের নিম্নতম পরিমাণ তিন মাস, সময়ে আরও বেশী। তা ছাড়া, ব্যবসা আরম্ভের আগেও অনেক সময় যায়। এই দীর্ঘ সময় ধরে সংসার-তরণী চালিয়ে নেওয়ার মত সঞ্চিত বিত্ত পাকিস্তান থেকে অনেকেই নিয়ে আসতে পারে নি। অচল অবস্থা দেখা দেয় তাদের জীবনে।

এ-বাড়ীতে ধোবাদের মধ্যে সবচেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণ। পাকিস্তান থেকে আসার সময় সে যে অন্যের তুলনায় খুব বেশী কিছু একটা পুঁজি সঙ্গে করে এনেছিল এমন নয়। কিন্তু সে অদ্ভুত রকমের করিৎ-কর্মা লোক। পাকিস্তান থেকে এসে শহর দেখার মোহে বা সাময়িক অনিশ্চয়তার দরুণ একটা দিনও সে নষ্ট করেনি। জায়গা নিয়েছিল এ পাড়ারই একটি খোলার বস্তিতে। কতকগুলো সুবিধেও পেয়েছিল সে। শুরুতেই দুটো ডাইংক্লীনিংয়ের কাজ সে হাতে পেয়েছিল। ডাইংক্লীনিংগুলোর কাজ প্রচুর, যদিও মুনাফা কম। দাম মিটিয়ে দেয় তারা অনেক তাড়াতাড়ি।

একটি ডাইংক্লীনিংয়ের শুভ্র খদ্দর-মণ্ডিত মালিকের সঙ্গে লক্ষ্মণ সহজেই ঘনিষ্ঠতা করে ফেলেছিল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানে লক্ষ্মণ। সে খবর নিয়ে জানতে পারল, এই সুবেশ ভদ্রলোকটির ডাইংক্লীনিং-টি একটি লোক দেখানো ব্যাপার মাত্র। তাঁর আসল কাজ পার্মিট বের করা এবং বেচা। সোডার পার্মিটও বের করেন ভদ্রলোক। স্বভাবতঃই ভদ্রলোকের সঙ্গে জুটে সে বার দু'য়েক স্বল্প পরিমাণের কণ্ট্রোলের সোডা বের করতে পেরেছিল। তৃতীয় বারে ভদ্রলোক একটি মোটা পার্মিট বের করার প্রস্তাব আনেন লক্ষ্মণের কাছে। লক্ষ্মণ প্রতিবেশী ধোবাদের সঙ্গে জুটে প্রাথমিক প্রয়োজন গোটা পঞ্চাশেক টাকা চাঁদাও তুলে দেয় ভদ্রলোকের হাতে। কিন্তু লক্ষ্মণের সূক্ষ্ম দূরদর্শিতা ভদ্রলোককে হার মানালো। পার্মিট সম্পর্কে চূড়ান্ত খবর প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগে ভদ্রলোকের সততা সম্পর্কে লক্ষ্মণ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। গোপনে খবর নিয়ে জানতে পারল, পার্মিটের খদ্দের ভদ্রলোকের তৈরীই আছে; ধোবারা সোডার বস্তাগুলোর চেহারাও দেখতে পাবে না। কিছুই বুঝতে দিল না সে ভদ্রলোককে। আস্তে আস্তে দু'তিন কিস্তিতে ভদ্রলোকের ডাইংক্লীনিংয়ের শ' খানেক কাপড়

সে আটকিয়ে ফেলল। যথাসময় ভদ্রলোক পার্মিটটি মেরে দিলেন, সে-ও কাপড়গুলো মেরে দিল। যে-ধোবারা চাঁদা দিয়েছিল, লক্ষ্মণ তাদের ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিল। ভদ্রলোকটি তখন নিরুদ্দিষ্ট, ডাইংক্লীনিং হস্তান্তরিত।

সেই কাপড়গুলো বিক্রি করে লক্ষ্মণের হাতে যে পুঁজি জমল তাই দিয়ে সে সোডার চোরা কারবার শুরু করে দিল। প্রতিবেশী ধোবা-বৌরা হ'ল তার বিশ্বস্ত সহচর। রুক্মিণী, কৃষ্ণা, সুভদ্রা এবং আরও অনেকে। এদের মধ্যে হরেকেষ্টর বৌ রুক্মিণীই অসাধারণ পটুত্ব দেখাতে পেরেছে অল্পদিনের মধ্যে। পুলিশের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে দূরান্তর থেকে ট্রাম-বাসের পথ পার হয়ে এরা সোডা নিয়ে আসে র্যাশন ব্যাগে ক'রে এবং যথাস্থানে পৌছে দেয়। টাকা পয়সার লেন-দেনটা লক্ষ্মণ নিজের হাতে করে। আগাম কারবারে অসুবিধে নেই। মেয়েদের মুনাফার অংশ দেয় সামান্যই।

লক্ষ্মণ এবং তার প্রতিবেশীরা সবাই খাস ঢাকা শহর থেকে এসেছে। আগেও ছিল এক সঙ্গে; এক সঙ্গে স্থান-পরিবর্তন করে এসেছে এ বাড়ীতে। ঢাকায় ধোবাদের আত্মমর্যাদা জ্ঞান ছিল অদ্ভুত। নিজেদের তারা ভদ্রলোকদের চেয়ে ছোট বলে ভাবত না কখনো। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যই তার অন্যতম কারণ। ভদ্রলোকদের সঙ্গে অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় তারা নিজেদের হাতে কাদার গাঁথুনি দিয়ে ইঁট গেঁথে বাসের জন্য পাকা বাড়ী তৈরী করে নিত। আর একটা কাজ করত তারা ভদ্রলোকদের অনুকরণে। ঘরের ভিতর বৌ-মেয়েদের দিয়ে তারা পেশাগত কাজ প্রচুর করিয়ে নিত বটে, কিন্তু ভদ্র মেয়েদের মতই ঘরের বাইরে তাদের যাতায়াত ছিল নিষিদ্ধ। কলকাতা এসে সেই অবরোধটা গিয়েছে ভেঙে। বাইরের কাজ এখানে বেশী। বাজার করা, চোরাবাজারের সোডা আনা, খদ্দেরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, এ সব ব্যাপারে মেয়েদের অধিকতর দক্ষতা পুরুষেরা অবজ্ঞা করতে পারেনি।

ফল আপাতত ভাল হয়নি। আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন মেয়েরা পুরুষদের অন্যায় কর্তৃত্বের স্পৃহায় বিরক্ত হয়। আর সময় এবং সুযোগ মত বৌ-মেয়েদের উপর মার-ধোর করে শোধ নিতেও ছাড়ে না চিরকালের পবিত্র অধিকারের উপর হস্তক্ষেপে রুষ্ট পুরুষের দল।

এ বাড়ীতে যখন এসেছে, লক্ষ্মণের তখন জমজমাট অবস্থা। বড় রাস্তার

উপর নিজে ডাইংক্লীনিংয়ের দোকান দিয়েছে একটা। আরও ছুটো ডাইংক্লীনিংয়ের কাজ আছে হাতে। চোরাবাজারের সোডার কাজ তো আছেই। এ-পাড়ায় লক্ষ্মণের খদ্দেরের সংখ্যা সম-ব্যবসায়ীদের ঈর্ষা করার মত। বিনয়ে আর শঠতায় সে নারদ, বাক্‌চাতুর্যে সে গণেশ। কথার মাধুর্য দিয়ে ত্রুটি ঢেকে রাখতে পারে অনায়াসে। এই বাড়ীতেই ভদ্রলোকেরা আসার পরে প্রতিবেশীদের অলক্ষ্যে কখন যে বারো আনা ঘর সে দখল করে বসেছে তা এক আশ্চর্য ব্যাপার।

তিনটি পরিবার এখন স্বাধীন ব্যবসায়ে অসমর্থ হয়ে লক্ষ্মণের কাছে জনমজুরী খাটে। মেয়ে-পুরুষ-শিশু সবার জন্যই নির্দিষ্ট ধরণের কাজ আছে লক্ষ্মণের কাছে। মাস মাইনের ব্যবস্থা নেই। যে-ক'দিন কাজ করবে, সে-ক'দিনের মজুরী।

বড় রাস্তার উপর লক্ষ্মণের ছোট্ট ডাইংক্লীনিংয়ের দোকানটি। বড় বড় দ্বি-রঙা হরফে লেখা শোভন সাইন্‌-বোর্ড ঝুলছে: 'মাণিকতলা লন্‌ড্রী'। বাঁকা বাঁকা ছন্দায়িত হরফগুলির দিকে মাঝে মাঝে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পরাণ। স্বত্বাধিকারীর ন্যায়সঙ্গত গর্বও বোধ করে সেই সঙ্গে। পরাণ লক্ষ্মণের বড় ছেলে। লন্‌ড্রী পরিচালনার ষোল আনা ভার তার উপর।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত জীবনের মাঝখানে যেন এসে পড়েছে পরাণ। নিশ্ছিদ্র দম্‌-আট্‌কানো জীবন-চক্র থেকে হঠাৎ সে যেন চলে এসেছে একেবারে খোলা আকাশের নীচে। সেখানে একঘেঁয়ে অনবকাশ কাজ, আর নিয়ম-বাঁধা বিবর্ণ সংসার-যাত্রার চোখ-রাঙানী; এখানে অবকাশ আর প্রাচুর্য আর স্বাধীনতা। বর্ণে, বৈচিত্র্যে, বিরাটত্বে, সমারোহে এ এক রূপকথার রাজ্য। পরাণ সময়ে আনন্দে আত্মহারা হয়, সময়ে হাঁপিয়ে ওঠে। ভাবে, এই আশ্চর্য পরিবর্তনটার পুরোপুরি আনন্দ উপলব্ধি করার বা বোঝার ক্ষমতাও বোধকরি তার নেই।

ঢাকায় থাকতে সামান্য লেখা-পড়া শেখার পরই পরাণকে কুল-কর্মের জোয়ালে লটকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সামান্য শেখানোটাও নাকি বাবার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতা আর অর্থহীন অপব্যয়ের কাজ হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যিস একটুখানি লেখা-পড়া শিখেছিল পরাণ! তারই জোরে আজকে

বাবার ড্রাইংক্লীনিংয়ের একচ্ছত্র কর্তা হয়ে বসতে পেরেছে সে। কত সুবিধে। নিরক্ষর বাবাকে হিসাব নিকাশে ফাঁকি দেওয়ার অনেক সূত্র তার এখন জানা।

ড্রাইংক্লীনিংয়ের কাজকে কাজ বলেই মনে হয় না পরাণের। অঝোরে ঘাম ঝরে না গা দিয়ে, হাত-পা টন্ টন্ করে না, অনবরত ওঠা-নামা করার ফলে কোমর ধরে আসে না, চোখ বুজে আসতে চায় না ক্লান্তিতে। নিমন্ত্রণে যাওয়ার মত ফর্সা জামা-কাপড় পরে চেয়ার টেবিলে বসে শুধু রশীদ কাটা। বাবার মাইনে-করা মজুর এসে ময়লা কাপড় নিয়ে যায়। আবার নিয়মিত সময়ে ধোয়া ইস্ত্রি-করা কাপড় তুলে দিয়ে যায় দোকানে। তার কাজ শুধু হাত পেতে পয়সা গুণে নেওয়া। কে কবে কখন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল যে পয়সা রোজগারটা এমন সহজ কাজ!

তা ছাড়া আছে নগদ পয়সা। ঢাকায় থাকতে বাবার শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে নগদ একটা পয়সা হাতে আসাও কঠিন ব্যাপার ছিল। এখানে বাবাকে ফাঁকি দেওয়া কত সহজ! গুন্তির হিসাবটা বাবার ঠিক থাকলেও, যে-কাপড়টায় আট আনা দিচ্ছে খদ্দের, সেটায় ছ'আনা পাওয়া গেছে বললে বাবা বুঝবে কী করে? পয়সা আদায় করেও বাকি আছে বললে বাবা জানবে কী করে? দু'চার দিন পরে বাকি হিসাবের অর্ধেক ভুলেই যাবে বাবা। সুবিধে, অনেক সুবিধে। বিড়ি সিগারেট চা খুশি মত খাওয়া এবং খাওয়ানোর যে কী আশ্চর্য আনন্দ!

বেলা দশটায় একটা হাই তুলে জামার আস্তিনটা কনুইয়ের ওধারে ঠেলে দিয়ে পরাণ পা-জোড়া তুলে দিল টেবিলের উপর। এ সব আধুনিক স্টাইল সে দেখে দেখে শিখছে। এবার কি একটা সিগারেট ধরাবে সে? পাশের দোকানের ছোকরাকে হাঁক দিয়ে বলবে নাকি একটা সিগারেট দিয়ে যেতে! নাঃ, থাকগে।

পরাণ পকেট থেকে বের করে একটা বিড়ি ধরাল। তার এখন একটু আয়েস দরকার। এই মাত্র খুশি এবং বিরক্তি দুয়েরই কারণ ঘটেছে। কয়েকজন খদ্দের অনেক বকা ঝকা করে এইমাত্র বিদায় নিয়েছে। আবার অপরপক্ষে একজন বিদেশী খদ্দেরের কাছ থেকে আট আনা রেটের কাজে বারো আনা আদায় করেছে সে।

হঠাৎ সে উৎসাহিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে ডাকল: পটলদা—পটলদা।

সম্প্রতি পটলরা পরাণের 'মূল্যবান' বন্ধু-শ্রেণীভুক্ত হয়েছে।

পটল, শচীন আর রবি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। পরাণের ডাকে দোকানে এসে উঠল।

রবি মন্তব্য করল: এত তোর পটল তোলার শখ কিসের জন্য রে নবাবের পো।

'নবাবের পো' বলে ওরা ঠাট্টা করে; পরাণ ভাবে, ঠাট্টাচ্ছলে সম্মান-প্রদর্শন। করবে না? কত বড় কারবারীর রোজগেরে ছেলে সে! পোশাকে-আশাকে, চাল-চলনে ওকে ভদ্রলোকের ছেলে নয় বলে চেনার উপায় আছে নাকি কারো?

পটলকে চেয়ারটা ছেড়ে দিল পরাণ। নিজে বসল টেবিলের কিনারে। রবি আর শচীন বসল ময়লা কাপড়ের স্তূপের উপরে।

চা খাবে পটলদা? —পরাণ জিজ্ঞেস করে। পটলদের সঙ্গে আলাপে পরাণ 'তুমি' পর্যন্ত নেমেছে, কিন্তু 'দাদা' বর্জন করতে সাহস পায় নি এখনও অবধি।

সেই জন্যেই তো তোর দোকানে আসা।

পরাণ পাশের দোকানের ছেলেটাকে হাঁক দিয়ে চায়ের অর্ডার দিল।

পটল তার বন্ধুদের কাছে এতক্ষণ যে-গল্পটা বলছিল তাই শুরু করল। তার সাবানের এজেন্সীর অভিজ্ঞতার গল্প। যে দোকানেই পটল গিয়েছে তারাই 'স্যাম্প্ল্' দেখে আর দাম শুনে জানিয়েছে, আরও পাঁচ টাকা কম দামে ঐ মাল যত খুশি নিতে পারে পটল তাদের কাছ থেকে। কারখানার মালিক শুনে বলেছে, তার জিনিসের মর্যাদা আলাদা—ফুটপাথে বেচার জন্য তৈরী নয়। হঠাৎ একখানা ক্যাস্মেমো দেখে পটল জানতে পেরেছে, মালিক তাকে যে দাম বলেছে তার চেয়ে দশ পনেরো টাকা কম দামে সে বেচে বড়বাজারে। বড়বাজারে গিয়ে দেখেছে, বড়বাজারের দোকানীরাও ঐ মাল বিক্রি করছে দশ পনেরো টাকা কম দামে।

রসিয়ে রসিয়ে বলছিল পটল। বন্ধুরা হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

ব্যবসার রহস্য কি জানিস? পাঁচ টাকায় মাল কিনবি আর তিন টাকায়

বেচবি, আর তোর লাভ থাকবে দু' টাকা!—পটল তার অভিজ্ঞতার সারমর্ম জানাল বন্ধুদের।

এমন সময় অকস্মাৎ ওদের আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। হরেকেষ্টর বৌ রুক্মিণী যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। হাতে র‍্যাশন ব্যাগে চোরাবাজারের সোডা! প্রায় এই সময়টাতেই রুক্মিণী ফেরে রোজই। বন্ধু বান্ধবদের সামনে পরাণ ডাকতে পারল না। ডাকলেও কখনো আসে না রুক্মিণী। হাত আর মুখ দিয়ে কতকগুলো দুর্বোধ্য মুদ্রা রচনা করে পরাণ কী যেন জানাতে চাইল রুক্মিণীকে। জবাবে একটি কুঞ্চিত ভ্রূর ক্রুদ্ধ কটাক্ষ লাভ করে পরাণ ধন্য হল।

তোদের পুলিশ-বিজয়িনী, না রে পরাণ?—পটল জিজ্ঞেস করল।

তাই কী?

বৌ মানুষ। মাথায় সিঁদুর আছে। ওর সঙ্গে তোর সম্পর্কটা কী রে পরাণ?

তার গোপনে ইশারা করার চেষ্টা পটল দেখে ফেলেছে জেনে পরাণ মনে মনে রেগে গেল।

পরাণ পাল্টা প্রশ্ন করল: আচ্ছা পটলদা, সুনন্দার ঘরে তোমার এত আসা যাওয়া কেন? পরের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে এত মেলামেশা কি ভাল!

রবি এবার কৃত্রিম আড়ম্বরের সঙ্গে একটা সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: সেই কথাটাই তুই মনে করিয়ে দিলি পরাণ? তোর একটু মায়া দয়া নেই? এমনিতেই আমাদের পটলের পরাণটা তুষের আগুনের মতন ধিকি ধিকি জ্বলছে চব্বিশ ঘণ্টা!

সবাই হো হো করে হেসে উঠল, এক পটল ছাড়া। বিশেষ করে পরাণের সামনে এ ধরনের রসিকতায় পটলের পিত্তি অবধি জ্বলে গেল!

ছাখ্, রবি! এই শর্মা যদি ইচ্ছে করে, তবে সুনন্দা তো কোন্ ছার, ঐ আলতাই বল্, আর তটিনীই বল্, আর পাহারাওলার মেয়েরাই বল্,—যাকে খুশি বগল দাবা করে এই কলকাতা শহর ঘুরে বেড়াতে পারে। আমার কিসের পরোয়া রে? আমি ধর্ম মানি না, নীতি মানি না, বাপ মানি না। আমি এক মূর্তিমান লক্ষ্মীছাড়া, তা জানিস্?

পাহারাওলা নাম দিয়েছে ওরা মনোরমবাবুকে। ভদ্রলোক অত্যন্ত রক্ষণশীল। বাড়ির মেয়েদের কড়া পাহারায় রাখেন।

পটল যত রাগে, বন্ধুরা তত হাসে।

বন্ধুরা বিদায় নিলে পরাণ অসময়ে দোকান বন্ধ করে বাড়ীতে ফিরে এল।

ঘরে ঢুকে দেখে রুক্মিণী ভীত সন্ত্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে। মেঝেতে বেতের ধামায় সোডা ঢালা রয়েছে, পাশে পাল্লা বাটখারা। আর রুদ্র মূর্তিতে লক্ষ্মণ মেঝেতে বসে ধমকাচ্ছে রুক্মিণীকে।

আধাসের সোডা কী করছস্ ক' শিগ্‌গির হারামজাদী! ছেনালী কথা চলব না কইলাম আমার লগে।

হাচা কইতাছি, আমার কুন দোষ নাই লক্ষ্মণকা। আমার সামনে মাপ্যা দিছে সোডা।—অবরুদ্ধ কান্নায় রুক্মিণীর গলার স্বর করুণ, ভাঙা-ভাঙা।

লক্ষ্মণ ছাড়ল না। আধসের সোডার দাম রুক্মিণীর পাওনা থেকে কেটে রেখে তবে বিদায় করল তাকে। এবার পরাণের পালা। পরাণ সরে পড়ার চেষ্টায় ছিল, পারল না।

অসময়ে কিয়ের লাইগ্যা র‍্যা পরাইণা?

বড্ড পায়খানা চাপ্যা গেল হঠাৎ।

বাপের সামনে কলকাতার ভদ্র ভাষায় কথা বলতে এখনো সাহস পায় না পরাণ।

দোকানের সময়ডা বাদ দিয়া য্যান্ পায়খানা চাপে অখন থিক্যা।

বলে, সেই সঙ্গে এমন একটি মেয়ের গর্ভজাত বলে পুত্রকে বিশেষিত করল লক্ষ্মণ যাতে তার পিতৃ-মর্যাদাও ক্ষুন্ন হয়। পরাণের পাঁচ বছরের দিগম্বর বোনটি ফিক্ করে হেসে ফেলল শুনে।

পায়ে পায়ে পালিয়ে এল পরাণ। বারান্দায় এসে রুক্মিণীকে খুঁজতে লাগল। রুক্মিণী ঘরে নেই, বারান্দায় বা মাঠেও তাকে দেখা গেল না। শেষে ওপরে ওঠার সিঁড়ির পাশ দিয়ে পিছনের পুকুরে যাবার পথে রুক্মিণীর দেখা মিলল।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রুক্মিণীর মুখোমুখি হয়ে পরাণ বলল: তর ও আধাসের সোডার দাম আমি দিয়া দিমু, নিমুর মা।

কেত্তা দরদ দেখায় গো? দরদ দেখনের কাম নাই আমার। ভাল চাও তো অন্য জায়গাত্ যাও।—রুক্মিণীর গলা এবার করুণ শোনাল না এতটুকু।

বাবার কাছে যে মেয়েটা কেঁচোর মত কঁকায়, তার কাছে সেই মেয়েটিই সাপিণীর মত ফুঁপিয়ে ওঠে। সে যে আজ বলতে গেলে ভদ্রলোকদের একজন হয়েছে, তার কি কোন দাম নেই রুক্মিণীর কাছে?

রুক্মিণী বড় বড় পা ফেলে চলে গেল পুকুরের দিকে। ওদিকটায় ভীড়। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়িয়ে ভাবতে লাগল পরাণ।

ঐ সাপিনী মেয়েটিকে যে তার না হলে চলবে না। সে একরকম মনস্থির করে ফেলেছে। তার এই আশ্চর্য অবকাশ আর প্রাচুর্যের জীবনে বড় নিঃসঙ্গতা। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে সে। বিরাট মুক্তি যেন হাঁ করে গিলে ফেলতে চায় তাকে। মানুষের মধ্যে গিয়ে সে ভরসা পেতে চায়। কিন্তু কোথায় মানুষ? প্রতিবেশী ধোবা ছেলেদের সঙ্গে সে বড় মেশে না। আলাদা জাতের মানুষ এখন তারা। উপরতলার ওছা ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে বটে পরাণ। কিন্তু কোথায় যেন ফাঁক রয়ে গেছে। অবাধ ঠাট্টা ইয়ার্কির মধ্যে কোন দুর্বোধ্য জায়গায় এসে ওরা হঠাৎ থমকে যায়। চুপ করে থেকে বুঝিয়ে দেয়, একটু আলাদা তারা পরাণের থেকে। পরাণেরই চা-সিগারেট খেয়ে পরাণকেই ছোট করে তারা! কী যে রাগ হয়! তবু মিশতেই হয় ওদের সঙ্গে ভদ্র হওয়ার তাগিদে।

তা ছাড়া ওর ভরপুর যৌবনে একটি ঘন নিবিড় নারী সংসর্গ তো ওর চাই। উপরতলার মেয়েদের উপর লোভ ও ত্যাগ করেছে। উপরের সবচেয়ে ওছা মেয়েটির কাছেও ও ধোবা। ওকে দেখলে শাড়ী সাম্‌লাবারও তাগিদ বোধ করে না তারা। প্রয়োজনের বাইরে কথা বললে জবাবও দেয় না, এত তাদের অহঙ্কার। মাগী-পাড়াও গিয়ে দেখেছে পরাণ দু'একদিন। পোষায় না। পয়সা আদায় আর পয়সা খরচ করানোর এত ফন্দী জানে তারা যে শত দিলদরিয়া হয়েও পরাণের মফঃস্বলীয় মন আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

এ বাড়ীর ধোবাদের ঘরের বৌ-মেয়েদের কাউকেই নিজের সমমর্যাদার বলে মনে করে না পরাণ। রুক্মিণীকেও করে না। তবে একমাত্র ঐ ময়েটিকে সে কিছু অনুগ্রহ করতে পারে। বেশ বাঁধুনি, বেশ মুখশ্রী মেয়েটার! আর তেজ কি? 'মেয়েমানুষের তেজ যে পরাণের হঠাৎ কেন ভাল লাগল কে জানে?

চার

অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কল্যাণবাবুদের 'জনকল্যাণ সমবায় সমিতি' এক গাঁট কাপড়ের কোটা পেয়েছে। মালটা আজ বিলি করা হবে। সকাল বেলাই কল্যাণবাবু, পটল, সুধীনবাবু প্রভৃতি কয়েকজন চলে গিয়েছেন তদারক করতে। জিনিসটায় আরও অনেকে আগ্রহান্বিত। কিন্তু কোন কাজের দায়িত্ব নেই বলে পরে ধীরেসুস্থে যাবেন বলে ঠিক করে আছেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীতে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল। কালীকান্তবাবুর বড় মেয়ের শ্বশুর হঠাৎ সপরিবারে এসে হাজির হয়েছেন মালপত্তর নিয়ে। যে-অবস্থায় তিনি সর্বস্ব ফেলে রেখে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে যে-কোন মানুষের সহানুভূতি উদ্রেক করে। তাঁর অবস্থা ভাল, বড় ছেলে চাকরি করে, শিগ্‌গিরই বেশী ভাড়ায় হলেও একখানা বাড়ী ভাড়া করে নিতে পারবেন। শুধু অন্তর্বর্তীকালের জন্য তাঁর একটু আশ্রয় দরকার।

ভদ্রলোকের নাম অঘোরনাথ। তাঁর এবং তাঁর পরিবারস্থ সকলের অভিজাত চেহারা, অথচ তা সত্ত্বেও তাদের নিরহঙ্কার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু পাঁচ ছ' জন লোকের একটি পরিবারকে কী করে জায়গা দেওয়া যায় এ-বাড়ীতেই ?

সমস্যাটা নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে মনোরমবাবুও ছিলেন। অথচ তা সত্ত্বেও পাজী হারামজাদা রবি হঠাৎ বলে বসেছে: আপনি এর একটা কিনারা করুন না মনোরমদা। একখানা বড় ঘরে মাত্তর চারজন মানুষ থাকেন। আপনার ঘরখানা পার্টিশন করে অঘোরবাবুকে জায়গা দেওয়া যায় অনায়াসে।

এর থেকেই ঝগড়ার সূত্রপাত।

মনোরমবাবু রবির দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন: সোনার চাঁদ ছেলে, খুব বুঝি সুখ দেখেছ আমার? জান, আমি পাকিস্তানে তিনতলা বাড়ীতে থাকতাম? আসলে, বুঝলেন কালীকান্তবাবু, এটা ওদের ব্যক্তিগত আক্রোশ ছাড়া আর কিছু নয়।

মনোরমবাবু হঠাৎ একথা বললেন না, এটা তাঁর ধারণা। তাঁর রোজগার পত্তর ভাল। এ-বাড়ীতে এক মাত্র তাঁরই একটি বাচ্চা চাকর এবং কিছু ফার্নিচার আছে। তাছাড়া পরিচ্ছন্নতা, মেয়েদের আব্রু প্রভৃতি নিয়ে প্রায়ই তাঁর খিটিমিটি লাগে প্রতিবেশীদের সঙ্গে।

কালীকান্তবাবু বিনীতভাবে বললেন: ব্যক্তিগত আক্রোশ-টাক্রোশ কিছু নয় মনোরমবাবু। এটা দয়ার কথা। আমার আত্মীয়—, নিজের ঘরে জায়গা নেই। যদি দয়া করে স্থান একটু জায়গা, এই কথা।

অসম্ভব কথা! এত লোক বাড়ীতে থাকতে আমার উপর কেন অসঙ্গত চাপ?

আপনার পরিবারে লোক কম।

সকলে মিলে যত নম্রভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন, মনোরমবাবু ততই রেগে আগুন হন। এদিকে অফিসের বেলা হয় দেখে তপন, সুধীর প্রভৃতি অফিসওয়ালারা কেটে পড়ল একে একে।

কালীকান্তবাবু অগত্যা বললেন: এখন তবে থাক্ আলোচনা। দুপুরে কল্যাণবাবু আসুন। কী করা যায় তখন দেখা যাবে।

যাই করুন, আমার ঘর বাদ দিয়ে করবেন। শেষ কথা জানিয়ে রাখলাম। —মনোরমবাবু তবু বললেন তীক্ষ্ণ গলায়।

ওদিকে ঝগড়ার প্রতিধ্বনি মনোরমার শোয়ার ঘরে গিয়ে বেজে উঠেছে। সেখানে মনোরমবাবুর স্থুলাঙ্গিনী স্ত্রী মন্দাকিনী একখানা হালের কেনা শাড়ী দেখাতে এসেছিলেন মনোরমাকে। কল্যাণবাবুর জনপ্রিয়তার দরুণ মনোরমার খাতির যথেষ্ট এ-বাড়ীর মেয়ে-মহলে। না হলে যার-তার ঘরে মন্দাকিনী যাতায়াত করেন না বড় একটা।

দেখুন তো দিদি, শাড়ীখানা কেমন হ'ল? কালকে কিনে এনেছেন উনি বড় মেয়ের জন্য।

শাড়ীখানা পরীক্ষা করে দেখলেন মনোরমা।

বেশ হয়েছে! এ রকম শাড়ীই তো আজকালকার ফ্যাসান।

বেজায় দাম দিদি। পুরো ছাব্বিশ টাকা নিয়েছে।

তা নেবে বৈকি? ভাল জিনিসের ভাল দাম।

এই পর্যন্ত গেল ভূমিকা। অতঃপর মন্দাকিনী মেঝের উপর বসে পড়ে বললেন: তারপর দিদি, শুনেছেন তো সব!

মনোরমা বুঝতেই পারেন নি প্রথমটায়।

কি শুন্‌বো গো দিদি? কিসের কথা বলছেন? —তারপর হঠাৎ বুঝতে পেরে হেসে বললেন: আপনার ঘর পার্টিশান করতে চায় বুঝি ওরা?

দেখুন তো দিদি কেমন আব্দারের কথা! দু'খানা পাঁচখানা নয়,—একখানা মাত্তর ঘর। সবে গুছিয়ে নিয়েছি।

তা আপনারা তো সংখ্যায় কম, ওঁরাও নাকি অল্প ক'দিন মাত্র থাকবেন।

মন্দাকিনী অবাক হয়ে গিয়ে বললেন: আপনিও শেষটায় ঐ কথা বললেন দিদি! আজকালকার মানুষের কথায় বিশ্বাস করতে বলছেন আপনি?

মনোরমাকে আর জবাব দিতে হ'ল না এ-কথার। পাশের ঘরের সুধীনবাবুর স্ত্রী নলিনীর কানে গিয়েছিল কথাটা। তিনি তৎক্ষণাৎ এ ঘরে এসে জুটলেন।

মন্দাকিনীদি'র গলা শুনলাম না? আরে তাই তো, দিদিই তো! কী কাণ্ডটা করছেন আপনারা বলুন তো দেখি! দখল করা বাড়ী; আজ আছে, কাল নেই। তার জন্য এত ঝগড়ার কি আছে বুঝতে পারছি না।

মন্দাকিনী এবার বেশ চেঁচিয়েই বললেন: ঝগড়া করছি আমরা? এমন মিছে কথাটা বললেন নলিনীদি?

ততক্ষণে দীপঙ্করবাবুর স্ত্রী এবং বিধবা বোনকে দেখা গেল দরজার গোড়ায় উঁকি মারতে।

স্নানের ঘাটে মনোরমবাবুর মেয়ে নবনীতা আর ছন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সুনন্দার। সুনন্দা মুখরা মেয়ে। সুযোগটা ছাড়ল না।

ব্যাপার কি তোদের? মায়ের আঁচল না ধরে নিজেরাই নাইতে এসেছিস্ যে বড়?

আজকে সব অ-নিয়ম,—বড় মেয়ে নবনীতা বলল খোঁচাটা গায়ে না মেখে।

হবেই তো! সারা বাড়ীর লোকদের যা নাচিয়ে তুলেছিস তোরা!

নবনীতা একটু লাজুক প্রকৃতির। ঝগড়ার সম্ভাবনা এড়িয়ে যেতে চাইল তাড়াতাড়ি।

আমি ভাই ওসবের মধ্যে নেই সুনন্দা। যা না ছিরির বাড়ী, তার আবার ঝগড়া!

ছন্দা কিন্তু ছাড়ার পাত্রী নয়। দিদির কথার পৃষ্ঠে বলল : কিন্তু তাই বলে ঘর ছাড়ব আমরা কিসের জন্যে? যাদের এতো পরাণ পোড়ে, ঘর ছাড়ুক গে না তারা!

আমাদের ঘরে জায়গা থাকলে তোর বলার অপেক্ষায় থাকতাম না ছন্দা!

তোমার আবার ঘরের দরকার কি সুনন্দাদি? বয়সের ছেলে যেখানেই আছে সেখানেই তো তোমার ঘর বাঁধা।

তার পুরুষ-ঘেঁষা স্বভাবের প্রতি এমন কদর্য ইঙ্গিতও সুনন্দা অনায়াসে হজম করল। একটু হেসে জিভ্ কাটল মাত্র।

কিন্তু আর একজনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল জলের ভিতর থেকে। কালীকান্তবাবুর বোনঝি আলতো জলে গা ডুবিয়ে চান করছিল। এ-বাড়ীর বিখ্যাত কালো মেয়ে সে। বাড়ীর লোকে আড়ালে বলে 'মা-কালী'।

কে রে কথা বলছে? গায়ে যেন বিষ্ঠা ছিটিয়ে দিল! ছন্দা না? ঠিক ধরেছি। বুনো ওল খেলেই গলা ধরবে। ছোটই কি আর বড়ই কি?

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝখানে যেখানটায় বাঁক নিয়েছে, সেই চত্বরটার উপর বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে দীনেশ, শচীন আর রবি।

অঘোরবাবু কিন্তু সত্যিই ভদ্দর লোক,—গম্ভীরভাবে দীনেশ বলল। যেন একটা খুব দামী মন্তব্য করছে সে।

চাঁদা-টাদা চাইলে পাওয়া যেত মনে হয়,—রবি বলল।

একটা কিছু কর্ ভাই ভদ্রলোকের জন্য।

আসুক পটলা। শোনা যাক কী বলে।

এবারে শচীন বলল নিজের বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে: পটল বলবে আমার এইটে। খালি পটল আর পটল তোদের মুখে! ছোকরার বুদ্ধি নেই এক ফোঁটা! যত পটপটি সব মুখে।

পুরো এক মিনিট রবি শচীনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছাখ্, শচীন, একটা কথা বলব তোকে। সুনন্দার দিকে দৃষ্টি দিবি না কখনো। সাবধান করে দিচ্ছি। ওরা এসেছে থেকে পটলা সুনন্দার

পিছনে লেগে আছে জোঁকের মত। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি করাটা ভাল নয়।

পটলের সঙ্গে একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা অনুভব করে শচীন। কিন্তু পটলের ভয়ে খুব সাবধানে থাকে সে। রবি জানল কী করে ?

কী কথার মধ্যে কী কথা যে তুই টেনে আনিস রবি, তার ঠিক নেই।

আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার মতলব তোর শচীন ? পারবি না, বৃথা চেষ্টা। ভাল বলছি শোন্। পটলের সঙ্গে লাগার চেষ্টা ছেড়ে দে। বিপদ হবে কিন্তু। প্রেম করার শখ হয়ে থাকে তো তার জন্য ঢের মেয়ে আছে এ-বাড়ীতে।

দীনেশ সায় দিল : দশ পনেরোটার কম না।

হঠাৎ এক একবারে দু'তিন সিঁড়ি করে পার হয়ে পটল এসে উপস্থিত হল ওদের সামনে।

রবি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল : পটলা ? তুই ? দোকান বন্ধ হয়ে গেল এর মধ্যে ?

না-রে। জল খেতে এলাম একবার। জল তেষ্টা পেয়েছে খুব।

কিন্তু বড্ড ভুল সময়ে এসেছিস্ রে। সুনন্দা এইমাত্র চান করতে গেল ঘাটে।

তবে আর কি ! আমি কাঁদতে বসি এবারে ! যত সব বাজে কথা ছাড়তো রবি। তারপর বাড়ীতে গোলমাল কিসের রে ? তাই দেখতেই এলাম।

কথার মোড় ঘুরে গেল আবার। দীনেশ আর রবি বিস্তারিত ঘটনা জানালো পটলকে।

সকলে চায় ভদ্দরলোক থাকেন। কিন্তু মনোরমবাবুকে রাজী করান শিবের অসাধ্যি। —দীনেশ উপসংহার টানল।

ভেবে চিন্তে একটা উপায় বাৎলা পটলা। রবি অনুরোধ জানালো।

পটল চিন্তিত মুখে বলল : মারের ভয় দেখাই মনোরমবাবুকে, কি বলিস্ ?

মন্দ কি ?

কিন্তু কল্যাণদাই যে রাজী হবেন না। মুস্কিল যত কংগ্রেসী লোকদের নিয়ে।

তবে কি করা যায়?

পটল চিন্তা করল খানিকক্ষণ।

এক ব্যবস্থা করা যায় রবি। যদি অবিশ্যি সুধাদেরা রাজী হয় ওনাদের ছোট ঘরখানা মনোরম বাবুকে দিয়ে মনোরমবাবুর বড় ঘরটা পার্টিশন করে ফ্যাল্। ভদ্রলোক একদিকে থাকবেন, আর একদিকে সুধাদিরা।

চমৎকার আইডিয়া! দেখছিস শচীন, বুদ্ধি কার মাথায় জোটে?

এমন সময় একটা অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটল। পটল যখন কথাগুলো বলছে, এক কলসী জল কাঁখালে নিয়ে সুধা তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। কথাগুলো শুনেছে সে। চত্বর অবধি উঠে এসে সুধা দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের সামনে। একেবারে বোকা বনে গেল যেন পটলরা।

আপনার নাম বুঝি পটলবাবু? শুনুন, আপনার কথা আমি শুনেছি। ঐ-টুকু রদ বদল করলেই যদি কাজ হয়, তবে আমার আপত্তি নেই। আপনারা ব্যবস্থা করুন। তবু গোলমালটার একটা নিস্পত্তি হোক।

কথায় কোন আড়ষ্টতা নেই, অথচ প্রগল্‌ভতাও নেই। শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ দেহটিতে সুষমার অভাব নেই। পঁচিশ বছরের রুক্ষ অবহেলিত যৌবন বন্দী হ'য়ে রয়েছে দেহের কানায় কানায়। চোখের নীচে কালি পড়েনি, নাকের পাশে ভাঁজ পড়েনি। সুধার একটা বিশ্রী বদ অভ্যেস, শাড়ী সামলিয়ে চলার প্রয়োজন সে কদাচিৎই বোধ করে। অগোছালো বস্ত্রাঞ্চলের আড়ালে তার ঋজু আনমিত সুস্পষ্ট স্তনরেখার উদ্ধত ভঙ্গীটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সারা দেহে ছড়িয়ে আছে এমন একটি স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব যে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠবে এমন সাধ্য কারও নেই।

নারীর যৌবন যে পুরুষের মনে ভয় সঞ্চার করে এমন কথা কে জানত? দারুণ অস্বস্তিতে পটল প্রায় ঘেমে উঠল। কিছু তবু তো বলতে হবে মেয়েটিকে।

কিন্তু ধরণীবাবু যদি আপত্তি করেন?—পটল চেষ্টা করে বলল।

সে আমি দেখব।

আত্মনির্ভরতার গর্বে একটু হাসল সুধা। তারপর জলপূর্ণ প্রকাণ্ড কলসীটার ভারে ঈষৎ বাঁকা হয়ে পায়ে পায়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

সুধা চোখের আড়ালে চলে গেলে তবে দীনেশ সহজ হয়ে একটু মুচকি হাসল।

ধরণীবাবু আপত্তি করবে কিরে? জানিস্ না, ওনাদের সম্পর্কটা উল্টো। আসলে ধরণীবাবুই বৌ, আর সুধাদিই স্বামী।

দুপুরে বাড়ী এসে খবর শুনে কল্যাণবাবু চিন্তিত হলেন। ওদিকে চারটের মধ্যে গিয়ে কো-অপারেটিভের দোকান খুলতে হবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্যাটার মীমাংসা হবে কি? অথচ সমস্যাটাও জরুরী। একজন বিশিষ্ট বিপদ্‌গ্রস্ত লোকের আশ্রয়ের সমস্যা।

কিন্তু আশ্চর্য, হাউস্‌-কমিটির মীটিং পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। পটলের আপোষ সূত্রটি শুনে মনোরমবাবু উচ্ছৃংখল যুবকের দুরভিসন্ধিকে তীব্রভাবে তিরস্কৃত করলেন। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাই বলে তিনি গেলেন না। সর্বনাশ উপস্থিত হলে বুদ্ধিমান মানুষকে যে অর্ধেক ত্যাগ করতে হয় এ তত্ত্ব তিনি জানেন।

ধরণীবাবুকে জানিয়ে এলেন কল্যাণবাবুই। তাঁদের অভিপ্রায় অনুসারেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সুধা তখন দুপুরের কাজ-কর্ম শেষ করে সবে মিনিট পনেরো হল দেওয়ালে হেলান দিয়ে পা ছাড়িয়ে বসে ঝিমুচ্ছে।

খবর শুনে এসে ধরণীবাবু ধুপ করে বসে পড়লেন মেঝেতে, অবিশ্যি খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে।

সুধা?

বল,—সুধা চোখ বুজেই জবাব দিল।

ঘর বদলাবদলি করার কথা তুমি বলেছিলে?

বলেছিলাম।

আশ্চর্য! একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না?

জবাব দিতে সুধা দেরী করল। আরামের ব্যাঘাত হচ্ছিল বলে বোধকরি বসার ভঙ্গীটা একটু পালটিয়ে নিল সুধা। তাইতেই শাড়ীর প্রান্ত সরে গিয়ে সুধার সুডৌল স্বচ্ছ জানুদেশের খানিকটা অনাবৃত হয়ে পড়ল। এটা সুধার অনিচ্ছাকৃত অমনোযোগিতা। ধরণীবাবুর বিশ্বাস কিন্তু অন্য রকম। নিজের

যৌবন-সম্ভারকে প্রদর্শনীর বস্তু করে সুধা আইনসঙ্গত স্বামীর প্রতি উদ্ধত অবজ্ঞায়। দাঁতে দাঁত চেপে ক্রোধ-সংবরণ করলেন ধরণীবাবু।

দরকার বোধ করিনি,—সুধা জবাব দিল এতক্ষণে।

দরকার বোধ করনি? বাড়ীর কর্তার মত নেওয়ার দরকার বোধ করনি?

তেমনি নির্বিকার তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে সুধা জবাব দিল: অন্যায় হয়েছে বলে যদি মনে কর, তবে যাও না, অন্যায়টা সংশোধন করে এস। ওদের বলে এস, এ ব্যবস্থা চল্‌বে না।

সহজ কথা। অধিকারে হস্তক্ষেপ হয়েছে বলেই যদি ধরণীবাবু মনে করেন, তবে সুধার সিদ্ধান্তে অননুমোদন জানিয়ে এলেই তো তাঁর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে! তাতে বাড়ীসুদ্ধ লোক তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা আবিষ্কার করলেই বা! ক্ষতি যা সে তো ধরণীবাবুর আত্মসম্মানের, সুধার কী বা আসবে যাবে?

ধরণীবাবুর কিন্তু এটা আত্মপ্রতারণা। বাড়ীর লোকেরা তাঁদের সম্পর্ক অনেকখানিই অনুমান করতে পারে। কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করে না। অবকাশ নেই। তা ছাড়া দেশ জোড়াই এত অস্বাভাবিকতা যে বেশী কৌতূহল প্রকাশ করতে গেলে কৌতূহলের বেলুন ফেটে যাবে যে!

ফরিদপুর জেলার নদীয়া-সংলগ্ন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে ধরণীবাবুর বাড়ী। সেই একই গ্রামের মেয়ে সুধা। অঞ্চলটাতে ভদ্রলোক-মহলে মোটামুটিভাবে পশ্চিম-বঙ্গীয় ভাষা প্রচলিত বলে এ দেশে এসে ভাষা নিয়ে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

খুড়োর অন্নে মানুষ হয়েছে সুধা। সুধার বাবা তার বালিকা বয়সেই মারা যান। খুড়োর ঘরে আদর দেওয়ার লোক না থাকলেও খাটিয়ে নেওয়ার লোক ছিল। তার ফাঁকেও নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সুধা। কিন্তু বৃদ্ধা মায়ের অনুযোগ সত্বেও সুধার বিয়ে দেওয়ার কোন আগ্রহ খুড়ো মশাই দেখালেন না। সুধার বয়স বাড়তে বাড়তে একুশে গিয়ে পৌছল। এমন সময় অভাবনীয় ভাবে ধরণীবাবু নিজেই এসে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। পণ লাগবে না বলে ভরসা দিলেন খুড়োমশাইকে। ধরণীবাবুর বয়স তখন চল্লিশ পার হয়েছে, যদিও তখনো

তিনি অবিবাহিত। স্বাস্থ্য, অর্থ, কোনটাই তাঁর ছিল না। কিন্তু জীবনের ভাঁটার টানের মুখে অতৃপ্ত যৌন-কামনার শেষ আক্রমণকে তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। এক গ্রামের মেয়ে বলে সুধার কথা তিনি জানতেন। এ মেয়ের বিয়ে হওয়া শক্ত; সুতরাং তিনি ভরসা করে তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব আনলেন। সুধার দিক থেকে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুরা জানিয়েছেন, সুধার কোন ভাবনা নেই। কারণ ধরণীবাবুর বড় ভাই কলকাতার বিখ্যাত সরকারী চাকুরে, বাড়ী-গাড়ী ইত্যাদির মালিক।

ধরণীবাবু রুগ্ন, ধরণীবাবু শরীরিক সম্পদে বঞ্চিত, আর সকলের সঙ্গে সুধাও তা জানত। বিয়ের আগে তা নিয়ে এতটুকু দুশ্চিন্তা বোধ করেনি সে। খুড়োর ভার লাঘব করতে পারছে ভেবেই খুশী ছিল। কিন্তু এক জন পরিপূর্ণা যৌবনবতী নারীর কাছে স্বাস্থ্য-বঞ্চিত পুরুষের বঞ্চনা যে আসলে কী, সুধা তা প্রথম বুঝতে পারল ফুলশয্যার রাত্রে। হৃত-যৌবন পুরুষের বিকৃত যৌন-তৃষ্ণার শিকার হয়ে সুধার সারা শরীর ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠল। তারপর শুরু হ'ল অস্তগামী যৌবনকে দেহে আটকিয়ে রাখার জন্য ধরণীবাবুর সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা! রোগের জন্য কদাচিৎ-ই ওষুধ খেয়েছেন ধরণীবাবু। কিন্তু এখন নানাজাতীয় তেজস্কর উগ্র ভেষজ বোতলে বোতলে নিঃশেষ করে ফেললেন। ঝিমিয়ে-পড়া স্নায়ুকে চাবুক মেরে উত্তেজিত করার চেষ্টার পরিণাম ভাল হল না। কিছুদিনের মধ্যেই ধরণীবাবু হাঁপ-রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন। রোগটার প্রবণতা বোধ করি আগে থেকেই ছিল; এবং দুর্বল দেহ পেয়ে জাঁকিয়ে বসল। আর রুগ্ন স্বামীকে অনায়াসে তার ভাগ্যের উপর ফেলে রেখে সুধা এবার আলাদা বিছানায় শুতে আরম্ভ করল। হিন্দু নারীর পতি-ভক্তির এই নমুনা দেখে ধরণীবাবুর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। গায়ের জোরে সুধার মধ্যে ধর্মবুদ্ধি জাগানোর চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু জন্মাবধি লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় অভ্যস্ত সুধাকে বশীভূত করা সম্ভব হয়নি ধরণীবাবুর পক্ষে।

পাকিস্তান হওয়ার পর বুদ্ধিমান খুড়োমশাই সুধার মাকে মেয়ের বাড়ীতে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন আসাম। গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে এল। খালি গাঁয়ের পাহারাদারি করতে ভাল লাগল না সুধার। সে জিদ্ ধরল কলকাতা চলে আসার জন্য।

ধরণীবাবুর বিখ্যাত চাকুরে দাদার বাড়ীতেই তারা প্রথম উঠেছিল।

বলা বাহুল্য, অক্ষম ভাইকে দেখে দাদা আনন্দে বিগলিত হননি। কেলেঙ্কারীর ভয়ে কোন শোরগোল না করে একটা পরিত্যক্ত গ্যারেজে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁদের। তবে ধরণী যেন একটা জায়গা-টায়গা দেখে নেয় তাড়াতাড়ি, কারণ গ্যারেজটা তাঁর অনেক কাজে লাগে। জায়গার অভাব তো কলকাতায়।

মানুষের মহত্বের অন্যায় সুযোগ নিতে সুধা চিরকাল গররাজী। সন্ধান পেয়েই ভাসুরের বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়িতে। ভাসুর অবিশ্যি এখনো ত্রিশ টাকা করে মাসে সাহায্য দেন ভাইকে। চিঠিতে মাঝে মাঝে জানান, ধরণী এবার একটা কাজ-টাজ দেখে নিক না। কতকাল আর গলগ্রহ হয়ে থাকবে এই বাজারে! তবু যে কেন ভদ্রলোক নিয়মিত টাকা পাঠান?—সুধা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে। না পাঠালে জোর করে টাকা আদায় করবেন এমন সাধ্য তো আর ধরণীবাবুর নেই। এরই নাম বোধ করি মহানুভবতা।

পাঁচ

রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়ির অন্যতম বাসিন্দা অটল। সংসারে বৃদ্ধ মা আর অনূঢ়া বোন তটিনী। নিজের পড়াশুনা বেশীদূর অবধি নয়, কিন্তু বোনকে পড়তে দিয়েছে কলেজে। বোনের উচ্চশিক্ষার উপর তার অসীম ভরসা। যদিও এই পড়ার বাড়তি খরচ জোগানোর জন্য তাকে খাটতে হয় অনেক বেশী। এ-বাড়ীর মধ্যে একটি ছোট্ট ঘরের বাসিন্দা এই নির্ঝঞ্ঝাট পরিবারটিই বোধ করি সবচেয়ে নিঃশব্দ।

অটল বাড়িতে খুব কম সময় থাকে। দিনের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, ঘুম ইত্যাদি বাবদ যে বাজে সময়টা নষ্ট হয় তার পরিধিটা যথাসম্ভব সংকুচিত করে এনেছে অটল। জীবনে তার অনেক আশা। ব্যবসা বাড়বে, আয় বাড়বে। আস্তে আস্তে একটা দোকান দেবে সে। জীবনে সে প্রতিষ্ঠিত হবেই। তার ফরিদপুরের বাড়ির পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি গিয়েছে, তা সত্ত্বেও বোনের বিয়ে দেবে, নিজে বিয়ে করবে। তাই কথা বলে সে সময় নষ্ট করে না। কল্যাণদার ঘরে ভবিষ্যতের অলস কল্পনায় মশগুল হয় না।

ভোর পাঁচটায় উঠে সে প্রাতঃকৃত্য সেরে নেয়। এ-বাড়ীর এতজন বাসিন্দার পক্ষে অপ্রতুল কয়েকটি পায়খানায় উমেদারদের দীর্ঘ লাইন পড়ার অনেক আগেই সে এ-কাজটি সেরে নেয়। ফিরে এসে দেখে, কয়েকখানা রুটি; একটু ভাজা আর চা তৈরী করে নিয়ে তটিনী বসে আছে তার জন্য। মা বেতো মানুষ, সকালের কাজ-কর্মগুলো তটিনীকেই সারতে হয়। দাদা খেতে বসলে তটিনী সামনে বসে উপদেশ নেয়। মায়ের অনুপস্থিতির অভাব মিটিয়ে দেয় অনেকখানি।

বেশী ঘুরবে না কিন্তু দাদা।

রোদের সময় ছায়ার দিকে থাকবে।

আর দাদা, রোজই যদি দুপুরের খাওয়ায় অত অনিয়ম কর তবে আমি পড়ার কচু ছেড়ে দেব কিন্তু!

স্বয়ম্ভু অভিভাবিকাটিকে যথাসাধ্য আশ্বাস দেয় অটল। তবু ওরা দুজনেই

জানে, রোদ্দুরে অটলকে ঘুরতেই হবে, আর দুপুরের সময়ে খাওয়ার নিয়মও থাকবে না। আর তা বলে তটিনীও কিছু একটা পড়ার পাট চুকিয়ে দিতে পারবে না।

মাঝে মাঝে অটলের অভিভাবক-বুদ্ধি প্রবল হয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, পড়াশুনা আজকাল কেমন চলছে রে তটিনী?

চল্‌ছে কোন রকম।

সময় বড্ড কম পাস্, না?

না দাদা, মাথা থাকলে ঐ সময়টাই অনেক। তবে ঐ জিনিসটারই অভাব।

অটল ভরসা দিয়ে বলে: তোর হবে, তোর বেশ মাথা আছে।

দু'জনেই হাসে।

এমনি করে পৃথিবীর এক নিভৃত কোণে দুই ভাই বোন আর এক বৃদ্ধা মার যে সংসারটা চলছে কেউ বড় একটা তার খবর রাখে না। এক অদৃশ্য নিঃশব্দ সম্পর্কের সূত্র তিনটি আত্মার ভিতর দিয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে তাদের কর্মক্লান্ত মনকে সঞ্জীবিত রাখছে।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা-মেঘলা। এ দিনটা অটলের পক্ষে ভাল দিন নয়। এমন দিনে সকালের খাওয়ার সময় তটিনী হঠাৎ কথাটা পাড়ল।

দাদা, কিছু মনে করবে না তো?

মনে আবার কী করব। কী বল্‌বি বলনা!

তটিনী তবু ইতস্ততঃ করছে। অটলই আবার জিজ্ঞেস করল—কি বলতে চাইছিলি তুই?—বল্ না।

এবার তটিনী একটু সলজ্জ হেসে বলল: আমার এক বান্ধবীর বিয়ে, বুঝলে দাদা। ক্লাস সুদ্ধ সকলের নেমন্তন্ন। সবাই কিছু কিছু উপহার দেবে। আমি একেবারে খালি হাতে গেলে বড্ড কেমন দেখায়। তা না হয় থাক্‌গে।

থাকবে কি রে? কিন্তু কবে বিয়ে?

কাল।

অটল চিন্তিত মুখে ভরসাহীন আকাশের দিকে তাকালো। পরে হঠাৎ খুশী হয়ে উঠল।

তবে কথা থাকল তটিনী, তোর ভাগ্য নিয়ে আজ কাজে যাচ্ছি। ভাগ্যে থাকলে তোকে আর অপদস্থ হতে হবে না বন্ধুর বিয়েতে।

অনেকটা হাল্কা মন নিয়ে অটল বাড়ী থেকে বের হল। তটিনীর আকস্মিক আব্দার তবু তো ওদের মধ্যে খানিকটা নতুনত্ব আনল। না হলে ওদের মধ্যে সম্পর্কটা যত মধুরই হোক না, তবু খানিকটা একঘেঁয়ে। মুস্কিল এই যে, যা নিয়ে তার সারা দিনের চিন্তা, তার সারা সময়ের কর্মোদ্যম, তা নিয়ে তটিনীর সঙ্গে আলোচনাই করা যায় না। কী জানি, তটিনী যদি দাদাকে কৃপা করতে শুরু করে। তটিনী তেমনি আসলে ভিন্ন জগতের মানুষ। সে আছে পড়াশুনা নিয়ে; পড়াশুনার বাইরে আর কোন দিকে তার কোন ঝোঁক যদিই বা থেকে থাকে, সেও তা কোনদিন ওর কাছে খুলে বলে না, আর ও-ও কখনো বলতে চায় না। দু'জনের জীবন বয়ে চলেছে দুটো ভিন্ন খাতে। যোগাযোগ নেই; সেজন্য ব্যস্তও নয় কেউ। তবু তারা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসে।

ঝোলাঝুলি নিয়ে অটল সোজা কলেজ স্কোয়ারে এসে বিপনী সাজিয়ে বসল। লোকটা সে ফেরিওলা। পেশাটা তার খুব ভদ্রজনোচিত নয়। অন্ততঃ পাকিস্তানে দারিদ্র্যের মধ্যেও তার যে সম্ভ্রম ছিল তাতে এটা ছিল কল্পনাতীত। তাই বলে স্বদেশ ছেড়ে এসে পারিপার্শ্বিকটা বুঝে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তার দেরী হয়নি। পুঁজি যার স্বল্প, বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় যার সামান্য, কলকাতার মত শহরে তার পক্ষে এইটেই যে শ্রেষ্ঠ পেশা ভাগ্যিস সেটা চট্ করে সে আবিষ্কার করতে পেরেছিল। সংসারটা টেনেটুনে চালিয়ে নিতে পারছে তবু এরই জোরে।

সকালে বেচা কেনা ভাল জমল না। এক সুবেশ দম্পতী এসে অনেকটা সময় কাটিয়ে গেলেন। মহিলাটিই কথা বলছিলেন।

জামার ছিট দেখাও।

চেহারা আর পোষাকের আভিজাত্যের মান হিসেব করে অটল ছিট দেখালো।

কত দাম?

আজ্ঞে, দু'টাকা দশ আনা করে গজ।

আর নেই? অন্য জিনিস দেখাও।

অটল তবু দামী ছিটগুলিই দেখায়।

আর কিছু থাকলে দেখাও।

হঠাৎ অটলের মনে হল, এঁরা হয়তো সস্তার জিনিস চাইছেন। বেছে বেছে একটা নের্সা ছিট বের করে সামনে মেলে ধরে বলল, এইটে নেবেন! পাঁচ সিকে করে গজ।

মহিলাটি খুশী হয়েই যেন ছিটটা হাতে নিলেন। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন: কি গো? এইটেতেই চলতে পারে, কি বল? তারপর অটলের দিকে তাকিয়ে, চাকর বাকরের জন্য কিন্‌ছি, বেশী দামের জিনিস নিয়ে লাভ কি?

অটল জানে, ওরা ওরকম বলে। চাকর বাকরকে নতুন জামা দেবে না হাতী! বাচ্চা ছেলেরা পরবে, নয়তো বাবু বাড়িতে পরবেন। তিন গজ মাত্র কাপড় কিনলেন তাঁরা।

বেলা দশটা অবধি অটল বসে রইল। ইতিমধ্যে মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠল। একটু ভরসা পেল অটল। বিকেলের বিক্রির উপরই ভরসা ফেরিওলাদের।

অটল চলে যাওয়ার পর তটিনী বই খাতা পত্তর নিয়ে বসল। সময় সে নষ্ট করে না। পাঁচরকমের কর্তব্য পালন করে যেটুকু সময় পায় সেটুকু সে ষোল আনা সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। বাড়িতে সমবয়সী মেয়ের অভাব নেই। কিন্তু সে যথাসাধ্য তাদের সঙ্গে ইয়ার্কি আড্ডা এড়িয়ে চলে। আড্ডা দেওয়াতে সে যথেষ্ট পটু নয়। আর তা ছাড়া, সে জানে যে ভগবান তার মাথায় পড়াশুনার বুদ্ধিটা খুব বেশী দেননি। বুদ্ধিতে যেটুকু কম আছে, পরিশ্রম দিয়ে সেটুকু তাকে পুষিয়ে নিতে হবে। কারণ সে জানে পরীক্ষায় তাকে পাশ করতেই হবে,—ফেল করার মত বিলাসিতা তার মত উদ্বাস্তু মেয়ের জন্য নয়।

অবশ্য সে যদি দেশের বাড়িতে থাকত তা হলে ম্যাট্রিক-পাশ করার পর তার আর পড়াশুনা হত না। পাশের গ্রামে সম্প্রতি একটা মেয়েদের হাইস্কুল হওয়াতে সে প্রতিদিন আড়াই মাইল করে ঠেঙিয়ে গিয়ে পড়ে ম্যাট্রিক পাশ করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তারপর সে যে শহরে গিয়ে কলেজে পড়বে এ কথা কারও সুদূর কল্পনাতেও আসেনি।

উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা এসে সে সেই দুর্লভ কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। শখের জন্য নয়, বা জ্ঞান লাভের আগ্রহবশতও নয়। দেশের বাড়িতে তার সামনে একটা সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছিল; এখানে সেটা নেই বলে। দেশে থাকলে তার নিশ্চয়ই কোন সম্পন্ন গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হতে পারত। এখানে তার কপর্দকহীন ভাইয়ের কাছে সেটা একটা দুরাশা মাত্র। আর সেই জন্যই তার এত পড়ার আয়োজন। যাতে সে নিজের পেটভাতের ব্যবস্থাটা করে নিতে পারে।

এখনো মনে পড়ে, বাড়ি ফেলে চলে আসার সময় কী দুঃখই না হয়েছিল। সারাটা পথ কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল। শেষটায় বিরক্ত হয়ে দাদা তাকে বকেছিল পর্যন্ত। অথচ তেমন কিছু আরামের সংসার যে ছিল তা নয়। জমিজমার উপর নির্ভরশীল যে-সব সংসার সে-সব সংসারের মেয়েরা ভাল করেই জানে, পেটের ভাতটা জোটানোর জন্য কী হাড়ভাঙ্গা খাটুনিটাই না খাটতে হয়। ধান ভানা, কাপড় কাচা থেকে শুরু করে দূরের পুকুর থেকে কলশি কলশি জল আনা পর্যন্ত। তারপর আছে বহু শরিকে ভাগ হয়ে যাওয়া বাড়িতে সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে শরিকে শরিকে নিরবচ্ছিন্ন ঝগড়া।

তবু সেখানে একটা জিনিস ছিল—নিশ্চয়তা। এখানে নিশ্চয়তা নেই। মাথা গোঁজার জায়গাটা পর্যন্ত নেই। যে রোজগারটা আজ হচ্ছে, কালও যে তা হবেই এ কথা কেউ বলতে পারে না। এখানে তারা বলতে গেলে শূন্যের উপরে ভাসছে। তবু সেই একদিনকার ফেলে আসা জীবনের জন্য দুঃখটা তটিনীর মনে আস্তে আস্তে থিতিয়ে এসেছে। যাই হোক, এখানে খাটুনিটা কম, শরিকী ঝগড়াটা অনুপস্থিত। শান্তিপ্রিয় তটিনীর পক্ষে সেটুকু কম লাভ নয়।

তটিনী পড়তে পড়তে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে মা উঠে পড়েছেন। তটিনী ভাত চাপিয়ে দিয়েছিল উনুনে; মা নামিয়ে নিলেন। কড়াতে ডাল বসিয়ে দিয়ে মেয়েকে ডাকলেন, তটিনী, ওঠ। একটু বাটনা করতে হবে যে।

আবার বাটনা?—তটিনীর কণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তি।

তা আর কী করা! তুই বাটনাটা বাট, আমি তরকারিগুলো কেটে নি

অগত্যা তটিনীকে উঠতে হল। একটানা পড়ার সুযোগ তার হয় না, মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে।

পাটা সুতো ঠিকঠাক করে নিয়ে বাটনা বাটতে বাটতে তটিনী আবার ভাবল, লেখাপড়া তাকে শিখতেই হবে। কলেজে গিয়ে সে এক আশ্চর্য জীবনের সন্ধান পেয়েছে। কত রকমের মেয়ে আসে কলেজে। কারও কারও চেহারা পরীর মত, পোষাক প্রজাপতির মত। কোন কোন মেয়ে কী আশ্চর্য সপ্রতিভ আর কর্মঠ! পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ে বলে কারও সঙ্গে একটা কথা বলতে ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। আর এই সব মেয়েরা অনায়াসে ছেলেদের সঙ্গে সমানে কথা বলে তাদের হারিয়ে দেয় বাক্‌যুদ্ধে। এ সব দেখে তটিনীর মনে একটু ঈর্ষা হয় বৈকি। পৃথিবীটা এত বড়! মানুষ নিজের চেষ্টায় আর যোগ্যতায় এত উন্নতি করছে। আর তটিনী কি পড়ে থাকবে সকলের পিছনে?

কিন্তু তটিনীর শান্ত নির্বিরোধী মনে ঈর্ষা খুব বেশী স্থান পায় না। সে ভাবে, নানান জন নানান পথে জীবনকে সার্থক করে তুলছে। সে-ও নিশ্চয়ই নিজেকে প্রকাশ করার একটা পথ খুঁজে পাবে! যত ছোটই তার পরিসর হোক, একদিন কি আর সে পাঁপড়ি মেলে ফুল হয়ে ফুটে উঠবে না, আর বিস্মিত হয়ে সমস্ত লোক কি তাকিয়ে থাকবে না তার মুখের দিকে?

দিন কতক আগে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে চপলাদির। চপলাদি এক আশ্চর্য মেয়ে! ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। তটিনীর চেয়েও কালো গায়ের রঙ, তার চেয়ে অন্তত এক ফুট লম্বা। মুখখানায় কেমন যেন একটু রুক্ষতার ছাপ। কিন্তু চোখ জোড়া আশ্চর্য স্নেহ মাখানো। সবচেয়ে আশ্চর্য তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অনলস কর্মক্ষমতা আর অনর্গল কথা বলা।

আলাপ হয়েছিল বড় অদ্ভুতভাবে। কমনরুমে তটিনী বসেছিল চার পাঁচটি মেয়ের মাঝখানে, সবাই অনর্গল কথা বলছিল। সে শুধু শুনছিল। হঠাৎ ঘরের অপর কোণ থেকে কাদের সঙ্গে কী কথা বলে চপলাদি চলে যাচ্ছিল বাইরে বেরুবার দরজার দিকে। তটিনীকে দেখে কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছ?—জিজ্ঞেস করল চপলাদি।

হ্যাঁ।

উদ্বাস্তু?

হ্যাঁ।

নিজে উদ্বাস্তু হয়েও উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু করছ না ?

এই আকস্মিক অভিযোগে তটিনী সেদিন খুব থতমত খেয়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ কোন জবাবই দিতে পারেনি। শেষে বলেছিল ঢোক গিলে : উদ্বাস্তুদের জন্য কে কী করছে আমি তো জানিনা চপলাদি।

সেদিন তটিনী ভাবতেও পারেনি যে তার জীবনে চপলাদির আবির্ভাবটা ঠিক নিয়তির মত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে একটি উদ্বাস্তু সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠল। সে আবিষ্কার করল, মানুষের আত্মবিকাশের হয়তো নানান পথ আছে ; কিন্তু যারা দুঃস্থ, পতিত, অত্যাচারিত তাদের হয়ে কাজ করতে পারলেও নিজেকে বিকাশ করার, পরিপূর্ণ করার সুযোগ পাওয়া যায়।

সুযোগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাধা অনেক। সবচেয়ে বড় বাধা তটিনীর নিজের প্রকৃতি। তার নিজের চেয়ে অন্যের কথা ভাবতেই সে বেশী অভ্যস্ত। কাজেই উদ্বাস্তুদের জন্য ভাবতে তার ভালই লাগে। কিন্তু তার স্বভাবটা যে বড় চাপা ; চিরকাল বড়দের আদেশ অনুযায়ী নীরবে কাজ করতে করতে সে কি করে কথা বলতে হয় তা কোনদিন শেখেনি।

কাজে নেমে সে দেখল, রাজনীতি করতে হলে কথা বলা জানতে হয়। সেদিন সে তিনটি বান্ধবীর সঙ্গে গিয়েছিল এক ভদ্রলোকের কাছে উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আলাপ করার জন্য।

তুমি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মেলামেশা কর ?—ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

মিশব না কেন ? আমি নিজেই তো উদ্বাস্তু।—তটিনী বলল।

তুমি উদ্বাস্তু বটে, কিন্তু ক'জন উদ্বাস্তুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ?

জেরার মুখে তটিনীকে স্বীকার করতে হল যে সে মেয়েছেলে, অল্পবয়সী, কাজেই তার পরিচিতের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

সুযোগ পেয়ে ভদ্রলোকটি ঝাড়া আধ-ঘণ্টা ধরে উদ্বাস্তুদের গালাগালি দিলেন। তিনি বললেন : উদ্বাস্তুরা সাধারণত অত্যন্ত অভদ্র আর আত্ম-স্বার্থ-পরায়ণ। সেইজন্যই অপর লোকের কোন সহানুভূতি তারা পেতে পারে না।

কথাগুলো তটিনী মানতেও পারছিল না, অথচ কী করে যে উপযুক্ত জবাব দেওয়া যায় ভেবেও পাচ্ছিল না।

সে নেহাৎ-ই লাজুক মুখ-চোরা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। কোন্ পুঁজি নিয়ে সে

রাজনীতি করবে? সেদিন থেকে তটিনীর মনে একটা ক্ষোভ বাসা বেঁধে রয়েছে। সে চায় উদ্বাস্তদের জন্য কাজ করতে; কিন্তু হায়, তার যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই। শুধু আন্তরিকতা, শুধু সদিচ্ছা থাকলেই যদি কাজ হত।

বাটনা বাটা হয়ে গিয়েছিল। তটিনী আবার পড়ায় মন দিল। বেশীক্ষণ অবশ্য আর পড়া চলবে না। কলেজে যাওয়ার জন্য একটু পরেই তাকে উঠে তৈরী হতে হবে।

অটল ক্রশ স্ট্রীটে গেল। কিছু কেনা-কাটার দরকার আছে। বিচিত্র জায়গা। সরু রাস্তা, তার দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে আরও সরু সরু গলি। রাস্তা আর গলির দু'পাশে বিরাট বিরাট তিন-তলা চার-তলা সব বাড়ি। কদাকার, স্যাঁৎসেতে, শ্যাওলা-পড়া। লরি, ঠ্যালা গাড়ী আর অজস্র পথচারীর ভীড়ে রাস্তায় চলাই দায়। এই নিতান্ত অপ্রীতিকর জায়গায় কিন্তু কোটি কোটি টাকার লেন-দেন চলে দৈনিক। এখানকার বাতাস ফুসফুস ভর্তি করে টেনে নিজেদের ধন্য মনে করে অটলরা।

একটা ছোট্ট দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা থান পছন্দ করে অটল দাম জিজ্ঞেস করল।

চৌবিশ! সংক্ষিপ্ত উত্তর এল।

বাইশ করে হলে দাও।

লোকটা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে অটলের হাতখানা ঠেলে দিলে বলল: ব্যস্, ব্যস্! দুস্‌রা দুকানমে যাও। দামাদামি মৎ কর্‌না ইধার।

এরা এরকমই। আয়ত্তের মধ্যে স্বল্প সামর্থের বাঙালী ক্রেতাকে পেলে এরা কদাচিৎ-ই ভদ্র হতে চেষ্টা করে। দামাদামি চলবে না! এক পয়সা দামের হেরফেরের জন্য লক্ষ কথা ব্যয় করে শালারা। অটল দেখেনি বুঝি বড় কারবারীদের বাগবিতণ্ডা?

আরও দু'পাঁচ দোকান ঘুরে ফিরে অটল শেষে বদ্রীদাসজীর দোকানে গিয়ে উঠল। সে বদ্রীদাসজার পুরনো খদ্দের। বেশীর ভাগ জিনিসই কেনে এখান থেকে। অবিশ্যি গোটা জায়গাটাই তবু একবার ঘোরা চাই-ই অটলের। কয়েকটা জিনিস সে পছন্দ করে বিল করার জন্য এগিয়ে দিল।

বদ্রীদাসজী এতক্ষণ অন্য এক ক্রেতার সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত ছিলেন। এবারে অটলের দিকে মন দিলেন।

অটলবাবু যে? রাম, রাম! বৈঠিয়ে!

রাম রাম।—অটল বসল।

কি কি জিনিস নিলেন?

অটল দেখালো।

বদ্রীদাসজী বললেন: এক কাজ করুন অটলবাবু। ঐ শোস্তার ছিটটা আরও কিছু নিয়ে নিন। আজকালকার বাজারে চোলবে ভালো।

সত্যিই অটল সেই থান আরও একখানা নিল। বদ্রীদাসজী সাধারণতঃ ভাল পরামর্শই দেন।

রাত্রে যখন অটল বাড়ীর পথে পা বাড়িয়েছে, সে হঠাৎ লক্ষ্য করল সিনেমার গান 'কৃষ্ণ কানাইয়ার' সুরটা সে গুন্ গুন্ করে ভাঁজছে। কৌতুক বোধ হওয়ায় হাসল একটু। না, আজকের বিকেলের বিক্রিটা ভালই হয়েছে,—তটিনীর পয় ভাল। বদ্রীদাসজীর পরামর্শে কেনা দু'খানা থানই বিক্রি হয়ে গেছে। বেশ ভাল মানুষ বদ্রীদাসজী।

ঘোষাল মশাইয়ের ডিস্পেন্সারীর সামনে এসে অটলকে থামতে হল। কল্যাণবাবু চীৎকার করে ডাকলেন: অটলবাবু, ও অটলবাবু!

অটলের মেজাজ ভাল ছিল। ঘরে গিয়ে বসল।

ঘোষাল মশাই বললেন: আপনার সঙ্গে কথা আছে অটলবাবু। পালাবেন না যেন।

সাধারণ কুশলাদি বিনিময় হল দু'চার জনের সঙ্গে। বাড়ির প্রায় অনেকেই উপস্থিত—সুধীনবাবু, মনোরমবাবু, পটল, দীনেশ প্রভৃতি। পাড়ারও দু'চারজন আছেন। কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এঁরা জড়ো হয়েছেন বোঝা যায়।

কাজের কথাটা কল্যাণবাবুই পাড়লেন: আপনাকে যে কো-অপারেটিভের একজন সভ্য হতে হবে অটলবাবু।

কো অপারেটিভ? সেটা কী জিনিস?

সারা দেশে তোলপাড় লেগে গেছে। কিছুই শোনেন নি আপনি?

কল্যাণবাবু বুঝিয়ে বললেন। মাত্র দশ টাকা দিয়ে সভ্য হতে হবে। এখন পাঁচ টাকা, বাকীটা পরে।

উপসংহারে কল্যাণবাবু বললেন: দশটা টাকা তো কিছুই নয়। প্রতি

মাসেই অমন দশ বিশ করে ডিভিডেণ্ড পাবেন যে। আমার কথাটা মনে রাখবেন তখন।

মোটের উপর অটল বুঝতে পারল, তার দশটা টাকার গলায় দড়ি দেওয়ার জন্য একটা গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছে। বিবর্ণ হয়ে হাত জোড় করে বলল: আমাকে মাপ করুন, কল্যাণদা। আমি পারব না। নিতান্ত গরীব আমি।

গরীব বলেই তো আসবেন এর মধ্যে। গরীবের জন্যই তো!

একে একে ঘোষাল মশাই, সুধীনবাবু, মায় পটল অবধি চেষ্টা করলেন। অটল তার সঙ্কল্পে অটল রইল। শেষে কল্যাণবাবু রেগে হরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন: দেখলেন হরেনবাবু, দেখলেন? বাঙালের গোঁ দেখলেন? আরে, মানুষ তো ভদ্রতা করেও বলে যে—ভেবে দেখি! তা নয়, যথা একবার না, তথা শতবার না!

সবাই হেসে উঠল। হরেনবাবুও হেসে বললেন: তা যাই বলুন কল্যাণবাবু,—বাঙালরা কাজের লোক বলে আমার একটা বিশ্বাস আছে।

কল্যাণবাবু খুশী হয়ে হো হো করে হেসে বললেন: সেটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে।

এক দমে বাড়ীর দোতলায় ওঠার সিঁড়ি অবধি এসে অটল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কল্যাণবাবুরা আর তার নাগাল পাবেন না আপাতত। ঘোষাল মশাইয়ের ডিস্পেনসারীতে সে আর যাচ্ছে না শিগগির।

হঠাৎ অটলের কানে গেল, একটা শিশুকণ্ঠ সুন্দর সুর করে বলছে: খালি চোদ আনা। খালি চোদ আনা!—অটল বুঝতে পারল, আজ সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই ছেলেটি তাকে কলেজ স্কোয়ারে দেখেছে। ঐ কথাগুলো বারবার বলেই সে আজ চারপাশে ভীড় জমিয়ে ফেলেছিল। দারুণ রাগে সে আকস্মিক আক্রমণে ছেলেটিকে ধরে ফেলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের সেই সময়কার চেহারার অসঙ্গতিটা মনে পড়ে গেল। নিজেই হেসে ফেলল অটল। লজ্জা পেয়ে ছেড়ে দিল ছেলেটিকে।

ঘরে এসে পাঁচটা টাকা দিল অটল তটিনীর হাতে।

খুশী তো?

কিন্তু এতগুলো টাকা না দিলেই পারতে দাদা। তোমার এত কষ্টের রোজগার।

তোর পয়ে হয়ে গেল বলে তো দিলাম।

তটিনী অত ভাগ্য মানে না। অটল যাই বলুক, রোজগারটা পরিশ্রমেই হয়। আর দাদার অত পরিশ্রমের টাকা কি আর সে বান্ধবীর বিয়েতে উপহার দেওয়ার মত বিলাসিতায় ব্যয় করতে পারে! তা নয়, তটিনীর অন্য উদ্দেশ্য আছে। টাকাটা বাস্তুহারাদের একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য সে দেবে লতিকাদির হাতে। যে অনাদর আর অবহেলা আজ বাস্তুহারাদের কপালে জুটছে সে তার অবসান দেখতে চায়। কিন্তু সত্যি কথাটা জানলে অটল কি আর টাকাটা দিত? দাদাকে তো ভাল করেই চেনে সে!

ছয়

অনেক হৈ চৈ আর সোরগোল তুলে কল্যাণবাবুদের 'সমবায় সমিতির' কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত আনড়ম্বরভাবে, অত্যন্ত আলগোছে একদিন সমিতির কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কেউ কোন প্রশ্ন করল না, কেউ জানতে চাইল না কেন বন্ধ হ'ল, কেউ এসে আপশোষ জানালো না। সেই যে একবার এক গাঁট কাপড়ের কোটা পাওয়া গিয়েছিল, তারপর আরও মাস-খানেক পরে আর একটা কোটা বরাদ্দ হয়েছিল, অনুরূপ পরিমাণ কাপড়ের। কিন্তু বন্ধু-পরিবৃত কল্যাণবাবু আর সে-কাপড়টা তুলতে সাহস পাননি। কাপড়ের কণ্ট্রোল থাকবে না বলে বাজারে তখন জোর গুজব। আর কোন অজ্ঞাত সূত্র থেকে অজস্র কাপড় এসে কলকাতার বাজার ছেয়ে গেছে। দাম কণ্ট্রোল-দামের সমানই। তবু কোটার মালটা তুলতে পারা যেত; কিন্তু অসুবিধে হ'ল কোটার মালের সঙ্গে আট-চুয়াল্লিশ, নয়-চুয়াল্লিশ প্রভৃতি কতকগুলি বাংলা দেশে অপ্রচলিত মাপের কাপড় থাকে, যা আগে চললেও এ-বাজারে চলবে না।

ঘোষাল মশাই বললেন: কো-অপারেটিভটা এখন বন্ধ করে দেওয়াই ভাল কল্যাণবাবু। আর কিছু করা যায় কিনা বরং ভেবে দেখুন।

কল্যাণবাবু সায় দিয়ে বললেন: ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমাদের রাষ্ট্র এখনো শিশুরাষ্ট্র। যাতে হাত দেবে তাই যে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারবে এতটা আশা করা ভুল।

রজত বলল: আমি আগেই জানতাম। আপনারা দেখে শিখুন।

এ কথায় কল্যাণবাবু রেগে গেলেন। কণ্ঠস্বরে রাগের আভাস প্রকাশ পেল। বললেন: সব সময়ই দেখতে পাই, তুমি আগে থেকেই জেনে বসে থাক। এত সব-জান্তা হওয়া ভাল নয় রজত।

রজত হাসতে লাগল। যে হাসি রাগকে গলিয়ে দেয় না, গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

আমি সব-জান্তা নই। কিন্তু আপনিই বলুন না কল্যাণদা, কো-অপারেটিভ সম্পর্কে আমি যা বলেছিলাম তা ফলে গেল কিনা।

ফলে গেল বলেই তো গা জ্বলে যাচ্ছে কল্যাণবাবুর। কো-অপারেটিভের পরাজয় যেন তাঁর নিজেরই পরাজয়। যেন তাঁর নিজের তৈরী একটি পরিকল্পনা তাঁর নিজেরই বুদ্ধির দোষে ভেস্তে গেছে। এ-ন আর কারও ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে যে সান্ত্বনা লাভ করবেন এমন কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। বললেন: আগেই তো বলেছি শিশু-রাষ্ট্রের দু'একটা ব্যাপারে ছোট খাটো দুর্বলতা থাকতেই পারে। এ-কথা তুমি কেন, সবাই বলতে পারে।

কিন্তু এ দুর্বলতার ফল তো ভুগতে হচ্ছে জনসাধারণকে। আগে একটু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করলে কী ক্ষতি ছিল?

কল্যাণবাবু ভাল করেই জানতেন, এ প্রশ্নের সত্যিই কোন উত্তর নেই। উত্তর নেই বলেই একটা মোক্ষম উত্তর দিয়ে প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করে দেওয়ার জন্য কল্যাণবাবুর মন আঁকু পাঁকু করতে লাগল, কিন্তু তর্কের ব্যাপারে অভিজ্ঞ কল্যাণবাবু নিজের মনকে সংযত করলেন। কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করলেন।

রজত, তুমি যদি গদিতে বসতে তা হলে আরও কম বিবেচনা করতে পারতে। কাজটা খুব সহজ নয় হে। যা বোঝ না, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। এখন কী করা যায় তাই চিন্তা করে দেখ।

ব্যাপারটার একরকম এইখানেই নিষ্পত্তি হ'ল। কল্যাণবাবু যে অনেক জাঁক ক'রে বন্ধু অমলেন্দু এবং স্ত্রীর কাছে সমবায় সমিতির মারফৎ অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য, শিল্পবিস্তার প্রভৃতি পরিচালনার কথা বলেছিলেন তার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মূলধন কোথায়? সরকার মূলধন সম্পর্কে নির্বিকার। সমবায় মন্ত্রীর কাছে তাঁরা যে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন, শিল্প-বিভাগের মারফৎ তার জবাবও এসেছে। তাঁরা জানিয়েছে তেল-কল, ছাপাখানা, দেশলাই, বরফ-কল প্রভৃতি কোন শিল্পেরই আপাতত কোন ভবিষ্যৎ নেই। সমস্যাটা উৎপাদনের নয়, অতি-উৎপাদনের।

এক কথায় অনিশ্চয়তার আর কোন অবকাশ নেই। কল্যাণবাবু ব্যাপারটা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন। তাই বলে কল্যাণবাবু যে খুব দুঃখিত বা বিমর্ষ হয়েছেন তা-ও নয়। ঐটেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। অনেক

আশা করা গিয়েছিল, অনেক খাটা গেল—তবু যখন কিছু হ'ল না, তখন আর ওটা নিয়ে মস্তিষ্কের শক্তি অপব্যয় না করাই ভাল।

বাইরে থেকে তাই মনে হল বটে, কিন্তু কল্যাণবাবু যে অন্তরে একটুও বিমর্ষ হলেন না তা নয়। তাঁর চোখের সামনে যেন একটা প্রকাণ্ড আশার ইমারত ভেঙে পড়ল। কো-অপারেটিভ সম্পর্কে তিনি অনেক আশা করেছিলেন বলেই নৈরাশ্যের যন্ত্রণাটা তীব্রভাবে বুকে বাজল। কী বিরাট বিপ্লব ঘটতে পারত কো-অপারেটিভের ভিতর দিয়ে! মুনাফাখোরদের গায়ে প্রত্যক্ষভাবে কোনরকম আঘাত না করেই জনসাধারণকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করা চলতে পারত। কিন্তু সেরকমের আশ্চর্য কোন ঘটনা ঘটল না। সব কিছু যে রকম ছিল তাই রয়ে গেল। শুধু সভ্যদের কিছু শেয়ারের টাকা মারা গেল; আর কিছু বোকা মানুষের কিছু হয়রানী সার হল।

অন্যান্য পাড়ায় যে সব সর্বার্থসাধক কো-অপারেটিভ গড়ে উঠেছিল কল্যাণবাবু সে সব সম্পর্কেও কিছু কিছু খবর জানতে পারলেন। সেগুলো অনেক ব্যাপক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। এখন প্রায় সর্বত্র কাজ গুটিয়ে নেওয়ার পালা চলছে। কিন্তু অনেক গণ্যমান্য কচ্ছপের এই মুখ খোলা আর মুখ বন্ধ করার প্রক্রিয়াটুকুর মধ্যে অনেক মালমসলা তাদের শক্ত খোলের আড়ালে নিরাপদ পেটের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। তবে কি এই সব কচ্ছপদের সাহায্য করার জন্যই সরকার পরিকল্পনা করেছিলেন?

কিন্তু এ ধরনের প্রশ্নকে কল্যাণবাবু কখনো প্রশ্রয় দেবেন না। প্রশ্নটা মনের মধ্যে জাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেটাকে বালি চাপা দিলেন। আসল কথা, অপেক্ষা করতে হবে। শিশুরাষ্ট্রকে সময় এবং সুযোগ দিতে হবে।

এমন সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যা না কল্যাণবাবুর জীবন না সমবায় সমিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু ঘটনাটি কল্যাণবাবুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল।

অটল একদিন মড়ার মত চেহারা নিয়ে কল্যাণবাবুর ঘরে এল। এ রকম এ-বাড়ীর সবাই আসে। কারও কোন বিপদ-আপদ ঘটলে সকলের আগে সে কল্যাণবাবুর কথাই মনে করে।

কল্যাণবাবু সবে ফিরেছেন সারাদিন ঘোরাঘুরির পর। অটলের চেহারা দেখে চমকে উঠলেন।—অটল যে! কি ব্যাপার বল তো।

অনেক অবান্তর কথার মধ্যে অটল যা বলল, কলকাতায় তা এমন কিছু অসাধারণ ঘটনা নয়। মাণিকতলার বাজারের সামনে অটল তার ফুটপাথের বিপণী সাজিয়ে বসেছিল। খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিল, অতর্কিতে টহলদারী পুলিশ এসে তাকে পাকড়াও করে। কয়েক ঘণ্টা থানায় আটকিয়ে রেখে অটলকে তারা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আটকিয়ে রেখেছে তার মাল।

ঐ মালের মধ্যে আমার যথাসর্বস্ব কল্যাণদা। মাল ফেরৎ না পেলে না খেয়ে মরব,—করুণ কণ্ঠে জানাল অটল।

কল্যাণবাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে বললেন : কাজটা তুমি ভাল করনি অটল।

জানি। আমি দোষ করেছি। আপনি আমাকে বাঁচান।

রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে ফেরিওলারা বসলে লোক-জনের চলা-ফেরার অসুবিধে হয়। সরকার তাই ফেরিওলা উচ্ছেদ আইন করেছেন। তুমি আইনের বিরুদ্ধে কাজ করতে গেলে কেন অটল?

না করলেই বা করব কি কল্যাণদা? ফেরি না করলে খাব কি?

কল্যাণবাবু হাসলেন।—এটা কি কোন যুক্তি হল? তবে তো চোরও বলতে পারে, চুরি না করলে আমি খাব কি?

এ প্রশ্নের জবাব অটল জানে না। সে চুপ করে রইল। তবু সে কল্যাণবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ভরসার প্রত্যাশায়।

অগত্যা কল্যাণবাবুকে ভরসা দিয়ে বলতে হল : কাল সকালে এস অটল। কী করা যায় দেখব।

সারা রাত ধরে কল্যাণবাবু ভাবলেন বিষয়টা। অটল কাজটা করেছে বে-আইনী। সমস্ত লোক যদি স্বাধীন দেশের সরকারের আইন ভাঙতে আরম্ভ করে তবে সরকার দাঁড়াবে কিসের উপর। কিন্তু এদিকে অটল বড় দুঃখী লোক। কোন রকমে ফেরিওলার কাজ করে মা আর বোনকে খাওয়াচ্ছে। তবু যে সে সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই নিজের সমস্যা মিটিয়ে নিচ্ছে এটা কম কৃতিত্ব নয়। গরীবের দুঃখ যেখানে প্রশ্ন, সেখানে কল্যাণবাবু আইনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকবেন কী করে? নীতি-টিতি আইন-টাইন তিনি অত বোঝেন না। কিন্তু তিনি এটুকু বোঝেন সমস্ত নীতির মূল

হওয়া উচিত মানুষের কল্যাণ। আইন যদি গরীবের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তবে গরীবকে বাঁচানোর জন্য সেই আইনের মধ্যে কোন ফাঁক আছে কিনা কল্যাণবাবু তা-ই দেখবেন। কাজটা নীতিসঙ্গত হল কিনা তা তিনি ভাববেন না।

পরদিন সকালে অটলকে নিয়ে থানায় গেলেন কল্যাণবাবু।

থানার ভিতর ঢুকে ডিউটি-রত অফিসারটিকে দেখে অটল কল্যাণবাবুকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল, ইনিই মাল আটক করেছেন।

ঘরে ঢুকে কল্যাণবাবু অফিসারটিকে নমস্কার করলেন। জবাবে অফিসার তাঁর বিড়াল-চক্ষুদ্বয় অগান্তুকদের মুখের উপর একবার দ্রুত বুলিয়ে নিলেন। পুলিশী প্রতি-নমস্কারের প্রথা বোধ করি এই।

খুব ব্যস্ত ছিলেন অফিসারটি। ঘরে উপস্থিতদের মধ্যে অধিকাংশই বোধ করি তাঁর অধস্তন কর্মচারী। তাঁদের কাছে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প করছিলেন তিনি।

কোন সম্ভাষণ মিলবে না বুঝতে পেরে কল্যাণবাবু নিজেই একটা বেঞ্চের এক কোণে বসলেন। অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বললেন: আমার একটু কথা ছিল স্যার।

বসুন,—এতক্ষণে এই পর্যন্ত ভদ্রতা দেখিয়ে দারোগাবাবু যেমন গল্প বলছিলেন তেমনি গল্প বলায় মন দিলেন।

এই লোকটির হয়ে আমি একটি কথা বলতে এসেছিলাম দারোগাবাবু— মিনিট পাঁচেক পরে কল্যাণবাবু আবার বলতে চেষ্টা করলেন।

দারোগাবাবু অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন: জানি। কিন্তু কোন সুবিধে হবে না দাদা। কেশ ডায়েরীতে উঠে গিয়েছে। কোর্টে পাঠানো হবে আজ। আমার কিছু করার নেই। যা বলার কোর্টে বলবেন।

ক্রমাগত অপমানে কল্যাণবাবুর ধৈর্যচ্যুতি হওয়ার জোগাড়। অটলের কথা ভেবে তবু নরম গলায় বললেন: আপনাদের হাতেই সব দারোগাবাবু। জানি তো আমরা। এ বেচারা বড়ই গরীব আর নিরীহ। এর মালটা ছেড়ে দিন দয়া করে।

কাকে গরীব নিরীহ বলছেন? এই লোকটাকে? মশাই, মানুষ চরিয়ে খাই আমরা। পাকা বদমাইশ আমরা দেখলে চিনি। কার হ'য়ে ওকালতী

করতে এসেছেন আপনি? জানেন, এরাই চোরাকারবারী, পকেটমার, জোচ্চোর?

আমার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকে এ লোকটা। একে আমি চিনি।

তবে আপনিও এর দলের। বেশী বেশী মিথ্যে কথা বলবেন তো আপনাকেও প্রসিকিউট করব।

আর সহ্য হ'ল না কল্যাণবাবুর। কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে আরম্ভ করলেন: হিসেব করে কথা বলবেন দারোগাবাবু। কাকে মিথ্যেবাদী বলছেন, তা জানেন? আমি একজন কংগ্রেসের লোক। এককালে টেরোরিজম করেছি। ঢের ঢের দারোগাকে টিট করে দিয়েছি এক কালে। ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না। এটা স্বাধীন দেশ।

জবাবে দারোগাবাবু আর একটি লোকের দিকে তাকিয়ে বললেন: তারপরেরটুকু শোন্ শম্ভু। সে বড় মজার ব্যাপার।—

কল্যাণবাবু কী একটা কঠিন কথা বলতে গিয়ে পিঠের উপর কার হাত পড়ায় থেমে গেলেন। একজন জমাদার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল: মিছিমিছি ঝামেলা কোরছো কেনো বাবু। কিছু দিয়ে টিয়ে মিটিয়ে নাওনা।

কল্যাণবাবু তৎক্ষণাৎ দারোগার দিকে ফিরে বললেন: টাকা নেবেন? টাকা পেলে মাল ফেরৎ দেবেন?

ভেবেছিলেন, প্রকাশ্যে ঘুষের কথা বললে দারোগার মুখ চুণ হয়ে যাবে।

কিন্তু দশ পাঁচ টাকায় হবে না তা আগেই বলে দিচ্ছি। কঠিন কেস। অন্তত পঞ্চাশ টাকা চাই।

প্রকাশ্য অফিসে ঘুষ নিয়ে আলোচনা? স্বাধীন দেশে? শকটা কাটতে বেশ সময় লাগল কল্যাণবাবুর। অটলের দিকে তাকালেন। তার চোখের করুণ মিনতি কি চাইছে বুঝতে দেরী হ'ল না। ভেবে লাভ নেই। গরীব মানুষটাকে বাঁচাতে হবে আগে।

অটলের কাছে মাত্র দশ টাকা ছিল। তাতে হ'ল না। কল্যাণবাবু নিজের থেকে আরও দশ টাকা দিয়ে রফা করলেন বহু কষ্টে। ভাগ্যিস অমলেন্দুর থেকে ধার-নেওয়া পঞ্চাশটা টাকার দশ টাকা পকেটে ছিল অবশিষ্ট।

মালের অবস্থা দেখে অটলের চোখে জল এল। কী অবস্থা করেছে

মালের জল্লাদগুলো। ডলাই-মলাই করে ধুলো-কাদা মাখিয়ে, এমন 'লাট' করে ফেলেছে যে, কাপড়গুলোর অর্ধেক দামও মিলবে কিনা সন্দেহ। তার মানে একটি আঘাতে অটলের মোট পুঁজির পরিমাণ অর্ধেক হয়ে গেল!

বড় সাধ ছিল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে অটল। ছোট্ট একটি নিজের বাড়ী, ছোট্ট একখানি দোকান। ফেরিওয়ালার পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব কল্পনা? বাড়ী জায়গা তাদের যে ছিল দেশে! কেন আবার তা ফিরে হবে না, যদি অটল তেমন করে খাটতে পারে? ডাইনে বাঁয়ে ফিরে তাকায় নি সে, বিলাস-ব্যসনে একটি পাইও নষ্ট করেনি। কারও সাতেও থাকেনি, পাঁচেও থাকেনি। পাছে মন বিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু সে কি চোরাবালুর উপর ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল এতকাল ধরে?

মাতালের মত টলতে টলতে ঘরে এসে ধুপ করে খালি মেঝের ওপর বসে পড়ল অটল। তটিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল অটলকে পরিচর্যা করতে।

আমার সর্বনাশ হয়ে গেল তটিনী,—অটল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল।

সমস্ত শুনে তটিনী সান্ত্বনা দিয়ে বলল: অত মুশড়ে যেতে নেই দাদা। মাল তো ফিরে পেয়েছো। লাট কাপড়গুলো ইস্ত্রী করে নিও। প্রায় পুরো দামই পাবে দেখো।

অটলের ঘামে-ভেজা লোমস বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তটিনী।

পুঁজি অর্ধেক হয়ে যাবে রে! কী করে যে সামলাব জানি না।

কিচ্ছু ভেবো না দাদা। আমি বরং একটা টিউশানি নেবো। তোমার ঘাটতি আমি ঠিক পূরণ করে দেব দেখো। আমি বলছি দাদা, সব হবে আবার। বাড়ি হবে, দোকান হবে, বৌ হবে।

পাগলী!—ম্লান হেসে বলল অটল। কিন্তু তটিনীর মিথ্যা প্রবোধ বাক্যগুলো কী ভালই যে লাগে!

তাই তো! তোকেও তো বিয়ে দিতে হবে রে তটিনী!

থানা থেকে ফিরে আসার পথে তীব্র শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করলেন কল্যাণবাবু। মাথা দপ দপ করছে; মুখ চোখ গরম হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়; সারা শরীর কাঁপছে।

এমন মর্মান্তিক ঘটনা দেশে ঘটছে, কিন্তু রিপোর্ট হয় না মন্ত্রীদের কাছে? মন্ত্রীরা জানতে পারলে এর প্রতিবিধান হ'ত নিশ্চয়ই। কিন্তু

সামান্য নাগরিক দায়িত্বও পালন করে না। এ হতভাগ্য দেশের অধিবাসীবৃন্দ! আশ্চর্য!

এই দায়িত্বটা নিতে হবে কল্যাণবাবুকে। তিনি রিপোর্ট করবেন। কিন্তু রিপোর্ট না পেলেই বা মন্ত্রীরা নিজেরা কেন জানতে পারবেন না নিজেদের ঘরের খবর? এমন কিছু দৈবাৎ-ঘটনা তো নয়!

সুধীনবাবু উকিল মানুষ। বললেন: অমন কাজও করতে যাবেন না কল্যাণবাবু। শেষটায় নিজেই ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।

এ-বাড়ির লোকেরা ব্যাপারটার উপর কোন গুরুত্বই দিল না। যেন ডাল-ভাত খাওয়ার মতই সহজ এ-ঘটনাটা। কেন কল্যাণবাবুর মন এমন বাস্তবপন্থী নয়? কেন বাস্তব বলেই কোন ঘটনাকে তিনি অনায়াসে স্বীকার করে নিতে পারেন না?

কিন্তু সমবায় সমিতির মত এ ঘটনাটাও কল্যাণবাবুর মনে ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে এল। শুধু মনের মধ্যে জেগে রইল একটা তীব্র ব্যর্থতা-বোধ। এ দেশে কিছু হয় না। কিচ্ছু হয় না। না আছে এ দেশের লোকের সেই সততা আর আন্তরিকতা; না পাওয়া যায় শিশু-রাষ্ট্রের থেকে পর্যাপ্ত আনুকূল্য।

অথচ মানুষকে কল্যাণবাবু এত ভালবাসেন! এই যে পটল, রবি, দীনেশ, বজত, ঘোষালমশাইয়ের দল—এদের জীবন যেন কল্যাণবাবুর জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে। এদের বাদ দিয়ে নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করতে কী যে খারাপ লাগে!

এ বাড়িতে এসে প্রথম একা একাই কিছু করতে চেয়েছিলেন কল্যাণবাবু। সে-ইতিহাস আজ প্রায় ভুলেই গিয়েছেন তিনি। আজ কেবলি মনে হচ্ছে, এ তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ। এ শুধু তাঁর অক্ষমতা, ব্যর্থতা, পলায়ন।

অথচ তাঁরও যে সংসার রয়েছে! তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জীবন-যাত্রা চলছে আজ অন্যের দাক্ষিণ্যের উপর। কল্পনাবিলাসের অবকাশ নেই, আপশোষ করার সময় নেই। নিছক নিজের স্বার্থপর প্রয়োজনের জন্য হলেও তাঁকে কিছু করতেই হবে। আর সেই কাজটাই কি সহজ? নিজের জন্য কিছু করাটা খুব সহজ বলে এতদিন ভেবেছেন কল্যাণবাবু। নিজের সংসারের দুরবস্থা দেখে বোঝেন নি। কিন্তু অটলকে দেখে বুঝতে পারলেন, এ-দেশে জীবন-সংগ্রাম আজ একটা কঠিন আবর্তের সামনে এসে পড়েছে।

রাতদিন এত খাটে অটল, তবু এত বড় ক্ষতি আজ তাকে স্বীকার করতে হল!
কল্যাণবাবুই কি পারবেন অনায়াসে কোন রোজগারের ব্যবস্থা করে নিতে?

মনে কোন উৎসাহ নেই, তবু মনকে শক্ত করলেন কল্যাণবাবু। কার কার কাছে যাবেন, তার একটা লিষ্টি তৈরী করলেন।

সকলের আগে গেলেন বোস সাহেবের কাছে। খুব অমায়িক ভদ্রলোক। কিছুদিন আগে ভদ্রলোক খুব গরীব হয়ে পড়েছিলেন। নিজের মোটরখানা পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই সময় একদিন ট্রামে কল্যাণবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভদ্রলোক প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। কল্যাণবাবুও তাঁর জন্য আন্তরিক দুঃখিত হয়েছিলেন। সত্যিই দুঃখিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসী-আদর্শে বিশ্বাসী কল্যাণবাবু বিশ্বাস করেন যে সকলের প্রয়োজন সমান নয়। যাঁর মোটর গাড়ীর প্রয়োজন, তাঁকে মোটর গাড়ীই দেওয়া দরকার।

সেই বোস সাহেব আজকে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন কয়লা সরবরাহের ওয়াগনের 'প্রায়রিটি পার্মিট' বের করে করে। ভদ্রলোকের অবস্থান্তরকে কল্যাণবাবু ঈর্ষা করেন না। তাই বলে তাঁর পথটাকেও তিনি সমর্থন করেন না।

বোস সাহেব বললেন: একটা কোল-মাইন কিনুন। ক্রেতার কাছে যেতে হবে না। এখন শুধু ফরোয়ার্ড পারচেজ আর এ্যাড্ভান্স পেমেণ্টের যুগ। লাল হয়ে যাবেন দু'বছরের মধ্যে।

মূলধন পাওয়া যাবে কোথায়?—হেসে বললেন কল্যাণবাবু।

সে কী কথা বললেন কল্যাণবাবু? মাত্র লাখখানেক টাকা জোগাড় করতে পারবেন না আপনার মত একজন কংগ্রেস নেতা? তাই আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

কিন্তু কোলিয়ারীর পরিকল্পনাটা কল্যাণবাবুর খুব ভাল লাগল। সত্যিকার দেশহিতৈষী পরিকল্পনা। অনেকক্ষণ ধরে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জেনে নিলেন। ভাব দেখে মনে হল, এ কারবার তিনি করলে করতে পারেন। একটা চাকরির কথা বলবেন বলে এসেছিলেন বোস সাহেবের কাছে। বলা হ'ল না।

কো-অপারেটিভের সঙ্গে আর একজন খুব গভীর ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল।

সে পটল। এজন্য সে কয়েকটা মাস কল্যাণবাবুর পিছনে পিছনে ছায়ার মত ঘুরেছে। দ্বিতীয়বারের কোটার মাল আনা হবে না শুনে সে অবাক হয়ে গেল। কল্যাণবাবুকে জিজ্ঞেস করল: এবারের কোটার কাপড় আনা হবে না কল্যাণদা?

কথাটা সে জিজ্ঞেস করল কল্যাণদার ঘরে নয়। ঘোষাল মশাইয়ের ডাক্তারখানাতেও নয়। পথে। কারণ, একমাত্র পথেই কল্যাণবাবুকে মাঝে মাঝে একান্তে পাওয়া যায়।

কল্যাণবাবু বললেন: না। সকলেই নিষেধ করছে।

কেন?

বাজারে তো কাপড়ের অভাব নেই এখন। এনে লাভ কি?

তা হলে এখন আমরা কো-অপারেটিভ থেকে কী করব?

আপাতত তো করার কিছু দেখছি না।

যারা শেয়ার নিয়েছে তাদের কী বলব?

সেইটেই তো সমস্যা পটল। তাদের টাকাগুলো যে আমরা খরচ করলাম। এখন তাদের কী বলব?

পটল হঠাৎ চুপ করে গেল। পথ চলতে চলতে কল্যাণবাবু আড় চোখে তাকিয়ে দেখলেন, কালো জোয়ান উৎসাহী ছেলেটা কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে। সান্ত্বনা দেওয়া দরকার।

কিছু ভেবো না পটল। কয়েকদিন সময় দাও। আবার কিছু একটা আরম্ভ করা যাবে।

না—ভাবছি না। ভাববার ভার তো আপনার ওপর।

এ কথায় কল্যাণবাবু হেসে উঠলেন। খুশি হয়ে নয়, লজ্জিত হয়ে।

কল্যাণবাবুর কাছ থেকে ফিরে এসে পটল রবিকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এল।

কিরে পটলা?—রবি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল।

চল্—কথা আছে। সিগারেট খাওয়াবি তো?

কথাটা ভাল না খারাপ।

যদি বলি খারাপ?

তাহলে খাওয়াব না।

তাই বল্। তাহলে তোকে ডবল সিগারেট খাওয়াতে হবে।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে সদর রাস্তায় নেমে এল। একটা লরি রাস্তার উপরকার খালখন্দগুলো এড়ানোর জন্যে ক্রমাগত এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে চলে গেল। একরাশ ধুলো উড়িয়ে গেল সেই সঙ্গে। ধুলোর হাত থেকে মুখটা বাঁচানোর জন্যে রুমাল বের করে পটল পকেটে হাত দিয়ে দেখল রুমাল নেই। বিরক্ত হয়ে বলল: দুঃ শালা!

কাকে গাল দিচ্ছিস?

ধোপাকে, শালী ধোপা আমার রুমালটা মেরে দিয়েছে।

গাল দিস্‌নি। মান্ধাতার আমলের একটা রুমাল নিয়েছে তো কী হয়েছে? এই নে, আমারটা নে। তারপর বল্—তোর কথটা কি বল্।

কোন দরকার ছিল না, তবু পটল গলা খাটো করে বলল: কাউকে বলবি না কিন্তু। খুব গোপনীয়। কল্যাণদা একটা ইণ্ডাস্ট্রী করতে চাইছেন আমাদের কো-অপারেটিভের তরফ থেকে।

ইণ্ডাস্ট্রী? মানে কারখানা?

হ্যাঁরে। অবাক হয়ে গেলি নাকি?

না—মানে—কারখানাটা কিসের হবে রে? সাবানের?

ধেৎ। সাবানের কারখানা তো এ পাড়াতে শতখানেক আছে। ওতে আর ক' পয়সা লাভ! কল্যাণদা স্টীল অথবা পেপারের কথা ভাবছেন। কোন্‌টা করবেন এখনো ফাইনালী ঠিক হয়নি।

বলিস্ কী? স্টীল? মানে ইস্পাত?

অথবা পেপার। দুটোতেই প্রচণ্ড লাভ। শতকরা পঁচাত্তর টাকা।

অত মূলধন পাবেন কোথায় রে কল্যাণদা?

মূলধন একটা সমস্যাই নয়। উদ্বাস্তুদের জন্য তো সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। সরকার কাদের বল্ তো?

কংগ্রেসের।

কল্যাণদাও কংগ্রেসের লোক। সুতোর গোড়া ধরে টান্ দিলে আগাও চলে আসে কিনা বল্ না?

সিগারেটের দোকানটা এসে গিয়েছিল। রবিকে বলতে হল না। সে ইচ্ছে করেই দুটো সিগারেট কিনে দিল পটলকে।

সিগারেট খাওয়া হয়ে গেলে দু'জনে বাড়িতে ফিরল। পটল জিজ্ঞেস করল: তোর এখন কাজ আছে নাকি রে রবি?

না। কাজ আর কী?

তবে তোর তাশজোড়াটা নিয়ে আয় কল্যাণদাদের ঘরের ওপাশের বারান্দায়। ওদিকটা এখন ছায়া।

দু'জনে কি খেলা হবে?

দীনেশ-টিনেশ দু-তিনজনকে ডেকে নিয়ে আসিস, ঐ পথে।

রবিকে বিদায় দিয়ে পটল চলে এল সোজা কল্যাণদার ঘরে। কল্যাণদা বেরিয়ে গিয়েছেন তা সে জানত। কাজেই সুনন্দাকে এখন নিরিবিলিতে ঘরে পাওয়া যাবে। রবির আসতে আসতে যেটুকু সময় যাবে তার মধ্যে সুনন্দার সঙ্গে দু' একটা কথা বলে নেওয়া চলবে। এমনি করে নানান্ কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুনন্দার সঙ্গে দু'চারটে কথা বিনিময় করতেই পটলের ভাল লাগে। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে সুনন্দার সঙ্গে গভীর আলাপ করার কথা সে ভাবে না।

উদ্বাস্তুদের এক ফালি জীবন-নাট্যে যখন অনেক উত্থান-পতনের নাটক জমে উঠছে, তখন নিতান্ত অনাদরে এবং অবজ্ঞায় আর এক ধরনের নাটকের সূত্রপাত হচ্ছে পটল আর সুনন্দার জীবনে। ওরা যে পরস্পরের প্রেমে পড়েছে তা ওরা না জান্‌লেও বাড়ীর অনেকেই জানে। লোকের মুখে এ খবর শুনে ওরা আমোদ পায়; লোকের কল্পনার রশদ জোটানোর জন্য আরও বেশী করে মেশে। সুনন্দা ভাবে, পটল তাকে একটু বিশেষ চোখে দেখে; কিন্তু তার মন রয়েছে সম্পূর্ণ নির্বিকার। পটল ভাবে, সুনন্দা হয়তো মজেছে; কিন্তু তার মনে কোন ভাবান্তর এলে সে তো কিছু একটা করেই বস্‌ত।

সুনন্দাকে ঘরে একা দেখে এক গাল হেসে পটল বসল মেঝেতে। ওর এ-ঘরে আসার লক্ষ্য কল্যাণবাবু, উপলক্ষ সুনন্দা।—সুনন্দা তা জানে।

কল্যাণদা আছেন?

না। তারপর তল্পীবাহকের দুনিয়া কেমন চলছে?

ভাল। তল্পীবাহকরা আছে তাই তো গণ্যমান্যরা গণ্যমান্য হতে পারেন।

তাই তো বলছি। তন্নীবাহকের জয়-জয়কার হোক।

পটল তবু রাগল না: মহারাণীর কোন তন্নী বহন করতে হবে না তো?

ভাল কথা মনে করেছ পটলদা। একটু উল এনে দেবে আমাকে? লাল উল। রাধেশ মামা গোটা কয়েক টাকা দিয়েছিলেন—খরচ করে ফেলি।

হ্যাঁ! হ্যাঁ! পয়সা বড় আপদ—যত তাড়াতাড়ি বিদায় করা যায় ততই ভাল। কিন্তু তন্নীবাহক বললে কেন? আমি পারব না ফরমাস খাটতে।

থুক! আর বলব না। পটলদা বড় লক্ষ্মী। পটলদা খাঁটি সোনা।

সুনন্দার কাছ থেকে ফিরে এসে পটল রবি ও আরও কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তাশ খেলতে বসল।

পরবর্তী কয়েকটা দিন পটল যেন তাশ খেলার মধ্যে ডুবে গেল। দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই,—পটলের তাশ খেলার কোন বিরাম নেই। পালায় পালায় সঙ্গী বদল হয়, কিন্তু সব দলের সঙ্গেই পটল আছে অন্যতম খেলোয়াড় হিসেবে। সকলে ভাবল, বাউণ্ডুলে স্বভাবের ছেলের এ-ও একটা খেয়াল। কেউ কল্পনাও করতে পারল না পটলের এই তাশ-খেলার নেশার মধ্যে একটা মস্ত আশার আলোর ধ্বংসস্তূপ লুকিয়ে রয়েছে।

এদিকে দিন কয়েকের মধ্যে এক কল্যাণদা ছাড়া বাড়িসুদ্ধ লোক জেনে গেল যে কল্যাণদা একটা বিরাট কারখানার পরিকল্পনা করেছেন। সকলের মুখ চোখ চক্‌চকে হয়ে উঠল সে কথা শুনে। কারণ সকলেই এ কথা মানে কল্যাণবাবুর তত্ত্বাবধানে কোন লোক বঞ্চিত হবে না।

সাত

অনেক জল্পনা-কল্পনা ক'রেও কোন সমাধানের সূত্র না পেয়ে বাড়ির লোকেরা ধরে নিয়েছিল বাড়ির সমস্যাটা আপনা-আপনি মিটবে। অনেককাল তো হ'য়ে গেল,—কৈ কোন ঝামেলা তো করল না বাড়িওয়ালা। আসলে বে-দখল-করা বাড়ি এখনকার কলকাতার একটা বড় সমস্যা। দেশের লোকের সরকার এর একটা সুসঙ্গত মীমাংসা কি না ক'রে পারে?

বাড়িওয়ালা এবং দেশের সরকার যে চুপ ক'রে বসে নেই, একদিন তার প্রমাণ মিলল। সেদিন দুপুরে বাড়িতে একজনও পুরুষ মানুষ নেই। এমন কি অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধরাও কোন-না-কোন কাজে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। পুরুষ বলতে এক ধরণীবাবু ছিলেন। কিন্তু তিনিও ঘর এবং সামনের বারান্দা ছেড়ে পূবদিকের বারান্দায় গিয়ে একটি চেয়ে-নেওয়া বিড়ি টানছেন গোপনে। হাঁপ-রোগী ব'লে তাঁর বিড়ি খাওয়া নিষিদ্ধ; সুধা জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না।

বাইরে ঘাম-ঝরানো তীব্র রোদ। গ্রীষ্মের অকরুণ আকাশে মেঘের ছিটে ফোঁটাও নেই।

এমন সময় জন পাঁচেক পুলিশের একটি ছোট্ট দল নিয়ে থানার দারোগা এলেন বাড়ীতে। নিচের কাজ গোছানো সহজসাধ্য বিবেচনা ক'রে সেখানে একজন মাত্র পুলিশ রেখে বাকী চারজনকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং গট গট করে উঠে এলেন উপরে।

সিঁড়ির পাশের প্রথম ঘরখানাই এখন সুধাদের। সে সবে একটু শুয়েছিল। কয়েক জোড়া বুটের এলোমেলো শব্দ শুনে সে কৌতূহলী হয়ে বাইরে এল। আর একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে গেল দারোগার সঙ্গে।

কী চান?—সুধা জিজ্ঞেস করল।

চেষ্টাকৃত মোলায়েম গলায় দারোগাবাবু বললেন: ক্ষমা করবেন অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে আমি এসেছি। আমার উপর এই বাড়ি খালি

ক'রে দেওয়ার আদেশ আছে। আশা করি, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে বেরিয়ে যাবেন বাড়ী থেকে। এক্ষুনি।

সুধা ঠিক নিরীহ মেষশাবকের মত মেয়ে নয়। সারা জীবন প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার ফলে তার ভিতরে প্রতিরোধ-প্রবণতা একটু বেশী। তা'ছাড়া পুলিশের হিংস্রতার রূপ দেখেনি বলে একটা অজ্ঞানতা-প্রসূত সাহসও তার ছিল।

বাড়িতে ব্যাটাছেলে কেউ নেই। এখন কোন কাজ হবে না বলে দিচ্ছি। দরকার থাকলে অন্য সময় আসবেন। খুব সময় বেছে নিয়ে এসেছেন যা হোক!—তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো নির্ভীক গলায় সুধা জবাব দিল।

বুটের শব্দ এবং কথা কাটাকাটি দুপুরের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে অনেকের কানেই গিয়ে পৌছল। ঘরে ঘরে মেয়েরা দরজার কপাট ফাঁক করে দেখল একবার করে। কিন্তু তারপরেই প্রতি দরজায় টাইট করে খিল আর ছিটকানি পড়ে গেল। তাতেও নিরাপদ বোধ না করে ঘরে বসে মেয়ে-মহিলারা কেউবা কাঁপতে লাগল, কেউ বা কাঁদতে লাগল। সুধাদের ঘরের পার্টিশনের ও-প্রান্ত থেকে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ ভেসে এল।

সুধীনবাবুর স্ত্রী নলিনী ডেকে তুললেন মনোরমাকে। মনোরমার আর তাঁর ঘরের ব্যবধান মাত্র একটা দরজার। বারান্দা পার হতে হয় না। সেই সাহসেই ডাকতে পারলেন।

ও দি-দি গো পুলিশ! কী হবে গো!

মনোরমা শুয়ে ছিলেন। ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

কি বলছেন দিদি? পুলিশ এসেছে? আসবে আগেই জানতাম। কোথায়?

সিঁড়ির কাছে, বারান্দায় সুধা ঝগড়া করছে খুব। নয়তো এসে পড়ত এতক্ষণ।

দারোগার মেয়ে মনোরমার পুলিশ দেখার অভ্যেস আছে।

সুধা একা ঠেকিয়ে রেখেছে? তবে চলুন, আমরাও যাই।

সে কি দিদি? পুলিশের সামনে যাবেন?—নলিনী ভয়ে আঁৎকে উঠলেন।

কপালে যখন তাই আছে, চলুন, ভয় কি? গিলে তো আর খাবে না!

ওদিকে মনোরমা, সুনন্দা, নলিনীকে বেরিয়ে আসতে দেখে পাশের ঘর থেকে আলতা, হিমানী দেবী প্রভৃতিও যোগ দিয়ে দল ভারী করলেন।

এদিকে তখন সুধার জেরার সামনে দারোগাবাবু হিমসিম খেয়ে গেছেন। সম্প্রতি কয়েকটি এই ধরনের বে-দখল-করা বাড়িতে দুপুরে পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আক্রমণ করে অদ্ভুত সুফল পাওয়া গিয়েছে। সেইসব খবরের উপর নির্ভর করে অল্প কয়েকজন সিপাই নিয়েই তিনি চড়াও হয়েছেন। অন্য সময়ে এসব উদ্বাস্তুদের বাড়ি আক্রমণ করতে রীতিমত প্রস্তুতি দরকার। ব্যাটারা বোমা-টোমা নিয়ে তৈরী থাকে পর্যন্ত! ডাকাত বিশেষ।

কিন্তু দারোগাবাবু জানতেন না যে সুধার মত মেয়ের সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে।

সুধা জিজ্ঞেস করছিল: কে আপনাদের খবর দিয়েছে যে এটা জবর-দখল-করা বাড়ি?

বাড়ির মালিক নিজে।

ডাকাতি করতে হলেও আর একটু ভাল ক'রে খোঁজ খবর নিতে হয়, বুঝেছেন। মাসে মাসে কড়কড়ে টাকা ভাড়া গুনে নিয়ে যান বাড়িওয়ালা। তিনি তো আপনার বোনাই হন, তাই খামোখা মিথ্যে একটা খবর দিতে গিয়েছিলেন আপনাকে! বেশ, বলছেন যখন, দেখান দিকি, চিঠি দেখান।

সে-চিঠি দেখাতে পুলিশ বাধ্য নয়।

ওমা! তাও বাধ্য নয়? পুলিশ বুঝি শুধু বাধ্য পুরুষ নেই দেখলে মেয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করতে? ভাল কথা বলছি আপনাকে, শুনুন। মানে মানে সরে পড়ুন। পুলিশের পোশাক প'রে ডাকাতি অনেক জায়গায় করা যায় বটে; কিন্তু এখানে চলবে না। পরশুর কাগজেও ছিল, বসিরহাটে পুলিশের পোশাক প'রে এসে কারা ডাকাতি করেছে। কন্ট্রোলের মাল খানাতল্লাসী করবে বলে পুলিশের পোশাক প'রে একদল লোক এই সেদিন বড়বাজারে গহনা চুরি করেছে। আমরা জানি কিনা এসব ব্যাপার। কাজেই এখানে সুবিধা হবে না।

কী সব বলছেন আপনি যা-তা?—দারোগাবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন।

এমন সময় মনোরমা সদলবলে এসে পড়লেন।

দেখুন মনোরমাদি, এরা পুলিশ-ফুলিশ কিছু নয়। পুলিশের পোশাক পরে ডাকাতি করতে এসেছে। কথায় কথায় ধরে ফেলেছি আমি।

দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিলেন দারোগাবাবু। অপ্রয়োজনীয়বোধে তৈরী ওয়ারেন্টটাও আনেন নি সঙ্গে। এখন এই মেয়েটি যে-রকম ডাকাত-ডাকাত বলছে,—শেষটায় কোন ঝামেলায় না পড়ে যেতে হয় তাঁকে।

মনোরমা দেবী বললেন: পুলিশই যদি হবেন আপনারা, তবে আপনাদের অর্ডার কোথায়, দেখান।

মনোরমার দারোগার মেয়ে হওয়ার অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগল। জায়গা মত আঘাত লাগায় দারোগা আর দাঁড়ালেন না। সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ফিরে যেতে যেতে বললেন: আচ্ছা, আজ যাচ্ছি বটে, কিন্তু কাজটা ভাল করলেন না। এর উপযুক্ত ফল পাবেন শিগগিরই।

এদিকে নিচের পুলিশটির অবস্থা আরও শোচনীয়। সামনে পেয়ে লক্ষ্মণের ঘরে ঢুকে পড়েছিল সে বিনা বাক্যব্যয়ে। ঘরে ছিল রুক্মিণী, সুভদ্রা এবং আরও তিন-চারটে মেয়ে। একটু আগে চোরাবাজারের সোডা এনে তারা বেতের ধামায় তুলেছে। তখনো খোলা অবস্থায় রয়েছে সোডাগুলো। পুলিশ দেখে তৎক্ষণাৎ অনুমান করল, সোডা ধরতে এসেছে নিশ্চয়। মেয়েগুলো হিংস্র হয়ে উঠল। রুক্মিণী দারুণ সাহসী এবং সেই পরিমাণে শক্তিশালী। একবার পুলিশের হাত কামড়িয়ে দিয়ে পুলিশ-বিজয়িনী নাম কিনেছে সে। রুক্মিণী আগে, তার পিছনে আর সব মেয়েরা, কোনরকম ভূমিকা না ক'রে এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশটির উপর। কীল, চড়, আঁচড়, কামড়ে আধমরা হ'য়ে দুর্বোধ্য মাতৃভাষার বুলি ছাড়তে ছাড়তে সে কোনরকমে দৌড়িয়ে পালিয়ে বেঁচেছে।

পুলিশ-বিজয়-পর্ব সুনিশ্চিতভাবে সমাধান হওয়ার পরে দোতলার বারান্দায় প্রকাণ্ড জটলা বসে গেল। সমস্ত ঘরের সমস্ত মেয়ে মহিলা যোগ দিলেন জটলায়। নেহাৎ ফাঁকা জায়গায় বাড়িটা না হ'লে শোরগোলে পাড়ার লোকের ভীড় জমে যেত নিঃসন্দেহে। আজকের জটলার কেন্দ্র সুধা। আজকের নাটকে প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে পড়েছে সে। অকর্মণ্য স্বামীর স্ত্রী বলে এতকাল সে ছিল কৃপার পাত্রী।

তা জানা ছিল বলে বাড়ির লোকের সঙ্গে সুধা বিশতও কদাচিৎ। দিন-কতক আগে এক ভদ্রলোকের আশ্রয়-সমস্তায় খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করে সে বাড়ির লোকের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু আজ আর সে শুধু বিস্ময়ের বস্তু নয়, আজ সে বীরাঙ্গনা।

বাড়িসুদ্ধ মেয়ের সমবেত প্রশ্নবাণ আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাঝখানে পড়ে সুধা সহজেই বিব্রত হ'য়ে পড়ল।

নলিনী দেবী বললেন: ভাগ্যিস তুমি ছিলে সুধা! তুমি না থাকলে এতক্ষণ আমাদের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হত।

মনোরমা বললেন: কী বলে যে তোমার প্রশংসা করব সুধা! তোমার মত সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি খুব কম বাঙালী মেয়েরই আছে।

মন্দাকিনী দেবীর চোখে-মুখে আতঙ্কের ভাবটা এখনো কাটেনি। বললেন: এখনো আমার বুক কাঁপছে গো! কি বিপদটা গেল মাথার উপর দিয়ে! শতবার তোমাকে ধন্য ধন্য করি সুধা! মেয়েছেলের এমন সাহস হয় বাপের বয়সেও ছাখে নি কেউ।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মন্দাকিনী। স্থূলদেহের শ্লথ মাংসপেশীগুলো, বিশেষ করে নিতম্বের পেশীগুলো কাঁপতে লাগল কান্নার বেগে।

এই প্রশস্তির বন্যার মধ্যে সুনন্দাও যোগ দিল।

তুমি মেয়েদের মান বাঁচিয়েছ সুধাদি। তুমি আমাদের দুর্নাম ঘুচিয়েছ।

সুধাদের ঘরের পার্টিশনের ওপারের বাসিন্দা অঘোরবাবুর স্ত্রী মানসী এসে সুধাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ফর্সা সুন্দর মুখের আয়ত চোখ দুটি তখনো কান্নায় লাল।

এত বিপদেও মানুষ পড়ে! পুলিশের সামনে যে সুধা ঘামেনি, মানসীর বাহু-বেষ্টনীতে সে ঘেমে উঠল।

এদিকে বাড়ির শিশুমহলেও উৎসব লেগে গিয়েছে। পুলিশ দেখে মা-দিদিদের ভয় পেতে দেখে তারাও প্রথমটায় খুব ভয় পেয়েছিল। কিন্তু সুধাকে কেন্দ্র করে মা-মাসীমা-দিদিদের বিচিত্র জটলা, ফুঁপিয়ে কান্না আর অঙ্গভঙ্গী দেখে তারা দারুণ কৌতুক বোধ করছে এখন। বিশেষ করে ভাল লেগেছে ওদের মন্দাকিনীর মত বয়স্কা মহিলার সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কান্না

সব ছেলে-মেয়েই এখন সেইটে অনুকরণ করায় ব্যস্ত। মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে চাপা হাসিতে উচ্ছল কৃত্রিম কান্নার ধুম লেগে গিয়েছে।

' ওদিকে বয়স্কদের মধ্যে জনকয়েক সুধাকে রেহাই দিয়ে সরে এসে নতুন জটলা জাঁকিয়ে তুলেছেন। এখানকার নেত্রী মন্দাকিনী। এতক্ষণে তিনি তাঁর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ফিরে পেয়েছেন।

কী জাঁহাবাজ মেয়ে রে বাপু! বাপের বয়সেও এমন দেখি নি। পুলিশের মুখের উপর পট্‌ পট্‌ করে কথা, বলে গেল! এতটুকু ভয় ডর নেই! এমন বেহায়া মেয়ে বাড়িতে বিপদ ঘটাবে কোন সন্দেহ নেই।—বললেন মন্দাকিনী।

দীপঙ্করবাবুর বিধবা বোন হিমানী বললেন: 'তেমনি কাঠখোট্টা চেহারা। দেখলে মনে হয় পুরুষের বাবা।

নলিনী দেবী পর্যন্ত বললেন: সোয়ামীকে সাত ঘাটের জল খাওয়ায় মাগী। আমি তখনি জানতাম। এ মেয়ে বড় সহজ মেয়ে নয়। আজকে তো সব বুঝতে পারা গেল।

হিমানী দেবীর মেয়ে আলতা হাততালি দিয়ে বলল: ঠিক হয়েছে! সুধাদির সঙ্গেই তবে সই পাতাব আমি।

চড় খাস্ নি বুঝি? হিমানী ধমক দিয়ে উঠলেন: ও-মাগীর ত্রিসীমানায় যাস্ তো গলায় নুনের পোঁটলা বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেব।

একটু পরে সুনন্দা, আলতা, ছন্দা প্রভৃতি তরুণী মেয়েদের দল নিচের তলায় এল খবর নিতে।

নিচের তলায় তখন বিরাট ঐকতানবাদন শুরু হয়ে গেছে। দূর থেকে শুনে মনে হয়, অনেক মেয়ে এক সঙ্গে বসে বুঝি কাঁদছে। ব্যাপারটা আসলে তা নয়। তারা সকলে মিলে সমবেত চিৎকারে পুলিশদের শাপ-শাপান্ত করছে। দোহাই ঈশ্বরের, এই পাপের ঝাড় যেন যার যার মত বাড়ীতে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনসমেত মুখে রক্ত উঠে মরে পড়ে থাকে! সবাই যে এক কথা বলছে তা নয়। যার যা মনে আসছে তাই বলছে। একজন যা বলছে আর একজন তার পুনরাবৃত্তি করছে।

সুনন্দাদের দেখে তারা হঠাৎ থেমে গেল। তাদের কাণ্ড দেখে সুনন্দা হেসে.ফেলেছিল। কোনরকমে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল: তোমাদের এখানে পুলিশ এসেছিল?

আসে নি আবার?—দু'তিনজন এক সঙ্গে জবাব দিল। তারপর পরমোৎসাহে শুরু হল উপরতলা আর নিচের তলার অভিজ্ঞতা বিনিময়।

পুলিশী হাঙ্গামার ফলে উপরতলা আর নিচের তলার বিচ্ছিন্ন জীবন-যাত্রার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতার সেতু গড়ে উঠল। অন্তত কিছুদিনের জন্য। এক বাড়ির বাসিন্দা হওয়ার ফলে একই সুখ-দুঃখের শরিক হয়ে পড়েছে তারা। এই চেতনাটা এখন এসেছে তাদের মধ্যে। এর পরেও মাঝে মাঝে এসেছে। কিন্তু স্থায়ী হয় না।

ভীড়ের সংস্রব এড়িয়ে ঘরে এসে সুধা দেখল ধরণীবাবু অপেক্ষা করছেন।

বারোভাতারে মাগীদের মত পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া করতে একটুও লজ্জা হল না তোমার?—ভূমিকা না করে ধরণীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

পুলিশের সঙ্গে দুটো কথা বলায় এমন কিছু আত্মপ্রসাদ বোধ করেনি সুধা। কিন্তু সারাদিনের উত্তেজনায় সুধার মেজাজটা ভাল ছিল। বাড়ীসুদ্ধ লোক যখন হৈচৈ-তে ব্যস্ত, তখন স্বামীত্বের কর্তব্য পালনের জন্য ধরণীবাবুর এই ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় সুধা হেসে ফেলল। অন্য সময় হলে হয়তো রাগ করত।

বাইরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সুধা বলল: ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে ছাখো। ওরা কিন্তু প্রশংসা করছে আমাকে।

আমার বৌ অজানা অচেনা পুলিশ গুণ্ডা বদমাইশের সঙ্গে কথা বলবে এ আমি পছন্দ করি না।

বেশ তো! এরপর পুলিশ এলে দরজায় দাঁড়িয়ে বৌকে পাহারা দিও। সাহসে কুলুবে তো?

হঠাৎ কী সন্দেহ হওয়ায় সুধা ধরণীবাবুর মুখের কাছে নাক নিয়ে শুঁকে দেখল।

যা ভেবেছি! আবার চুরি করে বিড়ি খেয়েছো? লজ্জা হবে কি মরলে?

যুগপৎ রাগে আর ভয়ে ধরণীবাবুর অবস্থা হ'ল শোচনীয়।

আট

সেদিন এবং তার পরদিন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরেই বাড়িতে জল্পনা-কল্পনা চলল। বাড়ি সম্পর্কে একটা সক্রিয় কর্মপন্থা ঠিক করতে হয় এবার। মেয়েদেরকে, বিশেষ ক'রে সুধাকে, অশেষ ধন্যবাদ। তারা একবার পুলিশকে ঠেকিয়েছে। কিন্তু পুলিশ তো আবার আসবে।

আলাপ-আলোচনায় কিছুই হ'ল না শেষ পর্যন্ত। শুধু জমাট বাঁধা দুশ্চিন্তা পাষাণ-ভারের মত এ-বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সকলের মনে চেপে বসল। আশ্চর্য এই যে, এমন দুর্দিনেও বাড়ির একটি মেয়েও তার পুরুষকে এ-বাড়ি ছাড়ার জন্য অনুরোধ করল না। যদিও পুলিশের ভয়ে তারা কেঁদেছে, এখনো কাঁদছে। তারা জেনে নিয়েছে, এ-বাড়ি ছাড়লে আর কোথাও তাদের আশ্রয় জুটবে না এত বড় একশো বর্গমাইলের কলকাতায়। বাড়ি মিললেও রাক্ষুসে ভাড়া জোগানোর ক্ষমতা নেই তাদের পুরুষদের। যত বিপদই আসুক, এ বাড়িতেই থাকতে হবে তবু তাদের। ভিন্ন পথের কথা ভেবেছিলেন মাত্র দু'জন, মনোরমা আর মন্দাকিনী।

তৃতীয় দিন সকালে বাড়ির মালিকের ম্যানেজার এসে উপস্থিত হলেন হঠাৎ। বাড়ির লোকেদের সে কী বিস্ময়! অনেক তৈল মর্দন করেও এ মূল্যবান্ মানুষটিকে এক ইঞ্চিও নড়ানো যায়নি। আজকে হঠাৎ তাঁদের উপর এত অযাচিত অনুগ্রহ কেন মানুষটির? পকেটে ক'রে কী এনেছেন ইনি? সুসংবাদ, না দুঃসংবাদ?

কল্যাণবাবুরা এমন আদর-আপ্যায়ন করলেন ভদ্রলোককে যে, রাজা-গজারাও তাকে প্রচুর বলে মনে করতে পারত। সবচেয়ে সুসজ্জিত ঘর বলে মনোরমবাবুর ঘরে বসানো হ'ল ভদ্রলোককে। সাধ্যের অতিরিক্ত চা, জলখাবার, সিগারেট সরবরাহ করা হ'ল।

ভদ্রলোক শেষে আসল কথাটা তুললেন।

আপনাদের একটা সুযোগ দিতে পারি আমি। অবিশ্যি যদি কাজে লাগাতে পারেন।

রামায়ণ গানের শ্রোতাদের চেয়েও বেশী একাগ্রতা কল্যাণবাবুদের! শ্রীমুখের প্রতিটি কথা যেন তাঁরা গিলছেন!

বাড়ির মালিকের জমিদারীর এক অংশের লাটের খাজনার আজই নাকি শেষ তারিখ। মালিক মদ আর আনুষঙ্গিক নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে সবে কাল ব্যাপারটা তাঁর গোচরে আনা গেছে। মালিকের হাত এখন শূন্য। অথচ অন্তত পাঁচ হাজার টাকা চাই আজ বেলা তিনটের মধ্যে। এই সুযোগে কিছু টাকা অগ্রিম দিতে পারলে এখুনি বাড়ি ভাড়ার পাকাপাকি চুক্তি হ'য়ে যেতে পারে বাড়ির মালিকের সঙ্গে।

কল্যাণবাবুরা যেন হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ ধ'রে ফেললেন।

কত ক'রে ভাড়া দিতে হবে বলবেন না?—উল্লাস চেপে জিজ্ঞেস করলেন মনোরমবাবু।

নিশ্চয়! দু'হাজার টাকা। মোষের খাটালও এর চেয়ে কম ভাড়ায় পাবেন না।

ভাড়া সাব্যস্ত নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা গোলমাল বেধে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। সুধীনবাবু উকিল মানুষ। সবাইকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন: ভাড়া নিয়ে বেশী ওজোর আপত্তি করে দরকার নেই কল্যাণবাবু। চুক্তিটা করে ফেলুন আগে। ভাড়া কমানোর পথ দেখিয়ে দোব পরে।

শেষ পর্যন্ত রফা হ'ল, দেড় হাজার টাকা।

তারপর অগ্রিম ভাড়া জোগাড়ের জন্য ছুটলেন সকলে। উপর নিচ ক'রে বহু কষ্টে চারশো টাকা হ'ল। তাও হ'ত না। ভাগ্যিস, সুধীনবাবুর কাছে কিছু থোক টাকা ছিল!

টাকার অঙ্ক শুনে ম্যানেজারের মুখ শুকিয়ে গেল।

সে কি? একটা মাসের ভাড়াও দেবেন না?

আবার অনুনয় বিনয়ের পালা চলল। হঠাৎ করে অত টাকা কী ক'রে দেওয়া যায়? টাকা কি মানুষের ঘরে থাকে? বাড়ীর সব লোক উপস্থিতও নেই। পাঁচ দিনের মধ্যে বাকি টাকা দিয়ে আসা হবে। ইত্যাদি।

অবশেষে ম্যানেজার রাজী হলেন।

দাখলের কি আপনিই সই করবেন ম্যানেজারবাবু?—সুধীনবাবু সমীহ ক'রে জিজ্ঞেস করলেন।

কি দরকার? স্বয়ং মালিক যে বসে রয়েছেন বাইরে মোটরে।

কল্যাণবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

সে কী? এই রোদ্দুরে! না জানি কত কষ্ট হচ্ছে তাঁর! বলা উচিত ছিল আপনার আগেই।

কিচ্ছু ভাববেন না। বড়লোকের গায়ে রোদ্দুর অত চট ক'রে লাগে না।

সকলে ম্যানেজারের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। গেট ছাড়িয়ে একটু আগে দাঁড়িয়ে রয়েছে দামী মোটরখানা। সকলে তাকিয়ে দেখলেন, গাড়ীর সামনের হেলান-দেওয়ার জায়গাটার মাথায় আলগোছে বিশ্রাম করছে বিরাট এক জোড়া ফর্সা নিটোল মোলায়েম পা। পায়ের মালিক হুডের আড়ালে অদৃশ্য। আর একটু এগিয়ে তাঁরা পায়ের মালিকের মুখখানাও দেখলেন। লাল টকটকে মুখখানায় বিশ্বের বিরক্তি জমাট বেঁধে রয়েছে। ঠোঁটের সঙ্গে অলসভাবে লেগে রয়েছে একটি শুভ্র সধূম সিগারেট।

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পায়ের মালিকের কানে কানে কী বললেন! শুনে তাঁর মুখখানা আরও যেন খিঁচিয়ে উঠল।

সই করা দাখলেটি কল্যাণবাবুর হাতে পৌছে দিয়ে ম্যানেজারবাবু বিদায় নিলেন।

সেদিন মনোরমবাবুর মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক লোকও অনায়াসে নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে বাড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চা-জলখাবারে আপ্যায়িত করলেন।

নিচের তলায় অপরাহ্ণের দিকে বিরাট আসর বসে গেল ধোবাদের মধ্যে। খরচার দায়িত্ব লক্ষ্মণের। মেনু তেলেভাজা আর তাড়ী।

নয়

পরদিন দুপুরবেলা। মেয়েদের দুপুরের বিশ্রামের এখনো দেরী আছে। ঘরে ঘরে কাজ চলছে এখনো। অনেক ঘরে খাওয়া হয়নি এখনো মেয়েদের।

ধরণীবাবু মেঝের উপর শুয়ে ঘুমের চেষ্টায় ব্যস্ত। সুধা এসে ধাক্কা দিল গায়ে।

ওঠো গো, ওঠো! বৌকে সামলাবে তো দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে যাও। নেমন্তন্নের লোক যে এসে পড়েছে!

ধরণীবাবু উঠে বসে হাতের তালুতে চোখ কচলালেন।

কারা?

কারা আবার? পুলিশ।

আজকে আর পাঁচ-সাত জন নয়। পুরো এক লরী বোঝাই হ'য়ে পঁচিশ জন সঙ্গীনধারী পুলিশ।

ভাড়ার টাকা দেওয়া হয়েছে, তবু পুলিশ? অত বৃহৎ সংখ্যায়? বিস্ময়ে আতঙ্কে বাড়িখানা যেন মূক হ'য়ে গেল।

কোন ভুল-চুক হয়নি তো? সুধীনবাবু, কল্যাণবাবু, কালীকান্তবাবু প্রভৃতি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন বাইরে পুলিশের ভুল ভাঙাতে। ক'দিন ধ'রে তাঁরা নিয়ম ক'রে বাড়িতেই থাকছেন। কারও গায়ে গেঞ্জী, পরনে লুংগী। কারও খালি গা, কোন রকমে কোঁচার খুঁট গায়ে জড়িয়েই চলে এসেছেন।

বারান্দার উপরে দেখা হ'ল দারোগাবাবুর সঙ্গে। সেদিনের তিনি নন। হয়তো এক ধাপ উপরের অফিসার। নিরুত্তেজ যান্ত্রিক গলায় দারোগাবাবু তাঁর অপ্রিয় কর্তব্যের কথা জানালেন সবাইকে: শান্তভাবে বেরিয়ে যান একে একে বাড়ি ছেড়ে। না হ'লে বুঝতেই পারছেন, আমার উপর বল-প্রয়োগ করার অর্ডার আছে।

মুখের একটি রেখারও পরিবর্তন হ'ল না দারোগাবাবুর। যেন সাধারণ

দৈনন্দিন রুটিনের কাজ করছেন। কিন্তু যারা শুনল, তাদের বুকে তখন হাতুড়ী পিটছে।

দেখুন, আপনি—আপনারা—বোধহয় একটা ভুল হয়েছে। আমরা—আমরা তো ঠিক বে-আইনী নই। —বলতে গিয়ে সুধীনবাবু বার বার হোঁচট খেলেন। গুছিয়ে বলতে পারলেন না কথাটা।

দারোগাবাবুর গলার স্বর এক পর্দা চড়ল।

বে-আইনী নন? কী বলছেন আপনি আবোল-তাবোল?

কথাটা পরিষ্কার করলেন কল্যাণবাবু।

মানে আমরা এ-বাড়ীর আইনসঙ্গত ভাড়াটে। সম্প্রতি মিটমাট হয়েছে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে। ভাড়া দেওয়ার দাখলেও আছে। দেখতে পারেন।

আবার সেই পুরোনো কায়দা? জ্বালাতন দেখছি! —দারোগাবাবু ক্রুর হাসি হাসলেন: কোথায় দাখলে, দেখান। জাল-জোচ্চুরী হলে কিন্তু সেই দায়ে আলাদা ক'রে "প্রসিকিউট" করব।

একটু যেন আশার আলো দেখা গেল। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে সুধীনবাবু ছুটলেন দাখলে আনতে।

দাখলেটার দিকে একবার চোখ বুলিয়েই দারোগাবাবু সেখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

জাল-ফাল করে কেন মিছিমিছি নতুন ফ্যাসাদ বাধানোর চেষ্টায় আছেন? আরে মশাই, বাড়ীওয়ালা তো পাঁচ ছ' মাস ধরে খুঁচিয়ে মারছে আমাদের। গভর্ণমেণ্টই বার বার বলেছেন, ওদের আরও সময় দাও। কিন্তু ভাল কথার মানুষ তো নন আপনারা। কাজেই গভর্ণমেণ্ট কড়া আদেশ দিয়েছেন সমস্ত বেদখলকারীদের ঝাড়ে-মূলে উপড়ে ফেলে দিতে হবে।

কথা শুনে কল্যাণবাবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। দৃঢ়স্বরে বললেন: দেখুন দারোগাবাবু, আমরা সবাই ভদ্রলোক। আমি নিজে একজন পুরনো কংগ্রেস সেবক। জাল-জুয়াচুরীর আমরা কখনও ধার ধারি না।

দারোগাবাবু এবার খিঁচিয়ে উঠলেন।

আপনারা ছোটলোক এবং বদমাইশ! জোর ক'রে পরের বাড়ি দখল ক'রে রেখে ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেন। আপনারা তো ডাকাত এবং গুণ্ডা! আবার বলছেন কংগ্রেস-সেবক! কী লজ্জার কথা! কী ঘেন্নার কথা!

দারোগাবাবু কল্যাণবাবুকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পুলিশদের ইঙ্গিত করলেন। ইতিমধ্যে বাড়ির ছেলের দল ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হ'ল। কাছাকাছি কোথাও আড্ডা দিতে দিতে তাঁরা খবর পেয়েছে। দু'জন পুলিশ সামনের ঘরে ঢুকছিল। পটল গিয়ে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল দু'হাত বিস্তৃত করে।

হঠ্ যাও!—বলে একজন সিপাই পটলকে ধাক্কা মারল। কিন্তু স্বাস্থ্যবান পটলকে নড়াতেও পারল না। এবার দু'জন পুলিশ যুগপৎ তাকে সজোরে ধাক্কা দিল। পটল ছিটকে গিয়ে দরজার চৌকাঠের উপর পড়ল। তার মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত নেমে এল।

কল্যাণবাবু ডাকলেন: পটল!

পটল মাথাটা চেপে ধরে পুলিশকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে এল।

কল্যাণবাবু দ্রুত চিন্তা করছিলেন। দারোগার অপমানজনক কথাগুলো সারা গায়ে বিছুটির মত জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। দারোগা যা বলেছে তাই কি সরকারেরও মনের কথা? দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই ক'রে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য দেশবিভাগ সমর্থন ক'রে গৃহচ্যুত হয়ে আজ তাঁরা গুণ্ডা বদমাইশ? বাধ্য হয়ে তাঁরা সাময়িক আশ্রয় নিয়েছেন যাতে সরকার তাঁদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করার সময় পান। সেইজন্য তাঁরা বেদখলকারী, ডাকাত? এ যে দেশের কল্পনাতীত বিশ্বাসঘাতকতা! তবে কি বাঁচার দাবীতে প্রতিরোধ-সত্যাগ্রহ শুরু করবেন তিনি? এই ছেলের দল তার কথায় প্রাণ দিতেও ইতস্তত করবে না তা তিনি জানেন। কিন্তু তাই কি সম্ভব? নিজেদের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ! তাই কি হয়?

মজলিশী শান্তিপ্রিয় লোক সুধীনবাবু। কোনোদিন কোন হাঙ্গামায় পড়েন নি জীবনে। তাঁর মুখ নিদারুণ আতঙ্কে শাদা হয়ে গেছে। তবু কোনরকমে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা ক'রে বললেন: মাথা ঠাণ্ডা রাখুন কল্যাণবাবু। পুলিশের সঙ্গে এখন গোলমাল ক'রে লাভ নেই। এই দাখলেটা আমাদের দলিল। দারোগা দাম না দিক, কিন্তু দাম আছে। এর জোরে আমরা যুঝতে পারব পরে।

দাঁতে দাঁত ঘষছে ছেলের দল। অজানিতভাবে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে

আসছে। মিনতি-করুণ চোখে পটল কল্যাণবাবুর মুখের দিকে তাকাল। কল্যাণবাবু ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন।

তা হয় না পটল। শান্তিভঙ্গ করব না আমরা।

এইমাত্র যে দারুণ আঘাত পেয়েছে, পটল সে কথা ভুলে গেছে। এতগুলো লোক যে গৃহচ্যুত হতে চলেছে, সে-কথাও সে আপাতত ভাবছে না। শুধু একটি চিন্তাই তার মাথায় এখন দাপাদাপি করছে। বে-আইনী আইন-রক্ষকেরা শুধু গায়ের জোরে এতগুলো সৎজীবনে অভ্যস্ত মানুষকে তাড়িয়ে দেবে? আর তারা এতগুলো জোয়ান ছেলে তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে? তাদের গায়ের রক্ত কি ঠাণ্ডা? কিন্তু বুড়োদের নিয়ে বড় মুস্কিল। তাদের গায়ের রক্ত ব্ল্যাস্ট ফার্ণেসের আঁচেও গরম হয় না।

সমস্ত বাড়ির লোক তাদের মালপত্র নিয়ে এসে জড় হল পার্শ্ববর্তী পার্কটায়। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। উপর থেকে মার্তণ্ডদেব অকৃপণ ধারায় আগুন বর্ষণ করছেন। আর নীচে গাছের ছায়ায় পোঁটলা পুঁটলির উপর বসে রয়েছে একদল গৃহহারা মানুষ। মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী অবাক বিস্ময়ে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। যেন তারা সব পথের কুকুর। দরজায় দরজায় তারা হাত পাতবে আর বাড়ির মালিক লাঠি নিয়ে এসে তাদের তাড়িয়ে দেবেন। এই তাদের বিধিলিপি।

কৌতূহলী বিক্ষুব্ধ জনতার ভীড়ে রাস্তা, পার্কটার চারপাশ অবরুদ্ধ হ'য়ে গেল। এতগুলো লোককে এতদিন ধরে এ-বাড়িতে থাকতে দিয়ে আজকে আশ্রয়চ্যুত করছে কারা? এমন কী দুর্ঘটনা ঘটেছে যাতে এদের নিশ্চিন্ত বসবাসের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা করা যায় না? প্রত্যেকের মুখে চোখে এই প্রশ্ন। কিন্তু জবাব যারা দেবে তারা অনুপস্থিত।

পুলিশ দলের কর্তব্য-বোধ সজাগ হয়ে উঠল। এত অনাবশ্যক লোকের ভীড় তাদের উপস্থিতিতে? সঙ্গীন বাগিয়ে ধেয়ে এল সম্মানাহত পুলিশের দল। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

যার যার মালের উপর বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত লোকগুলো বসে পড়েছে। মেয়েরাও আর কাঁদছে না। যদিও মুখ চোখ দেখলে বোঝা যায় একটু আগেই অনেকেই কেঁদেছে।

কল্যাণবাবু, সুধীনবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ঘাসের উপর বসে পরামর্শ করছিলেন। লক্ষ্মণ এসে সামনে দাঁড়ালো।

ভাড়া দিয়াও কাম হইল না বাবু? বেবাক টাকাভাই বরবাদ গেল?

খানিক ধৈর্য ধর লক্ষ্মণ ভাই। একেবারে অরাজকতা হয়নি এখনো দেশে। যাচ্ছি পুলিশ কমিশনারের কাছে। একটা ফয়সালা হবে নিশ্চয়। আমরা না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যেও না তোমরা। জানিয়ে দাও সব্বাইকে। —কল্যাণবাবু বললেন দৃঢ় শান্ত গলায়।

এমন সময় দেবু এসে কল্যাণবাবুর হাত ধরে টানতে টানতে বলল, চল বাবা। মা ডাকছে।

গুটানো বিছানার উপর বসে হাঁটুর উপর কনুইয়ের ভর রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন মনোরমা। কল্যাণবাবু আসতেই দু'হাতের মধ্যে তাঁর হাত দু'খানা নিয়ে বললেন: তোমাকে আমি মিনতি করে বলছি,—যা হয়েছে, হয়েছে, তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু আর তোমাকে আমি এক মুহূর্তও এখানে থাকতে দোব না। আমাদের নিয়ে দাদার কাছে চল বারুইপুরে। পরে যা বিবেচনা হয় করা যাবে। কিন্তু আমার মাথা খাও, এখানে আর নয়। পুলিশ-ফুলিশের হাঙ্গামায় যদি তুমি পড়, তবে আমি আর বাঁচব না।

মিনতি-করুণ অসহায় নারীর কণ্ঠস্বর।

এই তো তোমাদের সাহস! আর তারই জোরে তোমাদের এত তেজ আর দেমাক!—মনে মনে ভাবলেন কল্যাণবাবু। হাসলেন। আর ছোট্ট ছেলেকে যেমন করে সান্ত্বনা দিতে হয় তেমনি করে মনোরমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন: তা যে হয় না রমা। এতগুলো লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়া যায় কি? কিন্তু তোমার কোন ভয় নেই। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করি, তা আমার মনে থাকে সব সময়।

তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল যে পুলিশের হাঙ্গামায় যাবে না। কক্ষনো না।

কী যে বোকা মেয়ের মত কথা বল মনোরমা? এখনো কি বৃটিশ-রাজত্ব আছে যে পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া করব? শান্ত হয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত খানিক অপেক্ষা কর। আমি যাব আর আসব।

অনতিদূরে বসে সুনন্দা গভীর অমনোনয়নের চোখে মা'র ভেঙে-পড়া ভীরু চেহারাটা দেখছে।

আরও তিন চার জনকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণবাবু রওনা হয়ে গেলেন।

দুশ্চিন্তায় উত্তেজনায় ধরণীবাবুর অসুখ বেড়ে গিয়েছিল। ঘাসের উপর গুটানো মাদুরটায় বসে বাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। পাশাপাশি একটু ব্যবধান রেখে তেমনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন সত্তর বছরের বৃদ্ধা কানে-খাটো সুধার মা।

শুধু ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসেছিল সুধা। তার নির্বিকার ভাবলেশহীন চোখ দিক্‌চক্রবালের দিকে নিবদ্ধ।

এবার কোন্ চুলোয় যাওয়া হবে, সুধা? ধরণীবাবুর কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

জানি না।

বড় তো তেজ ক'রে এসেছিলে! আবার তো সেই দাদার বাড়িই যেতে হবে?

কেন? পৃথিবী কি এতই ছোট যে মরবার জায়গাও পাওয়া যাবে না?

সুধার মার কানে গিয়েছিল কথাটা। বললেন: আলাই বালাই, অমন কথা বলতে নেই।

হঠাৎ পটল ·ব্যস্ত ·হয়ে এসে জিজ্ঞেস করল: টিন্‌চার আইডিন আছে সুধাদি—টিন্‌চার আইডিন?

এ ক'দিনে পটলের সঙ্গে সুধার বেশ ভাব হয়ে গেছে।

দূরে নিবদ্ধ দৃষ্টিকে সুধা কাছে টেনে আনল। পাল্টা প্রশ্ন করল: আপনার রক্ত বন্ধ হয়নি পটলবাবু?

আমার জন্য নয়, ধোবাদের জন্য। ওদের ক'জন আবার জখম হয়েছে কিনা? চলুন না আপনিও! ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবেন।

মন্দাকিনী দেবীর থেকে টিন্‌চার আইডিন সংগ্রহ করে নিয়ে ওরা অন্ত দিকে গেল। ব্যাপারটা দূর থেকে আর একজন লক্ষ্য করল। সুনন্দা। শ্রীমান পটলদার গতিবিধির পরিধি তো অনেক দূর গড়িয়েছে দেখা যায়। গোমুখ্যু, হাড়-হাভাতে ছেলেটার পিছনে মেয়েগুলো জুটতেও পারে! ভালই হ'ল। এই সুযোগে পটলদার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দেবে সুনন্দা। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল সুনন্দার, মেজাজটাও। পটলের

মত ছেলের দিকে কেইবা নজর দেয়!—সেটা কোন কথা নয়। কিন্তু সুনন্দার চোখের সামনে অন্য মেয়ে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে, এ কী রকম অমার্জনীয় ঔদ্ধত্যে আজ পেয়ে বসেছে পটলকে?

পটল চিন্তা করেই সুধাকে নির্বাচন করেছে। অপরিচিত পুরুষকে শুশ্রূষা করতে হলে শক্ত মেয়ে দরকার। সুধাকে নিয়ে ধোবাদের মধ্যে এল পটল।

পুলিশী অভিযানের প্রকোপে ধোবাদের বেশ মূল্য দিতে হয়েছে। তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি, ভাড়া দিয়েও বাড়ী থেকে তাড়া খেতে হতে পারে। ফলে তারা কলরব করে পুলিশের আদেশের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। আর উপরতলার মত অত ধৈর্য নিচের তলার পুলিশ দেখাতে পারেনি। সরকারের পবিত্র অর্ডারের বিরুদ্ধে বোকা মানুষদের নির্বোধ প্রতিবাদ শুনলে কার না রাগ হয়! যুক্তিসঙ্গতভাবে রেগে তারা তাদের সবুট পায়ের এবং বন্দুকের পিছনের মোটা দিকটার সামান্য সদ্ব্যবহার করেছিল। তাইতেই জখম হয়েছিল চার পাঁচ জন। পুলিশ বিজয়িনী রুক্মিণী আদর দেওয়ার মত সামান্য ধাক্কাতেই পড়ে গিয়েছিল উবু হয়ে। একজন রসিক সিপাই সঙীন দিয়ে তার অবিন্যস্ত শাড়ীটা ফালি করে কেটে অপ্রকাশ্য শরীরতত্ত্বটা জেনে নিতে চেয়েছিল। মজা পেয়ে অন্য মেয়েদের নিয়েও টানাটানি শুরু করেছিল কয়েকজন সিপাই। শেষটায় লক্ষ্মণ এসে বাঁচায় তাদের। সে অবিশ্যি ওদের লক্ষ্য করেই ধমক দিয়েছিল: শালীর পো শালীরা! সিপাইদের লগে লাগস্?—কিন্তু তাইতেই নিবৃত্ত হয়েছিল পুলিশের দল।

আরও খানিকক্ষণ পরে ব্যাকুল চিন্তিত মুখে অফিস-প্রত্যাগতরা এসে উপস্থিত হ'ল। আসার পথেই তারা খবর পেয়ে এসেছে।

মনোরমবাবু স্যুট-পরা অবস্থাতেই ঘাসের উপর বসে প'ড়ে তম্বি করে নিকটবর্তী সবাইকে শুনিয়ে বললেন: বাড়িতে কি পুরুষ মানুষ ছিল না? কেউ এ কথা বলতে পারল না, বাড়ি আমাদের ভাড়া করা?

মন্দাকিনী দেবী এসে তাঁর পাশে বসে ফিস্ ফিস্ করে বললেন: বলেছিলেন—কল্যাণবাবু, সুধীনবাবু, সকলে বলেছিলেন। সে যা সাংঘাতিক কাণ্ড! দাখলেও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পোড়ারমুখো পুলিশগুলো সে সব বিশ্বাসই করল না।

মনোরমবাবু তেমনি উঁচু গলায় বললেন : কী করে বিশ্বাস করবে? ভাল করে বুঝিয়ে না বললে কেউ বিশ্বাস করে? আমি না থাকাতেই সব মাটী হ'ল দেখছি। সেদিন নেহাৎ আমি ছিলাম বলে নিরুপদ্রবে ভাড়ার হাঙ্গামাটা মিটে গিয়েছিল।

কল্যাণবাবু পুলিশ কমিশনারের কাছে গিয়েছেন শুনে মনোরমবাবু আর এক দফা রাগ করলেন : এ কাজটাও ওঁরা ঠিক ভণ্ডুল করে আসবেন। কেন, আমি না ফেরা অবধি অপেক্ষা করলে চলত না?

তপন মলিন মুখে মা'র কাছে গিয়ে বসল।

মালপত্তরগুলো নষ্ট হয় নি তো মা?

নলিনী একটু সামলে নিয়েছেন এতক্ষণে।

নষ্ট বিশেষ হয় নি বাবা। তবে সব এলোমেলো করে তছ্‌নচ্‌ করে দিয়েছে। তুই কিন্তু এখনই যাস্ না আবার। জল-টল খেয়ে তবে যাবি।

তপন হাসল। কিন্তু মায়ের অনুরোধ রাখার জন্য ব্যস্ত হ'ল না। আসছি বলে সে পটলের দলে গিয়ে ভিড়ল। বিস্তৃত খবর না পেলে মন সুস্থির হবে কী করে?

একটু পরে পাড়ার পরিচিত ভদ্রলোকেরা এলেন খোঁজ খবর নিতে এবং সহানুভূতি জানাতে। ঘোষাল মশাই, রজত, পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে হরেনবাবু, জ্যোতিষবাবু প্রভৃতি। তাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেন; পুলিশের বে-আইনী কাজের নিন্দা করলেন; কল্যাণবাবুদের দৌত্যে সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা প্রকাশ করলেন। অল্পক্ষণ পরেই প্রাচীনের দল যা হয় খবর জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিলেন। রয়ে গেল শুধু রজত।

রজত পটলদের সঙ্গে গিয়ে জুটল।

তারপর কী করবেন, পটলবাবু?

থেকে যান না, রজতদা? কী করি না করি দেখবেন।—পটল জবাব দিল।

পটলকে রজতের খুব ভাল লেগে গেল। ইতিপূর্বে কো-অপারেটিভের ব্যাপার নিয়ে পটলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু স্বল্প-শিক্ষিত অমার্জিত পটলেরদিকে তখন সে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। আজকে মনে হ'ল, তুচ্ছ করার মত ছেলে পটল নয়। বিপদের সময় মানুষকে যত ভাল চেনা যায়

এত অল্প সময়ে যায় না। গৃহচ্যুত হয়ে পটল দিশাহারা হয়ে যায়নি। হারিয়ে ফেলেনি সাধারণ মনুষ্যত্ববোধ। সবাইকে সে প্রয়োজনমত সাহায্য দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। মায় ধোবাদের পর্যন্ত। নিজেও যে জখম হয়েছে সে-কথা মনেই নেই তার। এতগুলো পরিবারের জন্য অতঃপর কী করা যায় নিজের মস্তিষ্কের সাধ্যানুযায়ী সে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছে। দুশ্চিন্তায় আত্মহারা হয়নি। আরও বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হয়নি। উপায় হিসাবে কিছু একটা পরিকল্পনা যে ইতিমধ্যেই পটলের মাথায় এসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদিও ট্রেড সিক্রেটটা এখুনি প্রকাশ করতে চাইছে না। এই উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্যই হয়তো সমবয়সীদের মধ্যে পটল লীডার।

রজত দেখল, পটল রাজনৈতিক চিন্তার ধার ধারে না। উদ্বাস্তুদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। নিজের আয়ত্তের বাইরে যে ভবিষ্যৎ তার চিন্তায় সময়ক্ষেপ করে লাভ কি? হাতের কাছে যে-কাজটা এসে পড়েছে, ঘাড়ের উপর যে-বিপদটা চেপে বসেছে, তাইতেই সে তার সমস্ত সামর্থ্য ব্যয় করতে পারলেই খুশি।

স্বাধীন দেশের পুলিশের ব্যবহার এমন বর্বরোচিত হওয়া উচিত নয় বলে কি আপনি মনে করেন না পটলবাবু? রজত পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল।

করি।

আজকে ওরা আর একটু বিবেচনা দেখালে পারত, কি বলেন?

পটল হেসে জবাব দিল: তা ওরা দেখাবে না রজতবাবু। কেন দেখাবে? সেজন্য কি ওদের টাকা দেওয়া হয়? ওদের আজ কেমন ঘোল খাওয়াই দেখুন না।

যারা চিরকাল খারাপ ছিল, তারা চিরকাল খারাপই থাকবে—তাই বোধকরি পটল ভাবে। দুনিয়াটা এরকম জেনেই পথ চলা ভালো, দুনিয়াটা অন্য রকম কেন হয় না, তা নিয়ে আপশোষ বা দুশ্চিন্তা করা মস্তিষ্কের শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয়।

অবাক হয়ে পটলকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল রজত। যে-মানুষটাকে সাধারণ সময়ে বখাটে আড্ডাবাজ দুষ্টুমীতে-ভরা বলে মনে হয়েছে, আজ বিপদের সময়ে তার এক নতুন রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক একটা

মানুষ থাকে যাদের বিপদের সময়ই ঠিক চেনা যায়। সাধারণ সময়ে তারা যেন ঠিক নিজেরাও নিজেদের চিনতে পারে না। অনেকখানি বাড়তি কর্মক্ষমতাকে যে তারা কী করে কাজে লাগাবে, তা যেন ভেবে ঠিক করতে পারে না। বিপদ আপদ এলে তারা যেন বেঁচে যায়—বাড়তি কর্মক্ষমতাটা ব্যবহার করার একটা সুযোগ পায়। পটল বোধ করি সেই জাতের ছেলে। অতীত, ভবিষ্যৎ বা তত্ত্বচিন্তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। পটলকে বড় বড় কথা বলতে রজত কখনো দেখেনি। কিন্তু উপস্থিত কোন কাজ পড়লে তার মাথা সক্রিয় হয়ে ওঠে। পটলের কথা শুনে রজতের তো মনে হচ্ছে, মনে মনে ইতিমধ্যেই সে কোন মতলব তৈরী করেছে। এই সক্রিয়তা দেখে রজত খুশি হলেও মনে মনে একটু শঙ্কিত বোধ না করে পারল না। গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলেটা এমন কিছু করে বসবে না তো যাতে এতগুলো অসহায় লোক পুলিশের বিরাগভাজন হয়? পুলিশকে পটল ভাল করে চেনে তো? পুলিশ যে-কোন রকম নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে; আর তারা যাই করুক সরকার তাদের নিজের একখানি হাত বলে গণ্য করে সমর্থন করবেন।

তাই যদি না হবে তবে যে-মানুষগুলো জন্মাবধি বাড়িঘরে থাকতে অভ্যস্ত, এমন কি, বৃটিশ সবকার যাদের কোনদিন ঘরছাড়া করার কথা ভাবতে সাহস পায়নি, আজ স্বাধীন সরকারের পুলিশ অনায়াসে সেই মানুষগুলোকে ঘর থেকে টেনে নামাতে সাহস পেল কী করে?

রজতের মাথার শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল অক্ষম অসহ্য রাগে। তাড়াতাড়ি অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য সে পটলদের সঙ্গে যোগ দিল।

হঠাৎ পরিপাটি বেশভূষায় সজ্জিত পরাণ হেলতে দুলতে এসে উপস্থিত হ'ল।

কী রে ব্যাটা পরাণ? এতক্ষণে আসতে পেরেছিস তবে? ছিলি কোথায়? শ্বশুরবাড়ী?—রবি জিজ্ঞেস করল।

দু:খের কথা আর জিজ্ঞেস কর কেন রবিদা? খদ্দের শালাদের কাপড় সামলাতে সামলাতে পরাণ-পাখী খাঁচা ছাড়ার জোগাড়!

লক্ষ্মণের নির্দেশে পরাণ খদ্দেরদের কাপড়-চোপড় দোকানে নিরাপদে সরিয়ে রাখতে গিয়েছিল। সঙ্গে অবিশ্যি দু'জন লোক ছিল।

আর কে কে তোর শালা আছে রে বল্‌তো? শিগগির বল্‌। আমি

আর তোদের কাপড় ধুতে দেব না। মরে গেলেও না!—রবি রেগে গিয়ে বলল।

ঐ ত্যাখো! এতগুলো লোকের মধ্যে ও যে ধোবার কাজ করে এ-কথাটা না বললেই চলত না রবিদা! ফুটো পয়সার মুরোদ নেই, কায়েতের পো বলে দেমাক! নিজের পরিচয়টা যে পরাণ নিজেই আগে দিয়েছিল এ-কথা তার মনে পড়ল না। পরাণ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের কাজের দিকে মন দিল। উদ্বিগ্ন চোখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে শেষটায় আবিষ্কার করতে পারল রুক্মিণীকে। এক রাশ ছেঁড়া ময়লা গরীব মানুষের পোঁটলা-পুঁটলির মধ্যে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রুক্মিণী তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ মিলতেই চোখ ফিরিয়ে নিল। হাতে দু'তিন জায়গায় ব্যাণ্ডেজ, কপালটা বলের মত ফুলে উঠেছে। অত রাগ কিসের গো, সোনামণি! পরাণ তোমার রাগ ধুয়ে জল করে দেবে!

রুক্মিণীর রাগ কিন্তু পরাণের উপর নয়। লক্ষ্যও করেনি তাকে প্রথমটায়। একটি অজানা কাম-প্রবণ বিদেশী সিপাই-এর বিরুদ্ধে রাগে তার অন্তরাত্মা অবধি জ্বলে যাচ্ছিল। এক খদ্দেরের একখানা শাড়ী ছিঁড়ে দিয়েছে হারামজাদা খানকী-সোহাগী দুশমন্‌টা! দুর্দিনের বাজারে ক'টাকা ক্ষতি-পূরণ লাগবে কে জানে! কাপড়ের যা দাম!

দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। উত্তপ্ত গুমোট আবহাওয়ায় ঠাণ্ডার প্রলেপ লেগেছে। সূর্যদেব তার আগুনের রশ্মিগুলোকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। আকাশে পাখীদের কলরব। বাড়ি ফেরার তাড়া লেগেছে তাদের। এই পার্কে যে হতভাগ্য লোকগুলো আছে তারা কোন্ বাড়িতে ফিরবে আজকে? এমন বাড়ি কি আছে এ পৃথিবীতে? রাস্তায়, মাঠে, পার্কে লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে গ্রীষ্মের দুপুরের অকরুণ উত্তপ্ততার উপব শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে প্রকৃতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ঝিরঝিরে প্রাণ-মাতানো বাতাসের দল সমুদ্র পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, নদীনালা অতিক্রম করে ছুটে এসেছে। সে বৈকালিক সামুদ্রিক বাতাস যেন প্রাণের উচ্ছল জয়-যাত্রা। শান্তি দেবে, পৃথিবীর ক্লান্ত মানুষকে তারা শান্তি দেবে। কিন্তু অশান্তি যেখানে জীবনের গভীরে বাসা বেঁধেছে সেখানে তাদের নিষ্ফল প্রয়াস পরিহাসের মত মনে হতে লাগল।

এতক্ষণে তটিনী কলেজের কাজ শেষ করে ফেরার সময় করতে পেরেছে।

হন্ হন্ করে সোজা বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হল পার্কের ভিতর এত লোক কেন? এ পার্কটায় তো এত ভীড় জমে না কোনদিন? শুধু তাই নয়, এ লোকগুলো যে চেনা-চেনা! ম্লান আলোতেও নিরিখ করে দেখলে বোঝা যায়। আর অত বোঁচকা-বুঁচকিই বা কেন?

পার্কে ঢুকতেই তটিনীর সামনে পড়লেন মন্দাকিনী।

কী হয়েছে মাসীমা?—তটিনী জিজ্ঞেস করল কম্পিত আশঙ্কিত গলায়।

মন্দাকিনী দেবী সানুনাসিক কণ্ঠে সর্বনাশের বিবরণ দিলেন। যে সঙ্গীণ বাংলাদেশের সমস্ত বাস্তুহারার মাথার উপর উদ্যত হয়ে রয়েছে অবশেষে তাই নেমে এসেছে? অনেক দূরে নয়, তাদেরই মাথা লক্ষ্য করে? তটিনী উদ্বিগ্ন চোখে চারদিক তাকিয়ে মাকে খুঁজতে লাগল।

তটিনীর মার কাছে আজকের দিনটা সবচেয়ে খারাপ গিয়েছে। দুপুরে তিনি ঘরে ছিলেন একেবারে একা। তাই থাকতে হয়। তটিনী কলেজে যায়, অটল কাজে যায়। পুলিশ যখন এসে হানা দেয়, কী করবেন দিশে করে উঠতে পারেন নি। পটলের দল ভাগ্যিস ছিল!

তটিনীকে দেখে চাপা গলায় কেঁদে উঠলেন তটিনীর মা। অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন: এতক্ষণে আসতে পেরেছিস্ রে? মনে পড়েছে মায়ের কথা?

তটিনী মার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'ল। পাখীর অত ডাক আর শোনা যায় না। গাছগুলো যেন জমাট অন্ধকারের মধ্যে আরও জমাট বাঁধা কালির পোঁচ। এখন রাত। সুনিশ্চিত সন্দেহাতীত রাত। কালো আকাশ মনের খুশিতে অন্ধকারের হাত বাড়িয়ে আড়াল করে দিল সেই মানুষদের, কয়েক ঘণ্টা আগেও যাদের মাথার উপর ছিল প্রকাণ্ড বাড়ির একখানা প্রকাণ্ড শক্ত ছাদ। তারা উঠল আকাশে। কিন্তু অতদূর থেকে তারার আলোর আশ্বাস আশ্রয়চ্যুতদের মাথা অবধি এসে পৌঁছুল না।

হঠাৎ কোত্থেকে ভূতের মত একটা টর্চ জেলে হাজির হল পটলদের সাত আট জনের দলটি।

পটল দ্রুত সংবাদ পরিবেশন করতে শুরু করল: 'মাসীমা, মাসীমা, উঠুন। বৌদি, উঠে পড়ুন! আলতা, সুনন্দা আর বসে থেকো না। মনোরমবাবু, চলুন।

ব্যাপারটা কি? কী বলছ পটল?

ব্যাপার এমন কিছু নয়। বাড়ির সামনে একটা মাত্র পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। আমরা পিছন দিক দিয়ে ঢুকব বাড়িতে। ভয় পাবেন না। ভাববেন না। ভাববাব সময় নেই।

কল্যাণবাবুদের জন্যে অপেক্ষা করবে না?

না, দরকার নেই।

সেরাত্রে অমানুষিক পরিশ্রম করলো ছেলেরা। সেই সঙ্গে অল্প বয়সী ধোবারাও। অতগুলো পরিবারের পর্বত-প্রমাণ লটবহর তারা টানল। শিশুদের, কুমারীদের, মা'দের, বৃদ্ধাদের তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। কয়েকটি লণ্ঠনের টিমটিমে আলো অনেকবার এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া-আসা করল।

বাড়ির উপরে নীচে চকিতের জন্য জ্বলে-ওঠা আলো দেখে এবং নিবিষ্টভাবে কান পেতে মানুষের আনাগোনার শব্দ শুনে বাইরের পাহারা-রত পুলিশটি বুঝতে পাবল। কিন্তু সে এখন তাই বলে ভিতরে যাবে না। বাইরে থেকে ভিতরে যেতে বাধা দেওয়ার ডিউটি তার। কোন রকমে একবার যারা ভিতরে ঢুকেছে আবার তাদের বের করে দেওয়ার কোন অর্ডার তার ওপর নেই।

কল্যাণবাবুরা এসে গেলেন ইতিমধ্যে। রজত তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল পার্কে। সেও খেটেছে খুব।

কল্যাণবাবু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: কি ব্যাপার গো রজত? জায়গাটা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে!

তার আগে বলুন, আপনাদের খবর কি?

যা জঘন্য ব্যাপার! ঘণ্টা চারেক অপেক্ষা করার পর সাহেব এলেন। আরও ঘণ্টা দেড়েক পরে দেখা করার অনুমতি পাওয়া গেল। বললাম সব। তিনি লিখিত দরখাস্ত নিলেন। বললেন, এন্‌কোয়ারী করবেন; ব্যস্‌!

রজত এদিককার ঘটনা সব বলল।

রজতের সঙ্গে পিছনের পথ ধরে বাড়িতে ফিরে এসে কল্যাণবাবু দেখলেন দোতলার সিঁড়ির উপর পটল দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে রবি আর দীনেশ। গরমের দিনে ভারী কাজ করে অত্যধিক ঘাম হয়েছে বলে তারা গায়ের জামা খুলে কাঁধের উপর রেখেছে। পরনের কাপড় হাঁটু অবধি তুলে

নিয়েছে। স্বল্প আলোতেও দেখা যাচ্ছে, ঘামে-ভেজা তরুণ মুখগুলো চকচক্ করছে। কর্মের উত্তেজনায়।

কল্যাণবাবু এক এক করে সকলকে জড়িয়ে ধরলেন। কী বলে যে আশীর্বাদ করবেন ভেবে পেলেন না। বারবার করে বলতে লাগলেন: সোনার ছেলে! তোমরা সব সোনার ছেলে!

পটল পরম প্রীত হয়ে বলল: দেখলেন কল্যাণদা, পুলিশ ব্যাটাদের কী রকম জব্দ করে দিলাম?

যেন এতগুলো অসহায় লোককে ঘরে ফিরিয়ে আনাটা পটলের আসল উদ্দেশ্য ছিল না। তার আসল উদ্দেশ্য পুলিশকে জব্দ করা। তার যদি কোন কৃতিত্ব পাওনা হয়ে থাকে তবে তা পরোপকারের জন্য নয়, পুলিশকে জব্দ করার জন্য।

তারপর একদিন দুদিন চারদিন পাঁচদিন সাতদিন কেটে গেল। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় জজ সাহেবের বাগান-বাড়ির বাসিন্দারা প্রহর গুনতে লাগল। কিন্তু পুলিশ আর এল না।

ঘটনার পরদিন খবর জানতে পেরে অমলেন্দুবাবু এলেন এ-বাড়িতে। বন্ধুবরের হালফিল অবস্থাটা জানার তাগিদে। কল্যাণবাবু ঘরে ছিলেন না। অভ্যর্থনা করলেন মনোরমা। এ-বাড়ির অন্দরমহলেও অমলেন্দুবাবুর অবাধ গতিবিধি।

মনোরমা বসতে আসন দিয়ে নিজে মেঝের উপর বসলেন।

আমাদের মাথার উপর দিয়ে যা ঝড় বয়ে গেল! শুনেছেন ঠাকুরপো?

শুনেই তো খবর নিতে এলাম বৌদি। তা জিদ তো আপনাদেরও কম নয়! জোর করে বাড়ি দখল করে বাস করছেন। পুলিশ তুলে দিতে চাইলে নড়বেন না। জোর করে তাড়িয়ে দিলে খিড়কীর দরজা দিয়ে এসে ঢুকবেন। লোক তো সোজা নন আপনারা।

মনোরমা গলার স্বর করুণ করে বললেন: তা নয় ঠাকুরপো! জিদ আমার মোটে নেই। কিন্তু আপনার বন্ধুটিকে নিয়ে পেরে উঠছি না। এত করে বলছি—খুব হয়েছে, চল বারুইপুর। তা সব কথা এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে।

যাওয়ারই কথা। সোজা রাস্তা কিনা।

ঠাট্টা নয় ঠাকুরপো। আপনি একবার বলুন না ভাল করে বন্ধুকে। তবু যদি শোনে। মেয়েমানুষ তো মানুষ নয় যে তার কথা শুনবে কেউ।

আরে বাপরে! দারুণ রেগে আছেন যে? কিন্তু জানেন? কল্যাণ এখন আমার কথা শুনবে না। এতগুলো মানুষের নেশা—বুঝছেন না? কিন্তু এত ভয় পাচ্ছেন কেন, বৌদি? বাড়িওলা যখন টাকা হাতে করে নিয়েছে—কিছুদিন অন্তত নিশ্চিন্ত!

ভুলে গিয়েছিলাম ঠাকুরপো। আপনিও যে ঐ দলের!

অমলেন্দু হো হো করে হেসে উঠলেন।

কোন্ দলের বৌদি? আপনাকে বলতেই হবে।

ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতরকার দরবার সালিশী সেরে কল্যাণবাবু ফিরে এলেন।

অমলেন্দু যে! আজকে সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম?

যার মুখ রোজ ছাখো!—বৌদির। কিন্তু আমি আসব এ আর এমন বেশী কথা কি গো? কত দেশপ্রেমিক নেতারা আসবেন এবার দেখে নিও। তোমরা যে এখন হিরো! চুপি চুপি একটা খবর বলি শোন। ঘোষাল মশাইয়ের ডাক্তারখানায় শুনলাম, পাড়ায় জোর গুজব তোমরা নাকি সব কমিউনিস্ট!

কল্যাণবাবু কৌতুক বোধ করলেন।

তাই নাকি? তাই বলছে নাকি সবাই?

বলবেই বা না কেন? আরও বলছে যে তোমাদের নেতা নাকি একটি কালো যুদ্ধবাজ মেয়ে। নাম সুধা। নামটাও শুনে এসেছি। একেবারে দেবী চৌধুরাণীর আধুনিক সংস্করণ। তুমি আছ তলে তলে। কংগ্রেস-কর্মীর ভেক পরে।

আমিও আছি?

একশোবার! মানুষের পবিত্রতম অধিকার যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সেই অধিকারকে তোমরা উড়িয়ে দিয়েছো! জোর করে দখল করে রেখেছো পরের বাড়ি। যাদবপুরে যারা জোর করে জমি দখল করছে, তারা আর তোমরা এক জাতের।

তৎক্ষণাৎ দারুণ তর্ক বেধে গেল দুই বন্ধুর মধ্যে। কল্যাণবাবু বললেন : এটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

অমলেন্দু বললেন : তাই-বা চলবে কেন! ভাড়া জোগাতে না পারো, বাড়ি না যদি জোটে, ফুটপাথে থাকবে, শিয়ালদা স্টেশনে থাকবে, তাই বলে পরের বাড়ি দখল করবে?

বাড়ি যদি খালি পড়ে থাকে?—কল্যাণবাবু প্রশ্ন করলেন।

থাকলোই বা। একশোখানা বাড়ির মালিক আমি, একশোখানা বাড়িই খালি ফেলে রাখব। আমার খুশি। তুমি একখানা বাড়িরও মালিক নও। ফুটপাথে থাক। পারো তো বাড়ি বানিয়ে নাও না? কে বাধা দিচ্ছে! কালো কারবার করো, স্মাগলিং করো, টাকার পাহাড় বানাও।

তুমুল তর্ক চলল প্রায় ঘণ্টা খানেক। দু দু'বার করে চা করতে হ'ল মনোরমাকে। আর সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, কোন মীমাংসা হ'ল না তর্কের।

বাকী প্রসঙ্গটা আর একদিনের জন্য মুলতুবি থাক কল্যাণ। বৌদির অভিশাপ কুড়িয়ে তাহলে শেষটায় আর বাড়িই ফিরতে পারব না হয়তো। যাওয়ার আগে চলো না, তোমাদের দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পরিচয় করে যাই।

কার সঙ্গে? সুধার? বড্ডই যেন আগ্রহ দেখছি? চিবকুমারেব আবার মতিচ্ছন্ন হল না তো শেষটায়?

ভয় নেই। সামলিয়ে নিতে পারব।

ধরণীবাবু চুপচাপ বসেছিলেন। সুধা বাসন-পত্তর নিয়ে কোন কিছু কাজে ব্যস্ত ছিল।

আমার এই বন্ধুটি একটু কথা বলবে সুধাব সঙ্গে।—কল্যাণবাবু দরজার মুখ থেকে ভিতরে উঁকি দিয়ে জানালেন।

ধরণীবাবু তৎক্ষণাৎ কথাটিও না বলে ঘব থেকে বের হয়ে গেলেন। এটা তাঁর নীরব প্রতিবাদ। সুধা যে দিনকতক হ'ল ক্রমশঃ স্বাধীন জেনানা হয়ে উঠছে তা তাঁর মনঃপূত নয়। সুধা লক্ষ্য করে মনে মনে হাসল।

একখানা মাদুর বিছিয়ে সুধা আগন্তুকদের বসতে দিল।

অমলেন্দুবাবুই প্রথম কথা শুরু করলেন।

আপনি খুব আশ্চর্য হয়েছেন সুধা দেবী, তাই না? কিন্তু এইটেই আমার পেশা। আমি একজন সাংবাদিক কিনা। বিশেষ ঘটনা এবং বিশেষ লোকের সন্ধান পেলেই আমাকে খোঁজ খবর নিতে হয়।

কিন্তু সে জন্য আমার কাছে কেন?

আপনি যে একজন বিশেষ মহিলা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। একটি ঝানু দারোগাকে শুধু কথার জোরে হটিয়ে দেওয়া বাঙালী মেয়ের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ঘটনাটা আসলে খুব সাধারণ। আমি মেয়ে বলেই পেরেছিলাম।

আচ্ছা, ঘটনাটা একটু বিস্তারিত বলতে পারেন।

কল্যাণদাই তো সব জানেন। শুনবেন তাঁর কাছে।

আপনার মুখেই না হয় শুনলাম।

আমার ভাল লাগবে না বলতে।

অমলেন্দু বুঝলেন, সুধা এ ব্যাপারে আর এগুবে না।

আর একটি প্রশ্ন সুধা দেবী। আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত?

না।

পাড়ার লোকে যে বলছে?

পাড়ার লোকে যা-খুশি বলে আমাকে গাল দিতে পারে। কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে।

কাউকে রাজনৈতিক কর্মী বললে গাল দেওয়া হয় না। যদিও অবিশ্যি আপনি রাজনৈতিক কর্মী নাও হতে পারেন।

শুনুন, আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু উপদেশ দেবেন না। আর কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে বলুন।

আপনার দেশ ছিল কোথায়?

এইটেই আমার দেশ।

এখন তাই। কিন্তু আগে দেশ কোথায় ছিল?

চিরকাল এইটেই আমার দেশ। আমি অতীতটাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াই না।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি রেগে কথা বলছেন।

ঠিকই ধরেছেন। পাছে আপনি উপকার করতে চান এই ভয়ে আগে থেকেই রাগ করছি।

কল্যাণবাবু এবার অমলেন্দুকে চিমটি কেটে কানে কানে বললেন: আর কি? খুশি হয়েছ তো? কেটে পড় এবার।

বাইরে বেরিয়ে এসে কল্যাণবাবু মন্তব্য করলেন: বাব্বা! মেয়েমানুষের এমন ডাকিনী মূর্তি আমি দেখি নি।

তা হোক। কিন্তু মেয়েটির মধ্যে জিনিস আছে হে।

অমলেন্দুর এক রকম মন্দ লাগেনি সুধাকে। প্রথমতঃ, ভাল লেগেছে সুধার আড়ষ্টতাহীন প্রগল্‌ভতা-বর্জিত কথাবার্তা। দ্বিতীয়তঃ, ভাল লেগেছে সুধার অনপচয়িত যৌবনের রুক্ষ মলিন সৌন্দর্য। তৃতীয়তঃ, ভাল লেগেছে সুধার দৃপ্ত, স্পষ্টতঃই আক্রমণাত্মক ভঙ্গীটি।

রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে অমলেন্দু হঠাৎ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন, সুধার কথাই তিনি ভাবছেন। নিজের মনের কাছে অকপটে স্বীকার করলেন, এ মেয়েটিকে তাঁর অদ্ভুত ভাল লেগেছে। সেই সঙ্গে হঠাৎ মনে পড়ল, আজ সকালে তাঁর একটা দরকারী এন্‌গেজমেণ্ট ছিল। একটা রাজনৈতিক মীটিং-এর ব্যাপারে। কর্তব্যে অবহেলার দরুণ মনটা অনুশোচনায় ভরে উঠল। তিনি কি শেষটায় কাজ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? মনে পড়ল, রাজনৈতিক কর্মীদের সংসর্গ এখন যেন তাঁর ভাল লাগে না। তাদের সব কিছুই যেন কেমন কৃত্রিম, যান্ত্রিক। সুধার মধ্যে যুদ্ধং দেহি ভাবটা কত স্বাভাবিক। কত স্বতঃস্ফূর্ত। রাজনৈতিক কর্মীরা রাতদিন যুদ্ধং দেহি বলছে। তেমন স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে হয় না তো? কিন্তু এরকম করে ভাবার জন্য অমলেন্দুর মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। কেমন একটা অপরাধ-বোধ মনকে পীড়া দিতে লাগল। সেইটে কাটিয়ে ওঠার জন্য ভাবলেন, আজ সকালের অভিজ্ঞতাটা নিয়ে তিনি একটা রিপোর্টই লিখবেন। তবু তো মনে হবে সকালটা তিনি অপচয় করেন নি।

বাড়ির ব্যাপারে উদ্বেগশূন্য হওয়ার জন্য কল্যাণবাবুরা আর একবার গেলেন বাড়ির মালিকের কাছে। সঙ্গে গেলেন অঘোরবাবু, সুধীনবাবু ও মনোরমবাবু। মনোরমবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন: ভাল করে বলতে কইতে পারলে কি আর সামান্য একজন ভদ্রলোককে কায়দায় আনা যাবে না!

সহজেই সাক্ষাতের অনুমতি মিলল দেখে কল্যাণবাবু বিস্মিত হলেন। অন্যরকম হবে বলেই যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল।

রাজাবাহাদুর কোনরকম ভূমিকা না করেই কাজের কথায় এলেন।

বকেয়া ভাড়ার কী করবেন ঠিক করেছেন আপনারা?

তাঁরা বিনীতভাবে কিস্তিতে শোধ দেওয়ার প্রস্তাব করলেন।

প্রথম কিস্তির জন্য কত টাকা এনেছেন?

স্যার, দু'শো এনেছি আপাততঃ।

রাগের এমন অভিব্যক্তি কল্যাণবাবু জীবনে কমই দেখেছেন। রাজা বাহাদুরের লাল চোখ যেন ব্ল্যাস্ট ফার্ণেসের তরল লোহিত, গড়িয়ে যে-কোন মুহূর্তে ছিটকে পড়বে তাঁদের গায়ে; নাকটা ফুলে উঠল, যেন রবারের তৈরী বেলুন; ফেনা গড়িয়ে এল পুরু ঠোঁটের কিনারা দিয়ে। উল্কা বৃষ্টির মত কথা ছুঁড়তে লাগলেন রাজা বাহাদুর। দুধে-আলতা রঙের প্রকাণ্ড মুখ-খানায় রাগের সে কী অভিব্যক্তি! কিন্তু আশ্চর্য! ঐ মানুষটার মুখে যেন এরকম কথাই মানায়! সারা জীবনের সাধনায় অর্জিত নিপুণ অভিনয়-কৌশল।

জজ সাহেব বলে চললেন: ইয়ারকি করতে এসেছেন আমার সঙ্গে? ইয়ারকি? এক মাসের ভাড়াও পুরো না এনে দেখা করতে সাহস পেলেন আমার সঙ্গে? আশ্চর্য সাহস আপনাদের; কিন্তু আরও আশ্চর্য প্রতিফল পাবেন তার! কী ভেবেছেন আপনারা? একখানা কাগজ পেয়ে খুব কায়দা করে নিয়েছেন ভেবেছেন? ম্যানেজার শুয়ারটার কথায় কাগজখানা দিয়েছিলাম। হারামজাদার চাকরি না খেয়ে আমি জলগ্রহণ করব না। শালা বেইমান বলেছিল, নপুংসক কংগ্রেস সরকার কোন প্রতিকার করবে না। করত না প্রতিকার? শয়তানের দলকে টেনে হিঁচড়ে ভাগাড়ে ফেলে দিত না এ্যাদ্দিনে?—বসে আছেন কেন আপনারা? কিসের আশায়! নতুন শয়তানীর মতলব আছে বুঝি আরও? সুবিধে হবে না! যান! ভাগুন! বেরিয়ে যান! বদমায়েশির জবাব যথাসময়ে পাবেন।

জানালার শার্শিগুলো, অব্যবহৃত ঝাড়লণ্ঠনগুলো কেঁপে কেঁপে উঠল যেন শব্দের তরঙ্গে, যেন প্রতিধ্বনি করে বলল, হ্যাঁ, পাবেন।

মনোরমবাবুর বাক্‌চাতুর্য প্রকাশ করার আর সুযোগ হ'ল না।

দিন কতক পরে কালীকান্তবাবুর মেয়ের শ্বশুর অঘোরবাবু বিদায় নিলেন। তাঁর জন্য বাড়িভাড়া হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু এ-বাড়ির লোকদের একের পর এক বিপদ ঘটতে দেখে অমায়িক ভদ্রলোক ভীরু স্বার্থপরের মত পালিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর এখনো যাওয়ার অনিচ্ছা ছিল। উপায় নেই। বেকার ভাড়ার টাকা গুনতে হচ্ছে বলে ছেলে বারবার তাগিদ দিচ্ছে।

ক'দিনের মধ্যেই আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারের গুণে অঘোরবাবু অত্যন্ত ঘনিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটি হ'ল দীর্ঘস্থায়ী এবং করুণ। ভদ্রলোক বারবার জানিয়ে গেলেন, বিপদ ঘটলে তাঁকে যেন অবিশ্যি খবর দেওয়া হয়। তিনি সাহায্য করবেন সাধ্যানুযায়ী।

দশ

জজ সাহেবের বাগান বাড়িতে প্রথম যে মানুষগুলো এসে উঠেছিল, আজ মাত্র কয়েকমাস পরে সে মানুষগুলোকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা প্রথম যখন এসেছিল, তখন পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল মামুলী ভদ্রতার। বাড়ি সংক্রান্ত মীমাংসার প্রশ্নটা ছিল যার যার নিজের প্রয়োজনের ব্যাপার। তার বাইরে প্রত্যেকের সারাদিনের কর্ম-জীবন বয়ে চলেছিল যার যার নিজস্ব ধারায়। কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ ছিল না সেখানে। এঁদের মধ্যে কল্যাণবাবু এলেন যেন এক ঝলক মুক্ত হাওয়া। মানুষটা তিনি না কাজের, না বাস্তব দিক দিয়ে বুদ্ধিমান। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের হিসেবে জীবনকে ঢেলে সাজবেন বলে সঙ্কল্প করেও তিনি তাঁর উদার হৃদয়ের উত্তাপের নিচে জড়ো করলেন বাড়িসুদ্ধ লোককে। তারপর একে একে এ-বাড়ির উপর দিয়ে অনেক ছোট-বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছে। নিতান্ত ছোট ঘটনাগুলোও তুচ্ছ নয়; যেমন তুচ্ছ নয় হঠাৎ বিপদাপন্ন অঘোরবাবুর সাময়িক আশ্রয় নির্ধারণের সমস্যাটা। যৌথভাবে অনেক কাজে হাত দিতে হয়েছে বাড়ির লোকদের। কোঅপারেটিভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; বাড়ি নিয়ে এত হাঙ্গামা করেও কোন মীমাংসা হয়নি। তবু লোকগুলো আজ আর প্রত্যেকের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। পরস্পরের থেকে উত্তাপ সঞ্চয় করে মনের শক্তি বজায় রাখতে চায় সবাই। সেদিন এ বাড়িটা ছিল কতকগুলো বিচ্ছিন্ন পরিবারের যোগফল মাত্র; আজকে তারা একটি বৃহত্তর যৌথ পরিবারে রূপান্তরিত হতে চলেছে যেন।

অবিশ্যি ব্যতিক্রম আছে। আজও অটল বা মনোরমবাবু ভাবছেন, তাদের নিজেদের কর্মধারার সূত্রেই তাঁদের সমস্যাগুলোর সমাধান হওয়া সম্ভব। আজও সুধা ভাবছে, তার জীবনের সমস্যা বিচিত্র, অদ্বিতীয়, একান্তভাবেই তার নিজস্ব।

এ-বাড়ির ঘরগুলির স্বয়ং সম্পূর্ণতা নেই বলে কত আপশোষই না বাড়ির লোকদের ছিল। আজ আর পর্দার কথা কারও মনেই হয় না। পরস্পরের

থেকে লুকোনোর মত কিছু আর কারও নেই আজকে। সেই শাক-চচ্চড়ি খাওয়া আর তালি-দেওয়া কাপড় পরার কথা তো সবাই জানে। ঘরে বাইরে অক্ষত শাড়ী পরে শালীনতা বজায় রাখার বিলাসিতা মেয়েরা আজকে ভাবতেই পারে না। কিন্তু তাই বলে কি ও-ঘর সে-ঘরের লোকেরা এ ঘরে আসবে না? অসুবিধে হয় বৈকি? হঠাৎ খেয়াল হয়, শাড়ীর ছেঁড়া জায়গাটুকু সরে গিয়ে ব্লাউজহীন স্তনের বোঁটাটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে পাশের ঘরের লোকটির সামনে। তাতে কি? লোকটা তো পর নয়, বাইরের লোকও নয়।

অগোচরে আর একটি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটছে লোকগুলির মানসক্ষেত্রে। দেশের বাড়ির সেই পুরোনো নীতিবোধ আর মূল্যবোধ কর্পূরের মত মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। দেশে থাকতে কে কবে কল্পনা করতে পেরেছিল যে বাড়ির তরুণী মেয়ে-বৌরা অনাত্মীয় যুবক ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবে? আজকে কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই জাগে না এ বাড়ির লোকদের মনে। এ বাড়িতে পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের অবাধ মেলামেশা আজকে অপরিহার্য প্রয়োজন। অভিজাত পরিবারের শৌখীন মেলামেশা নয়। অনেক অস্বস্তিকর অবাঞ্ছিত পরিবেশেও আলাপ করতে হয় ছেলেদের সঙ্গে। হয়তো স্নান করে ফেরার সময় ভিজে কাপড়ে সমস্ত শরীরটা প্রদর্শনী হয়ে উঠেছে জেনেও কোন ছেলেকে ডেকে জরুরী কথা বলতে হয়। ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে আলাপ করতে হয় কত সময়। কাছাকাছি জায়গায় মেয়েরা নিজেরাই যায়। দূরে কোথাও যাওয়াব দরকার হলে মেয়েদের সঙ্গে বাড়ির একটি নিস্পর ছেলেকে সাথী হিসেবে দিয়ে কর্মক্লান্ত অভিভাবক পরিশ্রমটা বাঁচল বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

অতিরিক্ত সকড়ির বাচ-বিচার, বিধবার আচার-নিয়ম আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে আড্ডার মাঝখানে কেউ হয়তো দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলেন: কী ছিলাম, আর কী হয়েছি! কিন্তু সেই লোকটিও জানেন, ক্রমরূপায়িত জীবনের আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে তাঁর মনের কোণটিও রসসিক্ত হয়ে উঠেছে।

মূল্যবোধের পরিবর্তনের আশ্চর্য প্রমাণ পাওয়া গেল তপনের বিয়েতে। সুধীনবাবুর যোগ্য চাকুরে ছেলের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন

মনোরমবাবু তাঁর বড় মেয়ে নবনীতার জন্য, আর কালীকান্তবাবু তাঁর বোনঝি আলতার জন্য। নবনীতা ফর্সা, সেবা-ভক্তি পরায়ণা; নম্র, লাজুক, ভীরু। আদর্শ বাঙালী বধূ হওয়ার যোগ্য। আর আলতা এ বাড়ির বিখ্যাত কালো মেয়ে, 'মা-কালী' বলে পরিচিত। তেমনি মুখরা, গায়ের জোরে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে তপন আলতাকেই পছন্দ করল। রক্ষণশীল প্রকৃতির সুধীনবাবু দেশের বাড়িতে হলে ছেলেকে এক ধমকে ঠাণ্ডা করে দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য! দেশান্তরিত হয়ে আজ ছেলের মতে মত দিলেন তিনি।

মা-কালীর সঙ্গে তুই যে ডুবে ডুবে এত জল খেয়েছিস্, তা আগে বোঝা যায়নি তো?—বন্ধুরা ঠাট্টা করে প্রশ্ন করেছে।

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে তপন বলেছে: খবর্দার! ফের মা-কালী বললে কিন্তু বন্ধুবিচ্ছেদ অনিবার্য।—তারপর হেসে জবাব দিয়েছে বন্ধুদের প্রশ্নের: নাঃ রে, যা ভাবছিস তা নয়। প্রেম-ট্রেম কিছু নয়। ভেবে দেখলাম, নবনীতাকে বিয়ে করলে মনোরমবাবু হবেন শ্বশুর। তাঁর মোড়লী সহ্য করা অসম্ভব। তা ছাড়া, আসল কথা কি জানিস, বৌ যদি চালাক চতুর চৌপিঠে না হয়, তবে সে বৌ নিয়ে কি করব? শয্যাসঙ্গিনী তো বিয়ে না করেও পাওয়া যায়।

আশ্চর্য বলে মনে হলেও এ-বাড়ির তরুণ মহলের দার্শনিক হ'ল আমাদের ম্যাট্রিকুলেট পটল। তার মনটা চরমপন্থী, অন্ততঃ তাদের তাই ধারণা। তার মতে নীতি-টিতি একেবারে কিছু না, ফাঁপা বেলুন। দরকার হলে বা ইচ্ছে হলে, চুরি ডাকাতি ব্যাভিচার সব কিছুই করা যায়। কৃপণ পৃথিবী থেকে যেটুকু উপভোগের জিনিস পাওয়া যায় কেড়ে-কুড়ে নিতে হবে। কেউ বাধা দিলে ঠেঙাতে হবে আচ্ছা ক'রে। নিকৃষ্ট অপরাধ হ'ল অনুতাপ করা আর আগামী কালের কথা ভাবা। পটলের বিশ্বাস, তত্ত্বটি খুব আধুনিক এবং মৌলিক, এবং এ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে।

আরও একটা দিক আছে। এ বাড়ির লোকেরা যতই পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, ততই তাদের সম্পর্কের মধ্যে নতুন বিচিত্র সমস্যার জন্ম হচ্ছে। বাইরের পৃথিবীর অসামঞ্জস্যের প্রভাবে নানা জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে

তাদের সম্পর্কের মধ্যেও। ভরসা এই, যে-সমস্যার সূত্র-মাত্র জানতে পেরেও দেশের বাড়ির লোকেরা সর্বনাশ হয়ে গেল বলে ক্রোধে আত্মহারা হ'ত, সেই লোকগুলি আজকে নেই। সমস্যাগুলোর মীমাংসা হয় সহজে। যদিও তাতে ঝঞ্ঝাট মেটে না অনেক সময়।

এগার

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তিন চারটি ধোপা পরিবার নিজেদের স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্মণের কাছে জন-মজুর খাটছে। লক্ষ্মণের এই সুখী পরিবারে সেদিন আর একজন যোগ দিল।

হরেকেষ্ট, রুক্মিণীর স্বামী, সেদিন লক্ষ্মণের কাছে এসে মুখ কাচু-মাচু করে মাথা চুলকোতে লাগল।

এগ্‌গা কথা আছিল লক্ষ্মণকা।

কি কথা কস্ না কিয়ের লাইগ্যা?

আমার গাহেকগুলান লইয়া লও তুমি। তোমার ধারেই কাম করুম ঠিক করছি।

কস্ কি র‍্যা? নিজের ব্যবসাডা ছাইড়্যা দিবি?—লক্ষ্মণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

হঃ! ব্যবসা-ট্যবসা ভাল লাগতাছে না।

যেন আর কোন কারণ নেই। দীর্ঘদিন ব্যবসা করে করে একঘেঁয়ে লেগেছে, তাই নিতান্ত নতুনত্ব হিসেবে নতুন প্রস্তাব নিয়ে এসেছে লক্ষ্মণের কাছে।

খবর শুনে দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল রুক্মিণীর। তার বোকা স্বামী এটা করল কী? এত কষ্ট করে পুলিশের চোখ এড়িয়ে চোরাবাজারের সোডা আনে সে! লক্ষ্মণের চোরাই ব্যবসা ছাড়া হরেকেষ্টর কাজেও তো তা লাগে! সে কথাও না হয় ছেড়ে দিল রুক্মিণী। কিন্তু পৈতৃক ব্যবসা, কুল-ব্যবসা ছেড়ে কখন কারও মঙ্গল হয়?

রাত্রিবেলা স্বামীকে জিজ্ঞেস করল রুক্মিণী।

কুল ব্যবসাডা ছাইড়্যা দিতাছ বলে তুমি?

দিমু না? এ বাজারে ব্যবসা করে বেকুবে।

এ কথা বলার সঙ্গত কারণ ছিল হরেকেষ্টর। তার এই অল্প ক'দিনের ব্যবসার মধ্যে অনেক দুরদৃষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তাকে। এক ডাইং

ক্লীনিং-এর কাজ নিয়েছিল। চোরেরা হঠাৎ ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে তার গোটা ত্রিশেক টাকা মেরে দিয়েছে। সে-ধাক্কাটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতেই সম্প্রতি একজন স্যুটধারী ভদ্রলোক তার গোটা দশেক টাকা বাকী রেখেই কোথায় উধাও হয়েছেন। তাছাড়া, পাওনা আদায়ের ব্যাপারেও হরেকেষ্ট তেমন পটু নয়। ধার বাকী পড়ে রয়েছে অনেক। এসব খবর রুক্মিণী জানে। কিন্তু হরেকেষ্টর ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার পিছনে আরও একটা কারণ ছিল যা রুক্মিণী জানে না। কাপড় ধোয়ার ব্যাপারে কতকগুলো কাজে মেয়েদের সাহায্য পেতে ধোবারা অভ্যস্ত। কিন্তু সোডার চোরা কারবারের নেশায় মত্ত রুক্মিণী সেদিকে দারুণ উদাসীন। ছোট্ট পাঁচ ছ' বছরের বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে কাজ করতে ভারী অসুবিধে হয় হরেকেষ্টর। ছেলেটাকে যত মারা যায়, তত যেন সে আরও বোকা হয়ে যায়। রুক্মিণীকে আয়ত্তে আনার জন্য হরেকেষ্ট বকা-ঝকা, দু'-একটা চড় চাপাটিরও আশ্রয় নিয়েছে! স্বাধীন রোজগারেব নেশা রুক্মিণী তবু ছাড়তে পারে নি।

আমারে একবার জিগাইলেও তো পারতা!—রুক্মিণী অনুযোগ দিয়ে বলল।

বৌকে জিগাইয়া তবে কাম করুম? অমন বাপের পোলা আমি লয়।

কিয়ের লাইগ্যা জিগাইবা না শুনি? মিছাই খ্যাট্টা খ্যাট্টা গতর লাগাইয়া ফেললাম, না?

হরেকেষ্টর মেজাজ এমনিতেই খারাপ ছিল। রেগে গেল।

ব্যস্! ব্যস্! ফের আবার কথা কস্ না তুই? জানস্ তো, সিধা বানাইয়া দিমু।

ভাত দেওনের ভাতার না, কিল মারনের গোঁসাই।—বলে রুক্মিণী তৎক্ষণাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। হরেকেষ্টর পরবর্তী কর্মপন্থা ভালই জানা আছে রুক্মিণীর।

মানুষটা বড়ই কাঠ গোঁয়ার। সত্যিই আর পারা যায় না তাকে নিয়ে। খদ্দেরদের সঙ্গে পর্যন্ত তুচ্ছ কারণে খিটিমিটি বাধায়। সেইজন্যই তো ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারল না হরেকেষ্ট। তার উপর আবার মদ ধরেছে সেই ঢাকায় থাকতেই। এখানে সংসার চলে তো বলতে গেলে রুক্মিণীর

টাকাতেই। হরেকেষ্ট যা পায় তার অর্ধেকই তো যায় শুঁড়ির দোকানে। হরেকেষ্টর মত স্বামী নিয়ে 'হাড়ে-মাড়ে সাত-পাঁজড়ে' জ্বলছে রুক্মিণী।

লক্ষ্মণের কাজে হাত দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই হরেকেষ্ট গোঁয়ার্তুমি শুরু করল।

সেদিন সোজাসুজি লক্ষ্মণের কাছে অভিযোগ পেশ করে বসল:

এত কেপ্পন কিয়ের লাইগ্যা গো তুমি লক্ষ্মণকা?

কি কস্ তুই যা তা হরেকেষ্ট? বুঝ্যা সুঝ্যা কস্ তো?

তবে কি আন্দাজে কই নাকি? এত্তটুকু সভা দিয়া এতগুলান্ কাপড় কাচবা; কাপড়ের তো বারোভা বাজ্যা যায়। তা যায় যাউক, তোমার খদ্দেরের যাইব। কিন্তু আছড়াইতে আছড়াইতে আমাগো যে পরাণ শ্যাষ। হেয়ার কি?

লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সাফ জবাব দিল:

ভাখ হইর‍্যা, তুই না পারস চইল্যা যা যেখানে মন লয়। কিন্তু তর বাজে কথা শোননের মত সময় নাই আমার।

দিনকতক পরে হরেকেষ্ট সকালবেলা দিব্বি ভাল মানুষের মতই কাজে যোগ দিল। কিন্তু আধ ঘণ্টাখানেক কাজ করেই কি ভাবল সেই জানে, কাজ ফেলে রেখে সোজা চলে এল লক্ষ্মণের কাছে।

লক্ষ্মণকা, কমু?

না করছেকে ডা?

তোমার কামের কেমন ধরন বুঝি না লক্ষ্মণকা। দিনে যোরে দু'গা কইর‍্যা ট্যাহা দাও। না হয় তাও মাইন্যা লইলাম। কিন্তু মাসে পনেরো দিন কাম হইলে চলবে কেমতে আমাগো?

বড়ই ব্যাজর ব্যাজর করনের স্বভাব তর হরেকেষ্ট! তর কেমতে চলব তার আমি কি জানি?

জানন লাগব লক্ষ্মণকা। এগ্‌গা বেবস্থা করনই লাগব।

বটে? কি করন লাগব শুনি?

হরেকেষ্ট তারও সমাধান মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। কিচ্ছু ভাবতে হবে না লক্ষ্মণকে।

হয় আমাগো রোজ দিন কাম দাও, নয়ত মাসিক ব্যাতন কইর‍্যা দাও। যাট ট্যাহা না দাও, পঞ্চাশ দিও।

এ রকমই একটা কিছু প্রস্তাব আশা করেছিল লক্ষ্মণ। লোকটা তো কম বজ্জাত নয়! খোলা জায়গায় গোলমাল করে আরও পাঁচটা লোকের মেজাজ খারাপ করে দেবে! কিন্তু লক্ষ্মণ এসব বরদাস্ত করবে না কক্ষনো। এমনিতে সে খুব ভাল মানুষ। পাঁচটা পরামর্শ চাও, দেবে। পাঁচ টাকা ধার চাও, তাও দেবে তক্ষুনি। কিন্তু ব্যবসার হিসাব নিকাশ সে খুব ভাল বোঝে। সেখানে এক পয়সার গোলমাল সে সহ্য করতে রাজী নয়।

বোচকা বোচকা মেলাই লাভ দেখতাছস্ বুঝি আমার? লোভে জিব্‌ডা বুঝি লক্ লক্ করতাছে তর? দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্রশ্ন করল লক্ষ্মণ।

হরেকেষ্ট আবার বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল: হাচা কইতাছি লক্ষ্মণকা, তোমার লাভের ওপর আমার লোভ তো নাই। তুমি শুধু মাসকাবারী ব্যাতন কইর‍্যা দাও। আর কিছু চাই না আমি।

এর লাইগ্যাই লোকে কয় কলিকালে পরের উপ্‌গার করলে উল্টা ফল হয়! জানস্, তগো কাম দেওনের ফলে লাভ দূরের কথা, ঘরের ট্যাহা আইন্যা দেওন লাগে তগো হাতে? জানস না আজকালকার ব্যবসার হাল?

লক্ষ্মণ যে ক্রমশ রেগে যাচ্ছে তাও যেন বুঝতে পারছে না হরেকেষ্ট। সে আবার লক্ষ্মণের কথার প্রতিবাদ করে বসল।

ধোবার কামে কি থাকে না থাকে আমারে শিখাইবা? করি নাই কোনদিন ধোবার বেবসা?

ব্যস্! যথেষ্ট বলতে দেওয়া হয়েছে হরেকেষ্টকে। আর সহ্য করতে পারে না লক্ষ্মণ।

হরেকেষ্টা, তরে জবাব দিলাম। অক্ষণ চইল্যা যা তুই। আমাকে মিথ্যুক কস্ এত সাহস তর!

কোথাকার জল গড়াতে গড়াতে কোথায় এসে যে দাঁড়ালো এতক্ষণে হুঁস হল হরেকেষ্টর। কিন্তু ইতিমধ্যে সেও রেগে গিয়েছে। নিছক সত্য কথা বলতেই লক্ষ্মণকা রেগে গেল? বুদ্ধিমান মানুষের এ আবার কেমন ধরনের বোকা সাজা?

আর বাক্যব্যয় না করে হরেকেষ্ট পেছন ফিরে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

কিন্তু ইতিমধ্যে কার্যরত ধোবারা গোলমাল শুনে উঠে এসেছিল, এবং ঝগড়ার শেষ দৃশ্য দেখেছিল। তারা তাড়াতাড়ি এসে হরেকেষ্টকে পাকড়াও করল।

ওদের মধ্যে বৃন্দাবন বয়স্ক। বলল: বোকার মত কাম করস্ না হরেকেষ্ট। যা, লক্ষ্মণের পা ধইর‍্যা মাপ চা।

হরেকেষ্টর সেই এক কথা: আমি হাচা কথা কইলাম! তবু লক্ষ্মণকা গোসা হইয়া গেল!

নিয়মমত রুক্মিণী সোডা নিয়ে এসে লক্ষ্মণের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে ঘরে এসে দেখল, হরেকেষ্ট টান টান হয়ে শুয়ে আছে। কী হ'ল আবার লোকটার? সকালে না দেখে গেল লোকটা কাজে যাচ্ছে? কপালে হাত দিয়ে দেখল জরও হয়নি। জিজ্ঞেস করল: ব্যাপারডা কি গো? কামে গিয়া অসময়ে ফির‍্যা আইল্যা বড়।

সাড়া মিলল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রুক্মিণী মন্তব্য করল: জোয়ান মানুষ কাম ফেল্যা ঘবে বইয়া থাকে এমন বাপের বয়সে দেখি নাই।

পাঁচ বছরের ছেলে নিতাই কোথা থেকে এক পাটি ছেঁড়া জুতা সংগ্রহ করে এনে তার ভিতর পা গলাতে চেষ্টা করছিল। উত্তরে হরেকেষ্ট ছেলেটার পিঠে গোটা কয়েক কিল বসিয়ে দিয়ে বলল: খানকীর বাচ্চা, যত জঞ্জাল আইন্যা ঘর ভরতাছিস্?

যত দোষ বুঝি পোলাডার?—রুক্মিণী রেগে জানতে চাইল।

কিন্তু কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল রুক্মিণীর। ব্যাপারটা জানতে হয় তো! বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিবেশীদের কাছে জিজ্ঞেস করে ব্যাপার সহজেই জেনে নিতে পারল রুক্মিণী।

হাসবে, না কাঁদবে, রুক্মিণী ঠিক করে উঠতে পারল না। এই নিরেট বোকা গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকটিকে নি.য় সে জীবনে সুখ পেল না। ব্যাপারটা ক্রমশ চরমে উঠছে যেন। এ লোকটির উপর নির্ভর করে থাকলে কবে না জানি খাওয়াই জুটবে না। এখন যা একবেলা করে জুটছে সে তো ওর নিজের রোজগারে। হরেকেষ্ট যা আনে সে তো হয় শুঁড়ির দোকানে দিয়ে আসে, নয় মাংসই কিনে আনে হয়তো। কিন্তু তার রোজগার যদি কখনো বন্ধ হয়ে যায় তখন কী উপায় হবে?

ঘরে ফিরে এসে রুক্মিণী হরেকেষ্টকে বোকা লক্ষ্মীছাড়া অপদার্থ ইত্যাদি যা-তা বলে বক্‌তে শুরু করল। এ-ও জানতে চাইল, যার নিজের বুদ্ধি নেই, বৌয়ের থেকে বুদ্ধি নিতে অহংকারে বাধে কেন তার? আর এতই যদি আত্ম-সম্মানবোধ তবে বিয়ে করেছিল কেন?

রুক্মিণীর কথার মাঝখানে হরেকেষ্ট আশ্চর্য মৃদুস্বরে তাকে একবার থামতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু রুক্মিণী কি তখন অত সহজে থামে? শেষে হরেকেষ্ট উঠে বসে রুক্মিণীর তলপেট লক্ষ্য করে একটা লাথি বসিয়ে দিল।

কেমন লাগে রে খানকী? আরও চাই?

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে রুক্মিণী ছিটকে পড়ে গিয়েছিল মেঝের উপর। এক ধরনের হিংস্র হাসি হেসে হরেকেষ্ট এগিয়ে গিয়ে ভূপতিত শত্রুর গায়ে আর একটা লাথি বসিয়ে দিয়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

তুই তো স্বাধীন কাম করস্! ল' মজুরী ল'!

কথাটা বলল না রুক্মিণী। কান্না চাপার চেষ্টায় অসমান সশব্দ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বারান্দার মোটা থামে হেলান দিয়ে বসে তাকিয়ে রইল উদাসীন দৃষ্টিতে।

বেলা এগারোটার কম নয়। প্রকাণ্ড বারান্দাটা থেকে রোদ সরে গিয়ে চত্বরে নেমেছে। অনেক ঘরের বৌ-ঝিরা বারান্দার উপরই রান্নাবান্না বা অন্যবিধ কাজে ব্যস্ত। এদিকে ইতিমধ্যেই রোদের তেজ যেন দুর্বার হয়ে উঠেছে। বাঁধানো চত্বরের উপর পড়ে রোদ যেন ঠিকরে এসে চোখে বিঁধছে। পাশের মাঠে ধোবারা অজস্র কাপড় শুকোতে দিয়েছে। আর সেই সাদা কাপড়ের উপর রোদ যেন অজস্র খুশিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অনেক দূরে দৃষ্টি পারিয়ে দিয়ে রুক্মিণী যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, বাতাসকে ঝাঁপিয়ে দিয়ে তরল রোদ যেন ঝির ঝির করে পড়ছে। আজ সে বসে বসে শুধু রোদ দেখবে। রোদের নিষ্ঠুর খেলা।

কিন্তু বসারও জো নেই বেশীক্ষণ। রান্নার সময় বয়ে যাচ্ছে। পিরীতের কুটুমকে পিণ্ডি সাজিয়ে দিতে হবে আবার!

এমন সময় দোকানের কাজ শেষ করে পরাণ ফিরে এল বাড়িতে। রুক্মিণীকে বারান্দায় বসা দেখে আর ঘরে গেল না। সোজা চলে এল রুক্মিণীর কাছে। উঁকি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, ঘর থেকে হরেকেষ্ট দেখতে

পারে কিনা। সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল: এগগা পান খাওয়াতে পারো রুক্মিণী?

অভ্যাসবশত রুক্মিণী প্রথমটায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো পরাণের দিকে। তারপরে পরাণকে সুদ্ধ অবাক করে দিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

আমাগো মত মান্‌ষের ঘরে পান থাকে বুঝি? যদি কিন্যা আন্যা দাও তবে ভাল মিঠা পান সাজ্যা দিমু!

হরেকেষ্ট কিন্তু পরদিনই গিয়ে লক্ষ্মণের কাজে ফের যোগ দিয়েছিল। প্রতিবেশীরা অনেক বুঝিয়েছিল রাত্রিবেলা। লক্ষ্মণ ঠকায় ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে এঁটে ওঠার জো নেই। কঠিন ঠাঁই। হরেকেষ্ট যেন রাগ করে নিজের পায়ে কুড়ুল না মারে।

লক্ষ্মণের কাছে না গেলে আর কী করবে সে? আর কী জানে সে?

লক্ষ্মণ সহজে রাজী হয়নি। কাকুতি মিনতি করতে হয়েছিল নানাভাবে। মানুষটাকে ঠক নিষ্ঠুর বলে জেনেও বলতে হয়েছিল, তার মত দয়ালু আর কেউ কখনো দ্যাখেনি।

বারো

পুলিশের তৃতীয় অভিযান আর হ'ল না দেখে এ-বাড়ির লোকেরা হয়তো ভাবছে, আপদ গেল। কিন্তু ধরণীবাবু জানেন, এ সমস্যা অত সহজে মেটার নয়। নিয়মিত ভাড়া না পেয়েও শক্তিমান বাড়িওলা কখনো ছেড়ে দেবে না তাদের। আর বাকী-বকেয়া সুদ্ধ ভাড়া মিটিয়ে দেবে এ-বাড়ির লোকদের এত বিত্ত কোনদিন হবে না। মাথার উপর খড়্গ ঝুলছে জেনেও এ-বাড়ির লোকেরা যে কি করে রাতদিন হাস্য কলরবে বাড়ি মাথায় করে রাখে, নিবিষ্টভাবে চিন্তা করেও ধরণীবাবু তা বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁর তো রাত্রের ঘুমের ব্যাঘাত হয় দুশ্চিন্তায়।

স্বামীর কর্তব্য হিসেবে সুধার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করলেন সেদিন ধরণীবাবু।

এ-বাড়ির মেয়াদ খুব বেশীদিন নেই সুধা।—ধরণীবাবু শুরু করলেন দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা থেকে উঠে।

সুধা তখন রোদে মেলে দেওয়া কাপড়গুলো নিয়ে এসে গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। প্রথমটায় মনে হ'ল, কথা বোধ করি শোনেইনি এত দেরী করল সুধা জবাব দিতে। শুধু বলল : ও।—যেন কথাটা এই প্রথম সে জানল! আর তার জীবনের সঙ্গে এ-খবরের কোন যোগাযোগ নেই।

নিজেকে অপমানিত বোধ হয় ধরণীবাবুর। স্বামীর কথার জবাবে একটা অক্ষর উচ্চারণ করতেও নচ্ছার মাগীর বুকটা ফেটে যায় যেন!

একবার নির্বোধের মত পুলিশকে দু'টো ধমক দিতে পেরে তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে আছো! মাটীতে পা অবধি পড়ে না আজকাল!

চোখ নেই তোমার? তাকিয়ে দেখ না আমার পা মাটীতে কিনা?—সুধার মুখে যেন একটু হাসিও দেখা গেল।

কিন্তু অত আহ্লাদ থাকবে না চিরকাল। পুলিশ আবার আসবে, এবং সেদিন এ-বাড়িও ছাড়তে হবে। সেদিন কোন্ চুলোয় যাবে জিজ্ঞেস করি?

ভেবে ঠিক কর। ভরণ-পোষণের ভাতার তো তুমি।

সেজন্যই দাদার বাড়ি ছেড়ে আসার সময় পই পই করে নিষেধ করেছিলাম।

তাতে কী হয়েছে? এখনো তো যেতে পারো।

ধরণীবাবু আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন: যাবে, সত্যি সত্যি? অন্ততঃ দু'বেলা চাট্টি করে ভাত খেয়ে বাঁচা যাবে। একবেলা করে খেয়ে কী চেহারা করেছো আয়নাতে দেখেছো কখনো?

সুধা হেসে বলল: এটা বোধকরি গৌরবে পরস্মৈপদী!

ধরণীবাবু ঠাট্টা গায়ে মাখলেন না।—যাবে তো চল। এখনো যাওয়া যায়। পরে হয়তো খুব দেরী হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি যাবে তো একা যেতে হবে তোমাকে।—সুধা এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে ধরণীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

হুম্! ধরণীবাবু একা গেলে তো পোয়া বারো! রসিক নাগরের অভাব কি এদেশে? কিন্তু ধরণীবাবু তাঁব নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত। সুধা যদি ডালে ডালে বেড়ায় তো তিনি পাতায় পাতায় হাঁটবেন।

মেয়ে মানুষেব এত দেমাক বাপের বয়সেও আমি দেখিনি।—ধরণীবাবু হুম্ হুম্ করে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাইয়ে এসে ধরণীবাবু হাতের কাছে পেলেন নান্তুকে। কালীকান্ত বাবুর ছোট ছেলে, বছর আটেক বয়স। কাপড়ের খুঁট থেকে একটি পয়সা বের করে বললেন: যাওনা খোকা, এক পয়সার বিড়ি এনে দাও। রাস্তায় নামলেই দোকান।

নান্তু অনায়াসে মুখের উপর বলে দিল: পারুম না।

এই রকমই হয়েছে আজকাল। বুড়ো মানুষের কথা একটা বাচ্চা ছেলে পর্যন্ত অবহেলা করে। চড় মেরে গালটা ফাটিয়ে দিলে গায়ের ঝাল মেটে।

হঠাৎ দীনেশকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে ধরণীবাবু বললেন: ও দীনেশ, একটা বিড়ি দাওনা ভাই। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

নেহাৎ সুধার স্বামী বলেই দীনেশ অনিচ্ছুক হাতে একটি বিড়ি বাড়িয়ে দিল ধরণীবাবুর দিকে। একটা বিড়ি কম নয়। আড়াইটা বিড়ি পয়সায়।

এ-বারান্দা দিয়ে ঘুরে পাশের বারান্দায় গিয়ে তবে ধরণীবাবু বিড়ি ধরালেন। সুধার ভয়ে একটা বিড়ি পর্যন্ত খেতে পারেন না তিনি। পৃথিবীতে

এমন আর কোন্ স্বামী আছে যে তাঁর মত স্ত্রীকে ভয় পায়? মহাভারতেও উল্লেখ নেই এমন কোন স্বামীর। না, ভয় পাওয়া চলবে না। শেষ মীমাংসা করতে হবে সুধার সঙ্গে।

বিড়ি খাওয়া শেষ করে ধরণীবাবু ঘরে ফিরে এসে বললেন: কিন্তু তিরিশ টাকায় চলবে কী করে শুনি? সোনা-দানা, থালা-বাসন সব তো শেষ করেছো?

সে-দায়িত্ব আমার। যদি না পারি উপোষ করে থাকবে।—নির্লিপ্ত ক্লান্ত গলায় জবাব দিল সুধা।

আমি উপোষ করতে পারব না।

না পারলে আমাকে ত্যাগ করে চলে যেও।

হ্যাঁ, ঐ মোক্ষম যুক্তিটা আগে দিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!

হঠাৎ ধরণীবাবু লক্ষ্য করলেন, আজও সুধার অসাবধানতায় পায়ের দিককার কাপড় উঠে গিয়ে পরিপুষ্ট থল্‌থলে উরুদেশটি অনাবৃত হয়ে পড়েছে। পাশ থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঢিলা আঁচলের আড়ালে জলভরানত স্তন-যুগলের আশ্চর্য নিষ্ঠুর ইশারা।

অক্ষম অসহ্য রাগে ধরণীবাবুর আর কথা বলা হল না।

পরদিন সকালের দিকে পটল দীনেশের দল পুকুর ঘাটের অনতিদূরে আড্ডা জমিয়েছিল। উদ্দেশ্যটা খুব সৎ নয়। এই সময়টাই মেয়েদের পুকুরঘাটে আনাগোনার সময়। অনেকে স্নান করতেও আসবে। কেউ বা ভ্রূ-কুঞ্চিত করবে ওদের দেখে। কেউ বা কৌতুক-হাসি চাপতে চেষ্টা করবে। খুব সাহসী মেয়ে হয়তো ওদের শুনিয়ে বলবে: অসভ্য। খুব ভীরু মেয়ে হয়তো ওদের দিকে একবারও না তাকিয়ে প্রমাণ করবে ওদের উপস্থিতি সে বিশেষভাবে টের পেয়েছে।

বয়স্ক পুরুষ কেউ দেখলে হয়তো খারাপ ভাববেন। বয়েই গেল। বিনা খরচায় খানিকক্ষণের জন্য যদি ওরা একটু আনন্দ পেতে পারে তাতে কার কী ক্ষতি?

ওদের আলোচনাও সেই চিরাচরিত প্রসঙ্গ নিয়ে। হয় সুনন্দার কথা নিয়ে পটলকে ক্ষেপানো, নয়তো তপন-আলতার বিয়ের ব্যাপার, নয়তো

আর কোন মেয়ের সঙ্গে আর কোন ছেলেকে জড়িয়ে আধা-কাল্পনিক আধা-আনুমানিক বিশ্লেষণ।

হঠাৎ ঘাটে সুধাকে দেখে ওরা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কেন এমন অস্বস্তি বোধ হয় ওরা জানে না। সুধাও তো নেহাৎ-ই একটি মেয়ে যার যৌবনও আছে!

হ্যাঁ, ওদের আশঙ্কা ঠিক। ওদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছে সুধা। বুঝতে পারার মত করে হাসল একটু। সুধা কিন্তু ঘাটে না গিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল।

পটলবাবু, আপনাকেই খুঁজছিলাম কাল থেকে।

শুনে পটল গর্বভরে একবার বন্ধুদের দিকে তাকাল। আর বন্ধুদের মুখ ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল।

কেন বলুন তো?

এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জটা কোন্ জায়গায় একটু বলে দেবেন? খুব ভাল করে নির্দেশ দিয়ে দেবেন যাতে খুঁজে বের করতে কষ্ট না হয়।

না হয় আমিই নিয়ে যাব আপনাকে আজ দুপুরে!

উঁহু! আপনি ভাল করে বলে দিন, আমি নিজেই যেতে পারব।

পটল পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বের করে ম্যাপ এঁকে বিশদ করে বুঝিয়ে দিল সুধাকে। জিজ্ঞেস করল: চাকরির চেষ্টায় যাবেন বুঝি সুধাদি? পটল অনুমানে বুঝত, সুধাদের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। কার অবস্থাই বা ভাল এ বাড়িতে?

সেই রকমই ইচ্ছেটা—সুধা সংক্ষেপে জবাব দিল।

রবি একটা কিছু বলবার জন্য এতক্ষণ আঁকু-পাঁকু করছিল। এবারে সুযোগ পেয়ে বলল: বিশেষ আশা নিয়ে যাচ্ছেন না তো?

সুধা হেসে জবাব দিল: আশা নিয়েই তো যাচ্ছি।

তবেই তো বিপদ।—রবি বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল।

পটল ধমক দিল রবিকে: সুধাদিকে ডিস্‌কারেজ করছিস্ কেন রে রবে? জানিস, মেয়েদের কত সুযোগ সুবিধে? না, সুধাদি, কিছু ভাব্‌বেন না। আপনার কাজ হয়ে যেতে পারে।

সুধা চলে যাওয়ার পর রবি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল : চাকরি যদি অত সহজে সত্যিই পাওয়া যেত!

পটল বলল : লোকেই তো চাকরি পায়। কোয়ালিফিকেসন থাকলে চাকরি পাওয়া যায়।

পাওয়া যায় বলছিস?

বলছি তো। একটা এম. এ. পাশ ষাট টাকা মাইনের চাকরি পেলেও পায়।

কিন্তু যাদের কোয়ালিফিকেসন নেই, তারা কী করবে? তাদের কি বাঁচার অধিকার নেই?

আছে। তার জন্য ভিন্ন রাস্তা আছে।

রবি বুঝল, পটল এবার তার দার্শনিক বক্তৃতা সুরু করবে। কাজেই প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ধরণীবাবু কোন চাকরি করেন না কেন রে?

পটল মুখের এমন ভাব করল, যেন এটা একটা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ। চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ শুনতে পেল কিনা। তারপর মুখের কাছে হাত তুলে এমন কতকগুলো মুদ্রা করল, যার অর্থ সে ছাড়া কেউ বুঝল না।

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেল্‌ল সুধা। জীর্ণ রঙ-চটা ট্রাঙ্কটা খুলে বহুদিনের সযত্ন-সঞ্চিত একমাত্র ফরসা শাড়ীখানা বের করে পরল।

আড় চোখে লক্ষ্য করে ধরণীবাবু জিজ্ঞেস করলেন : কোথায় যাওয়া হবে?

চুলোয় যেতে বলেছিলে। তাই যাচ্ছি।

থাক্, আমার জিজ্ঞেস করাই অন্যায় হয়েছে।

সুধা হেসে ফেলল। বলল : হয়েছে। বুড়ো বয়সে আর রাগ করতে হবে না। যাচ্ছি চাক্‌রির চেষ্টায়।

ধরণীবাবু জলন্ত দৃষ্টিতে সুধার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ বললেন : সামান্য একটা ফোন্ করে দাদা অমন কত চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেন।

জানি।

সুধা বাক্সের তলায় হাত গলিয়ে বহুদিনের অব্যবহৃত ধুলি-মলিন এক জোড়া স্যাণ্ডেল বের করল।

সেজেগুজে তৈরী হয়ে সুধা তন্দ্রাচ্ছন্ন মাকে জানিয়ে এসে দরজার গোড়ায় একটুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর ধরণীবাবুকে লক্ষ্য করে সংক্ষেপে চলি বলে বেরিয়ে গেল। যেন শাড়ীর মত অকিঞ্চিৎকর আবরণ দিয়ে ঢাকা এক টুকরো আগুন। আগুনের মতই চটপটে। কাজ করব ভাবলে তক্ষুনি তা করতে পারে। কোন আড়ম্বর বা আয়োজনের দরকার হয় না।

আচ্ছা, সাজলে-গুজলে সুধাকে কি এখনো সুন্দর দেখায়?—যেমন বিয়ের প্রথম রাত্রে দেখিয়েছিল? ধরণীবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করে কপালে টোকা মারতে মারতে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে সমাধান খুঁজে পেলেন। মানুষের কুৎসিৎ মনের ছাপ তার মুখে পড়বেই। কুৎসিৎ মনের ছাপ পড়ায় সুধাকে এখন সুন্দর তো দেখায় না, বরং পরম কুৎসিৎ দেখায়।

তা হোক্, কিন্তু মুখপোড়া এখন চলছে কোথায়? সুধার চাকরির কথা তো ভাঁওতা! মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ এমন কথা শোনেনি যে, মেয়েরা চাকরি করে স্বামীদের খাওয়ায়। মার্কামারা পরভৃতিকা ওরা। কোন সন্দেহ নেই, অন্য মতলব আছে সুধার। খোঁজ নিয়ে দেখতে হয় তো! সুধা ডালে ডালে বেড়াবে তো ধরণীবাবু পাতায় পাতায় হাঁটবেন।

ডালহৌসী স্কোয়ার দেখে সুধী অবাক হয়ে গেল। বাড়ি এত বড় বড় হয় আর এত উঁচু উঁচু! রাস্তাগুলো এত সুন্দর আর মসৃণ আর বড়! যে-কবি 'কালো জগতের আলো' বলেছিলেন, তিনি কি কলকাতার পীচ-ঢালা রাস্তা দেখেছিলেন? অথচ এত বড় রাস্তা গাড়ির অজস্রতায় যেন ছোট হয়ে গেছে! কী চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে গাড়িগুলো! কী মোলায়েম গতি! বুকের উপর দিয়ে চলে গেলেও বোধ করি বুকে ব্যথা লাগবে না।

পটল ম্যাপটা এঁকে দিয়েছিল ভালই। এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের অফিসটা সহজেই বের করা গেল। সরু গলিটায় প্রকাণ্ড পুরুষের সারি। ওরা বোধকরি তার মতই উমেদার! মেয়েদের বিভাগটা বুঝি উপরে? পটল তো তাই বলে দিয়েছে।

উপরে উঠে দেখল, মেয়েরাও সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। তবে সারিটা ছোট।

আরও কত লোক চারদিকে। উর্দিপরা বেয়ারারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই কর্মব্যস্ত। কেউ লক্ষ্য করছে না ওকে। জলজ্যান্ত পূর্ণ-যৌবনবতী নারীও কি কৌতুহল জাগায় না ওদের মনে? অফিস-ঘরের ভিতর ঢুকল সুধা। মাঝখান দিয়ে পথ। দু'-পাশে টেবিলের ধারে ধারে বসা অজস্র কর্মরত লোকের মধ্যে কয়েকটি মেয়েও আছে যে!

একটি বেয়ারা তাকে বলল: লাইনে দাঁড়ান মা।

বেশ ভদ্র মিষ্টি গলা বেয়ারাটার। কিন্তু সে কী করে জানল ও কী উদ্দেশ্যে এসেছে?

সুধা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল সেই সরীসৃপাকার লাইনের শেষ প্রান্তে। আস্তে আস্তে তার সামনের দৈর্ঘ্যটা কমে এল, আর পিছনের দৈর্ঘ্যটা বেড়ে চলল। শেষে তার সামনে আর একটিও মেয়ে রইল না। শুধু একখানি টেবিল, আর মুখোমুখি বসে একটি মেয়ে।

কি নাম?—কলম হাতে মেয়েটি মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল।

সুধা সান্যাল।

কোয়ালিফিকেশান কি?

ম্যাট্রিক পাশ।

খস্ খস্ করে লিখতে লিখতে মেয়েটি নাসিকা কুঞ্চিত করল।

সার্টিফিকেট দেখি।

সুধা দেখালো।

ট্রেইনিং পড়েছেন?

না।

সেলাই জানেন?

জানি কিছু কিছু।

সার্টিফিকেট?

তা তো নেই।

মেয়েটি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল: তবে কী জানেন না জানেন তা দিয়ে আমি কী করব? আমার সার্টিফিকেট চাই।

সুধা চুপ করে রইল।

নার্সিং-এর ট্রেইনিং নিয়েছেন।

না।

নেবেন?

বাড়ি থেকে নেওয়া যাবে তো?

যাবে না। হোস্টেলে থাকতে হবে। ষ্টাইপেণ্ড না পেলে খরচা লাগবে।

সংসার চালাবে কে?

মেয়েটি দারুণ বিরক্ত হয়ে বলল: সেকথা কি গভর্ণমেণ্ট বলে দেবে নাকি?

মেয়েটি খস্ খস্ করে লিখে এক টুক্‌রো কাগজ ওর হাতে দিয়ে বলল: হয়েছে। এবার যেতে পারেন।

সুধা এবার প্রশ্ন করল: চাকরি হবে তো?

করেছেন তো ম্যাট্রিক পাশ! ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে কেউ যদি চায় তো খবর পাবেন।

খবর পাব কদ্দিনে?

কেউ বলতে পারে না। দু'মাস, ছ'মাস, দু'-বছরও লেগে যেতে পারে,— সরুন এবারে। অনেক বকিয়েছেন। আরও মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিছনে।

হ্যাঁ, একটি ম্যাট্রিক-পাশ মেয়ের জন্য যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে মহিলাটি। তার নিশ্চয়ই ধন্যবাদ প্রাপ্য। ধন্যবাদ জানিয়ে সুধা বেরিয়ে এল।

রাস্তায় নেমে এসে সুধার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। এই অফিসটার মত হাজার হাজার অফিস আছে গভর্ণমেণ্টের। আছে এমনি হাজার হাজার বাড়ি। আছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পুলিশ, সৈন্য, গোলাবারুদ। আরও আছে কোটি কোটি টাকা। এই আকাশ-চুম্বী ঐশ্বর্য আর ক্ষমতার যারা মালিক, তাদের কী প্রয়োজন আজ এ-কথা জেনে যে স্বাস্থ্য-বঞ্চিত একটি পুরুষের স্ত্রীর একটি চাকরির দরকার আছে?—না হলে তারা না খেয়ে মরবে? তারা না খেয়ে মরে গেলেই বা এই ইঁট-কাঠ-সোনা-বারুদে তৈরী অতি-মানবিক ইমারতের এমন কী ক্ষতি হবে?

বাগান বাড়িতে বসে কয়েকজন তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ, আর অকর্মণ্য হিংসুটে লোক রাতদিন আলোচনা করছে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার নাকি তাদের জন্য কিছু করছে না। কেন করবে? সামান্য মানুষদের জন্য চিন্তা করবে অমিত ঐশ্বর্য আর ক্ষমতার অধীশ্বরেরা তাদের নৈশ নিদ্রার ব্যাঘাত করে?

সুধা তাকিয়ে দেখল, সমস্ত ডালহৌসি স্কোয়ার, বিরাট লালদীঘি। অজস্র সোনালী রোদে প্লাবিত হয়ে গিয়েছে। কী অকৃপণ হাতে দান করছেন সূর্যদেব! সূর্য কোন সজীব সত্তা নয়, অচেতন পদার্থ মাত্র। তাই সে এমন করে দান করতে পারে।

না, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের ঐ পদস্থ মেয়েটির ওপর সুধার রাগ হয়নি। হাজার কি পাঁচশো কি আরও কম মাইনে পায় হয়তো মেয়েটি। সুধার দিকে তাকিয়ে হাসলেই তার মাইনে কেউ বাড়িয়ে দেবে না। স্বভাবতঃই সে দাঁত খিঁচিয়ে কথা বলবে। সুধার জীবন কী ভাবে চলে তা জানলে তার জীবনের সুখ বাড়বে না। কাজেই সে ওর জন্যও চায়নি। সুধার মত একটি মেয়ে আজকে এই অফিসের গেটের সামনে মরে পড়ে থাকলে তাকে সরিয়ে দেওয়ার মত মুদ্দাফরাশ সরকারের হাতে আছে। পচা মড়ার দুর্গন্ধে মুখ বিকৃত করে নাকে রুমাল গুঁজতে হবে না সেই সুবেশা মেয়েটিকে।

বাড়ি ফিরে এসে পটলের সঙ্গে দেখা করল সুধা।

কেমন বুঝলেন—পটল জিজ্ঞেস করল।

আশা আছে বলে মনে হ'ল না।

এক কাজ করুন না। অক্‌ল্যাণ্ড হাউসে যান না একবার?

সেখানে কি?

আরে বাপ্‌রে! সেখানে যে রিফিউজীদের স্বপ্নের স্বর্গ তৈরী হয়েছে! ডক্টর রায় যে দু'হাত দিয়ে মুক্ত হস্তে দান ক'রছেন রিফিউজীদের!

তাই নাকি? আপনি গিয়েছিলেন?

গিয়েছিলাম। আমার সুবিধে হ'ল না। আমি যে ফুটো পয়সারও মানুষ না। যাদের পয়সা আছে শুধু তাদেরই টাকা দেন সরকার।

তার জন্য চটছেন কেন? বুদ্ধিমান লোক তো তাই করে! কিন্তু তা হলে সেখানে আমারই বা গিয়ে কী লাভ হবে?

আপনার হতে পারে সুধাদি! মেয়েদের জন্যে নাকি কী-সব ছোট-খাটো কতকগুলো ব্যবস্থা আছে।

তের

জজ সাহেবের বাগান-বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের চেয়ে আগেই কল্যাণবাবু খবরটা পেয়েছিলেন: ডক্টর রায় রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেছেন উদ্বাস্তুদের জন্যে।

ঘোষাল মশাইয়ের ডিস্পেন্সারীতে যথারীতি তুমুল তর্ক শুরু হয়ে গেল।

ডক্টর রায়ের প্রেস-নোটটা দেখার সময় পাওনি বোধহয় এখনো রজত?—কল্যাণবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সময় আমার অনেক, কল্যাণদা। দুঃখের বিষয়, করার মত কোন কাজ দেয় না কেউ।

বাজে কথা বাদ দাও, পড়েছ কিনা তাই বল।

পড়েছি। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে কিছু গৌরী সেনের টাকা খরচা হবে বুঝতে পারছি।

ঘোষাল মশাই এবার ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন: এখন কি তোমার এ-নিয়ে আলোচনা করার সুবিধে হবে রজত? একেবারে টাট্‌কা খবর! দাদাদের থেকে কি "পয়েণ্টস্" জানতে পেরেছো এর মধ্যে?

রজত লাল হয়ে গিয়ে বলল: কী মনে করেন আমাকে বলুন তো ডাক্তারবাবু? আমার কি কোন স্বকীয়তা নেই? নিজে কিছু ভাবতে পারি না আমি?

কল্যাণবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন: আরে চটছো কেন রজত? ঠাট্টা বোঝ না?

ব্যাপারটা নিয়ে খানিকক্ষণ বাক্-যুদ্ধের পরে ঘোষাল মশাই বললেন: থাকগে কল্যাণবাবু, ছেলে-ছোক্‌রার কথা বাদ দিন। আসুন, আমরা একটা দরখাস্ত দিই। কি বল রজত? রাজী?

আপনারা যা-ই করবেন, আমি তাইতেই আছি।—রজত বলল।

কল্যাণবাবু তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন: কিন্তু যা-তা কিছু একটা করলে চলবে না ঘোষাল মশাই। এমন কিছু করা চাই যাতে পাঁচ জনের উপকার হয়। অন্তত আমাদের নিজেদের লোকগুলো যেন বাদ না যায়।

আপনি যখন এর ভেতর আছেন তখন তো অন্যরকম কিছু হতেই পারে না কল্যাণবাবু।

কিন্তু আলোচনা বেশীক্ষণ চলতে পারল না। কল্যাণবাবু উঠে পড়লেন মাঝখানে। এমন উত্তেজক আলোচনার মাঝখানে রসভঙ্গ করা কল্যাণবাবুর চরিত্রে অস্বাভাবিক। তাঁর ওঠার ধরণ দেখেও মনে হ'ল, আর কোন-কিছুর তাগিদ রয়েছে তাঁর মনে।

হঠাৎ উঠে পড়লেন ?—ঘোষাল মশাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, বিশেষ দরকার।

কণ্ট্রাক্টরীর ব্যাপার বুঝি ?

হতেও পারে। অসম্ভব কি।

কল্যাণবাবুর জবাব দেওয়ার ধরণে সবাই হেসে ফেললেন। হাসির লঘু আবহাওয়ার মধ্যে কল্যাণবাবু রাস্তায় নেমে এলেন।

আসলে ঐ কণ্ট্রাক্টরীর চিন্তাটা মাথায় থাকার ফলেই কল্যাণবাবু সরকারী পরিকল্পনার মহত্বটা বুঝেও তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। চিন্তাটা মাথায় এসেছে অল্প ক'দিন হ'ল। কিন্তু এর মধ্যেই জিনিসটা নিয়ে কল্যাণবাবু এত ভেবেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজে রূপ দেওয়ার জন্য এত ঘুরেছেন যে, আর কিছু তাঁর মাথায় ঢোকা এখন সম্ভবই নয়। কিন্তু হঠাৎ কণ্ট্রাক্টরীর ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ার পিছনে একটু ইতিহাস আছে।

প্রায় মাসখানেক আগের কথা। কো-অপারেটিভের আর কোন ভবিষ্যৎ খুঁজে না পাওয়ার ফলে কল্যাণবাবু তখন ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা শুরু করেছিলেন। না করে উপায়ও ছিল না। নিছক ধারের উপর নির্ভর করে সংসার-তরণীকে আর কতদূর ঠেলে নেওয়া যায় ? কিন্তু এই চেষ্টার ফলে যে পরিমাণ ঘোরাঘুরি করছিলেন কল্যাণবাবু, সেই পরিমাণে কোন বাস্তব সমাধানের পথ নিকটবর্তী হয়ে উঠছিল না। ত্রুটিটা প্রধানতঃ ছিল তাঁর মানসিক অনিশ্চয়তায়। চাকরি করবেন, না ব্যবসা করবেন, তা-ও ঠিক করে উঠতে পারেননি তিনি তখন পর্যন্ত। তা ছাড়া, উপায়ের সন্ধানে বেছে বেছে যাচ্ছিলেন তিনি তাঁরই সমপর্যায়ের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। ফলে সহানুভূতির পরিমাণটা বেড়ে উঠছিল, সাহায্যটা পড়েছিল শূন্যের কোঠায়।

এমনি অনিশ্চিত ঘোরাঘুরির পর্যায়ে একদিন তিনি চলমান ছিলেন কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথের উপর দিয়ে। 'ওয়ারলেসের' দণ্ড-সংযুক্ত একটি শোভন সরকারী গাড়ি কল্যাণবাবুকে পার হয়ে গিয়ে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গাড়ি-ঘোড়ার দিকে নজর যারা দেয় কল্যাণবাবু তাঁদের দলের নন। নিজের মনেই তিনি পার হয়ে যাচ্ছিলেন গাড়িটা, কিন্তু নিজের নামটা বার কয়েক সজোরে উচ্চারিত হতে শুনে ফিরে না তাকিয়ে পারলেন না। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক্‌ছেন কোন্ এক ভদ্রলোক। কে? আরে এ যে বিনায়কদা! তাঁদের টেরোরিষ্ট আমলের দাদা।

বিনায়কদা আজকে আর যে-সে লোক নন। তিনি প্রদেশের একজন মন্ত্রী। তথ্যটা ভাল করেই জানা আছে কল্যাণবাবুর। দু' একবার ভদ্রলোকের কাছে যাবেন বলেও যে না ভেবেছেন তা নয়। কিন্তু একজন কর্মব্যস্ত মন্ত্রীর কাছে তুচ্ছ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যাওয়ার কথাটা ভাবতে ভাল লাগেনি। তা ছাড়া, একটু ভয়ও ছিল মনে। মানুষের সুদূর কামনাকে আয়ত্ত করেছে যে লোকটি, সে যদি স্মৃতি-মন্থন করে অনেক অতীতকালের একটি সামান্য সম্পর্কের কথা মনে না আনতে পারে?

সাদর সম্ভাষণ করে কল্যাণবাবুকে গাড়িতে তুলে নিলেন বিনায়কদা। আগের কালের অত্যন্ত হৃদ্যতার সম্পর্কটুকু আজও মনে করে রেখেছেন তিনি, মন্ত্রী হওয়ার পরেও? আশ্চর্য! যারা কংগ্রেসের কুৎসা রটনা করে বেড়ায়, তাদের যদি একবার দেখাতে পারতেন কল্যাণবাবু!

মনের নিরুদ্ধ কৃতজ্ঞতা-বোধকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকাশ করারও সুযোগ দিলেন না বিনায়কদা। শুরু থেকেই তিনি একটানা প্রশ্ন করে চললেন কল্যাণবাবুকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর অবস্থাটা জেনে নিলেন ভাল করে।

তোমার চেহারা তো খুবই খারাপ হয়েছে, কল্যাণ! এর মধ্যেই বুড়িয়ে গিয়েছো যে!

তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় বিনায়কদার সুপুষ্ট নিভাঁজ মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস গোপন করে ফেললেন কল্যাণবাবু।

বয়স তো বসে থাকে না কারও জন্য বিনায়কদা।

উঁহু! যে উত্তরটা চাইছিলাম তা তুমি চেপে গেলে কল্যাণ। তা না হয় হ'ল, কিন্তু তোমার জামা-কাপড়েরই বা এমন শোচনীয় অবস্থা কেন?

তোমার সে মিহি খদ্দরের পোষাক তো দেখছি না, খদ্দরই তো ছেড়ে দিয়েছো দেখছি ?

খদ্দরে খরচ বেশী পড়ে যায় আজকাল।

সেই কথাই তো জানতে চাইছি হে। রোজগার-পত্তর কমে গিয়েছে বোধ করি আজকাল। তাই না ?

ধরেছেন ঠিকই বিনায়কদা। গোপন করে লাভ নেই। সুবিধে মত কোন কাজ পাচ্ছি না মোটে।

তুমি এক কাজ কর কল্যাণ। নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের আমরা কিছু কিছু সাহায্য দিচ্ছি। একটা মাসিক ভাতার ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতে পারব। কালকেই সকালের দিকে আমার অফিসে চলে এস তুমি।

কল্যাণবাবু দ্বিধায় পড়ে গেলেন।

কিন্তু আমার চেয়েও বেশী দরকার এমন লোকও তো আছে।

কী বিপদ! তাদের কি আমরা বঞ্চিত করছি? তুমি হলে আমার পুরনো দলের লোক। অন্যকে দশ টাকা দিলে তোমাকে পঞ্চাশ দেব।

কল্যাণবাবু ঘেমে উঠলেন এবারে।

আর কিছু করার সুযোগ করে দিন না বিনায়কদা।

আর কী করবে? সরকারী চাকরি তো পাবে না। বয়স নেই। ব্যবসার দিকে ঝোঁক থাকলে দু'একটা পার্মিট বের করে দিতে পারি। কণ্ট্রাক্ট পেতে পারো কিছু কিছু। সরকারের অনেক ছোট-বড় কাজ হচ্ছে।

প্রায় মিনিট দশ পনেরো আলাপ হ'ল বিনায়কদার সঙ্গে। গাড়ি গভর্ণর হাউসে পৌঁছতে যেটুকু সময় লাগল। শেষ পর্যন্ত খুব খুশ হতে পারলেন না কল্যাণবাবু। সেই বিনায়কদাকে যেন খুঁজে পাওয়া গেল না, যার সঙ্গে এককালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনৈতিক আলোচনা চলত। এই বিনায়কদা শুধু চান আগের সম্পর্কের জের ধরে তাঁকে খানিকটা সাহায্য করতে, নতুন করে সম্পর্ক পাততে নয়। সাহায্যও কোন সম্মানজনক কাজ দিয়ে নয়। নেহাৎ খয়রাতি সাহায্য।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে সাহায্যের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলেন কল্যাণবাবু। মনে পড়ে গেল রাত্রিবেলা মনোরমার কাছে বিনায়কদার প্রসঙ্গটা তুলতে গিয়ে।

আজকে একটা কাণ্ড হয়ে গেল রমা।

কী কাণ্ড গো ?

কল্যাণবাবু লক্ষ্য করলেন, মনোরমার চোখে-মুখে ঔৎসুক্য ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য! মনোরমা কি পাল্‌টে যাচ্ছে? স্বামীর প্রতি গভীর অনাস্থাবশতঃ তাঁর কথার দি.ক মনোরমা সাধারণতঃ বিশেষ আগ্রহ দেখান না।

বিনায়কদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কে বিনায়কদা ?

শুনেছ নিশ্চয়ই তাঁর কথা আমার মুখে; ভুলে গেছ। অনেক কাল আগের কথা। বিনায়কদা টেরোরিষ্ট আমলে আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

তুমি কি জানো বিনায়কদা এখন মন্ত্রী ?

কী করে জানব? কে আবার গণ্ডা গণ্ডা মন্ত্রীদের নাম মুখস্থ করে রাখবে? কিন্তু বিনায়কদা যদি মন্ত্রী তো তুমি তো তাঁর কাছে সাহায্য পেতে পারো ?

সাহায্য করার জন্যই তো আমাকে ডেকেছিলেন গো।

সাহায্যের রকমটা কল্যাণবাবুও কিছুতেই খুলে বলবেন না। মনো-রমারও শোনার আগ্রহের কিছুতেই অন্ত পাওয়া যায় না।

মনোরমার আগ্রহোজ্জ্বল চোখ-মুখ আর নরম নরম ছোট ছোট কথা শুধু অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলেন কল্যাণবাবু। এ যেন এক নতুন মনোরমা। মাঝখানের সেই অসহযোগিতার ভাবও নেই, আবার আগের সেই রণচণ্ডী মূর্তিও নেই! আরও অনেক আগের মনোরমাকে যেন খানিকটা খানিকটা পাওয়া যাচ্ছে। আগের কালের মনোরমার কৌতুকোজ্জ্বল চোখের নিচে দুটো থলির মত কী যেন বারবার করে ফুলে উঠত। কল্যাণবাবু ভাবতেন, বয়সের ভারে সেই সৌন্দর্যটুকু বুঝি নষ্ট হয়ে গেছে মনোরমার। কিন্তু আশ্চর্য! কে যেন আবার বসিয়ে দিয়ে গেছে সেই থলি দুটো মনোরমার চোখের নিচে।

পুলিশী অভিযানের 'পর থেকেই পরিবর্তনটা এসেছে মনোরমার। একটা প্রকাণ্ড দুশ্চিন্তার হাত থেকে যেন মুক্ত হতে পেরেছেন কল্যাণবাবু।

বিনায়কদার সাহায্যের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত খুলে বললেন কল্যাণবাবু।

তুমি কী করবে ঠিক করেছো? সাধা ভাত পায়ে ঠেলবে শেষে?

শোনো কথা! আমি না বুড়ো, না রোগী, না অক্ষম। খয়রাতি নিয়ে বাঁচতে হবে আমাকে এই জোয়ান বয়সে?

গভর্ণমেণ্ট দিচ্ছেন তোমার কাজের পুরস্কার। তাকে তুমি খয়রাতি বলছ কেন?

কিন্তু পুরস্কার পাব বলে তো কাজ করিনি কোনদিন?

এতক্ষণে মনোরমার রেগে যাওয়ার কথা। কল্যাণবাবুর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার দুর্ভাগ্য নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা আরম্ভ করার কথা। কিন্তু তার বদলে অনুরোধে মনোরমার গলার স্বর যেন আরও বিগলিত হয়ে এল।

শোনো। আমার একটা অনুরোধ একবার অন্ততঃ তুমি রাখ। ছেলে-মেয়েদের গায়ে জামা নেই। পুষ্টির অভাবে শুকিয়ে উঠছ তুমি।

আলোচনা আর শেষই হতে চায় না। অজস্র মিনতি-করুণ কথার পাঁজা তুলো দিয়ে কল্যাণবাবুকে একেবারে ঢেকে দিতে চাইলেন যেন মনোরমা।

অবশেষে কল্যাণবাবু রেগে গেলেন। মেয়ে মানুষের সানুনাসিক কণ্ঠস্বর কতক্ষণ সহ্য করতে পারে পুরুষ।

আমি ভিখিরী হলে খুশি হও এ কথা আগে বল নি কেন রমা?

মাপ করো। তোমার যদি দুঃখ হয় তবে এই চুপ করলাম আমি।

আলগোছে পশ্চাদপসরণ করলেন মনোরমা। এই অভাবনীয় ধৈর্য দেখে কল্যাণবাবু খুশি হলেন। মেয়েমানুষের এই রকমই তো হওয়া উচিত। পুরুষের গলার উপরে উঠবে কেন তার গলা? এই তো পাশাপাশি আছেন সুধীনবাবুর স্ত্রী, কালীকান্তবাবুর স্ত্রী! স্বামীদের গলা ছাড়িয়ে কই কখনো তো ওঠে না তাদের গলা? আসলে পুরুষের কাজে বেশী ঔৎসুক্য থাকারই কোন সঙ্গত কারণ নেই মেয়েদের। না, প্রভুত্ব বোধের থেকে এ কথা ভাবছেন না কল্যাণবাবু। বাইরের পৃথিবীর তারা জানে কী? তারা কি বাইরে যাচ্ছে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে?

কিন্তু কল্যাণবাবু জানতেও পারলেন না কী ভীষণ রাগে মনোরমার সারা অন্তর পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে! শুধু তার প্রকাশ নেই মনোরমা টেক্‌নিক বদলিয়েছেন বলে।

দিনকতক আগে কল্যাণবাবু একদিন রাত্রে ফিরেছিলেন জ্বর নিয়ে। জ্বর

নিয়েই দস্তুরমত খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন। হঠাৎ চেহারাটা অত্যন্ত শুকনো মনে হওয়ায় সন্দেহ করে মনোরমা কপালে হাত দিয়েছিলেন। দেখলেন গা গরম। থার্মোমিটার দিয়ে দেখলেন একশোর উপর জ্বর। সেদিন এই মানুষটার উপর একটা দারুণ অনুকম্পা বোধ করেছিলেন মনোরমা। কী অসহায় মানুষ! এমন অনেক দিন দেখা গেছে, ক্ষিধে পেলে বা তেষ্টা পেলে বুঝতে পারেন না কল্যাণবাবু। আজ যে জ্বর হয়েছে তা-ও তিনি জানেন না—কেউ তো বলে স্থায়নি! মনোরমা যদি না থাকেন, এবং বদলে আর কেউ যদি না আসে, তবে অনায়াসে বেঘোরে মরে পড়ে থাকতে পারেন কল্যাণবাবু। সেইদিন মনোরমা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে-লোকটার জন্যে প্রাণও দিতে পারেন তিনি, সে লোকটার উপর রাগারাগি করে অনর্থক আর মনোকষ্ট দেবেন না।

সেই মমতা-বোধের খোঁজও নেই আজ। নিবুর্দ্ধিতার নিঃসীম সমুদ্রে যার মস্তিষ্ক নিঃশেষে তলিয়ে আছে, সে-লোক শিশু হলে তার দাপাদাপি হাসিমুখে সহ্য করতে পারেন মা। কিন্তু সে-যদি বৃদ্ধ হয়, তার উপর যদি অনেকগুলো প্রাণীর জীবন-মরণ নির্ভর করে, তবে তার অর্থহীন হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি মধুর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারে না কোন সংবেদনশীল বধূর মনে। তবু টেক্‌নিক আর বদলাননি মনোরমা।

কল্যাণবাবুর চলন-বলন, এমন কি হাসি দেখেও মনোরমা বুঝতে পারেন তিনি ভিতরে ভিতরে রেগেছেন কিনা। মানুষটার গভীরতম অন্তর্দেশটি অবধি তিনি দেখতে পারেন এক্সরের রশ্মির মত। কিন্তু মনোরমা ভাল করেই জানেন, কল্যাণবাবুর সে-ক্ষমতা নেই। তাঁর ঘোমটা-ঢাকা মনের খবরের আভাসও টের পাবেন না তিনি। লোকটি শুধু যে চেনে মনোরমার আবয়বিক সংগঠনটাকে। তিনি হাসলেই কল্যাণবাবু খুশি, মেয়েমানুষের হাসিমুখ পুরুষের যৌন-বোধে শুড়শুড়ি জাগায় বলে! এমনি বটে পুরুষের ভালবাসা!

পরদিন সকালবেলা কল্যাণবাবু ভাবছিলেন, কোন্ দিকে যাওয়া যায় আজ। বোস সাহেবের কাছেই যাবেন কি আর একবার একটা চাকরির কথা বলার জন্য? মনোরমা এসে সামনে চা-রুটি রেখে শুরু করলেন:

আমার মাথা খাও, একটা অনুরোধ রাখ তুমি।

আবার সেই কালকের বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি!

এ যে হতেই হবে—পয়সার গন্ধ পেয়েছে যে মনোরমা! বাস্তবিক, মনোরমা আজকাল এত ভাল হয়ে গিয়েছে—তবু তাকে যেন পুরোপুরি ভালবাসতে পারছেন না কল্যাণবাবু। অলক্ষ্যে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে, খচ্ খচ্ ক'রে মনে বেঁধে। তাঁর স্ত্রী হয়েও পয়সাকে সকলের উপর গুরুত্ব দেবে কেন মনোরমা? পয়সার দারুণ প্রয়োজন আছে জীবনে এ-কথা মনে প্রাণে জেনেও কই তিনি তো তাঁর আত্মসম্মানকে বিকিয়ে দেননি পয়সার কাছে?

শেষ পর্যন্ত সেদিন কল্যাণবাবুকে যেতে হ'ল বিনায়কদার অফিসে। মনোরমার অনুরোধ রাখতেই নয়। সত্যি বড্ডই দরকার, অশ্লীলভাবে দরকার টাকার। বন্ধুবান্ধব অনেক আছে বলেই অনির্দিষ্টকাল অবাধ ধার পাওয়া কি সম্ভব! আর ধারও তো শোধ দিতে হবে! না, বিষ গেলার মত হলেও এই অনুগ্রহের অবজ্ঞার দান নিতেই হবে কল্যাণবাবুকে।

যথা-নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত লিখে দিয়ে কল্যাণবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে ভাবতে লাগলেন: এই উঞ্ছবৃত্তির হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিত্রাণ চাই। প্রথম সুযোগেই এই সরকারী অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সুযোগ সৃষ্টিও করতে হবে অবিলম্বে। কিন্তু কী উপায়ে? পথ কোথায়?

হঠাৎ মনে পড়ল, বিনায়কদা কণ্ট্রাক্টের কথা বলেছিলেন। কণ্ট্রাক্টরীতে অভিজ্ঞতা আছে কল্যাণবাবুর। একজন বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে জুটে অনেক দিন কাজ করেছিলেন তিনি। কাজ বুঝিয়ে দেওয়া, কুলি তাড়ানো, সরকারের ওভারসিয়ারকে সামলানো, মজুরী মেটানো,—সব কাজেই আভজ্ঞতা আছে। কর্মচারীর মত ছিলেন না। নির্দিষ্ট মাইনেও নিতেন না। অবিশ্যি নিজের সামান্য প্রয়োজনের জন্য মাঝে মাঝে যা নিতেন তার পরিমাণও কর্মচারীর মাইনে থেকে অনেক বেশী।

হ্যাঁ, কণ্ট্রাক্টরীর কাজই করবেন তিনি, যদি একজন মূলধন-নিয়োগকারী পাওয়া যায়। এ সব কাজে পাওয়া যায় সহজে।

কণ্ট্রাক্টরীর কাজে তিনি অনায়াসে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজনদের নিতে পারবেন। পটলকে, দীনেশকে, রবীকে—যারা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে একান্ত প্রত্যাশায়।

কণ্ট্রাক্টের কাজ হ'ল সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।

সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা। স্বাধীন সুখী ভারত গড়ে তোলার পরিকল্পনার তুচ্ছতম শরিক হওয়ারও যে বিপুল আনন্দ, তার চেয়ে বেশী কিছু কল্যাণবাবু জীবনে চান না। কাজে ফাঁকি দেবেন না; না হয় মুনাফা কম হবে। মুনাফা তাঁর না হলেও চলত, যদি না বৌ-ছেলে-মেয়ের সমস্যা থাকত।

সেই থেকে মাসখানেক হ'ল ভূতে-পাওয়া লোকের মত কণ্ট্রাক্টরীর চিন্তায় ডুবে আছেন কল্যাণবাবু। কাজ অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। টাকা দিতে চেয়েছে অমিয়। তাঁর বিশেষ স্নেহ-ভাজন রাজনৈতিক শাক্‌রেদ। সম্প্রতি বিয়ে করেছে, হাতে কিছু টাকা আছে। লাভজনক কাজে লাগাতে চায়। তা কল্যাণদার মত লোক পেলে তো তার ভাবনাই নেই। সমস্ত কল্যাণদার হাতে ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। কল্যাণদা শুধু যেন দেখেন, লোকশান না যায়। তাঁর উপর ছেলেগুলোর আশ্চর্য বিশ্বাসের কথা শুনলে চোখ দিয়ে জল আসতে চায় কল্যাণবাবুর। অমিয় কিন্তু মনে মনে তখুনি তার কর্মপন্থা ছকে নিয়েছিল। টাকা-পয়সা হাতে দেওয়া হবে না। নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকবে সে। বিলের টাকা নিজে তুলে আনবে অফিস থেকে। সে নিজেই কাজে হাত দিতে গেলে ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। কল্যাণদার অভিজ্ঞতা আছে—তাকে দিয়ে তুলে নিতে হবে কাজটা। মুনাফার অংশ? তা সে দেখা যাবে তখন বিবেচনা করে।

ঘোষাল মশাইয়ের ডিস্পেন্সারী থেকে বেরিয়ে কল্যাণবাবু প্রথমে গেলেন বিনায়কদার অফিসে,—সরকারের সাহায্য-ভাতাটা পাওয়ার তারিখ আজ। এই নিয়ে তিন দিন তারিখ পড়ল। তবু তো বিনায়কদা বললেন, শুধু কল্যাণবাবুর জন্যই তিনি এতটা করে দিলেন। ছ' মাসের কাজ এক মাসে। 'এতটা' মানে অবিশ্যি সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে লেখা দু'লাইনের একখানা চিঠি। তারই এত ওজোন যে ছ'মাসের কাজ এক মাসে হয়ে যায়।

ভাগ্য ভাল। টাকাটা পাওয়া গেল আজ। কী সব হিসাব-টিসাব করে তিনশো টাকা দিল তাঁর হাতে! এর পরে মিলবে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে। কী যে ভাল লাগল টাকাটা হাতে পেয়ে কল্যাণবাবুর! অদ্ভুত ক্ষমতা টাকার!

সেখান থেকে কল্যাণবাবু গেলেন পি-ডব্লিউ-ডির অফিসে। না, সরকারী অফিসকে নিয়ে পারা যায় না! কণ্ট্রাক্টর হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করার দরখাস্তটা কুড়ি পঁচিশ দিন পরেও প্রায় একই জায়গায় পড়ে রয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কল্যাণবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন। এখুনি নিশ্চয় বাঁকা বাঁকা বুলি আরম্ভ করবে বামপন্থী।

যা অনুমান করা গিয়েছিল ঠিক তাই হ'ল।

আরে কল্যাণ যে? স্বদেশীর অফিস আর টাকার অফিস এক জায়গায় হ'ল কবে থেকে হে?

অমলেন্দুর প্রথম সম্ভাষণই এই!

সোজা চোখেও পৃথিবীটাকে ছাখা যায় কিনা চেষ্টা করে ছাখো না অমলেন্দু!

অমলেন্দুর জেরার জবাবে কল্যাণবাবু স্বীকার করলেন, তিনি কণ্ট্রাক্টরী করার বাসনা রাখেন।

নিজের সরকারকে ঠকাতে পারবে তো কল্যাণ?—অমলেন্দু জিজ্ঞেস করলেন।

কিসের জন্য ঠকাব? যা-তা বলার অভ্যেস তোমার আর গেল না দেখছি।

তাতে দোষ ছিল না কল্যাণ। কাউকে যদি নিশ্চিন্ত মনে ঠকানোর পরামর্শ দেওয়া যায় তো সে বর্তমান সরকারকে। কিন্তু তা যে পারবে না তুমি। অথচ ঠকাতে না পারলে কণ্ট্রাক্টরীতে লাভ হয় না।

বই-পত্তর নিয়ে আছ, দুনিয়ার তুমি জান কী অমলেন্দু? সব সময় নিজেকে সব-জান্তা বলে ভাবাটা ভুল।

অমলেন্দুর কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন কল্যাণবাবু।

আরও অনেক জায়গা ঘোরা-ফেরা করে কল্যাণবাবু যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন ঘোষাল মশাইয়ের ডিস্পেন্সারীতে উদ্বাস্তু-ঋণ সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছিল তা নিঃশেষে ভুলে গিয়েছেন কল্যাণবাবু।

কিন্তু সেদিন অমলেন্দু যা বলেছিল, সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন কল্যাণবাবুর একজন বিশেষ পরিচিত ইঞ্জিনীয়ার তার তিন চার দিন পরে। বহু পুরনো কণ্ট্রাক্টর। কল্যাণবাবুর সঙ্গে তাঁর যে হৃদ্যতার সম্পর্ক তাতে তিনি কখনোই বাজে কথা বলবেন না তাঁর কাছে।

অমিয় বিশেষভাবে বলেছিল: ভাল করে আট-ঘাট বেঁধে নেবেন কল্যাণদা। লোকশান হলে কিন্তু আমি বাঁচব না।

সেই জন্যই যাওয়া ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। তাছাড়া এক্সপার্টের পরামর্শের তো সব সময়েই দরকার হবে।

কল্যাণবাবুর অভিপ্রায় শুনে ইঞ্জিনীয়ার তাঁকে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত করলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব ভাল! খুব ভাল! সাহস করে লেগে যান। খারাপ হবে কেন?

লাভ-টাভ কেমন থাকে আজকাল বিভাষবাবু? কল্যাণবাবু সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন।

তবে বলি, শুনুন। সবচেয়ে কম যে টাকা না হ'লে কাজ উঠতেই পারে না, তার থেকে দশ পার্সেণ্ট বাদ দিয়ে টেণ্ডার দিতে হয়। না হলে প্রতিযোগিতার বাজারে কাজ ধরা যায় না। সরকারী কর্মচারীদের জন্য দশ পার্সেণ্ট বাঁধা আছে তা তো জানেনই। তার উপর আপনার লাভ—তা-ও ধরুন দশ পার্সেণ্ট।

সে কী আশ্চর্য কথা বলছেন বিভাষবাবু? কুড়ি পার্সেণ্ট লোকশান দিয়ে শুরু করে দশ পার্সেণ্ট লাভ?

হ্যাঁ, ঠিক হবে। আমরা কড়ায় ক্রান্তিতে হিসাব করে সত্তর পার্সেণ্ট কাজ বুঝিয়ে দি সরকারকে।

কল্যাণবাবুর কাছে যেন আজগুবি মনে হচ্ছিল কথাগুলি।

বলেন কি?

অবিশ্যি তাতে সরকার আসলে তিরিশ পার্সেণ্ট পান। যে বাড়িটা একশো বছর টেঁকার কথা, সে-বাড়ী টেঁকে তিরিশ বছর।

কল্যাণবাবুর পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবী সরে যাচ্ছিল। এক মাস পরিশ্রমের পর এই কথা শুনতে হ'ল শেষে? তিনি যে সরষের ক্ষেতে হাত দিতে যাবেন তার মধ্যেই কি ভূত থাকবে?

এই কি বিধিলিপি?

তখন রাত্রি। ফিরতে ফিরতে কল্যাণবাবু তাকিয়ে দেখলেন, কৃষ্ণপক্ষের আকাশ কালোয় কালো হয়ে গিয়েছে। আকাশে কখন মেঘ জমেছে' তিনি

জানতে পারেন নি; তারই অদৃশ্য উপস্থিতিতে নক্ষত্রের দল আড়ালে পড়ে গিয়েছে। একটা তারারও দেখা নেই এত বড় আকাশে। আর সেই কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে শহরের বিজলী আলোর সমারোহ যেন বিদ্রূপ করছে বিশ্বজগৎকে।

কলকাতা আসার সময় ভেবেছিলেন, স্বদেশী সরকারের যাদুদণ্ড স্পর্শে সমস্ত কলুষ থেকে দেশের মুক্তি ঘটেছে। কিন্তু না, মুক্তি ঘটেনি। আর সেই কলুষের সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে স্বদেশী সরকার পরম আত্মতৃপ্তির সঙ্গে নিজেদের কাজের গুণ ব্যাখ্যা করছেন দিনের পর দিন।

পরদিন কোথাও আর গেলেন না কল্যাণবাবু। সারাদিন বাড়ি বসে রইলেন। সারা দুপুর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন। বিকেলে গেলেন না ঘোষাল মশাইয়ের ডিস্পেন্সারীর আড্ডায়। মনোরমা চিন্তিত হয়ে কল্যাণবাবুর কপালে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বর এসেছে কিনা।

রাত্রে হঠাৎ অটল এসে হাজির।

কল্যাণদা বাড়ি আছেন?

অটল? আরে এস, এস, বস। তারপর কারবার-পত্তর চলছে ভাল?

আপনাদের আশীর্বাদে একরকম চলছে কল্যাণদা। সেই জন্যই আসা। রিফিউজী লোনের জন্য একটা দরখাস্ত দিতে চাই। ব্যবসা বাড়াতে পারি তবে। আপনার অনেক চেনা-শুনা। যদি কাউকে একটু বলে দ্যান।

কোথায় দরখাস্ত দেবে? সেণ্ট্রালে?

গরীব মানুষ! প্রভিন্সিয়ালেই দেব কল্যাণদা।

তাইতো, কার কাছে পাঠাই তোমাকে?

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে সন্তোষের কাছে একখানা বিস্তারিত চিঠি লিখে কল্যাণবাবু অটলের হাতে দিলেন। সন্তোষের বাড়ির ঠিকানাও বুঝিয়ে দিলেন। আর এই উপলক্ষে তাঁরও মনে পড়ে গেল ঘোষাল মশাইয়ের ডিস্পেন্সারীতে সেদিনের আলোচনাটা।

পরদিন সকালে ঘোষাল মশাইয়ের ডিস্পেন্সারীতে কল্যাণবাবুর গলাটাই সব চেয়ে বেশী করে শোনা যাচ্ছিল।

বুঝলে রজত! এ-এক আশ্চর্য পরিকল্পনা! ভেবে দ্যাখো, লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে কোটি কোটি টাকা ছড়িয়ে দিচ্ছেন সরকার। তাতে গড়ে

উঠবে লক্ষ লক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা। তার মানে কী? টাকাটা ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশের লোকের মধ্যে। ব্যবসার লাভের ভাগ পাবে কোটি কোটি লোক। মুষ্টিমেয় কয়েকটা লোক যে ষোল আনা মুনাফা লুটবে সে গুড়ে বালি পড়বে চিরকালের মত।

খুব সত্যি কথা, ঘোষাল মশাই বললেন: তাহলে আমাদের প্ল্যানটা এবারে ঠিক করে ফেলুন। পঞ্চাশ হাজার অন্ততঃ বের করা চাই।

নিশ্চয়। না হলে আমাদের এতগুলো লোকের চলবে কি করে?

রজত কিন্তু কল্যাণবাবুর যুক্তির কথাই ভাবছিল।

কী হবে জানেন কল্যাণদা? দেশের পণ্যের উৎপাদন বাড়বে না, কিন্তু তা নিয়ে ব্যবসা করার লোকের সংখ্যা বাড়বে। ফলে অসম প্রতিযোগিতা এবং ঝানু ব্যবসায়ীর হাতে নতুন আনাড়ী কারবারীর অপমৃত্যু।

রেখে দাও বাজে কথা রজত! এইটে সূত্রপাত, এর সঙ্গে অন্যান্য পরিকল্পনা মিলিয়ে কংগ্রেস দেশে এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে, যাতে বিনা রক্তপাতে—তোমরা যার নাম সমাজতন্ত্রবাদ বল—তাই আসবে দেশে।

চৌদ্দ

শুরু হল সুধার অনির্দেশ্য ঘোরাঘুরি।

সরকারী মহিমার খবরাখবর জানাও সোজা নয়। মেয়েদের জন্য কোন্ ‘কোন্ পথে কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করছেন সরকার, বেশ কষ্ট করেই জানতে হ’ল সুধাকে। মনের মত একটি পথ কিন্তু সহজেই পাওয়া গেল। মেয়েদের সেলাইয়ের কল কেনার জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সরকারের। সুধা মন।স্থির করে ফেলল। সেলাইয়ের কলের জন্যই দরখাস্ত দেবে সে। সেলাইটা সে ভালই শিখেছিল। এককালে সুখ্যাতি পেয়েছে দেশের বাড়িতে থাকতে।

একখানা দরখাস্ত পেশ করে দিয়ে সুধা ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ঠিক করতে বসল। তার যোগ্যতা সম্পর্কে একবার অনুসন্ধান করেই নাকি ঋণ মঞ্জুর করবেন সরকার। তার জন্য দিন কয়েক সময় লাগিবে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে আট দশ দিন সময় লাগবে সেলাই-এর কলটা পেতে, তবে কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাতে কাজ শুরু করা যায় তার জন্য এখন থেকেই চেষ্টা করা উচিত। কাজের জন্য তাকে খুব বেগ পেতে হবে না। বাড়িতেই তো দু’তিন শ’ লোক। আর প্রত্যেক ঘরেই বলে রাখলে বাড়ির লোকদের যাবতীয় জামার অর্ডার সে অনায়াসেই পাবে। পটলের সাহায্য নিয়ে পাড়ার থেকেও কিছু কিছু কাজ সংগ্রহ করা যাবে। ব্যাপারটা নিয়ে পটলের সঙ্গে সময় থাকতে আলাপ করে নিতে হবে একবার। মোটের উপর কল পাওয়ার পরে কল নিয়ে একদিনের জন্যও বসে থাকার লোক সুধা নয়।

ভাগ্যিস্ সুধা আগে ভাগেই পটলের সঙ্গে আলাপ করেনি বা কোন অর্ডার নিয়ে বসেনি! আট দশ দিনে কল পাওয়া যাবে বলে সে ভেবেছিল ; কিন্তু আট দশ দিন পার হয়ে গেল, তবু দরখাস্ত ইন্সপেক্টরের টেবিলেই এল না। অনেক তদ্বির করার পর এবং একটি ভদ্রলোককে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করার পর সুধার দরখাস্তটি ইন্সপেক্টরের হাতে এল প্রায় সপ্তাহ দু’য়েক পরে।

ইন্সপেক্টরটির পিছনে সুধাকে তিন চার দিন ঘুরতে হ’ল। বেমানান

স্যুট-পরা ভদ্রলোকটি অফিসে এসেই দারুণ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। উমেদারের দল তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি আশ্চর্য করিৎ-কর্মা লোক। শুধু যে একটি মাত্র মুখ নিয়ে দশটি মুখের সঙ্গে যুগপৎ কথা বলার অসাধারণ ক্ষমতা আছে তাঁর তা-ই-নয়। সেই দশটি মুখের অধিকারী-দের তিনি ধমকের চোটে বিপর্যস্ত করে তোলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি অধিকাংশকে আর কোন তারিখে আসার জন্য নির্দেশ দিয়ে বিদায় দেন, অবিশ্যি বিলম্ব-জনিত অপরাধটা তাদেরই ঘাড়ে চাপিয়ে। তারপর ধীরে সুস্থে একই হাতে একটি ধূমায়মান সিগারেট এবং একটি দামী নতুন ফাউণ্টেন পেন নিয়ে অবশিষ্ট ভাগ্যবানদের কাগজপত্র পরীক্ষা করতে বসেন। এই ক'জন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে তাদের আজকের এই দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য ক' ইঞ্চি জুতোর সোল ক্ষয় করতে হয়েছে জিজ্ঞেস করে জানতে ইচ্ছে করে সুধার।

সুধা ইতিমধ্যেই বার কয়েক ধমক খেয়েছে ইন্সপেক্টরটির কাছে। একদিন বেলা আড়াইটার সময় আসার জন্য আদিষ্ট হয়ে যথাসময়ে এসে দেখল ভদ্রলোকটি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাকে দেখেই তিনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন। একটার সময়ে নাকি সুধার আসার কথা ছিল। বিশেষ করে তার জন্যই নাকি ভদ্রলোক এতক্ষণ অবধি অপেক্ষা করে এখন বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে বেরিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবাদ অবাঞ্ছনীয় বুঝতে পেরে, সে পথে না গিয়ে সুধা আর একটি সময় নির্দেশ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানালো। তা ভদ্রলোক কিন্তু দয়ালু। দরখাস্ত বাতিল করে দেবেন বলে ভয় দেখালেও তিনি সুধাকে আর একবার সুযোগ দিতে রাজী হলেন। চার পাঁচ দিন পরে আর একটি নির্দিষ্ট তারিখে সুধা যেন আসে বেলা একটার সময়। নির্ধারিত তারিখে এবং সময়ে এসে সুধাকে আড়াইটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল। তারপর এলেন ইন্সপেক্টর। ভদ্রলোকটিকে লজ্জিত করার অভিপ্রায়ে সুধা জানালো, সময়মতো এসে সে দেড় ঘণ্টা যাবৎ বসে আছে। কিন্তু সুধাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক রেগে উঠলেন। সামান্য সাক্ষাৎকারের সময়টাও যদি সুধা ঠিক রাখতে না পারে, তবে সরকারের অর্থ-সাহায্য পেলেও কি সে তার সদ্ব্যবহার করতে পারবে ?

অবশেষে ইন্সপেক্টর একদিন সত্যি সত্যি সুধার কাগজ-পত্র নিয়ে

বসলেন। তার এ-জন্মের এবং পূর্বজন্মের (অর্থাৎ পাকিস্তানের) পরিবার-পরিজন, বাড়িঘর, সাংসারিক অবস্থা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিলেন ইন্সপেক্টর। সামান্য একটি শেলাই কল সাহায্য দেওয়ার জন্যে এত তত্ত্বের দরকার হয় গভর্ণমেণ্টের ?

অতঃপর ইন্সপেক্টরটি আসল প্রশ্নে এলেন।

আপনি সেলাই জানেন ?

জানি।

কোন ডিপ্লোমা কি সার্টিফিকেট আছে ?

এই প্রশ্নটিই আশঙ্কা করছিল সুধা।

না।

গভীর বিরক্তিতে ইন্সপেক্টরের মুখ-চোখ রেখা-বহুল হয়ে এল।

ডিপ্লোমা নেই, তবে আমাদের মিছিমিছি হয়রাণ করার মানে কি বলুন তো ?

সুধা মরীয়া হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল : ডিপ্লোমা না থাকলে কি সেলাই জানা যায়না নাকি ?

একটা প্রমাণ তো চাই, গভর্ণমেণ্টের কলটা পেয়ে আপনি যে বেচে দেবেন না, তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে ?

ডিপ্লোমা থাকলেই কি আর কল বেচে দেওয়া যায় না ?

সুধার জেরার চোটে রাগে ভদ্রলোক ভুলেই গিয়েছিলেন যে তাঁর হাতের সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। খেয়াল হওয়ায় আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন তিনি।

আবার বেয়াড়া তর্ক শুরু করলেন তো আপনি! তবে বলি শুনুন। শেলাই না জেনেও সামান্য দশ-বিশ টাকা খরচা করে কলকাতা শহরে সেলাই-অভিজ্ঞ বলে একটি ডিপ্লোমা পাওয়া কঠিন নয়। আবার আপনি যা বললেন, তা-ও ঠিক। ডিপ্লোমা না থাকলেই যে কেউ সেলাই জানতে পারে না এমন কোন কথা নেই। আবার সেলাই জানলেই যে কেউ একটা কল নিয়ে বসে এই দর্জি-কণ্টকিত কলকাতায় হঠাৎ-ই বিশ-পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে পারবে এমন আশা করা যায় না।, আর তখন সততার ধ্বজা ধরে না থেকে, যদি কলটা বেচে দিয়ে অন্ততঃ আরও কয়েকটা দিন বেঁচে

থাকবার ব্যবস্থা করে নেয় তো আমি অন্ততঃ তাকে দোষ দেব না। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমি যতক্ষণ এই চেয়ারে বসে আছি ততক্ষণ দয়া করে এ-ধরণের প্রসঙ্গ তুলবেন না। সদুত্তর দিতে পারব না।

সুধার মনে হল ইনস্পেক্টরটি হয়তো আসলে খুব কঠিন প্রকৃতির লোক নন! কিন্তু এমনি একটি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে কঠিন না হতে পারলে তাঁর উপায় নেই।

তা হলে আমি এখন কী করি বলুন তো?—সুধা আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল।

এক কাজ করুন। কোন গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে লিখিয়ে আনুন যে আপনি সেলাই জানেন।

আমার চেনা গেজেটেড অফিসার তো কেউ নেই।

আপনার পরিচিতদের কাছে খোঁজ করুন না! তাদের কারও না কারও জানা-শোনা গেজেটেড অফিসার নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু সেই গেজেটেড অফিসার জানবে কী করে যে আমি সেলাই জানি?

কি বিপদেই পড়লাম আপনাকে নিয়ে? আপনি কি ভাবছেন আপনি কাজ জানেন এ কথা জানলেই কেউ আপনার হয়ে লিখবে? তা নয়। গেজেটেড অফিসার লিখবে শুধু এই আনন্দে যে, তার একটা দস্তখৎ-এর কত দাম, তা জেনে আপনারা কৃতার্থ হবেন।

রাগ করবেন না। এ কথা যদি জানেনই, তবে অমন সার্টিফিকেট নিয়েই বা লাভ কি?

বলেছি তো আপনাকে—আমি গভর্ণমেণ্টের নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। আপনার সহস্র সত্যি কথার কোন দাম নেই গভর্ণমেণ্টের কাছে। কিন্তু আপনার মিথ্যা কথাকে যদি কানুন-মাফিক সাজিয়ে বলতে পারেন, তবে তা তক্ষুণি গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করে নেবে। এই জন্যই তো এমন অনেক উদ্বাস্তু আছে, যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বুঝেও আমরা কিছু করতে পারি না। তারা এমন বোকা যে সত্যি কথাটাও গভর্ণমেণ্টের গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থিত করতে জানে না। আবার অনেক লোক উদ্বাস্তু না হয়েও কাগজ-পত্র সাজিয়ে এনে মোটা টাকা বের করে নিচ্ছে। আসল কথা, গভর্ণমেণ্টের কাজ হ'ল কাগজ-পত্তরের ব্যাপার। বুঝেছেন?

কিছুটা।

তাহলে থাক আজকে। তৈরী হয়ে আসবেন আবার।

আর একটা প্রশ্ন ইনস্পেক্টরবাবু। তৈরী না হয় সব করে দেলাম। কিন্তু জিনিসটা পাব কদ্দিনে?

আবার একটা কঠিন প্রশ্ন করলেন। শুনুন তবে: কয়েকটি চাষী পরিবারের জন্য ঢেকি আর ধান-ভানার ব্যবসা বাবদ ঋণের প্রয়োজন জানিয়ে আমি রিপোর্ট দিয়েছিলাম মাসখানেক আগে। কিন্তু সরকারের অফিসের এত সব খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে, সে-গুলো ঠিকঠাক করে তাদের টাকা পেতে আরও অন্ততঃ চার-পাঁচ মাস লাগবে। অথচ আমি দেখে এসেছিলাম, ঐ লোকগুলো তখনই সপ্তাহে তিন চার দিন এক বেলা করে খাচ্ছে। এর পর কী হবে জানেন? ছ'মাস পরেও ঐ লোকদের সবটা টাকা একবারে দেওয়া হবে না। প্রথমে তারা ঢেকি-কেনার টাকা পাবে; তারপর ব্যবসার টাকা। সে-ও ধরুন আরও মাস ছয়েক পরে পাবে। আমি জোর করে বলতে পারি, ঐ অনাহারী মানুষগুলো প্রথম টাকাটা পেয়েই ঢেকি কিনবে, ঢেকি কোলে করে আরও ছ'মাস বসে থাকবে পরের কিস্তির জন্য, তা কখনোই হবে না। প্রথম কিস্তির টাকাটা পেয়ে তারা মনের আনন্দে দিনকয়েক দু'বেলা খেয়ে বাঁচবে।

অর্থাৎ আপনি যা বলছেন তাতে কল পেতে পেতে আমারও ছ'মাস লাগবে? অত দিন বেঁচে থাকতে পারব তো?

অন্ততঃ তিন চার মাস তো লাগবেই। তবে ভরসা দিয়ে বলতে পারি, শেষ পর্যন্ত দেখবেন ঠিক বেঁচে আছেন। ঐখানেই তো সরকারী পরিকল্পনার সার্থকতা। সামনে একটা আলেয়া দাঁড় করিয়ে রেখে যে মানুষের পরমায়ুকে কী করে টেনে লম্বা করা যায় এটা তার এক আশ্চর্য নিখুঁত পরীক্ষা। আর যদি মরেই যান তাতেই বা ক্ষতি কি? তবু তো একটা আশা নিয়ে মরতে পারবেন। মানুষ তো চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য দুনিয়ায় আসেনি!

কী যে হল সেদিন সেই সরকারের অন্নপুষ্ট ঝানু ইনস্পেক্টরটির! তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ভাষায় আরও অনেক কথা তিনি বলে গেলেন। হয়তো দিনের পর দিন অসহায় উদ্বাস্তুদের কাছে নিজের অসহায় দৌত্য-কার্য নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতদিনে ক্লান্তি এসেছে তাঁর। অবরুদ্ধ সহানুভূতির দরজাটি হঠাৎ

খুলে গিয়েছে আজ। তিনি বলে চললেন, উদ্বাস্তুরা যদি তাদের সাহায্যের টাকা সময়মতই পায়, তবে তো তারা তাদের পরিকল্পনা-মত, কাজ অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়। সরকারের যে তাতে দারুণ অসুবিধে। এই পরিবর্তনশীল বাজারে অনেক দেরীতে ছোট ছোট কিস্তিতে টাকা দিলে উদ্বাস্তুদের পক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর তখন ঋণ-পরিশোধে অক্ষম উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে 'ডিস্ট্রেস্ ওয়ারেণ্ট' আর হুলিয়া বের করার অখণ্ড অবকাশ থাকবে সরকারের! কত বড় সুবিধে! লক্ষ লক্ষ লোক সরকারের বিচারাধীন আসামী! স্বাধীনতা যজ্ঞে যারা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল, বিশ্বের কাছে তারা জোচ্চোর বদ্‌মাইশ বলে প্রমাণিত হবে অনায়াসে!

আফিস থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সুধার মন উদ্বেগে পূর্ণ হয়ে এল। সামান্য তিরিশ টাকার মাসিক বরাদ্দ থেকেও তিন চার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে এ ক'দিনের ঘোরাঘুরির ফলে। ইন্‌স্পেক্টরের মুখের কয়েকটি কথা শোনার জন্যই কি এতগুলো টাকা খরচ করেছে সুধা? ভাগ্য ভাল হলেও তিন চার মাস অপেক্ষা করতে হবে তাকে! শুধু তিরিশ টাকার ভরসায় এই দীর্ঘ সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যাবে কি? সোনা-দানার শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত এ কয়দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। ঘাটতি পূরণ করার মত কোন সম্বলই যে আজ আর অবশিষ্ট নেই!

গভর্ণমেণ্টের শক্তি-মদ-মত্ত রূপটি কল্পনা করে সুধা সেদিন বিস্মিত হয়েছিল। গভর্ণমেণ্টের কর্ণধারদের আজও অবশ্য সে দেখেনি; কিন্তু সে বিস্ময়-বোধ তবু আর নেই। নিঃসম্পর্কিত দূরত্ব থেকে সরকারের জমকালো রূপটি সুধাকে মুগ্ধ করেছিল। সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক পাততে এসে আজ আর সে জৌলুষ যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের অট্টালিকাবাসী কর্ণধারগণ কুঁড়েঘরের বাসিন্দাদের ডাকবে—সুধা আজও এমন অসঙ্গত দাবীকে মনে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু কেন তবু অট্টালিকাবাসীরা হাতছানি দিয়ে ডাক দিল কুঁড়েঘরের বাসিন্দাদের? আজ যে কাছে এসে দেখা যাচ্ছে, পুরোনো অট্টালিকায় অনেক শ্যাওলা জমেছে, খসে পড়েছে দামী আস্তরণ! ছাদ ফেটে ফাটল দিয়ে জেগে উঠেছে অনেক বটের চারা! বুনিয়াদী মহানুভবতার এ কী বিচিত্র নমুনা আজকে দেখতে পেল সুধা? পথের উপর

অনায়াসে মরে পড়ে থাকতে পারত যে-লোকটি, তাকে পুনর্বাসনের শেডের নীচে টেনে এনে মরতে দেওয়ার এ বিপুল আয়োজন কেন? শবদেহ রোদ্দুরে কষ্ট পাবে বলে?

ভদ্রলোকের এই মহানুভবতার অনেক রূপ সুধা দেখেছে জীবনে। তার কাকা, তার স্বামী, তার ভাসুর, তার আত্মীয়-স্বজন, দেশের বাড়ির প্রতিবেশীরা, এমন কি তার মা-ও তো কত চিন্তিত সুধার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু সুধার মন বড় ছোট; মহানুভবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ তার নেই, পালিয়ে যেতে চায় তার নাগালের বাইরে। ভেবেছিল নির্ব্যক্তিক সরকারের কাছে মহানুভবতার প্রশ্ন নেই। কিন্তু তা তো নয়। এখানেও মহানুভবতা যে শত মুখব্যাদন করে দানের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অগণিত ভিক্ষুকের সামনে! সেই ভিক্ষার দান পাওয়ার একটুখানি ক্ষীণ সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে সুধা কি আবারও এই দরজায় ফিরে আসবে? কিন্তু কার জন্য? নিজের বেঁচে থাকার প্রয়োজনকে সুধা কোনদিনই মূল্য দেয় না। একটি রোগ-জর্জর অক্ষম কামনা-ক্লিষ্ট অপ-মানুষ—তার স্বামী বলে এই পৃথিবীতে যার পরিচয়—সেই লোকটির প্রতি কোন মায়া-মমতা, কোন অনুকম্পা সুধার নেই। সেই লোকটির ভরণ-পোষণের জন্যই কি উঞ্ছবৃত্তি করা আজ তার পক্ষে অপরিহার্য? তা যদি না হয়, তবে কি সে মা'র জন্য আজ ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়েছে? কিন্তু তার মা-ই কি তাকে পরম নির্বিকারভাবে ধরণীবাবুর হাতে তুলে দিয়ে কন্যাদায় এড়াতে চাননি?

সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। অক্ল্যাণ্ড হাউসের সামনে চত্বরের উপর ছায়া দীর্ঘায়ত হয়ে উঠেছে। এখনো লোকের আনা-গোনার বিরাম নেই। বিড়ি-পান চায়ের দোকানে লোকের অজস্র ভীড়। হাল্কা পকেটের সামান্য ভারটুকুকেও উজাড় করে দিচ্ছে তারা চা-ওলা আর বিড়ি-ওলাদের কাছে। প্রতীক্ষার ক্লান্তিকে দূর করার জন্য কি? মনুষ্যত্বের অমর্যাদাকে ভুলে যাওয়ার জন্য কি? কে জানে?

সুধা রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ পরিপাটি করে পোশাক-পরা একটি কালো চেহারার ভদ্রলোক এসে তার সামনে দাঁড়ালো।

একটা কথা শুনবেন?—ভদ্রতার ভিজে গলায় ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

সুধা বিস্মিত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল: আমাকে বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ক'দিন ধরে আপনাকে এখানে লক্ষ্য করছি কি না। কি রকম বুঝতে পারছেন? সরকারী সাহায্য পাবেন বলে মনে করেন?

পাই বা না-পাই সেটা জানা আপনার পক্ষে কি খুব দরকারী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু দরকারী বৈকি? সরকারী সাহায্য যদি পান, তবে অবশ্য দরকার নেই। যদি না পান, তবে আমি হয়তো আপনার সামান্য কাজে লাগতে পারি। মানে, আমি আপনাকে কাজ দিতে পারি।

কাজ দিতে পারেন? কি কাজ?

ভদ্রলোক এবার গলার স্বর আরও মোলায়েম করে বললেন: আমারই কারখানায়। তবে আসুন না, বাইরে গিয়ে কোন ভাল রেষ্টুরেন্টে বসে বিশদভাবে সবটা বুঝিয়ে বলি।

সুধা কঠিন গলায় বলল: না। যা বলবার এখানে দাঁড়িয়েই সংক্ষেপে বলুন। কারখানায় মেয়েরা কাজ করে? সে-কারখানা কিসের? সে কাজ কী ধরণের?

কিছু না। খুব সাধারণ ব্যাপার। কাজও খুব সহজ। শুধু সন্ধ্যার দিকে তিন চার ঘণ্টা ডিউটি। দু'জন চারজন ভদ্রলোক আসবেন। তাদের একটু আদর-আপ্যায়ন করা এই পর্যন্ত।—এমন আলগোছে ভদ্রলোক বললেন যে, চা খাওয়ার চেয়েও যেন সে-কাজ সহজ।

কারখানায় ভদ্রলোকদের আদর-আপ্যায়ন করতে হবে? কেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ! আর সেজন্য তারা পয়সাও দেবেন। মোটা পয়সা! কী ভাবে কী করতে হবে কাজে নামলে বুঝতে পারবেন। কাজ শিখিয়েও দেওয়া হবে।

কিন্তু ভদ্রলোক বড্ড বেশী বলে ফেলেছিলেন। সুধা বুঝতে পারল। সুধা যথেষ্ট চেষ্টা করে রাগ চেপে রেখে বলল: বুঝতে আমি আগেই পেরেছি মশাই। সামান্য কথাটা বুঝতে পারব না, অমন বোকা মেয়ে পাননি আমাকে। যাক্, এবারের মত ক্ষমা করলাম আপনাকে। আর কখনো যদি আমার সামনে আসেন, তবে পুলিশে দেব মনে রাখবেন।

ধরা পড়ে গিয়ে ভদ্রলোক এতটুকু অপ্রতিভ হলেন না। বললেন: খুব মনে রাখব। তবে কী জানেন, বুঝতে পারলে সব মেয়েই ওরকম বলে প্রথমটায়। একটা শুধু অনুরোধ, যদি কোনদিন মনে করেন যে ফাঁকা নীতির

বুদ্ধির চেয়ে টাকার ওজন বেশী, তবে এ অভাগার কথা মনে করবেন। অভাগাকে যে-কোন দুপুরে এই অফিসের সামনে পাওয়া যায়। বলে ভদ্রলোক হন্ হন্ করে হেঁটে অন্যদিকে চলে গেলেন।

সুধা নিজের নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির জন্য গর্ব বোধ করল। কোন অভিজ্ঞতা নেই; তবু কী রকম ধরে ফেলেছে সে লোকটিকে চট করে। কিন্তু সুধা হঠাৎ রেগে গেল কেন লোকটির উপর? আশ্চর্য তো! এটা তো একটা তৈরী পরিচিত ব্যবসা। তার কাছে অপরিচিত হতে পারে, কিন্তু একটা পরিচিত ব্যবসা করছেন ভদ্রলোক জীবিকার প্রয়োজনে। সমাজ স্বীকার করে এ ব্যবসাটিকে। তার জন্য ভদ্রলোকের উপর রাগ করার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে?

সামান্য ঘটনাটিকে সুধা তক্ষুণি তার মন থেকে নির্বাসনে পাঠালো। বাইরের কাজ করতে নামলে, মেয়েদের অনেক বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। তা নিয়ে ভাবনা করলে চলে?

কিন্তু ট্রাম স্টপের সামনে এসেই সুধার মাথায় রক্ত উঠে গেল। যে-ট্রামটা এইমাত্র ছেড়ে দিল, তাতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তারই একটি চেনা লোক উঠে পড়ল যেন? না, কোন ভুল হয়নি। ধরণীবাবুই তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়েছেন ট্রামে।

আশ্চর্য! রুগ্ন মানুষ, নড়লে চড়লেও কষ্ট বাড়ে; অথচ, তাকে কোনদিন পায়নি, কোনদিন পাবেও না, এ কথা জেনেও সে-পুরুষ নিজের শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও গোয়েন্দার মত তাকে এখানে অনুসরণ করে কোন্ সাহসে? সেই মেয়ের দালালটি আর এই ধরণীবাবুর মধ্যে কোথাও কোন মিল আছে কি?

পনেরো

দু'বার চেষ্টা করার পর রাত প্রায় ন'টার সময় সন্তোষবাবুকে ধরতে পারল অটল।

চেতলার একখানা সুদৃশ্য দোতলা বাড়ীর দ্বিতলস্থ খান চারেক কোঠা নিয়ে সন্তোষবাবুর ছোট্ট পরিচ্ছন্ন বাসাটুকু। সেক্রেটারিয়েট টেবিল, রেডিও, আয়না-লাগানো আলমারী, বিদ্যুৎ-চালিত পাখা, একখানি ভারত মাতার কোলে মহাত্মা গান্ধীর ছবি এবং একখানি প্রায়-নগ্ন হাস্য-মুখরা মেমের ছবি, —ইত্যাদি মিলিয়ে বৈঠকখানা ঘরটি চমৎকার সুসজ্জিত। ঘরখানি দেখেই সন্তোষবাবুর প্রতি ভক্তি জাগ্রত হ'ল অটলের।

গেরুয়া রঙের খদ্দরের পায়জামা পরে সন্তোষবাবু গম্ভীরভাবে এসে অটলের কাছ থেকে কল্যাণবাবুর দেওয়া চিঠিখানা গ্রহণ করলেন। চিঠিখানা দেখেই সন্তোষবাবুর মুখ আলোকিত হয়ে উঠল। পত্র-লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার স্বীকৃতি-জ্ঞাপক সন্তোষবাবুব ভারিক্কি চালের হাসিটি ভারী ভাল লাগল অটলের। বড় মানুষেরা এইরকমের মাত্রা বজায় রেখেই তো হাসে।

দরখাস্ত করেছেন?—সন্তোষবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোন্‌টায়? সেণ্ট্রাল না প্রভিন্সিয়ালে?

প্রভিন্সিয়ালে। দেড় হাজার টাকা চেয়েছি।

মাত্তর? কেন, মোটামুটি কিছু বের করে নিতেন। গৌরী সেনের টাকা তো।

শোধ দিতে হবে বলেই তো ভয়।

আইন-কানুন সম্বন্ধে অটলের সুগভীর অজ্ঞতা দেখে সন্তোষবাবু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন।

টাকা পাওয়ার জন্য তো আপনাকে বছরখানেক দেরী করতে হবে।

অটলের ম্খ শুকিয়ে গেল।

অতদিন লাগবে?

আরও বেশী লাগবারই সম্ভাবনা বেশী। তবে আমি আপনাকে তিন মাসের মধ্যে পাইয়ে দিতে পারি যদি কিছু খরচা করেন।

কি রকম খরচা লাগবে সন্তোষদা?

মানে, কাগজে কলমে দেড় হাজারই থাকবে। তবে পাবেন তেরোশো। আপনি কল্যাণের লোক। আমি এক পয়সাও নেবনা। কিন্তু আমলাদের দিতে হবে।

অটল তাইতেই রাজী হয়ে গেল। তার তাড়াতাড়ি দরকার। ঘর একখানা-ভাড়া নিয়ে বসে আছে সে আশায় আশায়। টাকা পেতে দেরী হলে তো ভাড়া গুণতে গুণতেই ফতুর হয়ে যাবে সে।

একখানা দোকান ঘর দেখাতে হবে কিন্তু।—সন্তোষবাবু আবার বললেন।

ছোট একটা চালা ঘর ভাড়া নেওয়া আছে আমার।

ভাড়া নিতে হয় না। অন্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেও দেখিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু আমার তো ঘর লাগবেই।

সন্তোষবাবু বুঝতে পেরে বললেন: ও। আপনি যে-ব্যবসার জন্য টাকা চাইছেন, সেই ব্যবসাই করবেন তবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন—সবাই কি তাই করে না?

না। আজকাল যে-সব ব্যবসায়ে লাভ, তার খবর গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া যায় না। তাছাড়া, জানিয়ে যাদ ব্যবসা করেন, তবে তো টাকা শোধ না দিয়ে পারবেন না।

আশ্চর্য! তবে কি টাকা শোধ দেওয়ার পথ খোলা রাখাটা নির্বোধের কাজ বলে মনে করেন সন্তোষবাবু?

সন্তোষবাবু কী সব কাগজপত্তরের দিকে মন দিলেন। আর সেই অবকাশে অটল ভাবতে বসল। এত সুখ কী অটলের কপালে সইবে? সত্যিই কি সন্তোষবাবু তার জন্য টাকা বের করে দিতে পারবেন? আর সে হতে পারবে একটি দোকানের মালিক! আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র নয়, তটিনীর মিথ্যে সান্ত্বনা মাত্র নয়, সত্যিকারের চোখে-দেখা-যায় এমন দোকানের মালিক? ফেরিওলা অটল হবে দোকানদার?

এমন সময় নিখুঁত স্যুট-পরা নিখুঁত চেহারার এক ভদ্রলোক সস্মিত মুখে ঘরে এসে ঢুকলেন। সন্তোষবাবু তৎক্ষণাৎ বিগলিত হাস্যে উঠে গিয়ে ভদ্রলোকের হাত ধরে এনে বসালেন। অতঃপর অটলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দুই বন্ধু গুরুতর ব্যবসায়িক আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেলেন। অটল নিজের প্রয়োজন ভুলে গিয়ে রুদ্ধ-নিশ্বাসে শুনতে লাগল। আলাপ চলল বাড়ি আর জমির কারবার নিয়ে। কোন্ এক বোকচন্দ্রের থেকে তাঁরা একখানা বাড়ির দর পঁচিশ হাজারে চুক্তি করে এক হাজার টাকা বায়না দিয়ে রেখেছেন। এক মাড়োয়ারী নাকি আজ পঞ্চাশ হাজার দর দিয়েছে বাড়িটার জন্য, আগন্তুক ভদ্রলোকটি জানালেন। তাঁর ইচ্ছে, বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে টাকাটা হাতে করলে হয়। সন্তোষবাবু অন্ততঃ ষাটের কমে রাজী হতে চাইলেন না। চোরাই মাল নয় যে চোরাই মালের দামে দিতে হবে।

তারপর আলোচনা গড়িয়ে চলল ঢাকুরিয়া কলোনী সম্পর্কে। অর্থাৎ বিঘা ত্রিশেক জায়গার একটি প্লট বারোশো টাকা করে বিঘে দরে কিনে মালিককে তিন হাজার টাকা বায়না দিয়ে আটকিয়ে রেখে তাঁরা এখন দু'হাজার টাকা কাঠা হিসেবে খণ্ড খণ্ড প্লটে বিক্রি করছেন জায়গাটা। বিভিন্ন ক্রেতার কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা অগ্রিমও নিয়েছেন তাঁরা। এখন সমস্যা দাঁড়িয়েছে, মূল মালিককে জমির দামটা শোধ করে দিয়ে জায়গাটা নিজেদের নামে করে নেওয়া দরকার! অন্ততঃ হাজার বিশ পঁচিশ টাকা এক্ষুণি দরকার—ভদ্রলোক চিন্তিত বিষণ্ণ মুখে জানালেন। পূর্বোক্ত বাড়িটা বিক্রি করে তার লাভ থেকে অবিশ্যি এ টাকাটা হয়ে যায়। কিন্তু সেটা তো এখন ঘরের টাকা। ঘরের টাকা দিয়ে ব্যবসা করাটা নীতির দিক দিয়ে নাকি বাধে।

ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন: একমাসের মধ্যে জায়গাটা বিক্রি হয়ে যেত সন্তোষবাবু! জায়গা জায়গা করে বাঙালরা যা ক্ষেপেছে! মরার জন্যও নাকি তাদের একখানা নিজস্ব বাড়ি দরকার।

সন্তোষবাবু মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হেসে বললেন: সেণ্ট্রালের লোন একটা বার করে ফেলুন না কেন মিষ্টার চৌধুরী? আমার যে কচু ওদিকে হাত নেই।

হাত আমার যথেষ্ট আছে সন্তোষবাবু। দিল্লী অবধি ধাওয়া করতে

পারব। কিন্তু একটি অনুগত সত্যিকারের রিফিউজী চাই যে। গায়ের চামড় পাল্‌টিয়ে নিজেরা রিফিউজী তো সাজতে পারবো না কোনক্রমেই।

তার জন্য ভাববেন না,—সন্তোষবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন: আমি ভার নিচ্ছি। এই তো ইনি আছেন একজন রিফিউজী। কী বলেন অটলবাবু? আপনার নামে হাজার ত্রিশেক টাকার একখানা দরখাস্ত ঠুকে দিই? কিছু পেয়ে যাবেন আপনিও।

পরিকল্পনার অভিনবত্বে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অটল। তবু নিজেকে হারিয়ে ফেলল না সে। বলল: না—না, সন্তোষদা, আমাকে জড়াবেন না। আমি বোকা-সোকা সামান্য মানুষ!

অনেক অনুরোধ উপেক্ষা করে অটল বিদায় নিয়ে ফিরে এল।

ফেরার সময় উত্তেজনায় অটলের মাথা দপ্‌ দপ্‌ করতে লাগল। যেন সন্তোষবাবুদের দুঃসাহসিক পরিকল্পনাটা তারই! কী অসাধারণ ব্যবসায়ী বুদ্ধি সন্তোষবাবুর আর ঐ সুন্দর ভদ্রলোকটির। ঘর থেকে একটি পয়সাও বের না করে হাজার হাজার টাকা উপার্জনের কী অনায়াস আয়োজন! অটলের নিজেরই সগোত্র উদ্বাস্তদের মাথায় কাঁঠালটা ভাঙা হচ্ছে বলে অবশ্য মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। কিন্তু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সত্যযুগের কল্পনা নিয়ে আর কে বসে থাকে? এই সন্তোষবাবুরা আজকে ষাট হাজার টাকা দামে পরের বাড়ি বিক্রি করছে। কিন্তু আর বছর দুই পরে তাঁর নিজেরই অমন দু'-চারখানা বাড়ি থাকবে এ তো দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে অটল। ভাবতে ভাবতে অটলের গায়ে রোমাঞ্চ হল—যেন সন্তোষবাবুর বাড়িগুলোর আসলে সেই মালিক হবে।

কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র-জালের পুতুল অটল হবে না। সামান্য মানুষ সে।

হায়রে বোকা-বোকা নেহাৎ-ই সামান্য মানুষ অটল! বিধাতার মনের ভুলে পৃথিবীর ভার-বৃদ্ধি করতেই যার জন্ম!

কিন্তু এ-জন্য সামান্য একটু ক্ষোভ মনে জাগলেও অটল আজকে ভারী খুশী! সন্তোষবাবুর সাহায্যের আশ্বাস পাওয়ার ফলে তার এতদিনকার স্বপ্ন সফল হবে বলে আজকে আশা করতে পারে সে। পাকিস্তান থেকে এসে হীন ফেরীওয়ালার কাজ শুরু করে অবধি একটি ছোট-খাট দোকানের মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে সে। আলস্যে বা বাজে কাজে সে এক মিনিট

সময় নষ্ট করেনি। রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়ির নিরবচ্ছিন্ন আড্ডাগুলির মধ্যে কোনটিতেই কোনসময়েই তাকে দেখা যায় না। এমন-কি পুলিশী অভিযানের সময় বাসস্থান অনিশ্চিত হয়ে গেলে পর চিন্তিত হ'লেও সে তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। ব্যাপারটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজের নিয়মিত কাজ নিয়ে মত্ত ছিল। কিন্তু এত পরিশ্রম এবং কৃচ্ছ্র সাধন করেও হাতে উদ্‌বৃত্ত থাকেনি প্রায়ই। এবং যতই দোকান ঘরের কল্পনাটি সে অবাস্তব অলীক স্বপ্ন বলে বুঝতে পেরেছে, ততই দোকানদার হওয়াটা জীবনের দুর্লভতম সার্থকতা বলে বোধ হয়েছে তার কাছে। সত্যিই কি সে আজ সেই দুর্লভ সার্থকতার দ্বারদেশে উপনীত হয়েছে? ভরসা করে ভাবতেও যে ভয় করে!

ষোল

মনোরমা সহজে ছাড়লেন না। কল্যাণবাবুর বর্তমান কর্মপন্থার ভ্রান্তিটা আরও ভাল করে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করার জন্য তিনি অমলেন্দুর কাছে গেলেন তাঁর মেস অবধি ধাওয়া ক'রে। জানাই ছিল, দুপুরের আগের দিকে দশটা এগারটার সময় অমলেন্দু সাধারণতঃ মেসেই থাকেন।

অমলেন্দু উপুড় হ'য়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। মনোরমাকে দেখে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

আরে বাপরে! বৌদিকে দেখছি কেন এমন পাণ্ডব-বর্জিত দেশে? না-কি চোখে ভুল দেখছি?

তামাসা রাখুন ঠাকুরপো। বিশেষ দরকারে এসেছি।—মনোরমা ক্লিষ্ট হেসে অমলেন্দুর উচ্ছ্বাসে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন।

তা বুঝতে পেরেছি,—অমলেন্দু বললেন। না হলে কি আর বৌ-মানুষ সহজে পুরুষের দেশে পা বাড়িয়েছেন? কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো বৌদি?

ব্যাপার আবার কি? আপনার বন্ধুকে সামলান এবার আপনি। আমি হার মেনেছি।

বলেন কি? আপনি হার মেনেছেন? কেন? তার কণ্ট্রাক্টরীর কী হ'ল?

সে-ভূতটা ঘাড় থেকে নেমেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা ভূত চেপেছে এবারে। ব্যাপারটা খুলে বলি শুনুন। আপনার বন্ধু আরও দশ বারো জনকে সঙ্গে নিয়ে এবার এক লক্ষ টাকা উদ্বাস্তু-ঋণের জন্য দরখাস্ত করছেন। বোস সাহেব না কে তাঁব এক পরম উপকারী বন্ধু আছেন, তিনি কোলিয়ারীর প্ল্যান্ দিয়েছেন। তাই করা হবে।

ভালই তো। কোলিয়ারীর মালিকের বৌ হতে আপনার আপত্তি কেন বৌদি?

গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবেন পরে ঠাকুরপো। বুঝুন ব্যাপারটা ভাল করে। আমি এত করে বলছি যে ওসব বৃহৎ ব্যাপারে যেওনা বাবু শুধু সময় আর পরিশ্রম নষ্ট হবে। তা ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে দু' মাসের মধ্যে টাকা পাওয়া যাবে আর তিন মাসের মধ্যে কোলিয়ারী চালু হয়ে যাবে। আদর্শ কোলিয়ারীতে শ্রমিকদের মুনাফার কত অংশ দেওয়া চলবে তাই নিয়ে রাত-দিন আঁক কষা চলছে এখন!

চিন্তার কথা বৌদি।—অমলেন্দু এবার গম্ভীর হলেন: কল্যাণ আবার সব উদ্ভট কল্পনা নিয়ে মেতেছে! কী জানেন, বর্তমান দুনিয়াটা এমন জটিল হয়ে উঠেছে যে, কোন উদ্বাস্তুর পক্ষে মাথা ঠিক রেখে ঠিক পথ বেছে নেওয়া বড় দুষ্কর।

দুষ্কর শুধু আপনার বন্ধুর বেলায়। হাজার হাজার লোক কিন্তু বেশ কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। শুনুন, যে-জন্য আপনার কাছে এসেছি,—আপনি একটু ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানুন কত দিনে, কি কি শর্তে সরকার ঋণ দিয়ে থাকে এবং তাই দিয়ে বন্ধুকে বুঝিয়ে বলুন যে অত বড় লোন্ পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

তা আমি নিশ্চয়ই করবো বৌদি। কিন্তু কল্যাণ কি শুনবে আমার কথা? কিন্তু আপনি উঠবেন না বৌদি। চা না-খাইয়ে ছাড়ব না আমি।

চা খাওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করলেন না মনোরমা।

মনোরমা চলে যাওয়ার পর অমলেন্দু চিন্তিত হলেন। কল্যাণকে নিয়ে সত্যিই পেরে ওঠা যাচ্ছে না। বাস্তব আর আদর্শের মাঝখানে যে একটা বিরাট ফাঁক আছে এটা যে বোঝে না, তার জীবনে বিপদ অনিবার্য। মানুষটা এমন আশ্চর্য যে বার বার ঠোক্কর খেয়েও কিছু শিখছে না। সমস্যা-জর্জরিত সরকার যা কিছু করছেন তা শুধু সমস্যাগুলোকে, সাময়িকভাবে চাপা দেওয়ার জন্য। আর আদর্শবাদী কল্যাণ সরকারের প্রতিটি ব্যবস্থার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। বলা যায় না, কল্যাণ হয়তো উদ্বাস্তু-ঋণ দেওয়ার সরকারী পরিকল্পনার মধ্যেও সমাজতন্ত্রবাদের গন্ধ পাচ্ছে।

যে-কোন সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকেও বুঝতে পারে যে, সরকারের সামনে কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য নেই। ঘরে-বাইরে সরকারের শত্রু। ঘরের শত্রুই বেশী মারাত্মক। উপদলীয় স্বার্থ ও চক্রান্ত এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি

ও দীর্ঘসূত্রতার কাঁচি-কলে পড়ে সরকার শুধু গা বাঁচাতে চাইছেন। কোন সমস্যার সমাধান না হয় না হোক। লোকের কাছে সরকার প্রমাণ করবেন যে, তাঁদের চেষ্টায় ত্রুটি নেই। তাঁরা কাগজে কলমে দেখিয়ে দেবেন যে উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু টাকা খরচ হয়েছে। সে টাকার কতটুকু অংশ প্রকৃত উদ্বাস্তুদের হাতে পড়ল, যে দীর্ঘসূত্রতার ভিতর দিয়ে যে সামান্য টাকা তাদের দেওয়া হ'ল, তাতে কতটুকু কাজ হওয়া সম্ভব ; তা সরকারের দেখার দরকার নেই। বুদ্ধিমান লোকেরা তাই সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে নেই ; তারা সুযোগ খুঁজছে। সুযোগ পেলে সরকারের উপর কিছু 'বাণিজ্য' করে নেবে।

কিন্তু কল্যাণ আশ্চর্য ! সে নিজে নিজে কোন ব্যবসা আরম্ভ করবে না। বা নিজের জন্য কোন চাকরি খুঁজবে না। পাছে সরকারী টাকা মঞ্জুর হলে ব্যক্তিগত ব্যবসা বা চাকরির সঙ্গে পরিকল্পিত ব্যবসায়ের বিরোধ বেঁধে যায় ! কল্যাণ ভাবছে, পরিকল্পনা পেশ করতে যত দেরী হয়, সরকারের হাজারখানেক দপ্তর ঘুরে টাকা আসতে ততটুকু দেরীও হবে না।

এমন লোক কেন বিয়ে করে ? কেন তার ছেলে-মেয়ে হয় ?

আর এমন একটি অসম্ভব চরিত্রের মানুষের জন্য অমলেন্দু কেন চেষ্টা করবেন ? চেষ্টা করে কোন ফল হবে না জেনেও, শুধু চেষ্টা করা উচিত ভেবে কেন চেষ্টা করবেন ? কল্যাণ তাঁর বন্ধু বলে ? কিন্তু কল্যাণ কোন্ অর্থে তাঁর বন্ধু ? যে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাস করে, যে তাঁর আন্তরিক সুপরামর্শকে শত্রুপক্ষের কুপরামর্শ বলে জ্ঞান করে, সে কি তাঁর বন্ধু ?

চিন্তা করতে করতে অমলেন্দু উঠে খাওয়া-দাওয়া সারলেন। চিন্তা করতে করতেই রওয়ানা হলেন পত্রিকার অফিসের দিকে। অফিসে যা কাজ আছে তা সারতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। আজকের দিনটা অমলেন্দুবাবুর পক্ষে খুব কর্মভারাক্রান্ত। অফিস থেকে বেরিয়েই তাঁকে কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে রিপোর্ট আর তথ্য সংগ্রহের জন্য।

অফিসের কাজ শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন অমলেন্দুবাবু। মনের মধ্যে আবার সেই পুরোনো অন্তর্দ্বন্দ্বটা অনুভব করলেন। কেন তিনি কল্যাণবাবুর জন্য করবেন ? কিছু হবেনা জেনেও একজন ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী লোকের জন্য কেন করবেন ?

প্রশ্নের জবাব না পেলেও অমলেন্দুবাবু সার্কুলার রোডে এসে আটের বি রুটের একটা বাস ধরলেন। উদ্দেশ্য যাদবপুর যাওয়া। যাদবপুরের একটা উদ্বাস্তু সংস্থার অফিসে তাঁর একজন খুব পরিচিত লোক আছেন। উদ্বাস্তুদের সমস্যার সঙ্গে ভদ্রলোক ঘনিষ্ঠভাবে জাড়ত। তাঁর কাছে গেলে নির্ভরযোগ্য খবর পাওয়া যাবে।

কলকাতায় বর্ষা শুরু হয়েছে। পুরো বর্ষা না নামলেও আকাশে মেঘের আনাগোণার বিরাম নেই। মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত আর পিচ্ছিল করে দিচ্ছে। এ সেই জাতের বৃষ্টি, যার জন্য কোথাও আশ্রয় নিয়ে সময়ক্ষেপ করতে মন সায় দেয় না; অথচ বৃষ্টি মাথায় করে চলতে গেলে জামা ভিজে যায়, মাথার চুল ভিজে যায়।

অমলেন্দুবাবু যখন বাস থেকে নামলেন তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। বয়স্ক সাবধানী লোকেরা ছাতি মাথায় দিয়ে চলেছে, আর ছাতিহীনদের অস্বস্তি লক্ষ্য করে মনে মনে, পরম আত্মসন্তুষ্টি লাভ করছে। কয়েকটি ইস্কুলের ছেলে ছোটাছুটি করে বৃষ্টিতে ভিজছে। বৃষ্টিতে ভেজাটাই তাদের উদ্দেশ্য এবং বোধকরি জামা ভিজিয়ে নিয়ে মাষ্টারমশায়ের কাছে ছুটি চাইবে।

বৃষ্টি দেখে অমলেন্দু বিরক্তি বোধ করলেন। সামান্য সামান্য বৃষ্টি; কোথাও দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করার অজুহাত নেই। অথচ বৃষ্টির মধ্যে চললে জামার ইস্ত্রিটা নষ্ট হবে, জুতোয় কাদা লাগবে। শরীরটায় যত ড্যাম্প লাগবে, মনটাও তত স্যাঁৎসেঁতে বোধ হবে। এই বিরক্তিকর অবস্থার জন্য দায়ী কল্যাণ! হতভাগা কল্যাণ!

ভিজে ভিজে নির্দিষ্ট অফিসে গিয়ে লোকেশবাবুকে পাওয়া গেল। লোকেশবাবু অমলেন্দুকে অভ্যর্থনা জানালেন।

আসুন অমলেন্দুবাবু। ঈস্! একেবারে ভিজে গিয়েছেন যে!

কি করব—বাইরে জল হচ্ছে যে! বর্ষাকাল তো বোঝে না যে বর্ষার দিনেও মানুষের কাজ থাকে।

তাহলে আপান কাজ নিয়ে এসেছেন? তাই তো বলি, অমলেন্দুবাবু কি আর এমনি এমনি আসবেন গরীবের আড্ডায়?

আসতে পারলে খুশী হতাম। সময় পাই না।

কথাটা কি সত্যি? অমলেন্দুবাবু কি জজসাহেবের বাগান বাড়িতে বিনা প্রয়োজনে গিয়ে সময় নষ্ট করেন না?

লোকেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন: কী কাজ? কাজের কথাটাই আগে হয়ে যাক্।

অফিস বলতে একটা তক্তাপোশের উপর সতরঞ্চি বিছানো রয়েছে। যত কাগজপত্র সব তার উপর। টেবিল চেয়ারের বালাই নেই। অমলেন্দু তক্তাপোশের একপ্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসলেন।

উদ্বাস্তুদের যে সরকার ঋণ দিচ্ছেন, সে সম্পর্কে কিছু খবর বলুন লোকেশবাবু।

জানেন না কিছু? আপনি তো জার্নালিষ্ট।

জানি কিছু কিছু। আপনার কাছ থেকে সঠিকভাবে জানতে এলাম।

তথ্য কি তত্ত্বকে ছাড়িয়ে যেতে পারে? বর্তমান সরকার এ ধরণের সমস্যার কখনোই সমাধান করতে পারে না। যা আগেই জানতাম, তাই কাজে পরিণত হতে দেখছি।

লোকেশবাবু সব-জান্তার হাসি হাসলেন। এ-ধরণের ঋষি-দুর্লভ মনোভাবটা অমলেন্দুর ভাল লাগে না।

কী দেখছেন?

আমার অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে পঞ্চাশ একশ'জন ঋণের জন্য দরখাস্ত দিয়েছে, তাদের মধ্যে একজনও এখনো ঋণ পায় নি।

পাবে হয়তো। মাত্র তো কয়েক মাস হ'ল পরিকল্পনাটা চালু হয়েছে।

শুরু দেখেই শেষটা বোঝা যায়। কিছু হবে না। গৌরী সেনের টাকা কিছু নষ্ট হবে। তা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়।

লোকেশবাবু আবার বিজ্ঞের হাসি হাসলেন। এ ধরণের কথা অমলেন্দুর ভাল লাগে না। বাস্তব সম্পর্কে এত সহজে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় বলে তিনি বিশ্বাস করেন না।

সরকারের উদ্দেশ্যের কথা বলবেন না। সরকার একটা যন্ত্র। তার কোন উদ্দেশ্য নেই। আমাদের যন্ত্রটা খারাপ, ঘুন লাগা, তাই খারাপভাবে কাজ চলছে। যন্ত্রটাকে ভাল করে মেরামত করে নিলে আর একটু ভাল কাজ হতে পারত।

বুঝতে পারছেন না কেন অমলেন্দুবাবু।—লোকেশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন: যে যা হচ্ছে তা ছাড়া অন্যরকম কিছু হতে পারত না! এটা ইতিহাসের বিধান।

তর্ক লাগার উপক্রম হয়েছে দেখে অমলেন্দু কৌশলে প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। সরকারের ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যা যা জানার জেনে নিলেন। বুঝতে পারলেন, সরকারের কর্মকর্তাদের কোন সদিচ্ছা নেই, কোন মনুষ্যত্ব নেই এ-কথা হয়তো ঠিক নয়। তাদের শুধু একটা বোধ নেই,—সময়ের বোধ। যে লোক অনাহারে আছে তাকে আজই খাদ্য দেওয়া দরকার। দু'মাস পরে তার খাদ্য বরাদ্দ করলে সে-খাদ্য কবরখানায় পৌঁছে দিতে হবে। তা ছাড়া, অত্যন্ত বিরক্তিকর এদের কাগজ-পত্রের প্রতি ভক্তি। টাকার নিরাপত্তার জন্য আইনের বজ্র আঁটুনি লাগানো হচ্ছে, অথচ গোড়াটা যে ফস্কা তা নজরে পড়ছে না।

কিন্তু বর্তমান সরকারের দ্বারা এ ছাড়া আর কিছু হতে পারত না, অমলেন্দু তা বিশ্বাস করলেন না। এই বিজ্ঞানের যুগে যে-কোন আদর্শের সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে, একটা খণ্ড সমস্যার মীমাংসা করতে পারে। দেশটা জার্মানী বা আমেরিকা হলে তারা এতদিনে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করে ফেলত।

সঙ্গে সঙ্গে অমলেন্দুবাবুর মনে হল, তাঁর অনেক সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে তাঁর মনের একটা গরমিল যেন ধরা পড়েছে। তারা বড্ড বেশী সরলরেখায় চিন্তা করে। কিন্তু জীবন এত সরলরেখায় চলে বলে তিনি মানতে রাজী নন।

লোকেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন: এত খবর নিচ্ছেন কার জন্যে?

আমার এক বন্ধুর জন্যে।

আমাদের নীতির সমর্থক?

না।

সমর্থক হবেন বলে আশা আছে!

তা-ও নেই।

লোকেশবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

দেখুন অমলেন্দুবাবু, আমি শুনেছি, আপনি অনেক বাজে লোকের সঙ্গে মেশেন, এমন কি বিরুদ্ধ মতবাদের লোকের সঙ্গেও। সময় সময় এজন্য নিজের কাজেরও ক্ষতি করেন। এসব কিন্তু ভালো নয়।

আমার পক্ষে কোন্‌টা ভালো, আর কোন্‌টা ভালো নয় তা বোঝার মত বয়স আমার হয়েছে লোকেশবাবু।—বলে অমলেন্দু উঠে পড়লেন।

ফিরতে ফিরতে অমলেন্দুবাবু তাঁর প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন। কল্যাণের জন্য এটুকু কষ্ট স্বীকার করে ভালই করেছেন। কোন ফল হবে না জেনেও বন্ধুর জন্য এটুকু করা উচিত। মানুষ যে যে-কোন আদর্শ বা নীতির ঊর্ধ্বে, এ বোধটুকু না আসা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কোন মহৎ দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত হয় না।

একদিন পরেই অমলেন্দু সকালের দিকে কল্যাণবাবুর ঘরে এসে হাজির হলেন।

কল্যাণবাবু খবরের কাগজ পড়ছিলেন। নিজের কেনা কাগজ নয়, সুধীনবাবুর ঘর থেকে আনিয়ে নেওয়া। যথারীতি কলকণ্ঠে অমলেন্দুকে আহ্বান জানালেন কল্যাণবাবু।

সূর্য আজকে পশ্চিম দিকে উঠেছে কিনা ছাখ্‌ তো রে দেবু।

দেখতে হবে না। আমি দেখে এসেছি! তোমার অনুমান ভুল। সূর্য পূবদিকেই উঠেছে।

ইতিমধ্যে অমলেন্দুর সাড়া পেয়ে মনোরমা রান্নাঘর থেকে এ ঘরে এসে উপস্থিত হলেন।

তবে বোধকরি পথ ভুলে এসে পড়েছ এদিকে?—কল্যাণবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

অমলেন্দু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন: আমি তো তবু পথ ভুলে মাঝে মাঝে আসি কল্যাণ! আমার ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার কিন্তু পথ ভুলও হতে দেখলাম না কখনো।—তারপর মনোরমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন: আপনি যা বলেছিলেন, সে-সম্পর্কে আমি খোঁজ নিয়েছি বৌদি। অবশ্য কিসে যে কি হবে তা এখানকার অফিসারেরাও কিছু জানে না। দিল্লীর ব্যাপার কিনা। তবে যতদূর বুঝলাম, তাতে আপনার অনুমানই ঠিক বলে মনে হ'ল। ঋণ দেওয়ার পথটা একটা বিরাট গোলকধাঁধা বিশেষ। ঘুরে আসতে দু' তিন বছর লেগে যাবে অনায়াসে। তা ছাড়া, যে যে-রকম দরের লোক, তাকে সেই রকম টাকাই দেওয়া হবে। লক্ষপতিরাই লাখ টাকা ঋণ পাওয়ার অধিকারী।

কল্যাণবাবুর মুখের হাসি ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। মনোরমার দিকে তাকিয়ে বললেন : এই খবরের জন্য তুমি অমলেন্দু অবধি ধাওয়া করেছ রমা?

মনোরমা বললেন : না করে উপায় কি? তুমি তো শুনবে না আমার কথা। এখনো যদি তুমি আলেয়ার পিছনে ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট কর তো এর পরে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দাঁড়ানোর মত বটগাছের ছায়াও তুমি পাবে না। লক্ষ লক্ষ লোককে ছায়া দিতে পারে, এত বটগাছও এদেশে নেই। আসল খবর শুনলে তো ঠাকুরপোর মুখে? এবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে পথ ঠিক কর।

শোন রমা, পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যেস আমার কম। আর অমলেন্দু, তুমি বোধ হয় এটুকু স্বীকার করবে যে, দেশ যারা চালায়, তোমার আমার থেকে বুদ্ধি তারা একটু বেশী রাখে। তারা ভালই জানে, দরখাস্ত দিয়ে আশায় আশায় দু-তিন বছর বসে থাকার ক্ষমতা উদ্বাস্তুদের নেই। দু'তিন বছরে পৃথিবী উল্টিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় আজকালকার দিনে।

অমলেন্দু জবাব দিলেন : এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না কল্যাণ। শুধু এটুকু বলতে পারি, একটি অতি সাধারণ চাষীবৌয়ের বুদ্ধিও যদি সরকারের থাকত, তবে দেশটা হয়তো বেঁচে যেতে পারত। সে কথা থাক। তুমি বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে মোটা ঋণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরখাস্ত দিচ্ছ,—দাও। আপত্তি করব না। কিন্তু সেই সঙ্গে ছোট-খাটো কোন ব্যবসায়ের প্ল্যান নিয়ে অল্প টাকার জন্য প্রাদেশিক কেন্দ্রেও একটা দরখাস্ত দাওনা কেন? স্থানীয় ব্যাপার, তদ্বির করে তাড়াতাড়ি টাকা বের করতে পারবে।

তবে আসল কথা বলব অমলেন্দু—শুন্‌বে? হাসাহাসি চলবে না কিন্তু আগেই বলে রাখলাম। এই ক' মাসের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে পেরেছি, বিধাতার অভিপ্রায় নয় যে আমি ছোট-খাটো কোন কাজ করি। ঈশ্বর আমাকে দিয়ে এমন কিছু করিয়ে নিতে চান, যার ভিতর দিয়ে আমার একার নয়, আরও বিশ-পঞ্চাশ জন লোকের উপকার হয়। তোমরা নাস্তিক মানুষ, এ-কথা হেসে উড়িয়ে দেবে জানি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যাব না এ নিশ্চিত।

কল্যাণবাবু তো গম্ভীরভাবেই কথাগুলো বললেন, কিন্তু অমলেন্দুকে কষ্ট

করে হাসি চাপতে হল। এর পরে এ নিয়ে কথা বলতে গেলেই সেটা অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়াবে। তাতে লাভও কিছু হবে না। অমলেন্দু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রসঙ্গান্তরে গেলেন।

অমলেন্দু বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর কল্যাণবাবু মনোরমার উপর রাগে ফেটে পড়তে চাইলেন!

ঘরের ব্যাপার নিয়ে তুমি শেষে অমলেন্দুর কাছে গিয়েছিলে সালিশ মানতে?

ঠাকুরপো কি আমাদের পর? মনোরমা আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন?

বেছে বেছে খুব ভাল আপনার লোক বের করেছ রমা!

এ-কথা তুমি আমাকে বলতে পারো না কখনো। আমি কোন দিন চিনতাম তোমার বন্ধুকে? তুমিই তাকে ঘরে নিয়ে এসেছ; আপনার জনের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করেছ তাকে। নিজের ঘরে জায়গা দিয়ে রেখেছো কতদিন! আজ আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?

মানুষ কি চিরকাল একরকম থাকে কখনো? কী জানো তুমি মানুষের চরিত্রের? এতকাল অমলেন্দু ছিল আলাদা মতের মানুষ, আজকে সে বিরোধী পক্ষ। আমি কোন ব্যাপারে অপদস্থ হলে সে এখন আনন্দে হাততালি দেয়। অমলেন্দুকে ডেকে এনে কী অপদস্থই না তুমি আমাকে করলে রমা!

কল্যাণবাবুর কথা মনোরমা বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু সে-তর্ক এড়িয়ে গিয়ে মনোরমা বললেন: বেশ বলছ তো তুমি! এতে আমার দোষটা কোথায়? ঠাকুরপো যে সে-মানুষ নেই, সে-কথা এর আগে আমাকে জানিয়েছো কোন দিন?

কল্যাণবাবু গলার স্বর আর এক পর্দা চড়িয়ে বললেন: খুব হয়েছে! আর ন্যাকামী করতে হবে না! কত ধানে কত চাল হয়, বেশ জান বাপু তুমি। মেয়েমানুষ হলেও তুমি কম সেয়ানা নও! আসলে তুমিও তো অমলেন্দুর দলের। যখন যে কাজে হাত দিই তাইতেই তুমি বাগড়া দাও! কী করে আমাকে অপদস্থ করবে রাত দিন তোমার সেই চেষ্টা? ভাবছ কি, বুঝি না আমি কিছু?

অভিযোগ শুনে মনোরমা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একান্তভাবে কল্যাণবাবুকে

শুভ পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তাঁর যত চেষ্টা নিয়োজিত। নিজের শরীর-মন ক্ষয় করে, রাত্রের ঘুম বিসর্জন দিয়ে, তিনি যে লোকটির মঙ্গলের জন্য চিন্তা করছেন এই তার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা ?

আমি তোমাকে অপদস্থ করতে চেষ্টা করি ? এমন কথা বলতে পারলে তুমি ?

একেবারে আকাশ থেকে পড়লে বুঝি মনোরমা, না ? যেন ভিজে বিড়াল, আর কখনো কল্যাণবাবু দেখেন নি ! দিনকতক মোলায়েম ব্যবহার করে কী সাংঘাতিক ধোঁকা দিয়েছিলে তুমি কল্যাণবাবুকে ! আজ যখন অমলেন্দু পর্যন্ত তুমি ধাওয়া করেছো, তখনই তোমার স্বরূপ ধরা পড়ে গিয়েছে। এক হিসেবে ভালই হয়েছে। তোমার নিপুণ ভালবাসার অভিনয়ের মুখোসটা খুলে গিয়েছে একেবারে হাটের মাঝখানে। আর কোনদিন চিনতে ভুল হবে না কল্যাণবাবুর।

একশোবার তুমি সেই চেষ্টা কর, রমা ! স্বামীর উপর যে কোন বৌ এরকম করে শত্রুতা করে তা আমি এর আগে কখনো দেখি নি। একটা সাংঘাতিক ভুল ভেঙ্গে দিলে তুমি আজকে। সাধ করে বৌ ঘরে এনে দেখলাম, সে একটা দুশমন ! কী লজ্জার কথা ! কী ঘেন্নার কথা ! জীবনের উপর ঘেন্না ধরে গেছে আজকে !

মনোরমা আকুল হয়ে বললেন : ওগো কথাগুলো তুমি আর একবার ভেবে তারপর বল। তোমার এ-কথার পর আর আমি তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারি না। বুঝতে পারছ ? এখনো ফিরিয়ে নাও তোমার কথা।

মনোরমার করুণ আবেদনকে গ্রাহ্যও করলে না কল্যাণবাবু। আগের কথার জের ধরেই বলে চললেন : নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার যন্ত্র বানিয়ে তুলতে চাও স্বামীকে ? এত সহজ নয় কল্যাণ সেনকে আয়ত্ত করা। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও পারে নি বহু চেষ্টা করেও। কল্যাণ সেন তার আদর্শে অটুট থাকবে, তার জন্য সাত জন্ম যদি মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘর করা বারণ হয় তাতেও আপত্তি নেই।

আসল মানুষটাকে যেন চেনা যাচ্ছে একটু একটু করে। আশ্চর্য এই যে, মনোরমা তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়েও কল্যাণবাবুকে পুরোপুরি চিনতে পারেননি এতদিনেও। মিথ্যা মোহ আর বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে, তিনি

এতকাল ছিলেন নির্বোধের স্বর্গে। তীব্র ঘৃণা আর অবজ্ঞার দৃষ্টি নিয়ে যে-লোকটা চিরকাল তাঁকে দেখে এসেছে, সে লোকটাকে বিনিময়ে তিনি দিয়েছেন ভালবাসা, সে-লোকটার ছেলে-মেয়েদের স্থান দিয়েছেন গর্ভে!

দু'জনেই নিজের নিজের চিন্তায়, অর্থাৎ একে অন্যের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে ঝগড়ায় একটু ছেদ পড়ল। দূরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে সুনন্দা অনুমান করতে চেষ্টা করল, অতঃপর কে আগে কথা বলতে শুরু করবেন? মা কি জবাব দেবেন? না কি বাবাই আবার আরও কোন প্রচণ্ডতর আঘাত করে বসবেন?

তীক্ষ্ণ বিচারকের দৃষ্টি নিয়ে বাবা-মাকে দেখা সুনন্দার অনেক দিনের অভ্যেস। অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে সে লক্ষ্য করেছে, মার ধারালো ব্যক্তিত্ব যেন ইদানিং নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। বাবাকে তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে দিতে মা এখন পারছেন না। মার কণ্ঠে এখন সুস্পষ্ট মিনতির স্বর; বাবার কাছে যেন অনুগ্রহ-প্রার্থিনা হয়ে উঠেছেন মা ক্রমশঃ। আর বাবা তার ষোল আনা সুযোগ নিচ্ছেন আজকাল। পুরুষের অত্যাচার আর নিবুদ্ধিতায় কি মেয়েমানুষের চারিত্রিক গুণগুলোও নষ্ট হয়ে যেতে থাকে আস্তে আস্তে? সব দিক দিয়েই মা যেন নেমে যাচ্ছেন আজকাল, সুনন্দা বেশ অনুভব করতে পারে। তার সঙ্গেও মার আগেকার মধুর সম্পর্কটির চিহ্নও এখন নেই। এখন সামান্য কারণে মার ব্যবহার রুক্ষ হয়ে ওঠে।

ঝগড়ার সাময়িক বিরতির সুযোগ নিয়ে পটল আর রবি এসে ঘরে ঢুকল। তারা কল্যাণবাবুর কাছেই আসছিল। কল্যাণদার মুখের রূঢ় অশোভন কথাগুলো শুনে তারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল বারান্দায়। বারান্দায় তখন আরও চার-পাঁচজন প্রতিবেশী মহিলা এসে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতে কল্যাণবাবুদের কথা শুনাছলেন এবং হাসাহাসি করছিলেন। সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হয়ে কল্যাণদা এ বাড়ীতে তাঁর জনপ্রিয়তা খর্ব করতে চলেছেন, উপহাসের পাত্র হয়ে উঠছেন, এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পটলের আর উদ্বেগের সীমা ছিল না। অবকাশ পেয়ে সে তাড়াতাড়ি কল্যাণদার ঘরে গিয়ে ঢুকল, যাতে অশোভন ঝগড়াটা আর বেশীদূর না গড়ায়।

কল্যাণদার কাছে আসার পিছনে পটলদের গোড়াতে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এমনি বিনা কারণে তারা আসে প্রায়ই নিছক গল্প-গুজব করার জন্য।

অনিশ্চিত কর্মহীন জীবনে একটি বলিষ্ঠ মানুষের মুখের আশ্বাস ও শুভেচ্ছার বাণী শুনতেও ভাল লাগে বলে। কিন্তু এখন উত্তেজনার সময়ে অনধিকার প্রবেশ করতে গেলে একটা অজুহাত তৈরী করে নেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে পটলের মস্তিষ্ক চিরদিনই অত্যন্ত উর্বর।

পটলদের দেখে মুখের ক্রোধের আভাসকে হাসিতে রূপান্তরিত করতে কল্যাণবাবুর কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগল। তিনি সাদরে আহ্বান জানালেন পটলদের।

আরে এস এস পটল। এস রবি। বস তোমরা। ভালই করছ এসে। সংসারের খুঁটি-নাটি নিয়ে মেজাজটা বড় বিগ্‌ড়িয়ে ছিল।

সাংসারিক খুঁটিনাটির প্রতি পটলের বিন্দুমাত্রও ঔৎসুক্য নেই। এই মাত্র মনে মনে বানানো জরুরী কাজের কথাটা নিয়ে সে আলোচনা সুরু করল ভূমিকা না করে।

একটা জুরুরী আলোচনার জন্য এলাম কল্যাণদা। এবার আমরা ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্র-মৃত্যু-তিথি পালন করব ভাবছি। আপনি কি বলছেন?

রবি অবাক হয়ে পটলের মুখের দিকে তাকালো। এ নিয়ে তাদের মধ্যে তো কৈ কোন আলোচনা হয়নি!

কল্যাণবাবু তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তিনি চিরকাল ভালবাসেন। ভালবাসেন বই পড়তে, বিশেষ করে সাহিত্য।

তবু প্রস্তাবটার মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড কিন্তু রয়েছে তা কল্যাণবাবুর নজর এড়াল না। বললেন: প্রস্তাবটা তো খুবই ভাল পটল। এ সব ব্যাপারে আমার উৎসাহের অভাব নেই। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের অসুবিধে রয়ে গিয়েছে। সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিই পালন করা হয়; তাঁর মৃত্যু-তিথি পালন করার রীতি নেই।

সকলের উৎসাহদীপ্ত মুখে আবার ছায়া পড়ল। অতি তাড়াতাড়িতে ভেবে ঠিক করা প্রস্তাবটার মধ্যে যে এত বড় একটা ফ্যাকড়া রয়েছে তা কারও মাথায় আসে নি। পঁচিশে বৈশাখ তো এদেশে কবে এসে চলে গিয়েছে এ বছরের মত। এ অভিশপ্ত বাড়ির চিন্তাক্লিষ্ট মানুষদের কাছে তখন তার আবির্ভাব ঘটেনি। তা হলে উপায়? পঁচিশে বৈশাখ আবার ঘুরে আসতে তো এখনও অনেক দেরী।

ছেলেদের নিরুৎসাহ লক্ষ্য করে কল্যাণবাবুই আবার একটা উপায় খুঁজে বার করলেন : অবশ্য আমরা একটা কাজ করতে পারি। আমরা বলব, বিশেষ করে ২২শে শ্রাবণ আমরা মৃত্যু-উৎসবের জন্য মনোনীত করেছি এ কথা ঘোষণা করার জন্য যে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে আমরা স্বীকার করি না।

পটল হাত তালি দিয়ে উঠল : ঠিক বলেছেন কল্যাণদা। মৃত্যুকে আমার স্বীকার করি না। আমরা এ বাড়ির লোকেরা প্রতিদিন সে-কথা প্রমাণ করছি।

অতঃপর উৎসবের কার্যকর কর্মসূচীর জন্য জমাট আলোচনা সুরু হয়ে গেল। সুনন্দাও উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এসে আলোচনায় যোগ দিল। ঘরের গুমোটটা একটু কাটুক তবু। মনোরমা অবশ্য সুরুতেই রান্নাঘরে চলে গিয়েছেন।

রবি সুনন্দাকে লক্ষ্য করে বলল : মেয়েদেরও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে কিন্তু।

পটল বলল : তা আবার বলতে হয়? কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার নাকি?

আমি খুব রাজী।—সুনন্দা মনের উৎসাহটা যথাসম্ভব চেপে রেখে বলল : কিন্তু আমাদের শেখাবে কে?

প্রবোধবাবু মাষ্টারের বৌ খুব ভাল নাচ-গান শেখাতে পারেন। আমি জানি। পটল জানালো।

কল্যাণবাবু জিজ্ঞেস করলেন : কিন্তু প্রবোধবাবু কি রাজী হবেন অল্প-বয়সী বৌকে ছেড়ে দিতে?

কী যে বলেন কল্যাণদা? আমরা গিয়ে ধরলে না বলবে এমন অভিভাবক রাজা বাহাদুরের বাগান বাড়িতে নেই।

একটু পরে কল্যাণবাবু পটলদের সঙ্গে বের হ'লেন ব্যাপারটা নিয়ে বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপ করতে। কালে কালে এই রবীন্দ্র-মৃত্যু-তিথি উদ্‌যাপন থেকে সুরু করে এ-বাড়ির এবং স্থানীয় উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিরাট সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল লাইব্রেরী, ক্লাব, রীডিং রুম। পয়সার অভাবে প্রত্যেকটি প্রচেষ্টাই সীমিত হলেও উদ্যোক্তারা অফুরন্ত উৎসাহ দিয়ে ঘাটতি পূরণ করে নিয়েছিলেন।

আলোচনা শেষ করে ঘণ্টা দুই পরে কল্যাণবাবু যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মন অনেকটা শান্ত। মনোরমাকে অনেকগুলো কটু কথা বলার জন্য অনুতপ্ত বোধ করলেন নিজেকে। না, মনোরমাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? শত হলেও সে মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ কি কখনো বৃহৎ আদর্শবাদ বুঝতে পারে? পারে কখনো সংকীর্ণ স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠ্‌তে?

সুনন্দা রান্না করছে। মনোরমা বর্ষণ-ক্ষান্ত মেঘলা আকাশের মত মুখ নিয়ে বসে আছেন চুপচাপ।

কল্যাণবাবু মনোরমার সামনে বসে বললেন: আমাকে মাপ কর রমা। আমার অন্যায় হয়েছে।

মনোরমা জবাব দিলেন না।

কল্যাণবাবু আবার বললেন: মানুষ কথায় বলে, রাগ না চণ্ডাল। আর জানই তো, রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না।

কিন্তু জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে সারমেয়-জাতির অন্তর্গত যে-সব মেয়েরা—স্বামী দূর করে তাড়ালে ভয়ে দূরে সরে যায়, আর তু করে ডাকলে আনন্দে কাছে চলে আসে,—মনোরমা তাদের দলের নন। তাঁকে কেউ দান করেনি, নিজেই গ্রহণ করেছিলেন কল্যাণবাবুকে। কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য নয়। কল্যাণবাবুর কথার এবারও জবাব দিলেন না মনোরমা।

সেইদিন থেকে কল্যাণবাবু আর মনোরমার মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ রইল।

-

কল্যাণবাবুদের ঋণের জন্য দরখাস্ত দিতে অনেক দেরী হয়ে গেল। অটল, সুধা এবং আরও অনেকে তাদের দরখাস্ত নিয়ে তদ্বির-তদারক আরম্ভ করবার অনেক পরে। দরখাস্ত দেওয়া নিয়ে সুধীনবাবু, ঘোষাল মশাই, রজত, প্রভৃতির সঙ্গে কল্যাণবাবুর মতান্তর থেকে মনান্তর হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। এত উত্তেজিত হয়েছিলেন কল্যাণবাবু যে, জিনিষটা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন। হেতুটা সামান্য। কল্যাণবাবু পুরোনো কো-অপারেটিভের নামে দরখাস্ত দিতে জিদ করছিলেন; কিন্তু সেই মরা-হাজা প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে টানাটানি করতে কেউ রাজী হয়নি। শেষে ঘোষাল মশাইয়ের সুনিপুণ মধ্যস্থতায় কল্যাণবাবু যৌথ দরখাস্তে রাজী হয়েছিলেন।

সতেরো

একটি ঘরের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সুনন্দার আর ভালো লাগে না। পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলে মনে হয় ঘরখানাকে। আর সেইজন্যে সারাদিনে পৃথিবী-পরিক্রমণ প্রায় শেষ করে বিকেলের দিকে সূর্যদেব এক টুকরো আলো পাঠান পশ্চিমের জান্‌লা দিয়ে।

মনে হয়, পশ্চিম দিগন্তের ম্লানায়মান লালিমাটুকুই সুনন্দার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। সে বেশ বুঝতে পারে, জ্যেষ্ঠ সন্তান হলেও এ সংসারে সে এখন অনাবশ্যক। এখন তার জীবনের একমাত্র সার্থকতা নাকি মার কাজে সাহায্য করা। তা অবশ্য সে করে নিজের সাধ্য-সামর্থ অনুযায়ী। কিন্তু চোখের মাথা খেয়ে যে-ভাবে সামান্য দু' চারটে কাজ সে করে, তা না করলেই নাকি মা'র সুবিধে হতো! সে ঘর গুছিয়ে রাখলে মার নাকি মনে হয়, ঘরে ভূতের কীর্তন বসেছিল। কয়েকখানা ছেঁড়া টেনা, যার নাম বিছানা, আর কয়েকটা জোড়া-দেওয়া ভাঙা টিনের টুক্‌রো, যার নাম বাক্স,—এই অভিনব আসবাব দিয়ে যে এর চেয়ে ভালো করে কী করে ঘর সাজানো যায়, সুনন্দা তা জানেনা। কিন্তু দোষটা নাকি আস্‌বাবের নয়, দোষটা সুনন্দার শ্রীহীন স্পর্শের! হবেও বা। নিজেদের অক্ষমতা-পুষ্ট দারিদ্র্যকে ঢাকার জন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির ঘাড়ে দোষটা চাপানো সুবিধাজনক বৈকি!

সুনন্দার সঙ্গে মা'র ব্যবহারটা আগে ভালোই ছিল। মার উপর তার যথেষ্ট আস্থাও ছিল। সেই সঙ্গে ছিল সহানুভূতিও। একজন বাস্তব-বুদ্ধি-বর্জিত একগুঁয়ে পুরুষের সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে মা জীবনে অনেক সহ্য করলেন। সেইজন্য মনে মনে সে সবসময় বাবার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে থাকে, যদিও বাবার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে তার কোন অভিযোগ নেই। তার প্রতি বাবার ভালোবাসার কোন সময় ঘাটতি পড়তে দেখেনি সে। পয়সা থাকলে বাবা তাকে স্নো-পাউডার বা এটা-সেটা টুকিটাকি শৌখীন জিনিষ কিনে দিয়েছেন বরাবর। কিন্তু সুনন্দা অবাক হয়ে যায় মার কথা ভেবে

সংসারের কাছে মা যত মার খাচ্ছেন তত তার ঝাল ঝাড়ছেন মেয়ের উপর ! সে যে এতকাল ধরে মনে মনে মা'কে সমর্থন করে আসছে সেজন্য মার এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। তার প্রয়োজন সম্পর্কে মা পরম নির্বিকার, অবশ্য বাবাও। কিন্তু পুরুষ মানুষ বাবা কী করে বুঝবেন সুনন্দার কখন কিসের প্রয়োজন হতে পারে ?

মনোরমার জীবনের কেন্দ্র এখন ছোট ছেলে দেবব্রত। পোশাক পরিচ্ছদ যা সামান্য আসে শুধু তার জন্যই। সে স্কুলে যাবে বলে। বই-পত্রও তার জন্যে কেনা হয়! লণ্ঠনের পল্‌তে পাল্টানো হয়। সোনার ভাইটি লণ্ঠনের সামনে বই নিয়ে বসে তন্দ্রায় ঢুল্‌বে বলে। দেবুর জন্য দুধ কেনা যাচ্ছে না বলে মার কী আপশোস। পড়াশোনা সুনন্দাও এক সময় করেছিল। সে শুধু নিজের চেষ্টায়। তার পড়ার যে কোন গুরুত্ব আছে, তা কেউ কোনদিন ভাবেনি। সে এখন বেকার বসে আছে। কই, কেউ তো বলে না যে সুনন্দা না হয় স্কুলে যাতায়াত করুক !

এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল যদি সুনন্দাকে ওঁরা বিয়ে দিয়ে দিতেন। একটি নির্বোধ পুরুষের গলগ্রহ হয়ে থাকা সুখের নয়, মার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সুনন্দা তা জানে। কিন্তু বাবা-মার গলগ্রহ হয়ে থাকাটাই বা এমন কী সুখের ? আশ্চর্য এই যে, এ-বাড়ির লোকগুলোও যেন হিন্দুসমাজের রীতি-নীতি ভুলে গিয়েছে ! একবার ভুলেও কেউ বলে না যে অত বড় আইবুড়ো মেয়েকে ঘরে রাখা উচিত নয় ! ইচ্ছে ক'রে সুনন্দা এ-বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে বেশী বেশী মেলামেশা করে ! তাতে একমাত্র লাভ হয়েছে এই যে, তার নামের সঙ্গে পটলের নাম জড়িয়ে কতকগুলো কল্পিত কাহিনী রচনা করে তারা আড্ডা জমায়। এ-যুগের দেব্‌তারা মেয়ের বিয়ে না দিলে নরক-বাসের ব্যবস্থা তুলে দিয়েছেন নাকি ?

এ-বাড়িতে একটিমাত্র ব্যাপারে সুনন্দা খানিকটা কৌতুকমিশ্রিত আনন্দ বোধ করে। সেটা তার নামের সঙ্গে পটলের নাম জড়িয়ে এ-বাড়ির লোকদের কল্পনা-বিস্তারের বহর দেখে। আশ্চর্য ! একটি বিশ্ব-বকাটে বেকারের সঙ্গে প্রেম করবে—সুনন্দাকে এমনি নিরেট বলে ভাবতে পারে তারা অনায়াসে ! জীবন ভ'র দেখেও মায়ের ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে যাবে সুনন্দা ! তবে গুজবটাকে প্রশ্রয় দেয় সুনন্দা ; —আরও বেশী করে মেশে

পটলের সঙ্গে। বেঁচে থাকারও তো একটা অবলম্বন চাই জীবনে! মানুষকে অনেক অর্থহীন কাজ করতে হয় শুধু সময় কাটানোর জন্য। শুধু জীবনের ভয়াবহ শূন্যতার চেহারাটাকে সাময়িকভাবে ভুলে থাকার জন্য।

শারীরিক সম্পদে অবশ্য পটল খুব সমৃদ্ধ। আর অদ্ভুত তার কর্মতৎপরতা। প্রাণের প্রাচুর্যে গোটা বাড়িটাকে মাৎ করে রেখেছে এই ছেলে। বোকার মত পরের কাজ করে বেড়ায় বলে সকলের ভালবাসা পায় সহজেই। অনেকটা তার বাবার মত। যে-কোন ভাবাবেগ-সর্বস্ব মেয়ের বারটা বাজিয়ে দেওয়ার মত পর্যাপ্ত সম্পদ আছে পটলের। কিন্তু সুনন্দা যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

বেলা বোধকরি গোটা তিনেক হবে। সুনন্দা মরিচ-ভাঙা ঘুম থেকে উঠে মার কাছে এল।

মা, একখানা সাবান আনিয়ে দাও। ঘরে সাবান নেই।

মনোরমা বললেন: আজ আর হবে না রে সুনন্দা, পয়সা নেই। দু'চার দিন পরে কিনিস্।

সুনন্দা জিদ্ করতে থাকে।

দু'চার দিন পরে কিন্‌লে হবে না, মা। শাড়ী ব্লাউজ সব ময়লা। সাবান আজকেই চাই। এক্ষুণি। বিকেলেই কাচাকুচি সেরে নেব আমি।

এইরকমই হয়েছে আজকাল সুনন্দা! বাপের ধারা পাচ্ছে ক্রমশঃ। মনোরমার কোন কথা শুনবে না। সংসারের অবস্থা বুঝবে না। সব সময় নিজের গোঁ ধরে চলতে চাইবে! তাঁর বিশ্রামের সময়টুকুও মানবে না, এমন জেদ্ মেয়ের।

কাপড় একটু ময়লা হয়েছে তো কী হয়েছে? তুই তো আর অফিস করতে যাচ্ছিস না!

এত লোকের মধ্যে আমি নোংরা থাকতে পারব না মা। ধোবাবাড়ী কাপড় দিই না; নিজে পরিশ্রম করে কেচে পরি। তাও বুঝি পারব না আমি? বেশ তো!

পরিচ্ছন্নতা অবশ্য মনোরমারই শিক্ষা। তাই এবারও নরম গলায় নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন সুনন্দাকে।

লক্ষ্মী মেয়ে! আজ আর গোলমাল করিস্ নে। আজ সত্যিই পয়সা নেই।

সুনন্দা ঝাঁঝালো গলায় বলল: পয়সা নেই তো সকালে বাসুদেব বাবুকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্য চাঁদা দিতে দিলে কেন বাবাকে? বাবার দোষেই তো পয়সার এত অভাব আমাদের!

এরকম ঘটনা হয় এ-বাড়ীতে মাঝে মাঝে। কেউ কোন অকস্মিক বিপদে পড়লে পাঁচজনে দু'এক টাকা করে চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেন। বলা তো যায় না! যে-কোনও লোকের জীবনে যে-কোন সময়েই তো অনুরূপ বিপদ আসতে পারে।

সুনন্দার কথা শুনে মনোরমা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দিনে দিনে এ কী-রকম মতি-গতি হচ্ছে মেয়ের! কিছুদিন যাবৎ-ই দেখছেন সুনন্দা ঠিকমত কথা শোনে না। মুখে মুখে জবাব দেয়। মন ভালো নয় বলে এ দিকটায় তিনি ভালো নজর দিতে পারেন নি এতদিন। এখন মনে হচ্ছে, এটা একটু গাফিলতিই হয়ে গিয়েছে তাঁর দিক থেকে। সুযোগ পেয়ে এ-বাড়ীর পাঁচমিশেলী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশে মিশে স্বভাব খারাপ হয়ে যাচ্ছে মেয়ের। শাসন করা দরকার হয়ে পড়েছে।

হিসেব করে কথা বলবি সুনন্দা। কার সম্পর্কে কী বলছিস্ তুই? তোর বাবার মত যোগ্যতা আগে অর্জন করে নে, তারপর তাঁর সম্পর্কে কথা বলিস্। জানিস, তোর বাবা দেবতুল্য মানুষ?

আশ্চর্য! শেষটায় মার মুখ থেকে এই কথা শুনতে হ'ল? তবে কেন মা বাবার সঙ্গে দিন-রাত খিটিমিটি বাধান? ঝগড়া-ঝাটি আর অশান্তিতে শ্মশানের মত মনে হয় বাড়িটাকে?

দেবতা না হাতী! বাবার জন্যই তো আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট!

মনোরমা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন: সুনন্দা! এখনো বলছি মুখ সামলিয়ে কথা বলা শেখ! যিনি তোদের জন্ম দিয়েছেন, তিনিই যদি দুঃখ দেন, তবে তাই হাসি মুখে মেনে নিবি। তার উপর আবার কথা কী রে?

যেই কেন-না অন্যায় করুক আমি তা মানতে পারব না মা।

তুই তো একেবারে গোল্লায় যাচ্ছিস্ রে সুনন্দা! তোকে কড়া হাতে শাসন করতে হবে এবার। বাড়ীর বদ্ ছেলেদের সঙ্গে মিশে মিশে তোর এমন স্বভাব হচ্ছে আজকাল। আজ থেকে ওদের সঙ্গে মেশা বারণ করে দিলাম আমি।

ওদের সঙ্গে না মিশলে আমার সময় কাটবে কী করে? আমি মিশবই। আমি তো কোন অন্যায় করছি না।

অন্যায় করছিস না? ছাখ সুনন্দা, আমি তোর মা। মার কাছেও লুকুতে পারবি বলে আশা করিস্? জিজ্ঞেস করি, তোর বাক্সে লাল উল এল কোত্থেকে রে?

কথাটা প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল না মনোরমার। রাগের মাথায় বেরিয়ে গেল। তিনি জানেন, এসব ব্যাপারে উস্কানি দিলে গতিবেগ আরও বেড়ে যায়। আসলে হয়তো ব্যাপার বেশী দূর গড়ায় নি। আপনা-আপনি চাপা পড়ে যাবে একসময়ে।

সুনন্দার মনে পড়ে গেল, বহুকাল আগে লাল উলটা পটলকে দিয়ে কিনিয়েছিল। নিজের টাকায় কিনিয়েছিল! মা যে ভাবছেন, পটল উপহার দিয়েছে, সে-কথা মিথ্যা। কিন্তু মার নজর এমন ছোট হতে পারল? অন্যায় করে মেয়েকে সন্দেহ করে মেয়ের বাক্স লুকিয়ে পরীক্ষা করলেন?

আমার উপর কোন মিথ্যে দোষারোপ করো না মা। অমি কোন অন্যায় করিনি।

ন্যায় অন্যায় আমি বুঝব না সুনন্দা। আমি আদেশ করছি, ওদের সঙ্গে তুমি আর মিশতে পারবে না।

কিন্তু অন্যায় আদেশ তুমি কেন দেবে মা? আমার মনে কোন দোষ নেই—আমি ওদের সঙ্গে মিশব।

আমার কথা শুনবি না তুই?

তোমার অন্যায় কথা আমি শুনব না।

মনোরমা আর কথা বাড়ালেন না। সুনন্দার চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন রান্নাঘরে। সামনের ঘরের প্রতিবেশীরা যাতে না শুনতে পায় সেইজন্য এই সাবধানতা। সুনন্দা তো বড় হয়েছে! পাঁচজনের সামনে তাকে শাসন করা চলে না। মনোরমা সুনন্দার গালে চড় মেরে লাল করে দিলেন। হাত দুটো নিষ্ঠুরের মত মুচড়িয়ে দিলেন যতক্ষণ না সুনন্দা কাতরোক্তি করে উঠল। পিঠের ব্লাউজ সরিয়ে মাংসপেশীর উপর প্রচণ্ড শক্তিতে চিমটি কাটলেন যতক্ষণ না আপনা থেকেই পিঠটা বেঁকে এল।

কোন প্রতিবাদ না করে সুনন্দা নিঃশব্দে মার খেল। ছাড়া পেয়ে তেমনি নিঃশব্দে এ ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল অবসন্নের মত।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মনোরমা তাকে খুব কদাচিৎ-ই মেরেছেন। ছেলে-মেয়েদের মারার অভ্যেস নেই মার। সেই মা আজ এত বয়সের মেয়েকে মারলেন অনায়াসে কতকগুলো কল্পিত অভিযোগের জন্য?

কিন্তু শান্তিতে দু'দণ্ড শুয়ে থাকারও কি এ-বাড়িতে জো আছে ছাই! ঠিক এই সময়টাতেই দেবু ইস্কুল থেকে ফিরে এসে ওর উপর অত্যাচার আরম্ভ করে দিল। দিদিকে অসময়ে শুয়ে থাকতে দেখে দেবু প্রথমে ওকে ডাকাডাকি সুরু করে দিল। সাড়া না পেয়ে সুনন্দার গায়ে ধাক্কা দিতে লাগল। তাতেও দিদিকে নাড়াতে না পেরে হঠাৎ সে তার মুখখানা টেনে তুলে দেখল। চোখে জল দেখে সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে বলল: দিদি! তুই কাঁদছিস্? কী হয়েছে?

এবারেও কোন সাড়া না পেয়ে দেবু প্রতিশোধ নিল। নাচতে নাচতে আর হাততালি দিতে দিতে বলতে লাগল: এঃ রা-ম! বুড়ো—মেয়ে—কাঁ—দ্—ছে!

অগত্যা সুনন্দা উঠে মুখ-চোখ মুছে কলসী নিয়ে বেরুলো পুকুরঘাটের উদ্দেশ্যে। আর এমনি আশ্চর্য কপালের যোগাযোগ, পুকুরঘাটে দেখা হয়ে গেল পটলের সঙ্গে। নির্জন পুকুরঘাটে একা বসে বসে ছেলেমানুষের মত একরাশ পেয়ারা চিবুচ্ছে।

নন্দারাণী যে এমন অসময়ে? ঘরে বুঝি জল ফুরিয়ে গিয়েছে?—খাওয়া বন্ধ করে পটল জিজ্ঞেস করল!

সুনন্দা উত্তর না দিয়ে অন্য প্রশ্ন করল: তোমার বুঝি দিনে দিনে বয়স কমছে পটলদা?

পেয়ারা খাচ্ছি বলে? তবে তুমিও বয়স কমিয়ে নাও না? খাও দুটো পেয়ারা। বিনা পয়সায় অনেকগুলো পেয়ারা পেয়েছি।

আশ্চর্য! বাড়িতে অত গোলমালের পরে সুনন্দা সামান্য ইতস্ততঃ করে পেয়ারা চিবুতে বসে গেল অনায়াসে।

বেশ মিষ্টি, না?—পটল জিজ্ঞেস করল।

হুঁ—।

মিনিটখানেক নীরবে পেয়ারা চিবিয়ে সুনন্দা হঠাৎ বলল: আমাদের মেলা-মেশাটা বন্ধ করে দিলে ভালো হয় পটলদা।

খুব যে ভেবে-চিন্তে বলল সুনন্দা তা নয়। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, তাই বলল।

পটল তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

কেন বল তো সুনন্দা? কী হয়েছে?

কিছু হয় নি। পাঁচ জনে কানা-ঘুষো করছে, তাই ভাবছিলাম। কী দরকার মিশে!

করলই বা কানা-ঘুষো! কানা-ঘুষো করার সঙ্গত কারণ যে নেই তা তো নয়।

সুনন্দা বিদ্যুৎপৃষ্টের মত খানিকটা সরে বসল।

কী বলছ তুমি পটলদা যা তা? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

পটল যেন মনে মনে হাসল একটু। সদাহাস্য চঞ্চল পটলদার গম্ভীর চেহারাটা অদ্ভুত লাগছিল সুনন্দার কাছে।

সত্যি বলছি সুনন্দা। লোকে মিথ্যে মিথ্যে কানা-ঘুষো করে না। কথা যখন উঠলই তখন বলি: আমার জীবনের আজ কোন ভবিষ্যৎ নেই। দৈবাৎ তোমার সঙ্গে আজ এ-বাড়িতে দেখা হয়েছে। দিনগুলো আনন্দে কাটছে। সত্যি খুব আনন্দ বোধ করেছি আমি। কিন্তু আমি জানি, আমাদের এ জীবন ক্ষণস্থায়ী। কবে যে ঢেউ আসবে, খড়কুটোর মত কে কোথায় ভেসে যাব, জানি না। শুধু জানি, সেদিন তোমার আর আমার মধ্যে হয়তো দেখা হওয়ার সুযোগটুকুও থাকবে না। কিন্তু তাই বলে, আমার ভালবাসার কোন ভবিষ্যৎ নেই বলেই এ-কথা কী করে স্বীকার করব যে জিনিষটাই মিথ্যে?

ভয়ে ঘেমে উঠল সুনন্দা। এমন গম্ভীরভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পটলকে কোন দিন দেখেনি সে।

না—না পটলদা, ও-সব কথা বলো না। ও-সব মিথ্যে।

না সুনন্দা, মিথ্যে নয়। দেখবে?

হঠাৎ পটল সুনন্দাকে জোরে চেপে ধরে তার উষ্ণ ঠোঁটে একটি দীর্ঘ গভীর চুম্বন এঁকে দিল।

আর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সুনন্দা তৎক্ষণাৎ বাঘিনীর মত উঠে দাঁড়ালো!

বদ্‌মাইশ!

সুনন্দার মুখ হাত কানের ডগা অবধি আরক্ত। জোরে জোরে নিশ্বাসের উত্থান-পতনের সঙ্গে তার সুপুষ্ট বক্ষস্থলও উঠছে নামছে। পটল তাই অবাক হয়ে দেখছে।

লম্পট!

হঠাৎ সুনন্দা প্রতিশোধ নিল। সে পটলের মুখের উপর খানিকটা থুথু ছিটিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলল: অত করে ভালবাসা জানালে পটলদা, তাই একটু উপহার দিলাম। প্রতিবাদে ভালবাসা জানাতে পারলাম না বলে দুঃখিত। অত নীচুতে আমার নজর নাবেনি এখনো। শেষের কথা-গুলোতেই পটল আহত হ'ল বেশী। অপমানে নীল হয়ে গেল তার মুখ।

আর বিজয়িনীর মত মন্থর-গতিতে শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে সুনন্দা বাড়ির দিকে রওয়ানা হ'ল। কেন পটলদা এত বড় ভুল করল? তার আকর্ষণী শক্তিকে তো সুনন্দা স্বীকার করে নিয়েছিল। তার উদার অন্তঃকরণ, তার সজীব সাহসী মনটির সাহচর্য সুনন্দা কখনও প্রত্যাখ্যান করেনি। কিন্তু নিজের মনের কামনাকে এমন স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে গেল কেন পটলদা? মার শাসনে নয়, পটলদার হঠকারিতার জন্যই যে এখন তাদের মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। সুনন্দার মনের গভীর অন্তঃস্থলেও এখন পটলদার বিরুদ্ধে ঘৃণা আর অবজ্ঞা ছাড়া আর যে কিছুই অবশিষ্ট রইল না। বাবার বেলায় মা যে ভুল করেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি সুনন্দা করবে না।

সন্ধ্যার আগে আগে পটলকে তাদের ঘর আসতে দেখে সুনন্দা অবাক হ'ল। মনোরমা স্মিতমুখে পটলকে আহ্বান জানালেন। পটলের মুখের চেহারা একটু গম্ভীর হলেও স্বাভাবিক। মনোরমার হাতে সে আড়াইটা টাকা রাখল। তার থেকে মনোরমা একটি আধুলি তুলে নিয়ে পটলের অনিচ্ছুক হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন: তোমার কমিশনটা নাও পটল। না বললে শুনব না।

এতক্ষণে বুঝতে পারল সুনন্দা। দুপুরে অত বড় ঘটনা ঘটে গেলেও নিজের কর্তব্য-কর্ম বিস্মৃত হয়নি পটলদা। বেশ! বেশ!

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। সেদিন কল্যাণবাবুর সঙ্গে মর্মান্তিক ঝগড়া এবং পরিণামে বাক্য-বিনিময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মনোরমা সেদিনই দাদার কাছে চিঠি লিখেছিলেন। তাতে জানতে চেয়েছিলেন, অভাগা বোনটিকে একটু জায়গা দেওয়ার মত পরিসর দাদার বাড়িতে আছে কিনা। লোকের অভাবে চিঠিটা সেদিন ডাকে পাঠাতে পারেননি। আর পরের দিনই মনোরমার মত পাল্‌টিয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, এই দুর্দিনের বাজারে অভিভাবক-পরিবর্তনের চেয়ে স্বাবলম্বিনী হওয়া ঢের বেশী কাম্য। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের সামান্য খরচটাও কি রোজগার করিতে পারেন না তিনি? মেয়েরা সবচেয়ে আগে যে পথে রোজগারের কথা চিন্তা করে তিনিও তাই করলেন। ঘরে একটি সেলাই-এর কল আছে। পটলকে ডেকে এনে তিনি তার সঙ্গে চুক্তি করলেন যে, সে জামা তৈরীর অর্ডার সংগ্রহ করে আনবে আর তিনি জামা পিছু কমিশন দেবেন চার আনা করে। কমিশন নিতে পটল কিছুতেই রাজী হয়নি প্রথমটায়। তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে রাজী করিয়েছিলেন তাকে। তারপর প্রথম অর্ডারী কাজের মজুরী নিয়ে এসেছে আজ পটল।

আর কিছু অর্ডার পেলে না? মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন।

পাওয়া যাবে বৌদি। তবে—, পটল মাঝখানে থেমে গেল হঠাৎ।

তবে কি? খুলে বল না পটল।

কি জানেন বৌদি, আপনার তো অনেকদিনের অনভ্যেস, তাই—

তাই দর্জিদের মত সুন্দর ছাঁট-কাট আমার আসছে না। ঠিক বলছি, না পটল? আমি আগেই আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু এখন তাহলে কী করা যায় বলো তো?

সেলাই শিখবেন বৌদি? এক মাসের বেশী লাগবে না আপনার।

তাই তো—বড্ড যে জানাজানি হয়ে যাবে।

কল্যাণবাবুকে গোপন করে ঘরে বসে টুকটাক্‌ কাজ করা যায়। তাই বলে প্রকাশ্যে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে কোন কাজে হাত দেওয়া? মনোরমার বধূ-মন সায় দিল না এ-প্রস্তাবে।

মনোরমা তখনো জানেন না, সীমান্ত পার হওয়ার সময় বধূ-মনটিকে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ওপারে ফেলে আসতে হয়েছে তাঁকে।

আঠারো

পটলের হঠাৎ একটি চাকরি জুটে গেল।

রাজা বাহাদুরের বাগান বাড়িতে ঢুকতেই দুপাশে দুটো টিনের শেড পড়ে। এগুলোতে আগে একটি মুসলমানের কেমিক্যাল কারখানা ছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে কারখানাটা উঠে গিয়েছে বহুকাল। শেড্ দুটো খালিই পড়েছিল এতদিন। সম্প্রতি একটি সাঁশালো মারোয়াড়ী আবার নতুন করে কারখানা চালু করেছেন সেখানে।

পটল প্রথমে নিজেই গিয়েছিল চাকরির চেষ্টায়। শেঠজীর মন ভেজাতে পারেনি। শেষে কল্যাণবাবু অনুরোধ করায় পটলকে নিতে রাজী হয়েছেন শেঠজী। কল্যাণবাবুর বিশিষ্ট চেহারায় এবং পাড়ায় তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা শুনে শেঠজী তাঁর কথা অবজ্ঞা না করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। মাইনে এখন ষাট টাকা পাবে পটল। তিন মাস পরে কাজ শিখে নিলে মাইনে বাড়িয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন শেঠজী।

গোটা পনেরো টাকা অগ্রিম নিয়ে পটল প্রথমেই তার ছেঁড়া পুরোনো একমাত্র সার্টটাকে ত্যাগ করল। তার অগোছালো রুক্ষ চুল এবার তেল আর চিরুণীর সান্নিধ্য লাভ করে ভদ্র হয়ে উঠল। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে পটল উদার হস্তে বিড়ি বিলোতে লাগল।

দিন কয়েক 'পরে যত্ন করে সেজে গুজে পটল মনোরমার কাছে গেল আশীর্বাদ নিতে। পুকুরঘাটের ঘটনার দিনটার পরে পটল এই প্রথম এ ঘরে পা দিল আবার। এ ক'দিন সুনন্দাকেও এড়িয়ে চলেছে সে। সুনন্দার কথা মনে এলে নিজের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা বোধ হয় আজকাল। একটা পুঁচকে মেয়ে তাকে বদ্‌মাইশ লম্পট বলেছে, তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়েছে, অথচ পাড়ার নামকরা ডানপিটে গুণ্ডা ছেলে তার কিছুই প্রতিবিধান করতে পারেনি! ভাগ্যিস্ রবি, দীনেশ ওরা ঘটনাটি সম্পর্কে কিছু জানে না।

মনোরমাকে প্রণাম করে পটল বলল: আমি চাকরি পেয়েছি, জানেন বৌদি?

মনোরমা হেসে তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন: খুব জানি। তোমার চাকরিতে উন্নতি হোক এই কামনা করি।

উনুনের উপর কী যেন একটা চাপানো ছিল। শব্দটা কেমন অস্বাভাবিক বোধ হওয়ায় মনোরমা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন সেদিকে। যাওয়ার সময় বললেন: চা না খেয়ে যেয়ো না কিন্তু পটল।

অগত্যা পটলকে বসতে হল। পশ্চিমের জানলা দিয়ে উদাস দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দিল বাইরে।

দুষ্টুমীর হাসি নিয়ে সুনন্দা পটলের চালচলন দেখছিল। নিজে থেকে কোন কথা পটল বলবে না বুঝতে পেরে সে-ই অগত্যা প্রশ্ন করল: চাকরির খবর তো কৈ আমাকে বললে না পটলদা?

প্রত্যেকের কাছে গিয়ে গিয়ে খবর বলার মত সময় কোথায় আমার? যাদের কান আছে তারা নিজেরাই শুনতে পাবে।

প্রত্যেকের কাছে বলা আর আমার কাছে বলা কি এক?

আমার তো তাই ধারণা।

সুনন্দা পটলের অনেকটা কাছে এগিয়ে এল। গলার স্বর আরও খাদে ন্যামিয়ে কথা বলতে লাগল, যাতে রান্নাঘর থেকে না শোনা যায়।

আমি কিন্তু তোমার চাকরির খবরে খুব খুশি হয়েছি।

কারা খুশী হয়েছে আর কারা দুঃখিত হয়েছে আমি তার কোন তালিকা রাখব না বলে ঠিক করেছি সুনন্দা।

পটলদা! তুমি এখনও রেগে আছ আমার ওপর? আচ্ছা, পুকুরঘাটের সেই সামান্য ঘটনাটা কি ভুলে যাওয়া যায় না? আবার কি আমরা সেই আগের মত সহজ স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে পারি না পটলদা?— সুনন্দার মুখে স্পষ্ট করুণ আবেদনের চেহারা ফুটে উঠতে দেখে পটল বিস্মিত হল।

পটল এবার আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। তার এবারকার গলার স্বর নিশ্বাস পতনের শব্দের চেয়ে সামান্যই উঁচু।

আমার সঙ্গে মেলামেশা না করাই তো ভালো সুনন্দা। সেদিন তোমার যে কত বড় ফাঁড়া কেটে গেছে তা তুমি জানতেও পারোনি। তুমি তো ঠিক ঠিক চেনো না আমাকে। আমি যে একটা নামকরা গুণ্ডা ছেলে! কোন

ধর্ম মানি না, নীতি মানি না। আমার কোন বন্ধন নেই, সমাজ নেই, আসক্তি নেই। সত্যি বলছি সুনন্দা, আমি সেদিন তোমার সাংঘাতিক অনিষ্ট সাধন করতে পারতাম অনায়াসে, আর তার জন্যে এতটুকু অনুতাপ হত না আমার। সে রকম মারাত্মক ইচ্ছা যে সেদিন আমার হয়নি সেজন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও সুনন্দা।

পটলের এমন সাংঘাতিক আত্ম-পরিচয় শুনেও সুনন্দা এতটুকু ভয় পেল না; ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়ারও দরকার বোধ করল না। বরং তার চোখের স্বচ্ছ পর্দা ঠেলে যেন জল বেরিয়ে আসতে চাইল।

আমি তো এখনো ছেলেমানুষ পটলদা! কী বলতে কী বলে ফেলেছিলাম সেদিন; তার জন্যে কি এত রাগ করা উচিত তোমার? এস, কাছে এস।

সুনন্দার মুখের ভাবে কী ছিল কে জানে? কিন্তু পটল ধ'রে নিল তার ভাষাটা আমন্ত্রণের। অনুমানের উপর নির্ভর করে দুর্জয় সাহস নিয়ে সে এগিয়ে গেল। নিজেকে মনে করল একটা সিঁধেল চোর।

রান্নাঘরের দরজার দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে সে এগিয়ে গিয়ে সুনন্দার ভিজে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন ঠোঁটের ফাঁকে নিজের সুগোল ঠোঁট স্থাপন করল আর নিজের বলিষ্ঠ বুক দিয়ে সুনন্দার অ-পূর্ব-পিষ্ট দৃঢ়বদ্ধ বুকের স্পন্দন অনুভব করতে চেষ্টা করল।

একটুক্ষণ নীরবে সহ্য করে সুনন্দা পটলকে ঠেলে সরিয়ে দিল। ঘরে কেউ নেই বটে, যে-কোন মুহূর্তে যে-কেউ এসে পড়তে পারে।

দূরে সরে গিয়ে পটল এবার সহজ গলায় কথা-বলতে আরম্ভ করল।

তারপর সুনন্দা, চাকরি পাওয়ার পরেও কি আমাকে বদ্‌মাইশ বলে মনে হচ্ছে?

কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে এমন মনে করে? এখন তো তুমি দস্তুর মত ভদ্দরলোক।—সুনন্দা তরলকণ্ঠে বলল।

পটল পরিতৃপ্তির হাসি হাসল।

এখন কিন্তু আমি তোমাদের অত ফাই-ফরমাস খাটতে পারব না যখন-তখন।

আর তাই কি এখন সম্ভবই নাকি তোমার পক্ষে। তোমার এখন কত কাজ! ভাল করে কাজ করলে তবে তো চাকরিতে উন্নতি।

এখন থেকে জীবনটাকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলব ঠিক করেছি। আর ছন্নছাড়া থাকা চলবে না।

এমন সময় মনোরমা চা নিয়ে এলেন।

পটল চলে গেলে সুনন্দা ভাবতে বসল। পটলের সঙ্গে একটা আপোষ করার অভিপ্রায় সুনন্দার ছিল। কিন্তু পটল নিঃসন্দেহে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। করবেই—পুরুষ জাতটাই হ্যাংলা। তবে সুনন্দা আজকে পটলের অত্যাচারটা সহ্য করে নিয়ে ভালই করেছে। সে বাস্তববাদী মেয়ে। এ বাড়িতে থাকতে হলে এ সব ডানপিটে ছেলেদের একটু আধটু আবদার অত্যাচার সহ্য করতেই হবে। তা ছাড়া, সে অত শূচিবায়ুগ্রস্ত নয়। একটা চুমুতে তার কুমারীত্ব পচে গিয়েছে এ কথা সে মনে করে না। তা ছাড়া, বেকার পটলের মুখে থুথু ছিটোনোটা যত অনায়াস-সাধ্য, চাকুরে পটলের মুখে তা নয়। চাকরির একটা আলাদা দাম আছে। যদিও সামান্য চাকরি; কিন্তু এ সব চাকরিতে কাজ দেখাতে পারলেই উন্নতি;—বেশী লেখাপড়া জানার কোন দরকার হয় না।

কল্যাণবাবুর সংশোধনাতীত আশাবাদী মনও যেন ভেঙে পড়ছে আস্তে আস্তে। একটা অমোঘ ভবিতব্যতা যেন তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিচ্ছে; তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করছে।

উদ্বাস্তু ঋণের দরখাস্তটা দেওয়ার পর দু'মাস কেটে গিয়েছে। কল্যাণবাবু আশা করেছিলেন দরখাস্ত দেওয়ার পরেই তাঁকে নানা কাজে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। সরকার থেকে 'এন্‌কোয়ারী' আসবে, তাদের সন্তুষ্ট করতে হবে। সরকারের বিশেষজ্ঞকে প্ল্যান বুঝিয়ে দিতে হবে। নিজেদের এক্সপার্টের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। সহস্র কাজে নিশ্বাস ফেলার সময়ও পাবেন কিনা সন্দেহ ছিল কল্যাণবাবুর। কিন্তু হায়! দু'মাসের মধ্যে মাত্র রেজিষ্টার্ড চিঠির সঙ্গে যুক্ত প্রাপ্তি-স্বীকারের চিরকুটটি ছাড়া আর কোন সাড়াই মেলেনি গভর্ণমেণ্টের দিক থেকে। এখানকার অফিস থেকে বলেছে, দিল্লী থেকে কতদিনে দরখাস্ত তাদের হাতে আসবে তা তারা জানে না। পাহাড় দেখার মত, যতই এগিয়ে যাওয়া যাক্‌, তবু দূরত্ব হ্রাস পায় না।

সমস্ত সরকারী পরিকল্পনা কি এমনি? একান্ত ভরসায় যতই আঁকড়ে

ধরা যায়, সমস্যা সমাধানের বদলে ততই আরও নতুন নতুন সমস্যা সহস্র পাকে জড়িয়ে ধরে যেন! সাহায্য প্রাপ্তির আলেয়া সামনে না থাকলে বরং ভিন্ন দিকে চেষ্টা করে কিছু সাফল্য পাওয়া যেত হয়তো।

এখন কল্যাণবাবুর মনে হয়, এ রকমটা যে হবে তা তাঁর মন আগেই জানত। একটা নড়বড়ে আদর্শবাদের প্রেত প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি নিয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে অন্ধকারের দিকে। জানতে পারলেও প্রভাব অতিক্রম করার উপায় নেই। এ নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মনান্তর ঘটেছে, পত্নীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ঘুচে গিয়েছে। তবু আরও কত দিন ধরে, আরও কতবার করে কল্যাণবাবু সেই ভুল করেই চলবেন কে জানে?

মজলিশ-প্রিয় কল্যাণবাবুর আড্ডা আজকাল ভাল লাগে না। রজত পর্যন্ত অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছে, কল্যাণবাবু তর্ক এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। সে বলছিলও সেদিন কথাটা। কী করা যাবে? কল্যাণবাবু সরকারের নির্জীব লাউড্ স্পীকার হলে এতবড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না হয়তো আজ।

এ কয়মাসে কল্যাণবাবুর চেহারাও অনেক খারাপ হয়ে গেছে। মুখে জেগেছে অনেক নতুন নতুন রেখা, হাতের সঙ্কুচিত পেশীর উপর ভেসে উঠেছে কালো নির্বীর্য শিরা। অটুট স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরেছে সন্দেহ নেই। মাছ-দুধ-বর্জিত মাপা ভাত-রুটির জোর আর কত হবে? তার সঙ্গে আছে নিঃসঙ্গ মনের দুশ্চিন্তা!

সেদিন একটি ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজা বাহাদুরের বাগান বাড়ির লোকেরা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। কিছুদিন ধরে উত্তেজনার অভাবে সবাই যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। আবার শুরু হল নিরবচ্ছিন্ন শলা-পরামর্শ, আলাপ আলোচনা, দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত গল্প-গুজব। কোন শুভ ঘটনা নয়, তবু নিজের কাছ থেকে পালানোর মত একটা অবলম্বন পেয়ে কল্যাণবাবুও যেন বেঁচে গেলেন।

একটি নিরীহ গোছের বৃদ্ধের কাছ থেকে ডিম দর করা নিয়ে সেদিন পাড়ার মধ্যে একটি ছোট-খাটো জটলা সৃষ্টি হয়েছিল। বুড়ো টাকায় আটটা করে দাম চেয়েছিল।.পাড়ার লোকেরা ধমকের চোটে বুড়োর ডিম যে সাইজে ছোট এবং নিঃসন্দেহে অপকৃষ্ট এবং বুড়োর দাবীটা যে অযৌক্তিক তা প্রায় প্রতিপন্ন করে এনেছিল। বুড়ো শেষটায় প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে দাম কমিয়ে

টাকায় ন'টা অবধি দিতে রাজী হয়েছিল। ফলে পাড়ার লোকদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। সস্তায় ডিম খাওয়ার লোভে সবাই উঠে পড়ে প্রমাণ করতে বসল যে এত খারাপ ডিম টাকায় দশটা না দেওয়াটা বুড়োর পক্ষে অপরাধের সামিল।

সেই সময় রবি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। স্বদেশাগত বুড়োর প্রতি সহানুভূতিটাই তার বেশী হল, না, ডিমের প্রয়োজনীয়তাটাই হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল, বলা কঠিন। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ ন'টার দামে ডিম কিনতে রাজী হয়ে গেল। এবং ডিমের ওপর নিজের মালিকানা-স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ভেবে, সে ঝুড়িসুদ্ধ ডিমগুলো বুড়োর মাথায় তুলে দিল বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

যারা উপস্থিত ছিল তারা সবাই এ-পাড়ার পুরোনো বাসিন্দা। তাদের দর-দস্তরের মাঝখানে একজন বাঙাল বে-আইনীভাবে ডিম তুলে নিয়ে যাবে, এ ঔদ্ধত্য তাদের পক্ষে পরিপাক করা কঠিন। একজন এগিয়ে এসে রবির জামার কলার ধরল এবং সেইটেই সূত্রপাত। রবি অবশ্য জোয়ান সাহসী ছেলে, প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। কিন্তু অত লোকের সমবেত আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারবে কেন? প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে জামা কাপড় ছিঁড়ে ফিরে আসতে হল তাকে। বুড়োর ডিমও রেহাই পেল না। ক্রুদ্ধ জনতা রাস্তার ওপর আছড়িয়ে আছড়িয়ে ভাঙল ডিমগুলো।

ঘটনার বিবরণ শুনে পটল, দীনেশ, তপন, শচীনের দল রাগে জ্বলে উঠল। এত বড় দুঃসাহস, 'ফুল্‌কো লুচি' আর আধ ছটাক সরু চালের ভাত-খাওয়া কোঁচানো ধুতি-পরা ঘটিদের? ওদের বুঝি খুবই ইচ্ছে হয়েছে রুই আর ইলিশ মাছের দেশের, পদ্মা আর মেঘনার দেশের লোকদের কব্জির জোরের পরিচয় জানতে? ঘটিদের শুভ ইচ্ছাটা পূরণ করার জন্য কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই পটলের দল তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল। এবং জটলায় উপস্থিত ছিল বলে যে দু'চার জনকে রবি সনাক্ত করতে পারল তাদের সামান্য চড়টা চাপড়টা ঘুসিটা উপহার দিয়ে প্রাথমিক প্রতিশোধ গ্রহণের পালা শেষ করে তারা এলো বৃদ্ধদের কাছে পরামর্শ চাইতে।

উদ্বাস্তু বলে কি আমাদের মান-সম্মানও থাকতে নেই নাকি কল্যাণদা?—পটল জানতে চাইল

ঐ একটা জিনিষ আছে যা কারও কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো পটল!

ব্যাপার বলল পটলের দল। রঙ চড়িয়েই বলল।

শুনে বৃদ্ধের দল তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

আমরা কি খেলার ফুটবল? ওদিক থেকে সিকি চাঁদ-ওয়ালারা লাথি মারবে আর এদিক থেকে তিন সিংহ-ওয়ালারা পাল্টা লাথি মারবে?—কালী-কান্ত বাবু জানতে চাইলেন।

স্বাধীনতার জন্য সব্বার থেকে বেশী যুদ্ধ করলাম আমরা। সব্বার থেকে বেশী মূল্যও দিলাম আমরা। তাতেও হল না। এখন সকলের লাথি ঝাঁটা খেতে হবে বুঝি আমাদের বসে বসে?—কল্যাণবাবু প্রশ্ন করলেন।

প্রথম উত্তেজনাটা ঝিমিয়ে আসার পর আলোচনা জমে উঠলো। অনেক রকমের মূল্যবান আলোচনা হল বৈঠকে।

বাঙালদের ঠকানোর জন্য ঘটিরা জায়গা-জমির দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে।

অফিসে-বাজারে সব জায়গায় বাঙালদের অপদস্থ করে ঘটিরা।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা হল ভাষা সম্পর্কে। আর তাতে সবচেয়ে বেশী অংশ গ্রহণ করলেন মনোরমবাবু, যিনি বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতেও ভুলেও বাঙাল কথা ব্যবহার করেন না।

কী বিচ্ছিরি মেয়েলী ভাষা ঘটিদের!

হবে না? ওরা যে নাকি স্বরে কথা বলে। খেলুমগো, ম'লুমগো, খাইনিকো, করিনিকো: এমনি সব কথা। কথা যেন চিনি, জল পড়লেই গলে যাবে।

আ-কারকে এ-কারই যদি করবি তো মাকে মে বললেই তো পারিস তোরা।

ভাষাকে ওরা কি কম বিকৃত করেছে? আঁব, নেবেছে, হুকুর, নুচি,—অমন হাজার হাজার শব্দ এরা বিকৃত করছে। তবু জাঁক করে বলবে ওদের ভাষাই শুদ্ধ ভাষা।

শেষ পর্যন্ত, ভাষার উপর আধিপত্য করে পশ্চিমবঙ্গীয়রা যে বাংলাভাষাকে রসাতলে পাঠাচ্ছে এ-বিষয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইল না।

কল্যাণবাবু রায় দিলেন, ওরা ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত ওদের সঙ্গে মেলা-

মেশা বন্ধ। অবিশ্যি হিংসাত্মক কিছু করা চলবে না। অন্ততঃ আক্রান্ত না হলে।

বিকেলের দিকে পুকুরঘাটে মেয়ে আর মহিলাদের সম্মিলিত মিটিং বসল। এখানকার সুর অবশ্য ভিন্ন।

বাঙালদের মত কাঠ-গোঁয়ার বাপের বয়সে দেখি নি।

গাছের সঙ্গে ঠোক্কর খেলে গাছকে ধরে মারে।

ঘটিরা মেরেছে তো কী হয়েছে? রবিরই তো দোষ।

ওরা রাগবে না কি জন্য? ওদের বাড়া ভাতে ভাগ বসাতে আসি নি আমরা?

এমন কি মন্দাকিনী দেবী, স্বামীর কাছা-ধরা বলে যাঁর সুনাম আছে, তিনি পর্যন্ত পুরুষদের নিন্দায় আজকে পঞ্চমুখ।

গোঁয়ার, বোকা, বাস্তব-বোধ-বর্জিত পুরুষদের সঙ্গে ঘর করা যে কত বড় ঝকমারী তার পরিমাণটা যখন প্রায় নির্ধারিত হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করে বসল সুধা।

কিন্তু ওরা অন্যায় করে মারলে তাও সইতে হবে আমাদের?

বয়স্কাদের কথায় সুনন্দারও পরিতৃপ্তি হচ্ছিল না, গোঁয়ার গোবিন্দ পটলের জন্য মনে মনে একটু আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও। সুধার কথায় সে সায় দিল সহজেই।

মনোরমা মধ্যপথ ধরলেন।

অন্যায় করলেও ওরা যে সংখ্যায় অনেক। ওদের সঙ্গে মারামারি করে আমরা পারব কেন? নিজেদের ঝামেলা নিয়েই অস্থির—মার খেয়ে ঘরে শুয়ে থাকলে কি সুবিধা হবে? আপোষে মিটিয়ে ফেলতে হয় এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার।

এদিকে স্বভাবতঃই পাড়ার পুরোনো বাসিন্দাদের মধ্যে অনুরূপভাবে বাঙালদের আত্মশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে গয়ায় পিণ্ড দেওয়ার আয়োজন হচ্ছিল!

বাঙাল, পুঁটিমাছের কাঙাল।

বাঙালরা পায়খানায় গিয়ে কাপড় ছাড়ে না।

বাঙালরা লংকার চচ্চড়ি রেঁধে খায়।

বাঙাল বাপ ছেলেকে হালার-পো-হালা বলে গাল দেয়।

ওরা পেঁপেকে বলে পাউপা। কুম্‌ড়োকে বলে কুমোড়। বেগুনকে বলে বাইগুন। অর্থাৎ ভাষার সম্ভ্রম বলে কোন জিনিস নেই। জিবটাকে চালিয়ে একটা শব্দ বের করলেই হল।

পূর্ববঙ্গীয়দের ভাষাগত বর্বরতা নিয়ে অনেক সরস আলোচনা হ'ল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিপর্যয়ের জন্যও বাঙালরাই নাকি দায়ী।

শালারা হাইকোর্ট দেখেনি জীবনে, অথচ এক কাঠা ফাঁকা জায়গার দাম পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বসবে অনায়াসে!

আড়াই টাকার মাছ সাড়ে তিন টাকায় কিনবে—শালারা এমন হাভাতে!

যে-দিকে ট্রাম চলে তার উল্টোদিকে মুখ করে নাবে, ব্যাটাদের তো এই বুদ্ধি? অথচ ওদের ভীড়ে ট্রামে ওঠা দায়।

না, তেলে আর জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি ঘটি আর বাঙালে কখনো মিল হতে পারে না। ওদের পার্শেল করে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়াই একমাত্র যথাযোগ্য ব্যবস্থা।

পরদিন রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়ীর লোকেরা দল বেঁধে বাজার অফিস করল। আতঙ্ক এমন বিস্তৃত হয়ে পড়ল যে পাড়ার মধ্যে সংখ্যাল্প বাঙালদের ভয়ের চোটে বাড়ী থেকে বের হওয়াই দায় হ'ল। ভিন্ন সম্প্রদায়ের বন্ধুদের মধ্যে বাক্য-বিনিময় বন্ধ রইল; নয়তো আলাপের জন্য গোপন ব্যবস্থা করতে হ'ল। বিচ্ছিন্নভাবে মারামারি বা গালাগালি বিনিময়ের ঘটনাও ঘটল দু'চারটে।

তার পরদিন পালের মাথা পটল জখম হয়ে হাসপাতাল ঘুরে বাড়ি ফিরল। তাকে নাকি একা পেয়ে তিন চারজন 'কাপুরুষ' ঘটি এক যোগে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল। তাও লাথি আর ঘুসির সাহায্যে সে একাই ওদের প্রায় কাবু করে ফেলেছিল। শেষটায় একটা লোহার রডের আঘাত, মাথা সরিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও তার কানের উপর এসে লাগে। না, হাসপাতালে যেতে হয়েছিল বলেই আঘাত তেমন কিছু গুরুতর নয়। সামান্য একটু জায়গা সেলাই করতে হয়েছে শুধু। তবে সেও পূর্ণ দাশের দেশের মানুষ। আততায়ীদের সে চিনে রেখেছে। সহজে তাদের ছেড়ে দেবে বলে যেন কেউ আশা না করে।

পর পর পাঁচ পিরিয়ড ক্লাস ছিল কলেজে। শেষের পিরিয়ডে আবার ছোকরা প্রফেসর গুচ্ছেরখানেক নোট দিলেন। প্রফেসরটি বোধহয় লেকচার দেওয়ার চেয়ে নোট দেওয়াটা সুবিধাজনক মনে করেন। ছাত্র-ছাত্রীরা লেখায় ব্যস্ত থাকে বলে গোলমাল কম করে। এত তাড়াতাড়ি বলে যাচ্ছিলেন প্রফেসরটি যে, লিখতে লিখতে তটিনীর হাত ব্যথা হয়ে গেল।

তৃতীয় পিরিয়ডটায় অবকাশ পাওয়া গেল। মেয়েদের কমনরুমে ঢুকে ফ্যানের তলায় গা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল তটিনী। ওদের ক্লাসের আর একটি মেয়ে পাশে বসে পড়ে কানে কানে জিজ্ঞেস করল : তোর চেহারা দিনে দিনে সুন্দর হচ্ছে কেন রে তটিনী ?

যে কথা বলছিল, তার চেয়ে তটিনী ফরসা। তবে তটিনীকে ফরসা না বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলাই সঙ্গত। গ্রামের মেয়ে, কাজেই দৈর্ঘ্যে সে অনেক মেয়েকে ছাড়িয়ে যায়। প্রস্থেও সে মানানসই। চোখ নাক আর একটু চোখা হলে তাকে সুন্দরীই বলা চলত। কিন্তু সে সুন্দরী কিনা আপাতত তা সে ভাবছে না। বলল : বলিস্ কি রে ? নিশ্চয় তোর দেখার ভুল।

না রে। সত্যিই খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে।

তবে বোধ করি কলের জলে রঙটা একটু ফরসা হচ্ছে। তা তো হয়।

যারা গ্রাম থেকে আসে, তারা সাধারণতঃ তাদের গ্রাম্য পরিচয় গোপন রাখতে চেষ্টা করে। তটিনীর অত বুদ্ধি নেই। সে যে-কোন সুযোগে জানিয়ে দেয় অনায়াসে যে, গ্রামের মেয়ে বলেই তার এত ত্রুটি বিচ্যুতি।

মেয়েটি বলল : সত্যি করে বল্‌তো—তুই নিশ্চয় প্রেমে পড়েছিস্। প্রেমে পড়লে মানুষের চেহারা সুন্দর হয়।

তটিনী লজ্জিত হয়ে বলল : ধেৎ। আমাকে তুই তেমন মেয়ে ভাবলি ?

কেন, প্রেমে পড়া কি খারাপ ?

খারাপ না হোক। কিন্তু ভালই বা কি ?

খারাপ ভাল জানি না। তবে প্রেমে পড়তে মন চায়। জানিস্—আমাদের জি-বি প্রেমে পড়েছে ? আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ের সঙ্গে ?

জি-বি মানে প্রফেসর গোবিন্দ ব্যানার্জী। ছোকরা প্রফেসর। যিনি লেকচার দেওয়ার ভয়ে ক্লাসে নোট দেন।

না—না। তা কখনো হয় ?

সত্যি বলছি। নমিতা আমাকে চিঠি দেখিয়েছে।

তা হলে কী উপায় হবে?—উপায়ের কথা ভাবতে গিয়ে তটিনী যেন ভয়ে শিউরে উঠল।

কী আবার হবে? ওরা বিয়ে করবে!

সে কি? ওদের বাপ মা রাজী হবে?

তটিনীর ধারণা, প্রেম জিনিষটা একটা দারুণ দৈব দুর্ঘটনা। কখন কার জীবনে ঘটবে কেউ জানে না। যার জীবনে ঘটে তার স্বাভাবিক জ্ঞান-গম্যি কিছু থাকে না। এমন দুর্ঘটনা যার জীবনে ঘটে তার আর রক্ষে নেই। অনেকটা ট্রেনের তলায় চাপা পড়ার মত। মানুষ যেমন ইচ্ছে করে ট্রেনে চাপা পড়ে না, তেমনি কেউ ইচ্ছে করে প্রেমে পড়ে না। কিন্তু হঠাৎ চাপা পড়েছে বলে ট্রেন যেমন ক্ষমা করে না; তেমনি হঠাৎ প্রেমে পড়লেও সমাজ তাকে ক্ষমা করে না।

হঠাৎ ফোর্থ ইয়ারের চপলাদি কমন রুমে ঢুকেই তটিনীকে দেখতে পেয়েই ডাকলেন: তটিনী, শোন্।

যেন তটিনীকে সে কমনরুমে দেখতে পাবে তা সে আগেই জানত।

অগত্যা তটিনী উঠল। তার সঙ্গী মেয়েটি মনের মতো আলোচনায় বাধা পড়ায় একটু যেন ব্যাজার হল। তটিনী তার দিকে তাকিয়ে নীরবে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে, তেমনি নীরব ভাষায় সে অনিচ্ছুক অনুমতি দান করল।

চপলাদির পিছনে পিছনে তটিনী দোতলার লম্বা বারান্দা ধরে যেখানে রেলিং-এ হাত রেখে একটা ছেলে অপেক্ষা করছিল সেখানে এসে দাঁড়াল। ছেলেটি পরিচিত, নাম অমিয়। ছাত্রদের মধ্যে যারা উদ্বাস্তু সমিতিতে কাজ করে সে তাদের মধ্যে একজন।

চপলাদি জিজ্ঞেস করলেন কোনরকম ভূমিকা না করে: তোদের পাড়ায় যে ঘটি-বাঙালে দাঙ্গা, তুই তার মধ্যে কী করছিস?

দাঙ্গা?—তটিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

পশ্চিমবঙ্গীয় আর পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে? রক্তারক্তি কাণ্ড। কেন, তুই কিছু জানিস না?

না তো?

আশ্চর্য! তোদের জজ্ সাহেবের বাড়িই তো একটা প্রধান আড্ডা।

তোদের বাড়ির কতকগুলো গুণ্ডা গোছের ছেলে পথে ঘাটে স্থানীয় বাসিন্দা যাকে পাচ্ছে ধরে ধরে ঠেঙাচ্ছে। সারা শহর তোলপাড়—তুই কিছু জানিস্ না? বাড়িতে থাকিস্ না নাকি তুই?

বাড়িতেই তো থাকি।

চোখ কান নাক বুজে থাকার নাম বাস করা? এর নাম বুঝি উদ্বাস্তুদের জন্য লড়াই? দুটো চারটে পোস্টার লেখা আর বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো?

তটিনী লজ্জায় প্রায় আধমরা হয়ে গিয়ে মাথা নীচু করল। পাড়ায় এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল আর সে কিছু জানে না? চপলাদি তো ঠিকই বলেছে—নিজের বাড়ির খবর যে রাখে না, সে নিজেকে সেবিকা বলে গর্ব করবে কোন্ লজ্জায়?

এবার অমিয় তটিনীর পক্ষ সমর্থন করে বলল: তটিনীকে অত বকবেন না চপলাদি। না হয় বেচারা—

চপলাদি ফেটে পড়লেন: তোমাকে ওকালতী করতে আমি ডাকিনি অমিয়। কাজ মানে কাজ। উদ্বাস্তুদের জন্য কাজ মানে উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করা। উদ্বাস্তুদের প্রসঙ্গ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আড্ডা দেওয়া নয়।

তটিনী এবার জবাব দিল: আমি আড্ডা দিই না।

আড্ডা দাও না তো আমি রাজা হয়ে গিয়েছি। খবরের কাগজ পড়?

পড়ি।

তার মানে তুমি খবরের কাগজও পড় না। খবরের কাগজে তো তোমাদের খবর বেরিয়েছে।

অমিয় আবার মধ্যস্থতা করল: আর বকবেন না তটিনীকে চপলাদি। বরং কী করতে হবে ওকে বলে দিন।

কী করতে হবে বলে দিতে হবে? ও নিজে বোঝে না? করতে হবে 'পীস্'। দু'পক্ষের লোকের কাছে গিয়ে বলতে হবে, দাঙ্গা খুব খারাপ।

কী কী বলব বুঝিয়ে বল চপলাদি।—তটিনী অনুরোধ করল।

বলব। ছুটির পরে মেয়েদের বোর্ডিং-এ এস। এখন যাচ্ছি। কাজ আছে।

যে মেয়েটাকে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে তটিনীর কাছে একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ বলে মনে হয়, সে মেয়েটি গটগট করে হেঁটে চলে গেল। সাধারণতঃ ব্যাটা ছেলেরাও অত জোরে জোরে পা ফেলে না।

তটিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। সে যদি চপলাদির মত হতে পারত। একটা আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করার জন্য আগুন হয়ে জ্বলে উঠতে পারত আর জ্বালিয়ে দিতে পারত সমস্ত গ্লানি আর অবিচারকে!

অমিয় বলল: চপলাদির সবতাতেই কড়াকড়ি।

না, উনি সত্যি কথাই বলেছেন। নিজের বাড়ির খবর আমার জানা উচিত। কত বড় বিশ্রী ব্যাপার বলুন তো!—নিজেরা নিজেরা মারামারি করে শক্তি ক্ষয় করা!

ভাববেন না। ও-সব আপনি মিটে যাবে উত্তেজনা চলে গেলে। উত্তেজনার সময় জানলেও আপনি কিছু করতে পারতেন না।

বোধ হয় পারতাম না। আমি তো একটা অকম্মার ধাড়ী।

নিজেকে অত ছোট ভাববেন না। শুধু কাজেই কি মানুষের পরিচয়?

তবে?

কাজ না হলে মানুষের চলে না, কিন্তু কাজই সব নয়। যেমন টাকা ছাড়া বাঁচা যায় না, কিন্তু টাকার মধ্যে ডুবে গেলে সর্বনাশ! মানুষের বিচারে কিন্তু এর চেয়ে ভাল কোন মাপকাঠি দরকার।

এমন কথা তটিনী জীবনে কোনদিন শোনেনি, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল একবার অমিয়কে। হাফ্‌শার্ট আর মালকোচা মেরে কাপড় পরা সুন্দর ছেলেটিকে দেখলেই খুব কর্মঠ বলে মনে হয়। অমিয় কাজও করে খুব, রাতদিন। তটিনী তাকিয়ে দেখল, অমিয় গভীরভাবে তার দিকে তাকিয়ে কী যেন আবিষ্কার করতে চাইছে—চামড়া ভেদ ক'রে, বুকের কাপড় ভেদ ক'রে।

সে কি তটিনীর হৃদয়টাকে খুঁজছে? দারুণ অস্বস্তি বোধ করে তটিনী চোখ নামিয়ে নিল।

কী কাজের ছেলে এই অমিয়! কী চমৎকার কথা বলতে পারে সে সকলের সঙ্গে! তর্ক করে, আচমকা কোন অভাবিত কথা বলে প্রতিপক্ষ তাকে অপ্রস্তুত করতে পারে না কখনো। অবশ্য চপলাদি আরও ভাল করে বলতে পারে; খৈ ফোটার মত অবিরাম গতিতে সেরা সেরা যুক্তি আর

কাজের কথা চপলাদি বলে যায়। কাজ করতে করতে, এমন কি বই পড়তে পড়তেও সে কথা বলে। কথারা যেন সার বেঁধে ঠিক তার জিভের নীচটাতে তৈরী হয়ে থাকে ; সে জন্য মস্তিষ্কের কোন শ্রম দরকার হয় না। জীবনে কথাই আসল। মানুষের হৃদয় জয় করতে হলে কথাই একমাত্র অবলম্বন। দেশের কাজ করা, পাঁচজনের কাজ করা মানে কথা বলা। অফুরন্ত কাজের সমুদ্রে তটিনী যদি ডুবে যেতে পারত। যে কাজের ভিতর দিয়ে মানুষের জীবনের দুঃখ আর গ্লানি, অত্যাচার আর অভিশাপকে মুছে ফেলা যায়। যে কাজ যাদুদণ্ডের স্পর্শের মত মানুষকে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে। সেই আশ্চর্য কাজের মধ্যে তটিনী যদি হারিয়ে যেতে পারত, যদি ভুলে যেতে পারত নিজের অস্তিত্বকে !

ভগবান তাকে শুধু অনুভব করার ক্ষমতা দিয়েছেন ; কথা বলার ক্ষমতা দেননি কেন ?

পরদিন নিজেদের বাড়িতে বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় পটলকে কে ডাকল : পটলবাবু, শুনুন।

পটল পাশ ফিরে তাকালো। তটিনী ডাকছে। এই একমাত্র মেয়ে, অত্যন্ত গম্ভীর আর কুনো প্রকৃতির বলে যার সঙ্গে পটলের মোটেই ঘনিষ্ঠতা নেই। পটল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে কাছে এগিয়ে গেল।

তটিনী বলল : আপনাকে একটা কথা বলব বলে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় আছি।

কী কথা বলুন তো ?

না, এমন বিশেষ কিছু নয়। এই মারামারিটা সম্পর্কে। মিটিয়ে ফেলার কী ব্যবস্থা করেছেন জানতে চাইছিলাম।

পটলের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছিল। এ-বাড়ির অনেক বৃহৎ বৃহৎ সমস্যায় চুলের ডগাটি দেখা যায়নি এ-মেয়ের। আর আজকে সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত উৎকণ্ঠা ? অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছে নাকি পটলের জন্য ?

ওরা ক্ষমা না চাইলে তো কিছু ব্যবস্থা হবে না তটিনীদি।

কিন্তু এ গণ্ডগোলটা যে চলতে দেওয়া উচিত নয়। উদ্বাস্তু আন্দোলনের খুব ক্ষতি হবে এতে। পুরোনো বাসিন্দাদের সহানুভূতি যে চাই আমাদের। আর সহানুভূতি তাদের আছেও প্রচুর।

ঘোষাল মশাই কল্যাণবাবুর মত কংগ্রেস নেতা, রজতবাবুর মত বামপন্থী—সবাই তাদের কাজের সমর্থক। আর এই মেয়েটা আন্দোলন, না মাথা, না, কিসের কথা যেন বলছে। অত সব ভেবে কাজ করা পটলের ধাতে পোশাবে না বাবা!

আপনি বরং এক কাজ করুন তটিনীদি। কল্যাণদার সঙ্গে কথা বলুন।

কল্যাণদাকে একটু বলবেন তবে আমার কথা? দু' তিনবার খোঁজ করেও পাইনি কল্যাণদাকে। আমার আবার দুপুরে কলেজ থাকে কিনা।

আচ্ছা, বলব।—বলে পটল সরে পড়ল। কিন্তু কল্যাণদাকে ইচ্ছে করেই সে কিছু জানালো না। ঐ মেয়েটার কথায় গুরুত্ব দেয় কে? যে মেয়েটার কোন ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই, হঠাৎ মারামারি দেখে তার মনে বিবেক জেগে উঠেছে। একটু সুযোগ দিলে সে হয়তো এর পরে বলে বসত যে ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ। অথবা হয়তো বলত এক গালে কেউ চড় দিলে আর এক গাল পেতে দেওয়াই নিয়ম। যেন খুব হাসির ব্যাপার, এই ভেবে আপন মনেই পটল হেসে উঠল হা হা করে।

অনেক কথা বলার ইচ্ছে ছিল তটিনীর। বলা হল না। এক কথায় যা বলা হয়ে যায়, তা যে ফেনিয়ে ফেনিয়ে দশ কথায় কী করে বলা যায় তার কৌশল তো সে জানে না। অথচ মানুষের মন জয় করতে হলে তাই তো দরকার। চপলাদি হলে পটলকে এত সহজে রেহাই দিত না কক্ষনো।

ঘটি-বাঙালের লড়াইটা খুব আড়ম্বর করে সুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু আর নতুন কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। বাঙালরা ঘটিদের নিন্দা করে করে ক্লান্ত হয়ে একসময়ে ভুলে গেল কথাটা; ঘটিরাও। বৈশাখের কালো মেঘ বৃষ্টি না দিয়েই উড়ে গেল বাতাসে। কোন আপোষ প্রস্তাব হল না; কোন শান্তি-সভা বসল না।

আট-দশ দিন পরে পটল নিশ্চিন্ত মনে পাড়ার ভিতর দিয়ে ঘুরছিল। তার সঙ্গে হাবুল, এ-পাড়ার পুরোনো বাসিন্দা। হাবুল পটলকে এক শো সিনেমা দেখাতে রাজী হয়েছে।

আরও দিন কয়েক পরে একদল পুলিশ এসে পটলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। শুধু পটলকে নয়, সেই সঙ্গে দীপঙ্কর বাবুকে, কৈলাসবাবুকে, কার্তিককে এবং নিচের তলার লক্ষ্মণকে। চোদ্দ-পনেরো জনের একটি

সশস্ত্র পুলিশদল দস্তুর মত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে তৈরী হয়ে এসেছিল। অভিযোগ—অনধিকার প্রবেশ এবং বাড়ির দারোয়ানকে হত্যা করার চেষ্টা।

বাড়ীওলা তাহলে তাঁর পাঁচ লাখ টাকার ইমারতের কথা ভুলে যাননি! শেষ সাক্ষাৎকারের দিন তিনি যে হুম্‌কি দিয়েছিলেন তা দুর্বলের মিথ্যা আস্ফালন নয়। তাঁর এই আক্রমণ যেমন চাতুর্যপূর্ণ, তেমনি অভিনব। যে দারোয়ানকে কেউ কোনদিন দেখেনি, তাকে হত্যা-চেষ্টার অভিযোগের জের কতদূর গড়াবে কে জানে? সুধীনবাবু অনুমান করলেন, বাড়ীওলা একটি অতি-দীর্ঘ অতি শক্তিশালী জাল পাতছেন, তার আদি বা অন্ত এখনো দৃষ্টির আড়ালে।

পটলের অভাবটা সবাই বিশেষভাবে অনুভব করল। বেকার মূর্খ ছেলেটিকে তল্পীবাহক বলেই সকলে জানত। সে-ছেলেটির প্রাণশক্তি যে সকলের হৃদয়ে আসন বিস্তার করেছে, তা এর আগে কেউ কোনদিন কল্পনাও করেনি। সেদিন কল্যাণবাবুর কোন কাজে মন বসল না। সুধীনবাবু সারাদিন এই একই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে সকলের মনকে আরও বিষণ্ণ করে তুললেন। ঘুঁটেউলী নিজে ঘুঁটে দিতে এলে মনোরমার আশঙ্কা হল, যে-ঘুঁটে পটল দেখে আনেনি তাতে কী কয়লা জ্বলবে? একটি ছেলের বে-আইনী অশিষ্ট দৃষ্টিক্ষেপের অভাবে সেদিন পুকুর-ঘাটটা প্রাণহীন বলে মনে হল সুনন্দার কাছে।

খবর পেয়ে পটলের কম্পাউণ্ডার বাবা এসে কল্যাণবাবুদের ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে বকে গেলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী নাকি তাঁরাই। কোন জবাব, কোন প্রতিবাদ বা আশ্বাসে তিনি কান দিলেন না। পটলের বাবার এই আকস্মিক আবির্ভাবে আজ সর্বপ্রথম সবাই জানলেন, এ পৃথিবীতে পটলও ভুঁই-ফোঁড় নয়। তার এক প্রতাপশালী বাবা আছেন, আছে সৎমা এবং ভাই-বোনেরা। দৃষ্টির অন্তরালে দুর্দান্ত প্রকৃতির পটলকে শাসনের বেড়াজাল দিয়ে আট্‌কিয়ে রাখতে চেষ্টার করেননি তার বাবা। পটল শাসন মানে নি। বাড়ির লোকদের কোন কাজে লাগেনি সে, কিন্তু কাজে লেগেছে পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের! নিজের ঘরে কোন স্নেহ পায়নি; তবু স্নেহের আসন তার পাতা রয়েছে ঘরে ঘরে।

এই ঘটনাগুলোর পরে পাড়ায় আবার কানা-ঘুষো সুরু হল, এ-বাড়ীর

লোকেরা কি সত্যিই তবে কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত? না হলে চার-পাঁচ জন লোককে গ্রেপ্তার করতে চোদ্দ-পনেরো জন রাইফেলধারী পুলিশ আসে? গুজবটা প্রথম রটেছিল পুলিশী অভিযানের সময়, যখন মেয়েমানুষ সুধা পুলিশদের হটিয়ে দিয়েছিল প্রথম দিন।

সেদিন কল্যাণবাবুর কাছে প্রশ্নটা তুললেন হরেনবাবু।

কল্যাণবাবু, আপনারা নাকি একটা গুপ্তদল করেছেন?

দেখুন তো, গায়ে লেখা আছে কিনা?—কল্যাণবাবু হেসে বলেছিলেন। হরেনবাবুও হেসেছিলেন।

আসলে আপনাদের দুর্দান্ত সাহস দেখে লোকের মনে এরকম ধারণা জন্মায়।

একটু ভেবে হরেনবাবু হঠাৎ এক আশ্চর্য প্রস্তাব করে বসলেন।

আপনারাই পারবেন, কল্যাণবাবু। আসুন না, আমাদের ইস্কুলটা ঢেলে সাজবেন আপনারা। ক্লাস সেভন্ অবধি আছে, এই এলাকার মধ্যে আর দ্বিতীয় ইস্কুল নেই। সামান্য চেষ্টায় এটা একটা প্রথম শ্রেণীর হাই স্কুল হতে পারে। কাজের লোক আছেন আপনারা। আসুন না, হাত মেলান।

শুনে কল্যাণবাবু পুলকিত হলেন। সামান্য খোস-গল্প থেকে কত বৃহৎ সম্ভাবনার জন্ম হয়, এ কথা কে না জানে?

উনিশ

লক্ষ্মণকে পুলিশে নিয়ে যাওয়ার পরদিন পরানের মনে হল বিপত্তিটাকে হয়তো একেবারে নির্ভেজাল অশুভ বলে গণ্য করা যায় না।

মনের সাহস অনেক বেড়ে গেছে। অনায়াসে বেলা দশটার সময় ডাইং-ক্লীনিংএর দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে আসতে পারল পরান। সময়টা চমৎকার! গোটা নিচতলাটাতে একটিও পুরুষমানুষ নেই।

অথচ এই সময়টাতে রুক্মিণীকে আজ বাড়ীতে পাওয়া যাবে। তার সোডার চোরাবাজারের কারবার বন্ধ হয়ে গেছে কদিন ধরে। কোন্ অজ্ঞাত সূত্র থেকে হঠাৎ বর্ষার অনর্গল ধারার মত অজস্র অজস্র সোডা এসে মাঠ-ঘাট বাজার-দোকান প্লাবিত করে দিয়েছে। কোনদিনও সোডার কারবার করে না যে দোকানী, তারও ঘরে আজ দশ-বিশ বস্তা সোডা জমে গিয়েছে। সোডার মূল্যমান এখন কণ্ট্রোল দামের চেয়েও নীচে নেমে গিয়েছে।

বারান্দায় লোক নেই দেখে পরান আর নিজেদের ঘরের দিকে গেল না। রুক্মিণীর ঘরের ভেজানো দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে দেখল, একা রুক্মিণী রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত। বাচ্চা ছেলেটি অবধি নেই ঘরে। ঈশ্বরের ইঙ্গিত এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কী করে বোঝা যাবে?

খুট করে দরজায় একটা শব্দ হতেই রুক্মিণী তাকিয়ে দেখল, চোর ঘরে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে। হাসল একটু।

দরজা বন্ধ কইর‍্যা দেওনডা ভাল না গো। খুল্যা রাখ।

অত ভয় পাইতে নাই, রুক্মিণী। খানিক পরে খুল্যা দিমু।

চোরের নাগাল ঘরে ঢুকতাছ কিয়ের লাইগ্যা পরাইন্যা? তোমার মতলবডা য্যান ভাল না।

পরান রুক্মিণীর কাছে গিয়ে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে বসল।

কোন কথা শুনুম না আউজকা রুক্মিণী। আউজকা আমার কথার জবাব দেওনই লাগব।

রুক্মিণী ভ্রূ কুঁচকিয়ে বলল: অখন যাও তুমি? সব কাম পইড়্যা রইছে আমার।

জবাব না শুন্যা যামু না।

রুক্মিণী খুন্তি দিয়ে উনুনের উপর চাপানো রান্নার বস্তুটা নাড়তে লাগল।

তোমার মুখে রা নাই কিয়ের লাইগ্যা, রুক্মিণী?—পরান আবার জিজ্ঞেস করল।

রুক্মিণী আচমকা রেগে উঠে বলল: ক্যামন ধারার মানুষ গা তুমি? কামের সময় গোলমাল কর আইয়া?

পরান থমকে গিয়ে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর কাকুতি-মিনতি করে বলল: ওগো ভালো বাপের মাইয়া, আমার পরাণের দুক্ষুডা কি বোঝন যায় না একবারও? তবে দোকানের কাম ফেল্যা রাখ্যা আইলাম কিয়ের ল্যাইগ্যা গো?

রুক্মিণী নীরব।

আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না রুক্মিণী।—হাচা কইতাছি।

এবার রুক্মিণী ধমক দিয়ে উঠল: বদ্ পোলার কথা শুনলে গা জ্বল্যা যায়। পরের বৌয়ের পিছে পিছে ঘোরন! সোয়ামী আছে, পোলা আছে, তা বইল্যা হুঁস্ নাই!

আমার কথা শুনবা না তবে রুক্মিণী? তবে আমি আত্মঘাতী হমু কইলাম।

পরানের কিন্তু মনে মনে অসহ্য হয়ে উঠছিল। এতদিন ধরে এত কাকুতি-মিনতি করছে, তবু মেয়েটার মনই পাওয়া যায় না! এত দেমাক কিসের মেয়েটার?

হঠাৎ পরান লক্ষ্য করল, রুক্মিণী আড়-চোখে তার মুখখানা দেখতে চেষ্টা করছে। এটা কিছুর ইঙ্গিত কিনা না বুঝেই দুঃসাহস করে পরান হাত বাড়িয়ে দিল রুক্মিণীকে ধরার জন্য।

আর বিদ্যুৎ-পৃষ্টের মত রুক্মিণী সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আরক্ত মুখে বলল: এত সাহস তর?

কিন্তু রাগ দেখে পরান আর ভয় পেল না। সব সময়েই তার চোখ ছিল রুক্মিণীর মুখের উপর। সে দেখেছে, রেগে ওঠার আগে এক মুহূর্তের জন্য চাপা হাসি ভেসে উঠেছিল রুক্মিণীর নরম নিটোল মুখে।

পলায়মান রুক্মিণীর পিছনে পিছনে ছুটল পরান। রুক্মিণী কিন্তু দরজা

খুলে বেরুতে চেষ্টা করল না। ঘরের মধ্যেই চারপাশ দিয়ে ঘুরতে লাগল। সে ঘুরছিল সাবধানে জিনিষপত্র বাঁচিয়ে। আর পরান থালা গেলাস উল্‌টিয়ে ফেলল, বিছানা-পত্র মাড়িয়ে দিল। শেষটায় রুক্মিণী দাঁড়িয়ে পড়ল উদ্বিগ্ন মুখে। সুযোগ পেয়ে পরান পিছন থেকে দুই হাত দিয়ে রুক্মিণীর দুই বাহু চেপে ধরল।

ফালাইয়া ছড়াইয়া নাশ কইর‍্যা দিল সব! য্যান এগ্‌গা দশ্যি!

এত আশ্চর্য শিহরণ মনে জাগে নারীর সামান্য স্পর্শে? পরান যেন অভিভূত হয়ে গেল; অবাক হয়ে অনুভব করল নিজের বুকের উদ্দাম চঞ্চলতা। আঙুলগুলো যেন বসে গিয়েছে রুক্মিণীর নরম বাহুর মাংসের মধ্যে! ওর অনাবৃত পিঠের ঘাম লেগেছে পরানের বুকে। কী আশ্চর্য নরম নারীদেহ, তবু কী উষ্ণ! ধোঁয়া আর ঘামের গন্ধে কিসের এত মাদকতা?

পরানের জীবনে এ এক অভিনব অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। পাড়ার মেয়েদের কাছে সে গিয়েছে, কই এরকমটা তো বোধ হয় নি তাদের স্পর্শে! তারা যেন কাঠ প্রাণহীন পুতুল মাত্র, আর এ মেয়েটি এল যেন নব জীবনের দূত! যুগ যুগ ধরে এ মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে পারে পরান। কোন ক্লান্তি আসবে না, আর কোন চাহিদা থাকবে না।

তুমি আমার, রুক্মিণী, তুমি আমার! —রুক্মিণীর কানের কাছে মুখ নিয়ে পরান বলল।

পরানের ক্রমবর্ধমান চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে রুক্মিণী ফিস্ ফিস্ করে বলল: কিন্তু এগ্‌গা বথা পরাইন্যা! পিতিজ্ঞা কর। এ-কথা তুমি জান, আর আমি জানলাম। আর যেন কাক-পক্ষীতেও টের না পায় এ-কথা!

অবশেষে রুক্মিণী তবে ধরা দিল? ভদ্রগোছের, সুন্দর চেহারার, অবস্থাপন্ন বাপের ছেলে, তবু জোঁকের মত লেগে ছিল তার পিছনে! কতকাল আর তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায়! জীবনে না হয় লাগলই একটু রঙ! সুখ তো রুক্মিণী পায়নি কোনদিন জীবনে। সোয়ামী আছে বটে,— না দেয় আদর, না এমন কি ভাত-কাপড়!

দিন দুই পরে নিচের তলার জীবন-যাত্রায় দারুণ বিপর্যয় দেখা দিল। লক্ষ্মণের কাছে যারা কাজ করত তারা পরানের কাছে এসে বলল: নবাবের

মত বইয়া আছস্ যে পরাইন্যা ? কাজে লাগ্যা পড়। কাম দে আমাগো। বইয়া থাকলে খাওন দিব কেডা ?

সেই কথাই তো ভাবছে এ-কদিন ধরে পরান। পিতার বিরাট ব্যবসার এ ঝামেলা এখন সে কী করে সামলাবে ? ধোবার কাজের যাবতীয় খুঁটি-নাটি ব্যাপার সে কোনদিন শেখেনি। ঢাকায় থাকতে পিতার আদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ করত মাত্র। এখন এই স্তূপাকার কাপড়ের মধ্যে কোন্ বাড়ির কোন্ কাপড়, কী তার চিহ্ন, কী তার হিসাব নিকাশ,—এ সবের সে কিছুই জানে না। সবচেয়ে বড় বিপদ হল, পর্বত-প্রমাণ দায়িত্বের চেহারাটা দেখেই সে ভয়ে আঁৎকে উঠে পিছিয়ে এল। বরাবর বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকলে হয়তো অন্যরকম হতে পারত। তা হলে হয়তো সাহস করে কাজে হাত দিয়ে ঠোক্কর খেয়ে খেয়েও কাজটা বুঝে নিতে পারত শেষ অবধি। কিন্তু ড্রাইং-ক্লীনিং-এর মালিক হয়ে কাজের থেকে দূরে সরে গিয়েছিল সে। একরকম ধরেই নিয়েছিল যে তার ধোবার জীবন শেষ হল, এখন থেকে সে ভদ্রলোক! কে সেদিন জানত, ভাগ্য এমন পরিহাস করবে তার সঙ্গে ? এক আনা কাজও করতে হয়নি যাকে, তার ঘাড়ে এসে পড়ল ষোল আনা কাজের দায়িত্ব !

পরান না পারল সাহস করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে, না পারল ভরসা করে প্রতিবেশীদের বলতে : তোমরা দেখে-শুনে কাজ গুছিয়ে তুলে আমাকে বাঁচাও। শুধু বসে রইল মাথায় হাত দিয়ে—পর্বত-প্রমাণ দুশ্চিন্তার ভারে মাথাটা যাতে না ধ্বসে যায়।

পরান বুঝতে পারছিল, এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় রুক্মিণীর কাছে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু তারই বা অবকাশ কোথায় ? উদ্বিগ্ন খদ্দেরের দল আসতে লাগল ভীড় করে। একবার এলে আর যেতে চায় না তারা, প্রশ্নে প্রশ্নে বিপর্যস্ত করে তোলে, গালাগাল দেয়, মারের ভয় দেখায়। নাছোড়বান্দা খদ্দেরদের সে ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড় চিনে নিয়ে যেতে বলে।

ভাগ্যিস তাদের সংসারে এক দূর সম্পর্কিত কাকা আছে। সে তার নিজের আয়ত্তের জামা কাপড়গুলো কোনরকমে নিজে খেটে-খুটে চালিয়ে নিল। পরানের হাতে ড্রাইং-ক্লীনিং-এর কিছু টাকা ছিল। তাই সংসারটা রক্ষা পেল কোন রকমে। ড্রাইং-ক্লীনিং-এর দোকানটা বন্ধ রাখল। কিন্তু

তাই বলে বিশ্রাম নেই। কাকাকে সাহায্য করতে হয় সারাদিন ; আর আশ্রিত মানুষটার ধমক খেয়ে অপমান হজম করতে হয়।

লক্ষ্মণের খবর নিতে পরান রোজই যায় সুধীনবাবুর কাছে। একই উত্তর, কঠিন ধারা, জামিন মিলছে না। নিজের সংসারের প্রয়োজনেও সুধীনবাবু এতদিন অবধি ওকালতির লাইসেন্স নেননি শরীরটা অপটু হয়ে পড়েছে বলে। এবার বাড়ীর লোকদের কেসের তদ্বিরের ব্যাপারে সেই লাইসেন্স নিতে হয়েছে সুধীনবাবুকে। বাইরের উকিলের খরচ জোগাবে কে!

লক্ষ্মণের কাছে যারা কাজ করত, তাদের অবস্থা আরও সাংঘাতিক। কয়েকদিনের মধ্যেই দুটি পরিবার তো বাড়ি ছেড়েই চলে গেল।

রুক্মিণীর ঘরে দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না কয়েকদিন হল। রুক্মিণী এখন বেকার। হরেকেষ্ট ক্ষিপ্ত কুকুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজের সন্ধানে। স্থায়ী কাজ মেলে না ; দিন মজুরের কাজ পায়, তাও মাঝে মাঝে। জানা-শুনা বেশী নেই, যোগাযোগ নেই অন্য মজুরদের সঙ্গে। কী করে বেশী কাজ পাবে? পরান আসার সময় পায় না। একবার এসে জানিয়ে গিয়েছে নিজের দুরবস্থার কথা। রুক্মিণীকে বলেছিল, তাদের ঘরে খেতে। রুক্মিণী রাজী হয়নি।

শেষে রুক্মিণী এক বাড়িতে ঝি-এর কাজ পেল। বারো টাকা মাইনে, এক বেলা খাওয়া। খাবারটা বাড়িতে নিয়ে এসে তাই তারা তিনজনে খায়।

দিন কুড়ি-পঁচিশ পরে হরেকেষ্ট একদিন খুশি হয়ে বাড়ী ফিরল। একটা চালু ডাইং-ক্লীনিং-এর থেকে মোটা অর্ডার পেয়েছে সে।

যে বাড়িতে রুক্মিণী কাজ করত, সে বাড়ির গিন্নীর থেকে পাঁচটা টাকা আগাম নিয়ে এল সে। তাই দিয়ে কাজ শুরু হল তাদের। পরদিন আর রুক্মিণী বাড়ির কাজে গেল না। অসুস্থ বলে খবর পাঠালো। হরেকেষ্টকে সাহায্য না করলে এত বড় কাজ উঠবে কী করে?

কাজের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যের দিকে হরেকেষ্ট একটু বাইরে গিয়েছিল। রুক্মিণী অবসন্নের মত দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল ঘরে। দীর্ঘদিন এক বেলা আধপেটা করে খেয়ে খেয়ে বড়ই দুর্বল হয়ে গেছে শরীরটা। তার উপর দু'দিন ধরে পরিশ্রম গেছে অমানুষিক। আর মাত্র একটা দিন। ডাইং-ক্লীনিং-এর কাজের প্রথম টাকাটা পাওয়া যাবে কাল।

হঠাৎ পরান এসে বলল : রুক্মিণী! যাস্ তো চল্।

কই যামু?

জীবনের উপর ঘেন্না ধইর‍্যা গেছে। খাওন-দাওন করুম আউজকা পরাণ ভইর‍্যা।

রুক্মিণীর যাওয়ার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না। যাওয়ার মত শরীরের অবস্থাও নয়। কিন্তু কী নবাবের খানা খায় পরান বাইরে গিয়ে দেখতে হয়। অনাহারী মানুষের কাছে খাদ্যের লোভ প্রচণ্ড।

মাণিকতলা মেইন রোড ধরে তারা রেল সড়ক অবধি গেল। রেল লাইনের ধারে জঙ্গল-ঘেরা খানিকটা জায়গা। রাত্রে লোকজনের চলাচলও থাকে না এদিকটায়। সেই জঙ্গলের মধ্যে রুক্মিণীকে নিয়ে গিয়ে বসালো পরান।

কই আইলাম গো?

আমি লগে আছি তবু তর ডর করে?

পরান পুরি, মাংস, আলুর দম, মায় জিলিপি অবধি কিনে নিয়ে এল অনতিদূরবর্তী দোকান থেকে।

গুরুপাক খাদ্যগুলি খেয়ে রুক্মিণী আরও অবসন্ন বোধ করল।

ঘাসের উপর শুইয়া জিরাইয়া লও রুক্মিণী।—পরান বলল।

তখনও রুক্মিণী কিছু সন্দেহ করেনি। পরান যখন পাশে শুয়ে হাত ধরে তাকে কাছে আকর্ষণ করল, তখনো রুক্মিণী পরানের অভিসন্ধিটা অনুমান করতে পারেনি। যখন বুঝতে পারল, পরানের দৃঢ় বেষ্টনীতে তখন তার দেহ বন্দী। জগদ্দলের মত প্রবল চাপে দুর্বল শরীরে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড় হল। চেষ্টা করে নিশ্বাস স্বাভাবিক করল রুক্মিণী। তবু বিশেষ কোন বাধা সে দিল না।

বিশ্বাসটা প্রবল ছিল বলে বিস্ময়-বোধটা সীমা ছাড়িয়ে গেল। আর অতি-বিস্ময় ঝিমিয়ে পড়া স্নায়ুগুলোকে সক্রিয় হতে বাধা দিল।

সত্যিই ভালবাসস্ আমাকে পরাইন্যা?—রুক্মিণী হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল।

রুক্মিণীর গালের উপর নিজের ঘামে ভেজা গালখানা রেখে চোখ বুজে পরান বলল : সত্যি সত্যি সত্যি! এ্যামন ভাল জীবনে কক্ষনো কাউকে বাসি নাই।

অনতিদূরে প্রচণ্ড কলরব করে ট্রেন চলে গেল একখানা। মাটির সঙ্গে ওরাও কেঁপে উঠল। মোটরের হর্ণ শোনা গেল পাশ থেকে। কত কাছে লোকালয়, তবু কত দূরে!

ফেরার পথে পরান খুসী হয়ে ভাবল, এতদিনে তার জয় সম্পূর্ণ হ'ল। আর তাকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রুক্মিণীর হবে না কোনদিনও। কোন সন্দেহ নেই, অবশেষে তার জীবনেও ঘটল নারীর পদপাত। এরপর আরও কতদিন কতবার এই মেয়ের অনায়াস সাহচর্য সে লাভ করবে! ছল-চাতুরী, সাধ্য-সাধনার আর দরকার হবে না। জীবনের অনেক দুঃখের মধ্যে এইটুকুন সান্ত্বনার কথা সে ভুলবে না কোনদিনও।

পরান ছিল লঘু মেজাজের ছেলে। আমোদ আর স্ফূর্তির মধ্যে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলেই সে খুশি হত। ধুরন্ধর বাপের পক্ষছায়ায় থেকে কোন ঝক্কি ঝামেলা তাকে পোয়াতে হয়নি কোনদিন। কোন গভীর সমস্যা, কোন গভীর আবেগ তার ফুরফুরে ফাজিল বাতাসের মত জীবনটাকে বিপর্যস্ত করেনি কোনদিন। কিন্তু সে জানত না, বর্তমানে তাদের বাস চোরাবালুর উপরে। লক্ষ্মণকে হাজতে যেতে হল, আর একেবারে হঠাৎ জীবনের রুদ্র ভয়াল রূপটা পরানের সামনে অনাবৃত হয়ে পড়ল। ব্যবসায়ের দায়িত্ব সে নিতে পারল না বটে; কিন্তু অক্ষমতার লজ্জা গ্লানি আর অনুশোচনায় তার সারা অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। তার জীবনে প্রথম দুঃখের ছোঁয়া লাগল।

এই সময়ে পরানের জীবনে একটি নিবিড় আশ্রয়ের দরকার ছিল। এতকাল সে রুক্মিণীর পিছনে পিছনে ঘুরেছে শুধু সাময়িক স্ফূর্তির জন্য। আজও স্ফূর্তির জন্যই রুক্মিণীকে ঘরের বার করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সে আবিষ্কার করল, রুক্মিণী শুধু যে আনন্দ দিতে পারে তা নয়, সে তার জীবনের অবলম্বনও হতে পারে। রাত্রির রহস্যময়তার মধ্যে সে আবিষ্কার করল, রুক্মিণীকে সে ভালবাসে। ভালবাসা এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তা মানুষের সমস্ত চরিত্রকে রূপান্তরিত করে দেয়।

শরীরটা তখনও ঝিম্‌ঝিম্ করছিল রুক্মিণীর। পরানের কাঁধে শরীরের ভার রেখে চলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু উপায় নেই। সদর রাস্তা এটা।

হাচাই আমাকে ভালবাসস্ তুই পরাইন্যা? লয়?—রুক্মিণী আবার জিজ্ঞেস করল।

বাসি-বাসি-বাসি! পরান গাঢ়স্বরে তাকে আশ্বাস দিল।

তবে আমার ধর্ম নষ্ট করলি কিয়ের লাইগ্যা আউজকা? আমার যে সোয়ামী আছে!

আচম্‌কা প্রশ্নে বিব্রত পরান খানিক চুপ করে থেকে একটা অর্থহীন উত্তর দিল: তরে ভালবাসি রুক্মিণী। ভালবাসা কি দোষের!

পরান যখন ভাবছিল তার জয়ে আর কোন সন্দেহ নেই, সে জানতেও পারল না যে ঠিক সেই মুহূর্তে তার সন্দেহাতীত পরাজয় ঘটেছে রুক্মিণীর কাছে। ঠিক এই জিনিসটার কোন প্রয়োজন ছিল না রুক্মিণীর জীবনে। তার স্বামী আছে। নির্বোধ অত্যাচারী স্বামীর প্রতি রাগ ও অভিমান বশতঃ সে পরানকে অনেকটা প্রশ্রয় দিয়েছে; তাকে জীবনে পুরোপুরি গ্রহণের কথা সে কল্পনাও করেনি। পরানের কাছে সে চেয়েছিল, যা সে অন্যত্র পায় না। দুঃখের জীবনে খানিকক্ষণের সুখ-সান্নিধ্য। দুটো মিষ্টি কথা, একটু অনুগতের মিষ্টি হাসি, বড় জোর কিছু শারীরিক আদর সোহাগ। কিন্তু পরান এ কী করে বসল?

গত কয়েক মাসের পুরো ছবিটা ভেসে উঠল রুক্মিণীর মনে। বিশ্লেষণ করে, যুক্তি প্রয়োগ করে, ঘটনাগুলোকে যে পর পর সাজিয়ে নিল তা নয়। গোটা ছবিটা হঠাৎ বিনা চেষ্টায় এক সঙ্গে জেগে উঠল মনে। ছবিটা যেন তৈরীই ছিল মনের তলায়; শুধু উপরে ভেসে উঠল এখন। হরেকেষ্টর ব্যবসা বান্‌চাল্ করে দিল লোকেরা ঠকিয়ে ঠকিয়ে। ন্যায্য দাবীর কথা বলায় লক্ষ্মণের কাছে হরেকেষ্টর সেই লাঞ্ছনা! লক্ষ্মণ জেলে গিয়ে তাদের জীবনযাত্রাকে অচল করে দেওয়া! সোডার চোরাকারবার বন্ধ হয়ে যাওয়া!—সব মিলিয়ে এটা যেন একটা সুপরিচালিত চক্রান্ত-জাল। যাতে তাদের জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আর এই চক্রান্ত-জালের শরিক পরান তাদের ক্রমিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে তার জীবনের সীমানায়। বিপর্যয় চরম সীমায় পৌঁছলে পরানও সুযোগ নিয়ে সামান্য খাদ্য দিয়ে কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিল চরম মূল্য। পরাণ তার দুষ্‌মন। তার জীবনের সমস্ত দুর্দশার জন্য পরান দায়ী।

কালো অন্ধকার রাত। প্রকাণ্ড রাস্তার কালো পীচ থেকে যে কালোটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, কলকাতা শহরের অত বিজলীর আলোও যেন সে

দিন দুই পরে ঝামেলা মিটলে লক্ষ্মণ তার ব্যবসায়ের অবস্থার খবরাখবর জানতে পারল। সর্বনাশের পুরো বিবরণটা পেয়ে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। একমাস মাত্র অনুপস্থিত ছিল সে। এর মধ্যেই তার সোনার ব্যবসা ছারখার হয়ে গেছে! গ্রাহকেরা হাতছাড়া হয়ে গেছে। ডাইং-ক্লীনিং বন্ধ। নিজেকে প্রতিমুহূর্তে বঞ্চিত করে জমানো পুঁজি শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সামান্য অমনোযোগে সাজানো ব্যবসায়ের সমাধি রচিত হয়েছে। আজকে একশো গুণ মনোযোগ দিয়েও কবর খুঁড়ে সে-ব্যবসাকে টেনে তোলা অসম্ভব কল্পনা মাত্র।

পরানের ডাক পড়ল লক্ষ্মণের কাছে।

হারামজাদা, শূয়ার, খান্‌কীর পুত, নাকে তেল দিয়া ঘুমাইয়া আছিলি বুঝি?

পরান বুঝতে পারল, বিপদ আসন্ন। কী ভীষণ রেগেছে বাবা! নাক ফুলে উঠেছে। কপালের শিরা দপ দপ করছে—এত দূর থেকে অবধি দেখা যাচ্ছে। বাপের রাগের পরিমাণ দেখে পরান বুঝতে পারল, কত বড় অন্যায় করেছে সে ব্যবসার পুরো দায়িত্ব গ্রহণ না করে!

পরানকে চুপ করে থাকতে দেখে রাগ আরও বেড়ে গেল লক্ষ্মণের।

রা করস না যে বেজন্মার পুত! ক', ডাইং-ক্লীনিং বন্ধ করছস্‌ কিয়ের লাইগ্যা? ক', গাহেক-গুলান ছাইড়্যা দেছস্‌ কিয়ের লাইগ্যা? ক', শীগগীর। জবাব দে!

আমি কী করুম বাবা? আমি গাহেক চিনি না কিছু না।—করুণভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল পরান।

গাহেক চিনস্‌না বুঝি, না? মায়ের গব্‌ভে আছস বুঝি অখনো? জিগাই, গাহেকরা মাটির পিরথিমীতে থাকে, না সগগে থাকে?

পরান নীরব।

জবাব দে। নয়তো মোচড়াইয়া ভাইঙ্গা দিমু পিঠের হাড়!

মাটিতেই থাকে।

অ, তবে খুজ্যা লওনের সময় পাস্‌ নাই, কেমুন? ফর্সা পিরন গায় দিয়া মাগীগুলার পোন্দে পোন্দে ঘোরানেই সময় কাট্যা গেছে? আমার ঘরের ভাত

আর তর কপালে জুটব না রে! এতকাল যা খাইছস্ অখন তার শোধ লমু আমি।

হাত দিয়ে মারতে জুৎ লাগল না লক্ষ্মণের, হাতে ব্যথা লাগে। রান্না করার মোটা মোটা চেলাকাঠ পড়েছিল। তাই একখানা তুলে নিয়ে অত বড় ছেলেকে মারল লক্ষ্মণ।

মারের শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা দৌড়ে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো দরজার গোড়ায়। দু' তিনজন সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বহু কষ্টে নিবৃত্ত করল লক্ষ্মণকে। পরানকে টেনে নিয়ে এল বাইরে। ক্ষতস্থানগুলিতে জল পট্টি দিয়ে যন্ত্রণা হ্রাস করতে চেষ্টা করল।

প্রতিবেশীরা পরানকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে লক্ষ্মণকেই দোষী সাব্যস্ত করল।

কী চণ্ডালের মতো রাগ লক্ষ্মণ কাকার!

কেমন ধারার খামোখা রাগল লক্ষ্মণ কাকা? পরাণ্যার কী বা বয়েস! বেবসার অত ঝামেলার সে কী জান্‌ব?

তাও একটা মানে বুঝতাম, যদি সময়কালে শিখাইয়া পড়াইয়া লইত পোলারে!

সারাদিন বাইরে বাইরে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘুরে বেড়াল পরান। মনের সঙ্গে সে কী অমানুষিক যুদ্ধ। এত বয়সে বাপের হাতে মার খাওয়া এত লোকের সামনে! এ যে কী লজ্জা, এ যে কী অপমান, তার বোধ করি পরিমাপ হয় না। যদি চেনা মানুষের কাছে এ মুখ আর বের করতে না হত! যদি সে পালিয়ে যেতে পারত! কিন্তু তারও উপায় নেই। একটি মেয়ের প্রতি দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে তার। মেয়েটির জীবনের সঙ্গে তার জীবন জড়িয়ে গিয়েছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। সে আজ অসহায়, বিধবা। ভালবাসার পাত্রীর এই দুঃসময়ের দায়িত্ব কী করে অস্বীকার করবে সে?

আর একদিন ঠিক এমনি করে অকস্মিক ভাবে তার ঘাড়ে আর একটা দায়িত্ব এসে চেপেছিল—তার বাবার ব্যবসার দায়িত্ব। সেদিন সে দায়িত্ব পালন করার জন্য না ছিল যোগ্যতা, না ছিল উপযুক্ত মনোভাব। একটা লঘু চপল ছুটি যাপনের মনোভাব সেদিন তাকে পেয়ে বসেছিল। সেদিনের সেই অক্ষমতার জন্য গত এক মাস ধরে সে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে এই এক

মাঝে সে বুঝেছে যে জীবনটা ছুটি যাপন নয়। দায়িত্ব নিতে না পারলে জীবন মূল্যহীন। তা ছাড়া রুক্মিণী শুধু দায়িত্ব নয়, সে এখন তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেলে অন্ধকারের ঘোম্‌টায় মুখ আড়াল করে পরান বাড়িতে ঢুক্‌লো। সে সোজা গেল রুক্মিণীর ঘরের দিকে।

অগোছালো বিছানার স্তূপের মধ্যে রুক্মিণীর ছেলেটা শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মেঝের উপর চুপ করে বসে আছে রুক্মিণী ঠিক যেন একখানি মাটির তৈরী প্রতিমা। অগোছালো রুক্ষ চুলের রাশিতে জট পাকিয়ে গিয়েছে। এ ক'দিনের মধ্যে মুখখানা শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। বোবা জানোয়ারের মত চোখ দুটো নিষ্পন্দ, ভাষাহীন।

পরান কাছে গিয়ে বসল, তবু মাটির প্রতিমার সাড়া জাগল না। যে-স্বামী নির্যাতন করেছে শুধু, বিনিময়ে ভাত-কাপড়ও জোগাতে পারেনি, তার জন্য শোকটা কি খুবই বেশী হয়েছে মেয়েটার? ভালবাসার মানুষ কাছে এসে বসেছে, তবু খেয়াল নেই?

পরান ডাকল: রুক্মিণী! আমার মনের ফুল! কথা কও!

মাটির প্রতিমার তবু স্পন্দন নেই।

পরান এবার হাত দিয়ে শাড়ী সরিয়ে দিয়ে রুক্মিণীর নিরাবরণ নিভাঁজ স্তনের উপর রাখল হাতখানা। একটুখানি মৃদু চাপও দিল। রুক্মিণীর উপর তার অধিকার ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত। সংকোচ করার বা ভূমিকা করার আর প্রয়োজন কি?

এবার একটু নড়ে চড়ে উঠল যেন মাটির প্রতিমাটি। না, খুব বেশী ব্যস্ততা দেখালো না রুক্মিণী। ধীরে সুস্থে পরানের হাতখানা বুক থেকে তুলে নিয়ে গেল মুখের কাছে। একখানা আঙুল মুখের ভিতর পুরে দিয়ে চাপ দিল দাঁত দিয়ে। চাপ বাড়ালো আস্তে আস্তে। পরান চাপা আর্তনাদ করে হাত টেনে নিতে চাইলেও ছাড়ল না সে। রুক্মিণীর দাঁত রক্তে লাল হয়ে গেল; রক্ত নেমে এল তার ঠোঁটের প্রান্তে, গড়িয়ে পড়ে ভিজিয়ে দিল অনাবৃত স্তনটিকে। এই ঠোঁটে, এই বুকে, একদিন পরানের ছোঁয়া লেগেছিল। পরানেরই রক্তে সে-দাগ মুছে যাক আজ।

কোনরকমে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে পরান যন্ত্রণা-বিকৃত কণ্ঠে বলল: এ

কী, এ কী করতাছস্ রুক্মিণী? আমাকে কামড়াইয়া দিতাছস্ কিয়ের লাইগ্যা? কী দোষ করছি আমি?

রুক্মিণী এতক্ষণে কথা বলল। দুর্বল অথচ ঝাঁজালো গলায়:

কী দোষ করছস? তাও মুখ দিয়া কওন লাগব? তুই খুনী—তর লাইগ্যা আমি আজ বিধবা!

অভিযোগের অভিনবত্বে পরান স্তম্ভিত হয়ে গেল। কল্পনাকে আরো দূর প্রসারিত করেও হরেকেষ্টর মৃত্যুর সঙ্গে নিজের কোন সামান্যতম যোগাযোগও আবিষ্কার করতে পারল না সে। পৃথিবী যেন ঘুরছে! শরীরের স্নায়ু-তন্ত্রীগুলো অবশ হয়ে আসছে যেন! এক অতি জটিল দুর্বোধ্য জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরানের উদ্বেলিত বিক্ষুব্ধ প্রশ্নগুলো মূক হয়ে গেল। বুদ্ধি দিয়ে নাগাল পাওয়া গেল না তার। তার অপরাধ যে, সে একটি মেয়েকে ভালোবেসেছিল! ভালোবেসে যে-মেয়েটি জীবনের দুর্লভতম আনন্দের সঙ্গে তার পরিচয় করে দিয়েছিল। আর আজকে জীবনের নিষ্ঠুরতম বেদনা আর লজ্জাও উপহার দিল সেই মেয়েটিই।

মেয়েটিকে ভালোবেসে সে অন্যায় করেছিল? কিন্তু সে অন্যায় তো সে একা করেনি! রুক্মিণীর মুখের ভাষায় যে সমর্থনের কথা লেখা ছিল, তা তো সে বারবার নির্ভুলভাবে পাঠ করেছে। এমন কিছু তো সে করেনি যাতে রুক্মিণীর আপত্তি ছিল। তবে আজ কেন রুক্মিণী সব অপরাধের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়াতে চাইছে?

জীবনের এই বিশ্বাসঘাতক মূর্তির সামনে থেকে ভয়ে পালিয়ে গেল পরান। দরজা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে পিছনে কার খিল খিল হাসির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। প্রতিবেশী কোন বৌ আড়ি পেতে দেখছিল তবে তার অপমানের ঘটনাটা? কত লজ্জা, আর কত লজ্জা দেবে মা ধরিত্রী?

পরদিন খুব ভোরে উঠে মানুষের সাড়া জাগার আগে পরান বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ফিরে এল অনেক রাত্রে। তারপর দিনও তাই করল। তৃতীয় দিন সকালেও তেমনি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, কিন্তু আর ফিরে এল না।

সেদিন বিকেলের দিকে অনির্দেশ্যভাবে ঘুরতে ঘুরতে পরান এসে পড়েছিল কলেজ স্ট্রীটে। কলেজ স্ট্রীটের তখন অদ্ভুত চেহারা। একটা বিশ্রী ধোঁয়ার

গন্ধে চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছে। দু'পাশে দু'খানা ট্রাম জ্বলছে। একখানা আধপোড়া স্টেটবাস প্রেতের মত ফাঁকা রাস্তা পাহারা দিচ্ছে! রাস্তা জনমানব শূন্য। দু'পাশের দোকান-পাটের দরজা-জানালা বন্ধ। দূরে হঠাৎ একদল পুলিশকে বুটের শব্দ ছড়িয়ে এদিকে ছুটে আসতে দেখে সে দৌড়িয়ে গিয়ে ঢুকলো সামনের গলির মধ্যে। গলিটার বাঁকে একদল ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রত্যেকের হাতে একখানা করে ইট। কিছু না বুঝে পরানও একখানা ইট তুলে নিল। ছেলেদের সঙ্গে ছুটে গলির মুখে গিয়ে আগন্তুক পুলিশ দলের উপর সে-ও ছুঁড়ে দিল হাতের ইটখানা।

ছেলেগুলির সঙ্গে অনেকক্ষণ ছুটাছুটি করল পরান। শেষটায় এক সময়ে ছেলের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার মত মিলিয়ে গেল। শুধু একটি লোক এসে পরানের হাত ধরল।

আপনার নাম কি?

পরান নাম বলল।

মনে হচ্ছে আপনি উদ্বাস্তু, নয় কি?

আইজ্ঞা হ।

জানেন, আজকে এটা কিসের গোলমাল? উদ্বাস্তুদের মানুষের মত বাঁচার দাবী নিয়ে আমরা মীটিং করছিলাম। তাইতেই পুলিশ ক্ষেপে গিয়ে কাঁদুনে বোমা ছুঁড়েছে, গুলী ছুঁড়েছে। আপনি করবেন আমাদের সঙ্গে কাজ?

ভদ্রলোকের কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝল না পরান। এ-ধরণের কথা কোনদিন শোনেওনি সে। শুধু এটুকুন বুঝল, তার মনের অবরুদ্ধ আক্রোশকে প্রকাশ করার একটা পথ হয়তো দেখাতে পারবেন ভদ্রলোকটি।

করুম।—পরান স্বীকৃতি জানালো।

আপনি থাকেন কোথায়?

কৈ থাকুম? পথে।

আপনার কে আছেন? বাবা, মা, কি আর কেউ?

কেউ নেই।—পরান অনায়াসে মিথ্যা বলল।

তবে চলে আসুন আমার সঙ্গে। ক্যাম্পে ভর্তি করে দেব আপনাকে। তারপর আমরা কী করছি শুনবেন। যদি ভাল লাগে কাজ করবেন আমাদের সঙ্গে।

ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরান নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালো।

রাজা বাহাদুরেরর বাগান বাড়ি থেকে একটি ছেলে হারিয়ে গেল। সকাল বেলায় বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে, আর ফিরে এল না। নিঃশেষে শূন্যে মিলিয়ে গেল না তাই বলে। বেঁচে রইল সমাজেরই মধ্যে। বেঁচে উঠল মাথা উঁচু করে।

জীবনের চাপে মানুষকে বারবার নতুন করে গড়ে। ব্যক্তি-মানুষের চেয়ে জীবনের গতি অনেক বেশী শক্তিশালী। তা ব্যক্তি-মানুষের চরিত্রকে দ'লে মুচড়ে নতুন করে গড়ে। পরানের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। যে কাজের সঙ্গে সে যুক্ত হলো তা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর। পায়ের তলার মাটি যখন সরে যায়, মানুষ তখন সাংঘাতিক কিছু, চরম কিছু করতে চায়। হাল্কা মেজাজের পরানের মনে সাংঘাতিক সব পরিকল্পনা ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কুড়ি

সুধার মা মারা গেলেন। বুড়ো মানুষ উপযুক্ত খাদ্য না পেলে মারা যাবেন তাতে আশ্চর্যের কী আছে? আর মরলেই বা না খেয়ে মরেছে বলে কে রিপোর্ট দিতে যাবে? বুড়ো মানুষ তো মরেই থাকে!

সুধা কাঁদল না। অনেক হাতড়িয়েও সে তার হৃদয়ের কোন গোপন কোণে মায়ের জন্য এতটুকু ভালোবাসা সঞ্চিত আছে বলে খুঁজে পেল না। মনটা শুধু অত্যন্ত ফাঁকা মনে হল। আর দুঃখ হল নিজের মনের নির্মমতার পরিচয় পেয়ে। মাকেও ভালোবাসতে পারেনি, এমন আশ্চর্য সৃষ্টি-ছাড়া নিষ্ঠুর মেয়ে কোনো মানুষীর গর্ভে স্থান পেল কী করে? যাক্, তবে জীবনের সঙ্গে তার একমাত্র বন্ধন বোধকরি এবার ছিন্ন হল।

কিন্তু হায়! সুধা জানতেও পারছে না, অদৃশ্য অথচ খুব শক্ত তন্তুর একটা জাল বুনে বুনে জীবন তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে। জানে না, তবে তার চেতনায় অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে যেন এ-সত্যটা। বাইরের জগতে পা বাড়ানোর আগে চার দেওয়ালে বন্দী ছিল তার জীবন। বন্ধু বা বান্ধবী তার কোনদিন নেই; ছিল না, এমনকি পাড়া-বেড়ানোর অভ্যাস। দেশের বাড়ি থেকে সেই দেওয়াল-ঘেরা জীবনটাকেই নিয়ে এসেছিল কলকাতায়। কোন পরিবর্তন ছিল না, কোন পরিবর্তনের আশঙ্কাও করেনি কোনদিন। শুধু আঘাত খাওয়া আর আঘাত দেওয়া, শুধু ঘৃণা-বিনিময়ের একটা অপ্রতিরোধ্য চক্রের মধ্যে তার বন্দী-জীবন অনড় অচল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিরিশ টাকায় সংসার চলে না বলেই, ঘাটতি পূরণ করার মত সোনা-দানা ফুরিয়ে গেছে বলেই, সে মেয়েমানুষ হয়েও পথে বেরিয়েছিল। রোজগারের সন্ধানে সাধারণ অবস্থায় এমনটা হয়তো ঘটত না। মাসে দশ-পনেরো দিন খেয়ে যে ক'দিন বেঁচে থাকা যায়, সেইটেই বিধিলিপি বলে মেনে নিতে পারত হয়তো সে। হয়তো সে উদ্বাস্তু বলেই রোজগারের দুরভিলাষ চেপে বসেছে তার মনে। সেদিন পুলিশী-অভিযানের সময় তার প্রথম মনে হয়েছিল, এ-বাড়ির আরও দশটি পরিবারের

মধ্যে তারাও একটি। একেবারে বিচ্ছিন্ন একক তারা নয়। আর তার পরেই মনে হয়েছিল, তবে হয়তো আরও অনেক মেয়ের মত সে-ও রোজগারের চেষ্টায় বের হতে পারে পথে।

আর আজ পথের মায়া একটা দুর্নিবার আকর্ষণের মত তার মনে চেপে বসেছে। অক্ল্যাণ্ড হাউসে হাজার হাজার লোক রোজ যাতায়াত করে। কারও সঙ্গেই তার পরিচয় নেই, পরিচয় করারও দরকার বোধ করে না। তাই বলে একেবারেই পর বলেও তাদের মনে হয় না। রাস্তার অগণিত জন-সমুদ্রের মধ্যে সে নিঃসঙ্গ, একক। তবু কি সে তাদেরই একজন নয়? একই রাস্তার নিয়ম তো তাকেও মানতে হয়! দোকানে জিনিষ কিনতে গিয়ে সে দাম শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে। পাশে একজন বৃদ্ধ, একজন বালক, আরও মাঝামাঝি নানা বয়সের অনেক মানুষ। দাম শুনে তারাও থমকে দাঁড়িয়েছে। নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত অপরিচিত তারা। তবু সত্যিই কি কোন সম্পর্ক নেই তাদের সঙ্গে সুধার।

ফুলের কুঁড়ি ছায়ায় ঢাকা ছিল এতকাল। হঠাৎ সূর্যের আলো পেয়ে পাঁপড়ি মেলে দিয়েছে। ব্যাপ্তির আনন্দে ভয়ে কাঁপছে পাঁপড়িগুলো ; সৌরভ হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসে।

এই বিরাট জীবনের মধ্যে কোন গোপনতম কোণে কোন ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে এক ফোঁটা আনন্দের কণাও সুধার জন্য সঞ্চিত আছে কিনা, সুধা সারা জীবন তাই খুঁজে খুঁজে দেখবে। জীবনের কাছে তারও কিছু পাওয়ার আছে কিনা, কিছু দেওয়ার আছে কিনা, তা তাকে জানতেই হবে। না-ই-বা থাকলেন মা, না হয় নেহাৎই হাস্যকর ধবণীবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা, সুধা তবু ছাড়বে না।

শুধু অক্ল্যাণ্ড হাউসেব চারমাসের ভরসাতেই সুধা বসে রইল না। চাকরীর চেষ্টায় সে গেল কল্যাণদার কাছে, গেল মনোরমবাবুর কাছে। ইন্সিওরেন্স পলিসি বিক্রির চেষ্টায় ঘুরল লোকের পিছনে পিছনে। দু'মাসের চেষ্টায় একটা কেস্‌ও করতে পারল না সে। কলেজ স্ট্রীটে এক দেশের বাড়ির দরজীর কাছে গেল ফুরনের কাজের চেষ্টায়। কাজ নেই, কোন জায়গায় কাজ নেই। তবু, রেশানের চালও কেনা যায় না যে-টাকায়, তার থেকে ট্রাম-বাস খাজনা আদায় করে নিতে লাগল নিষ্ঠুর পরিহাসে।

হঠাৎ সেদিন এমপ্লয়মেন্ট এক্‌স্‌চেঞ্জ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে সুধার কী আনন্দ! ষাট টাকা মাইনের কয়েকজন কেরাণী নেবেন বলে গভর্ণমেন্ট যোগ্যতা-বিচারের জন্য পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। ভদ্রলোকদের নিঃস্বার্থ মহানুভবতা ফুটে উঠেছে চিঠির ছত্রে ছত্রে। খবরটা জানাতে পারছেন বলেই তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন। সুধা ছুটে গেল পটলের কাছে। পটল অবিশ্যি দুর্মুখ: ভরসা দিল না। এই ষাট টাকার চাকরীর জন্য ম্যাট্রিকুলেট্ তো তুচ্ছ, কত বি-এ, এম-এ-ও নাকি প্রতিযোগিতা প্রার্থী! আর পাঁচ-সাত হাজার পরীক্ষার্থীর অত খাতা দেখার সময় কোথায় অফিসারদের? প্রতিযোগিতার ফল নির্ধারণ করার জন্য অন্য সহজ পথ নাকি আছে। তবু অসীম বিশ্বাস নিয়ে সুধা পরীক্ষা দিয়েছিল। চেয়ে-চিন্তে বই জোগাড় করে কুড়ি-পঁচিশ দিন রাতদিন পড়েছিল সুধা। ফল বেরুবার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চাকরী দিতে অক্ষম বলে দুঃখ জানিয়ে চিঠি দেয়নি এখনো সুধাকে। বোধহয় পোস্টাল স্ট্যাম্প কেনার পয়সার অভাবে।

সেদিন সুধা একখানা চিঠি নিয়ে ধরণীবাবুর কোলের উপর ফেলে দিল। তার ভাসুরের চিঠি। ধরণীবাবুর উদ্দেশ্যেই লেখা। চিঠিখানা পড়লে চোখের জল চেপে রাখা দায়। বহু অর্থ-কৃচ্ছ্রতার করুণ ফিরিস্তি দিয়েছেন তিনি চিঠিখানাতে। একখানা মোটর তাঁর ছিল, সেটা তাঁর নিজের প্রয়োজনেই লাগে। বাড়ির লোকদের জন্য তাই তাঁকে আর একখানা মোটর কিনে দিতে হয়েছে। (কী করবেন? পরের জন্য খেটেই তো জীবনটা তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন!) এক চোটে মাসিক খরচা গিয়েছে দু'শো টাকা করে বেড়ে। অথচ আয় কমেছে। একটা বাড়ি ভাড়া দিয়ে পাঁচশো টাকা করে পেতেন। শালা ভাড়াটেরা রেণ্ট-কণ্ট্রোলে গিয়ে চোরা কংগ্রেস সরকারের আইনের কারসাজিতে চারশো টাকায় নামিয়ে এনেছে ভাড়া! ফলে ভদ্রলোকেরই এখন উল্টো সাহায্য দরকার! (আহা! এমন দুঃখীকে সাহায্য করার জন্যও সুধার কোন পুঁজি নেই!) কাজেই,—ভদ্রলোক এখানে তাঁর আসল কথাটা জানিয়েছেন খুব সংক্ষেপে,—ধরণীবাবুকে এখন মাসে পনেরো টাকার বেশী দিতে পারবেন না তিনি! একটা কাজ-কর্মের চেষ্টা দেখুক না ধরণী! (সত্যিই তো! গরীব দাদাকে শোষণ করার এই জঘন্য প্রবৃত্তিকে কতকাল আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে!)

পড়া শেষ হয়ে গেলে ধরণীবাবু নীরবে চিঠিখানা ফেরৎ দিলেন।

কী বুঝলে?—সুধা জিজ্ঞেস করল।

ধরণীবাবু নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন: বুঝলাম যে দাদার বাড়িতে থাকলে দাদা এমন সুযোগ নিতে পারত না।

ঠিকই বুঝেছো।—বলে সুধা ফিরল।

ধরণীবাবু ডাকলেন: শোনো।

সুধা আবার এদিকে মুখ ফেরালো।

কি বলছ?

তুমি এখনো আমার রোজগারেই খাচ্ছ।

সুধা ঠিক বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল। ধরণীবাবু ব্যাখ্যা করে বললেন: দাদার টাকা মানেই তো আমার টাকা।

তাই নাকি? এদ্দিন পরে হঠাৎ খেয়াল হল? কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

তাতে এই হয়েছে যে আমার খেয়ে আমারই উপর তুমি চোপা নাড়তে পারো না।

ও, আচ্ছা, মনে রাখতে চেষ্টা করব।

চেষ্টা নয়। মনে রাখতে হবে।

তবে শোনো—শুধু আমার জন্যই যদি তোমার দাদা টাকা পাঠাতেন, তবে ও-টাকা আমি লাথি মেরে ফেলে দিতাম।

সুধা সরে পড়ল। ধরণীবাবুর জ্বলন্ত দৃষ্টির আগুন সীমাহীন শূন্যকে এতটুকু উত্তপ্ত করতে পারল না।

এই চিঠির সঙ্গে যে আরও একখানা চিঠি এসেছে, তার খবর ধরণীবাবু জানতে পারলেন না! সেখানা এসেছে অকল্যাণ্ড হাউস থেকে। ছয় মাস পরে তাঁরা সুধার দরখাস্তের জবাব দিয়েছেন। অবিশ্যি শুরুতেই তাঁদের মহানুভবতার পরিচায়ক হিসাবে দুঃখ জানিয়ে। সুধা যে-বাড়ীতে আছে, সে তার আইনসঙ্গত ভাড়াটে কিনা সন্দেহ থাকায় তার দরখাস্ত নাকি তাঁরা বিবেচনা করতে অক্ষম। এই জবাবটার জন্যই কি সুধা অসীম আগ্রহে ছয় মাস ধরে পথের দিকে তাকিয়েছিল? ইন্সপেক্টর সময়ের কথা জানালে সেদিন সুধা আকুল হয়ে ভেবেছিল, তিরিশ টাকার সম্বল নিয়ে এই দীর্ঘ সময় তারা বেঁচে থাকবে কী করে? তবু আশা পেয়েছিল বলে অর্ধাহারে অনাহারে

এই সময়টা কাটিয়ে দিতে পেরেছে তারা। শুধু আশা দিয়ে মানুষকে দিনের পর দিন বাঁচিয়ে রাখার কী অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংস্থা! এর আবিষ্কর্তা কে সুধা জানে না; কিন্তু সেই অজ্ঞাতনাম মহান আবিষ্কর্তাটির পায়ে সুধা মনে মনে প্রণাম জানালো। বারবার করে কামনা করল, তার ভাসুরের মত দুরবস্থা যেন এই মহান ব্যক্তিটির না হয়! বাড়ির প্রত্যেকের জন্য দু'খানা করে গাড়ী বরাদ্দ করেও যেন কোন অর্থের অনটন তিনি টের না পান!

ঋণ দিতে না পারার জন্য ওরা দুঃখ জানিয়েছে (মহৎ ওরা!), কিন্তু সুধা হলে কৈফিয়ৎ চাইত! কী অধিকার আছে মানুষের মিথ্যা দরখাস্ত দিয়ে ওদের হয়রান করার? মহত্ব আছে বলেই কি তার অন্যায় সুযোগ নিতে হবে?

দুপুরে অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে সুধা অকল্যাণ্ড হাউসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। সোজা গেল সেই পুরোনো পরিচিত ইন্সপেক্টরটির কাছে। সুধার ভাগ্য ভাল। ভদ্রলোককে পাওয়া গেল তাঁর অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে।

সুধা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভদ্রলোক কলম থামিয়ে প্রশ্ন-বোধক দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে।

সুধা বলল: দেখুন, আমি রিফিউজী ক্যাম্পে ভর্তি হতে চাই। কী করতে হবে বলুন তো?

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন। চিনতে পেরেছেন কি তিনি সুধাকে? মুহূর্তের জন্যও কী তাঁর মনে এ-প্রশ্ন খেলে গেল যে অবশেষে এ-মেয়েটির জীবনে এমন কী ঘটল, যার জন্য সে উদ্বাস্তু-শিবিরে যেতে চায়?

মুখে কিন্তু কোন কৌতূহল প্রকাশ করলেন না কর্মব্যস্ত ভদ্রলোকটি। সংক্ষেপে বললেন: দরখাস্ত দিন।

সুধা জিজ্ঞেস করল: কালকেই ঢুকতে পারব তো ক্যাম্পে?

ভদ্রলোক এবার না হেসে পারলেন না।

বলছেন কি? এত তাড়াতাড়ি কখনো হয়? কত হাত ঘুরবে আপনার দরখাস্ত! এন্‌কোয়ারী হবে। কোন ক্যাম্পে জায়গা আছে কিনা বা কোন্ ক্যাম্পে জায়গা আছে তার খোঁজ হবে। তবে তো মঞ্জুরী আসবে! অন্ততঃ একটা মাস ধরে রাখুন তো!

সুধা ফিরল। উদ্বাস্তু ক্যাম্পে যেতে হলেও অপেক্ষা করতে হয় এক মাস?—বিশ্বাস করতেও বিস্ময় বোধ হয় সুধার। দু'চার টাকা করে সপ্তাহে দিয়ে আর একটি অমানুষিক পরিবেশের মধ্যে থাকতে বাধ্য করে মানুষকে তিল তিল করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু বলে রিপোর্ট দিতে পারার যে অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা, তার মধ্যে ঢুকতে গেলেও অপেক্ষা করতে হয়? তবে বোধ হয় মানুষ মরার পর প্রেতাত্মাদের বৈতরণী তীরে গিয়ে যমপুরীতে প্রবেশের ছাড়পত্রের জন্যও অপেক্ষা করতে হয় দিনের পর দিন!

কিন্তু উদ্বাস্তু-শিবিরেরই বা দরকার কি?—সুধা ফিরে আসতে আসতে ভাবল। তার নিজের মনের স্বীকৃতি অনুসারেই মা ছিলেন সংসারের একমাত্র বন্ধন। সে-বন্ধনটা কেটেছে। বেঁচেছে সে! স্বামী বলে ভালোবাসা দূরের কথা, রুগী বলে যে মমতা-বোধ করা—তাও তার নেই ধরণীবাবুর প্রতি। তবে কি যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই যাবে সুধা? কিন্তু দু'চোখ তাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই কি স্বস্তি মিলবে? মেয়ে মানুষের যে বিপদ অনেক! তবে কি যে চিরাচরিত পথে দুঃস্থ বঞ্চিত মানুষ চিরকাল সমাধান খুঁজে পেয়েছে সেই পথই গ্রহণ করতে হবে সুধাকে? জোর করে বন্ধ করে দিতে হবে হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুকুনিটা?

ছ'মাস আগে হয়তো এ-কথা ভাবা সহজ ছিল। এই ছ'মাস ধরে পথ চলতে চলতে শিশুর মত বিস্ময়ের চোখ নিয়ে এই বিপুল বিচিত্র দুর্বোধ্য কলকাতা শহরকে সে দেখেছে। সে-বিস্ময়ের ঘোর আজও কাটেনি। এই শহরকে প্রাণভরে না দেখে, এই জীবন-যাত্রাকে সম্পূর্ণ করে না বুঝে, সুধার পক্ষে মরাও কঠিন। কিন্তু সুধা তবে কী করবে?

এই ভাবনার তার কোনদিনই শেষ হ'ত না যদি একটি লোকের উপর তার চোখ গিয়ে না পড়ত। লোকটিকে সে চেনে, যদিও একদিনই মাত্র দেখেছিল লোকটিকে। লোকটিও এক দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়েছিল। সুধা হাতের ইশারায় ডাকল লোকটিকে!

লোকটি কাছে এলে জিজ্ঞেস করল: আপনার কারখানায় জায়গা আছে এখনো? কাজ পাওয়া যাবে?

লোকটি বিগলিত হাস্যে বলল: আমার কারখানায় কখনো জায়গার

অভাব হয় না। কিন্তু আপনি সত্যিই যোগ দেবেন তো? না, ঠাট্টা করছেন?

এমন সত্যি কথা জীবনে কোনদিন বলিনি।

কাছাকাছি লোকের ভীড় লক্ষ্য করে লোকটি বলল: তবে মাঠের দিকে চলুন। কথা বলি।

মাঠের মধ্যে একটা নির্জন জায়গা দেখে নিয়ে তারা দাঁড়ালো। লোকটি বলল: আপনি যে আসবেন তা আমি ভাবতেই পারিনি। এক একটা মেয়ে এরকম থাকে,—কিছুতেই মনে হয় না তারা এ-পথে আসবে। তবে আপনাকে এ টুকুই ভরসা দিয়ে বলতে পারি, প্রথমটায় একটু খারাপ লাগলেও পরে দেখবেন, নীতির মামুলি বুলির চেয়ে টাকা অনেক বেশী ভারী।

তিক্ততার সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে সুধা হাসল। বোধহয় লোকটিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যই।

দয়া করে বক্তৃতা দেবেন না। তারপর বলুন তো—আমাকে কী করতে হবে? কবে কোথায় যেতে হবে আমাকে?

লোকটি সত্যিই ক্রমাগত বিস্মিত হচ্ছিল। এমন অনায়াসে, এমন খোলাখুলি আলাপ ক'রে এ-কাজে মেয়েরা আসে না। মেয়েদের এ দিকে টানার জন্য নানারকম ঘোরানো-প্যাঁচানো ব্যবস্থা আছে। তার জন্য আলাদা অভিজ্ঞ ট্রেনার আছে। তবে এ মেয়ে হয়তো শেষকালে গোলমালে ফেল্‌বে। তার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

সে বলল, চেহারা আপনার আগের তুলনায় খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে। অবিশ্যি ক'দিন আর লাগ্‌বে চেহারা ঘুরতে! আপনার কাজ খুব সহজ, খুব ভদ্র। শহরের সবচেয়ে অভিজাত পাড়ায় আপনি থাকবেন। একটু বে-আইনী বটে, কিন্তু সেই জন্যই ভালো। সেইটেই সবচেয়ে বড় আভিজাত্যের নিদর্শন কিনা। আপনি আজ পঁচিশটা টাকা নিয়ে যান। দুদিন ভালো করে খাবেন দাবেন। ভাল একখানা শাড়ী আর ব্লাউজ কিনে নেবেন। কিন্‌বেন না হয় কিছু স্নো-পাউডারও। ভাল করে সেজেগুজে তিন দিনের দিন চারটের সময় এখানে আসবেন।

টাকাটা হাতে নিয়ে সুধা জিজ্ঞেস করল: টাকাটা যদি আমি মেরে দি? যদি আর ফিরে না আসি?

ভদ্র মেয়ে আমরা দেখলে চিনি।—লোকটি প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল।

যাক, একটু ভরসা পাওয়া গেল! আত্মবিক্রয় যারা করে, তাদের মধ্যেও তবে ভদ্র-অভদ্র আছে। চোর-বাটপাড়েরা নাকি খুব সৎ। নিজেদের মধ্যে ঘুষখোর সরকারী অধিকর্তাদের সততা নাকি সামরিক শৃঙ্খলাকেও হার মানায়।

বাড়ি ফেরার পথে সুধা অদ্ভুত হাল্কা বোধ করল নিজেকে। মুহূর্তের জন্যও কোন গ্লানি বা অনুশোচনায় তার মন পীড়িত হল না। এর চেয়ে আত্মহত্যা করাও ভাল, মনকে এ-কথা বলে চাবুক মেরে নৈতিক মানকে চাঙ্গা করতে চেষ্টা করল না সুধা। ঘরে এসে ধরণীবাবুকে বলল, সে একটা ট্যুশানি পেয়েছে। সন্ধ্যাবেলা যেতে হবে পড়াতে। মাইনে ভালোই দেবে।

দিন দুই পরে চৌরঙ্গী পাড়ার একটা বাড়ির দোতলা এক ফ্ল্যাটে সোফা-কৌচে সুসজ্জিত একটি ঘরে সুধাকে দেখা গেল। পাশা-পাশি আরও দু'খানা ঘরে আরও দুটি সুন্দরী সুধার মত অপেক্ষা করছে কয়েকটি লোকের সন্ধ্যা-যাপনকে সুন্দরতর করে তোলার প্রয়োজনে। পিণ্টুবাবু, মানে সেই মেয়ের দালালটিই, খবরটা দিয়েছেন সুধাকে।

ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে দয়ালু! তাঁর আয়াসের মধ্যে যেটা সবচেয়ে অভিজাত ব্যবস্থা, তাই তিনি নির্দিষ্ট করেছেন একান্ত আনাড়ি মেয়ে সুধার জন্য।

সাধারণ গোছের একখানা তাঁতের শাড়ী পরেছে সুধা। সামান্য প্রসাধনও করেছে। তবু দু'দিন পূর্ণ আহারের ফলে চেহারা একেবারে মন্দ খোলেনি সুধার।

অবশেষে সেই সাধারণ গোছের ছেলেটি (পিণ্টুবাবু বলে দিয়েছিলেন আজকে প্রথম দিনে একটি অল্প দামের সাধারণ গোছের খদ্দের পাঠাবেন তার কাছে) এল। ধোপ-দুরস্ত কাপড় পরা। পান খেয়েছে। ঠোঁটে ঝুলিয়েছে একটি সিগারেট।

আসুন!—বলে সুধা নমস্কার জানালো।

নমস্কার ফিরিয়ে দিল না ছেলেটি। সোজা ভিতরে ঢুকে গ্যাঁট হয়ে বসল সোফায়। আর একটা সিগারেট ধরালো ধীরে-সুস্থে।

তুমিই বুঝি পিণ্টুবাবুর নতুন মাল? কলেজে পড়া মেয়ে। তা বেশ! কিন্তু যাই বল, চেহারাটা তোমার আর একটু ভালো হলেই যেন ভালো হত।

সুধা কি বলবে ভেবে পেল না।

কি নাম গো তোমার? ছেলেটি প্রশ্ন করল।

শোভনা।—পিণ্টুবাবু বলে দিয়েছিলেন আসল নাম প্রকাশ না করতে।

মাইরী? ভারী পিয়ারের নাম তো! নাম শুনেই প্রেমে পড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভাগ্যিস তোমার এমন দুর্মতি হয়েছিল, তাইতো তোমাকে পাওয়া গেল!

দুর্মতি তো আপনারও হয়েছে।

সুধার কথায় ছোকরাটি থতমত খেয়ে গেল প্রথমটা। পরে হো হো করে হেসে উঠ্ল।

খাসা! ফোঁস না করে উঠলে আবার মেয়ে কি?

সুধা নীরব। ছেলেটি উঠে এসে সুধার গা ঘেঁষে বসল। সুধা তাড়াতাড়ি সরে গেল।

মা ফোঁস মনসা! তোমার ফণা-দুটো অমন আঁট করে চেপে রেখেছো কেন ব্লাউজ পরে? ব্যথা লাগছে যে! বোতামগুলো খুলে দি, কেমন?

বল্‌তে বল্‌তে সুধার অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করেই লোকটি সুধার বুকে হাত দিয়ে বসল।

আর তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুধা।

বিশ্রী! বিশ্রী ইতরের মত ব্যবহার আপনার!

সুধার সমস্ত শরীর গরম হয়ে উঠেছে। শরীর কাঁপছে দারুণ অপমানের তীব্রতায়! আস্‌ছি,—বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে সুধা।

বাইরে বেরিয়ে এসেই সুধার মনে পড়ল: তাইতো কী বোকা সে? যথেচ্ছ ব্যবহার করবে বলেই তো এক ঘণ্টার জন্য তাকে কিনে নিয়েছে ছেলেটা মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে!

বাইরে একটা বেঞ্চির উপর বসেছিলেন পিণ্টুবাবু। সুধাকে দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলেন: কি হ'ল?

কিছু না। বড্ড গরম!

প্রথম প্রথম একটু আধটু—

থাক্ আর বক্তৃতা দেবেন না। এক গ্লাস জল দিন তো?

ঝি জল নিয়ে এল। সুধা এক চুমুক মুখে দিয়েই মুখ বিকৃত করে বলল। এ নয়। শাদা জল দাও ঝি। শাদা ঠাণ্ডা জল।

মদ-মেশানো সোডা দিয়েছিল ঝি। পিণ্টুবাবু তৈরী করেই রেখেছিলেন।

কিন্তু ঐটেই ভাল ছিল। মদ নয় কিন্তু ওটা। ওষুধ-মেশানো জল। ওটা খেলে কিচ্ছু টের পেতেন না আপনি।

আমার দরকার হবে না। এক গ্লাস শাদা জল দাও ঝি।

না হয় আজ থাক্ সুধা দেবী। আর কোন মেয়েকে পাঠাই না হয়? পিণ্টুবাবু দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন।

আশ্চর্য! সুধার ঠোঁট বাঁকানোটা প্রায় হাসির মত! কিন্তু কোন জবাব দিল না সুধা। জল খেয়ে ফিরে গেল ঘরে।

সুধার ট্যুশনির ব্যাপারটা সবাই সহজ ভাবে বিশ্বাস করে নিল। রাত প্রায়ই একটু বেশী হয়ে গেলেও কেউ সন্দেহ করার কারণ খুঁজে পেল না। তিন চারটি ছেলে মেয়েকে নাকি পড়ায় সুধা। দেরী হতে পারেই তো।

প্রথম রোজগারের টাকা হাতে পেয়েই সুধা ভাসুরকে একখানা চিঠি লিখল। তাঁর অত টানাটানির সংসার থেকে টাকা বাঁচিয়ে সুধাদের আর সাহায্য যেন তিনি না পাঠান। আর আজ পর্যন্ত যত টাকা তিনি পাঠিয়েছেন, তার যেন একটা হিসাব দেন। হ্যাঁ, একবারে না পারলেও সুধা আস্তে আস্তে শোধ দেবে টাকাটা সুদসুদ্ধ। অবশ্য টাকাই শোধ করা যাবে। ওঁর উপকারের ঋণ তো আর শোধ করা যাবে না।

ভাসুর সুধার চিঠির কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু ধরণীবাবুর কাছে লিখলেন, তাদের বাড়িটা সরকারের কুনজরে পড়েছে বলে তিনি সংবাদ পেয়েছেন। কাজেই নিয়মিত মাসিক সাহায্যটা পেতে হলে ধরণীবাবুকে অন্য কোন বাড়ির ঠিকানা দিতে হবে।

সেদিন রাত্রে সুধা বাড়িতে ফিরল না। পরদিন সকালবেলা ফিরে এল আরক্ত কালি-পড়া চোখ নিয়ে, বিপর্যস্ত এলোমেলো চুল নিয়ে। সে-চেহারা দেখে দস্তুরমত সন্দেহ হয়েছিল বৈকি ধরণীবাবুর।

কাল রাতে ফিরলে না যে বড়?

পড়াতে পড়াতে অনেক রাত হয়ে গেল। মাসীমা আসতে দিলেন না।

তুমি বলনি, বাড়িতে তোমার স্বামী আছেন?

আমি বলেছি যে এক আধ রাত বাড়িতে না ফিরলে এমন কিছু ক্ষতি নেই।

এবার ধরণীবাবু অন্তরের নিরুদ্ধ রাগকে খানিকটা প্রকাশের পথ না দিয়ে পারলেন না।

কেন? কেন তুমি এমন কথা বলেছিলে? স্বামী তোমার রোজগারে খায় বলে?

স্বামীর রোজগারে যদি আমি খেতাম, তবু ঐ কথাই বলতাম।—সুধার মুখে ধারালো হাসি।

ধরণীবাবু আরও রেগে স্পষ্টবাদী হলেন।

আমি জানি, তুমি কেন কাল রাত্রে ফেরোনি। তোমার মুখে রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন আমি কি দেখতে পাই না ভাব?

অপরিচিত জায়গায় ঘুম আসে না আমার।

না, কোন পরিচিত ছেলে ঘুমুতে দেয় নি তোমাকে?

কৈফিয়তের সুতোকে আরও লম্বা করতে অনিচ্ছুক সুধা এবার শেষ জবাব দিয়েছিল: দেখ, আমি কি করি না করি, ভালো করি কি মন্দ করি, তার জবাবদিহি তোমাকে দিতে পারব না। আমি রোজগার করে তোমাকে খাওয়াচ্ছি বলে নয়। আমার উপর তোমার কোন দাবী বা অধিকার নেই বলে।

আর তিক্ত বিষাক্ত মন নিয়ে অজস্র জবাব-না-পাওয়া প্রশ্নের দরজায় কুলুপ এঁটে ধরণীবাবু চুপ করে গেলেন। স্বামী হয়ে স্বামীত্বের দাবী নেই তাঁর? কেন? কী তাঁর অপরাধ? তিনি রুগ্ন। উপযুক্ত চিকিৎসায় তাঁকে রোগমুক্ত করতে কেউ চেষ্টা করেনি। সে-অপরাধ কি তাঁর? রুগ্ন বলে উপার্জনে অক্ষম হওয়ায় তিনি নির্বিত্ত। সে-দোষ কি তাঁর? অথচ প্রতি মুহূর্তে অসহ্য অবজ্ঞার আগুন দিয়ে সুধা তাকে দগ্ধ করবে, যে-অপরাধ তিনি কোনদিন করেননি তারই মিথ্যা অভিযোগে? কেন?

সুধা এখন দিব্বি সময়মত পরিপাটি করে রান্না করে। সাবান মেখে ভাল করে স্নান করে (পিণ্টুবাবু বলে দিয়েছিলেন ওটা অত্যাবশ্যক) এমন-কি

দুপুর বেলা একটু ঘুম পর্যন্ত দেয়। সুস্থ স্বপ্নহীন ঘুম, চিন্তাজড়িত তন্দ্রা নয়। এমন কি সে এখন মাঝে-মাঝে পাড়া বেড়াতে বের হয়। আশ্চর্যজনক হলেও এ-কথা সত্যি। মনোরমার কাছে, সুধীনবাবুর স্ত্রী নলিনী দেবীর কাছে। কালে-ভদ্রে বা তটিনীর কাছে। সুধা মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যায় নিজের এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে। অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হয়েছে বলেই কি তার মধ্যে হঠাৎ সামাজিক চেতনা দেখা দিয়েছে? লজ্জা হল না, গ্লানি-বোধ হল না, ধরা পড়ে যাওয়ার আতঙ্ক হল না,—এ কী রকমের অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া মানুষ সুধা?

নিজের সহজ গাম্ভীর্যে আর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত সুধাকে কেউ এতটুকু সন্দেহ করল না। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পরিবর্তনে কেউ-বা খুশি হল কেউ বা ঈর্ষান্বিত, কেউ বা সমালোচনা করার নতুন উপকরণ পেল। কিন্তু কেউ ভাবল না সুধার কোন বিশেষ ধরণের নৈশ-জীবন আছে। না, সুধার সম্পর্কে এমন কোন ঘটনা ধরণীবাবুরও কল্পনাতীত।

যে এক মাস পটল জামীন না পেয়ে হাজত-বাস করছিল, সেই সময়টার মধ্যে রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়িতে আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

কল্যাণবাবু ইস্কুলের কাজে হাত দিয়েছেন। আর তাঁর যা স্বভাব, কাজে তিনি তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ নিয়োগ করেছেন। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের পর্যায়ের—সুধীনবাবু, কালীকান্তবাবু, মনোরমবাবু, ঘোষাল মশাই, রজত,—তাঁরাও রেহাই পান নি। কল্যাণবাবুর উৎসাহের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তাঁরাও কাজের মধ্যে যথাযোগ্য অংশ-গ্রহণ করেছেন।

যাতে শুরু থেকেই ইস্কুলটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায় সেদিকে কল্যাণবাবু প্রথমেই মনোযোগ দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিনি সদলবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিচিত হোমড়া-চোমড়ার কাছে গিয়েছিলেন। তিনিই ওদের বললেন, মানিকতলার বিখ্যাত দেশ-নেতা মন্মথবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। মন্মথবাবু তাঁদের মাথার বারো আনা দুশ্চিন্তা-ভার লাঘব করে দিলেন। আগামী জানুয়ারীতেই যাতে ইস্কুলটা 'এ্যাফিলিয়েশান' পায়, তিনি তার ষোল আনা দায়িত্ব নিলেন। এ আর একটা এমন-কী কাজ! স্বয়ং ভাইস চান্সেলারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় আছে যে! ইঙ্গিতটা যদিও খুব ভাল লাগেনি কল্যাণবাবুর, কিন্তু যে-কোন মহৎ কাজেই এ ধরণের ছোট-খাটো পথের গলতি এ-সমাজে বোধ করি অপরিহার্য।

কল্যাণবাবুরা যেন ইতিমধ্যে ম্যাট্রিক ক্লাশ অবধি কিছু ছাত্র গ্রহণ করেন ইস্কুলে। বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বলে কিছু আসবে যাবে না। কাগজপত্র ঠিক করে রাখলেই হবে। এবারের ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য কিছু ছাত্র যেন প্রাইভেট হিসাবে পাঠানো হয় ইস্কুল থেকে। এত সব সাজানো ব্যাপারে লিপ্ত হতে মনটা একটু খুঁৎখুঁৎ করে বৈকি কল্যাণবাবুর। কিন্তু উপায় নেই। অত নৈতিক সততার ধ্বজা ধরে থেকে আরব্ধ কাজটা পণ্ড করে দেওয়ার অবকাশ নেই কল্যাণবাবুর। জীবনের অনেক সময় নষ্ট করেছেন এইভাবে। এইবারে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট্ কিন্তু আপনাকে হতে হবে, মন্মথবাবু। —কল্যাণবাবু কৃতজ্ঞতার স্বীকৃত হিসাবে অনুরোধ করেছিলেন।

না—না। আমাকে আর এসব দায়িত্বের মধ্যে টানা কেন? মন্মথবাবু সবেগে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে হেসেছিলেন খুশি হয়ে।

ঘোষাল মশাই জোর দিয়ে বলেছিলেন: আপত্তি শুনব না মন্মথবাবু। এটা আমাদের দাবী।

মন্মথবাবু তাঁর মর্যাদার উপযোগী উদার হাস্যে মৌনং সম্মতি লক্ষণম্-এর সূত্র অনুসরণ করেছিলেন।

কিন্তু একটা অনুরোধ। একটা নতুন কমিটিই করুন আপনারা। অবিশ্যি আগে সব গুছিয়ে নিন। কমিটিতে কাকে কাকে রাখবেন, আমাকে আগে একটু জানাবেন।

অতবড় উপকারী বন্ধুর এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখতে আবার কেউ আপত্তি করবে নাকি?

আশ্চর্য এই যে, বছরের এই শেষ সময়েও নতুন-খোলা উপরের ক্লাসগুলির জন্য বেশ কিছু ছাত্র পাওয়া গেল। প্রায় সবাই যদিও উদ্বাস্তু। কিন্তু সমস্যা বাধলো পড়ানো নিয়ে। সাতটা ক্লাশের শিক্ষকের পক্ষে দশটা ক্লাশ সামলানো অসম্ভব। কল্যাণবাবু অবশ্য গোড়া থেকেই পড়াতে সুরু করেছেন। রজত এবং ঘোষাল মশাই পার্টটাইম হিসাবে পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন। তাছাড়া নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে জন-দুই শিক্ষিত বেকার যুবককে পাকড়াও করা গেল। একজন তো বাগান বাড়ীরই বাসিন্দা। আপাততঃ তাঁরা কিন্তু সামান্য হাত খরচার বেশী পাবেন না।

কিন্তু তবু টাকা দরকার। অনেক খরচ আছে সামনে। বাড়ি মেরামত খানিকটা না করলেই নয়, কিছু রদ-বদলও আবশ্যক হবে এতগুলো ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হলে। ফার্নিচার কিনতে হবে। কাজেই চাঁদা না তুলতে পারলে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে।

মনে মনে একটা কার্যক্রম ঠিক করে কল্যাণবাবু সেদিন রবিদের ডেকে পাঠালেন। এই সময়ে পটল থাকলে যে কত সুবিধা হত!

রবি আর শচীন এল। আর কাউকে পাওয়া গেল না হাতের কাছে।

ডেকেছেন নাকি কল্যাণদা? রবি জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, ইস্কুলের জন্য তোমাদের যে এখন দরকার। বুড়োদের দিয়ে সব কাজ হয় না। চাঁদা তুলতে হবে। মাঝে মাঝে সভা ডাকতে হবে। আপাতত দু'চার দিনের মধ্যে অবশ্যই কটা সভা করা দরকার পাড়ার ভদ্দর লোকদের নিয়ে। একটা সাড়া যাতে পড়ে যায় সারা এলাকাটার মধ্যে।

কল্যাণদা, আপনি যা বলবেন, আমরা তাই করব। কোন দিন তাতে আপত্তি করিনি। আজও করব না। পটলা থাকলে অবিশ্যি খুব সুবিধে হত।—রবি আশ্বাস দিয়ে বলল।

শচীন বলল: পটল নাই বা থাকল। তাতে কী হয়েছে? আমরা কি তার থেকে কম যাই কোন কাজে?

রবি একবার শচীনের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসল। অতঃপর আশু মীটিং ডাকার জন্য কি কি করতে হবে সেই আলোচনা শুরু হল।

হঠাৎ কী একটা কাজে সুনন্দা একবাব এল এ-ঘরে।

রবিদাকে আজকাল যে দেখিই না এদিকে? ভালো তো?—সুনন্দা ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল।

মেয়েদের সামনে রবি ভীষণ লাজুক। সুনন্দার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে বিব্রতভাবে বলল: ভালো সুনন্দা-দি।

শচীন একবারও সুনন্দার দিকে সোজাসুজি তাকাল না। কিন্তু সুনন্দা যতক্ষণ এ-ঘরে রইল, অনুভব করতে পারল যে একটি তীর্যক অর্থবোধক দৃষ্টি অনুক্ষণ তাকে অনুসরণ করে ফিরছে

আজকে সর্বপ্রথম কল্যাণবাবু কথাটা প্রকাশ করলেন মনোরমার কাছে। রবিরা চলে গেলে মনোরমাকে ডেকে বললেন: জান রমা, পাড়ার লক্কড় মার্কা ইস্কুলটাকে হাইস্কুল করার ভার নিয়েছি। কি বলছ—ভালো করিনি?

মনোরমার সঙ্গে কল্যাণবাবুর অসহযোগিতা এখনো অব্যাহত। মনোরমা নেহাৎ প্রয়োজনীয় দু' একটা কথা ছাড়া কল্যাণবাবুর সঙ্গে অনাবশ্যক বাক্যালাপ করেন না। অসহযোগিতার ফলে কল্যাণবাবুর মতি-গতির অবশ্য কোন পরিবর্তন হয় নি। মনোরমা ভালো করেই জানেন, কল্যাণবাবু এখন যে কথা বলছেন, এ-ও নেহাৎ মন-রাখা কথা। এর বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করলে তা যত যুক্তিসঙ্গতই হোক, কল্যাণবাবুর মনে এতটুকু রেখাপাত করবে না।

তবু একটু ভেবে নিয়ে মনোরমা বললেন: কাজটা হয়তো খারাপ নয়, কিন্তু তোমার কী সুবিধে হবে এতে? থাকলোই না হয় তোমার পেটে বিদ্যা, কিন্তু তোমার যে ডিগ্রি নেই। হাইস্কুলে মাস্টারী করার যোগ্যতা তো ডিগ্রির মাপেই বিচার করা হয়।

যথাসম্ভব শান্ত নিস্পৃহ গলায় মনোরমা কথাগুলো বললেন। কল্যাণবাবু মত জানতে চাইলেন বলেই বললেন। না চাইলে নিজে থেকে বলতে যেতেন না কোনদিন। এ খবর তো তিনি আগে থেকেই জানতেন, আর এর পরিণাম সম্পর্কে আশঙ্কাও তাঁর নতুন নয়। তাই বলে এদ্দিনের মধ্যে গায়ে পড়ে জানাতে যান নি তিনি কল্যাণবাবুকে। এখন যে তিনি নিজের আন্তরিক সুচিন্তিত অভিমতটা জানালেন, সেও নেহাৎ ঔচিত্য বোধের খাতিরে। মানা না মানা কল্যাণবাবুর ইচ্ছা। না মানলে সেজন্য তিনি কল্যাণবাবুকে কোন অনুযোগ জানাবেন না।

আশ্চর্য! এ কাজের জন্য সারা পাড়ার লোক অভিনন্দন জানিয়েছে কল্যাণবাবুকে। এ-বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছে এ-কাজে হাত দেওয়ার ফলে। তবু আজও তিনি ঠাঁই পেলেন না তাঁর নিজের ঘরে!

কল্যাণবাবু দুঃখিত হয়ে বললেন: একটা কথা তোমরা ভুলে যাও রমা যে, ইংরেজের আমলটা এখন আর নেই। লোকের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বদলে গেছে। সিঁদুরে রঙ্ দেখলেই এখন আর লোকে ভাবে না যে এই আমটাই ভালো। জানো, আমি যখন ফার্স্ট ক্লাশে পড়াচ্ছিলাম, হরেনবাবু নিজে আড়ি পেতে শুনেছেন? আমাকে পরে ডেকে বললেন, পাশ-করা মাস্টারের মুখেও এমন পড়ানো শোনেন নি তিনি। আমাকে একশো টাকা করে দিচ্ছে ইস্কুল থেকে। আমাকে কিছু বলতে হয়নি। হরেনবাবু নিজেই কমিটিকে বলে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ক'টা গ্রাজুয়েট মাস্টার একশো টাকা পায় বল তো?

দ্যাখো শেষ অবধি। ভালো হলেই তো ভালো।—মনোরমা যবনিকা টানলেন আলোচনায়।

•

সুনন্দার উপর শচীনের চোখ পড়েছে সে এ-বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকেই। স্বাস্থ্যবতী উজ্জ্বলবর্ণা এই মেয়েটির সাবলিল লাস্যময় চাল-চলন

শুরু থেকেই তাকে মুগ্ধ করেছে। সুনন্দার দীর্ঘ আয়ত অনবগুণ্ঠিত চোখ-জোড়া ভালো লেগেছে তার।

তবু এতদিন পর্যন্ত পটলের ভয়ে মনের ভাবকে রূপ দিতে পারেনি শচীন। পটল যেমন ডানপিটে, তেমনি একরোখা। গায়ের জোরে তার সঙ্গে এঁটে ওঠা অসম্ভব। সবচেয়ে অসুবিধার ব্যাপার এই যে, এ-বাড়ির তরুণ মহল এই মাকাল ফলটির নামে অজ্ঞান। পটল না হলে তাদের নাকি কোন কাজ হয় না! তাদের আড্ডা অবধি জমে না! এই তরুণ-মহলের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, পটল আর সুনন্দার মধ্যে তলে-তলে ভালোবাসা-বাসি গোছের একটা ব্যাপার চলছে। এর মধ্যে আর কাউকে মাথা গলাতে দিতে তারা রাজী নয়। তারা কিছুতেই এ-কথা বুঝতে পারে না যে, একটি অভিজাত-বংশীয়া সত্যিকারের ভদ্র মেয়ের পক্ষে পটলের মত একটি লম্পটের সঙ্গে প্রেমে পড়া সম্ভব নয়। আর পটলও তেমনি ছেলে—জানে যে সুনন্দাকে জয় করা তার পক্ষে আকাশ-কুসুম কল্পনা-মাত্র, তবু তাই বলে আর কাউকে সুযোগ দিতেও সে রাজী নয়। মানুষের নীচ স্বার্থপরতার এর চেয়ে জঘন্য দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

ভরসা এই যে, যোগ্য লোক একদিন না একদিন সুযোগ পায়। শচীনও সুযোগ পেয়েছে এতদিনে। শ্রীমান পটল নিজের কৃতকর্মের ফলে শ্রীঘরবাসী হয়েছেন। আপদ বিদায় হয়েছে পথের থেকে! আর ঠিক এই সময়টাতেই এ-বাড়িতে শচীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্মানের অধিকারী। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ-সম্মান অর্জন করেছে সে। দীর্ঘ দিন বেকার থাকার পর সম্প্রতি পাকিস্তানে গিয়ে কাস্টম্‌স্‌কে ফাঁকি দিয়ে বিদেশী ওষুধ সীমান্ত-পারাপার করার বিদ্যাটা সে আয়ত্ত করেছে। ফলে আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে সে তার সামান্য হাজার টাকা মূলধনকে দ্বি-গুণিত করতে পেরেছে। এ বাড়ির বাসিন্দাদের মাপকাঠিতে এটা অনেক টাকা। টাকার মালিককে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেনি তারা। তা-ছাড়া এখন প্রকাশ পেয়েছে যে শচীনের বাবাও নাকি একেবারে, যাকে বলে ফুটো পয়সার মানুষ, তা নন। কাজেই সব দিক দিয়েই শচীনের যে এখন পয় ভালো এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রচুর চা-মিষ্টি এবং বিড়ি-সিগারেটের অমোঘ অস্ত্রে শচীন ইতিমধ্যে

বাড়ির ছেলেদের মধ্যে পটলের শূন্য আসন দখল করে নিয়েছে। কালু নামে একটি নিরীহ ছেলেকে মিষ্টি খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে তার অসীম কৃতিত্বের খবরটা সুনন্দার কানে পৌঁছেও দিয়েছে সে। এখন শুধু বাকী আসল কাজটা—সুনন্দার মুখোমুখি হয়ে মনের ভাবটা প্রকাশ করে বলা। শচীনের পক্ষে এ-কাজটা খুব কঠিন। সে যে সত্যিকারের ভদ্রলোক,—পটলের মত, অর্থ থাক বা না থাক্, ফর-ফর করে কথা বলতে পারে না। বিশেষ করে সুনন্দার জমকালো চেহারার সামনে নিজের সরু দেহ, ভাঙা গাল, আর গর্তে-ঢোকা চোখ নিয়ে দাঁড়ানোর কথা ভাবতেই বুকে হাতুড়ী পেটা শুরু হয়ে যায়। যারা সত্যিকারের রুচিবান্ তাদের বিপদ অনেক।

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত সুনন্দার কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে একখানা চিঠি লিখল শচীন। চিঠিতে এ-কথা জানাতে ভুলল না যে, সুনন্দার ধ্যানে দুমাস ধরে রাত জেগে জেগে শরীর ক্ষয় করে ফেলেছে সে। কল্যাণদার অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘরে গিয়ে সে চিঠিখানা নিঃশব্দে মেঝের উপর ফেলে এল। সুনন্দা তখন ঘরেই ছিল, তবু তার হাতে চিঠি দেওয়ার সাহস হল না! চিঠিখানা সুনন্দার চোখে যে সহজেই পড়বে এ-বিষয়ে অবশ্য সে নিশ্চিন্ত ছিল।

আর আশ্চর্য! সুনন্দা জবাব দিল। সুনন্দা অবিশ্যি তাকে এই সব বদ্ মতলব ছেড়ে অবিলম্বে জাহান্নমে যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু তাইতেই শচীন উৎসাহিত হয়ে দ্বিতীয় চিঠি লিখল সেই দিনই। এবারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তুলে দিয়ে নিজের বিদ্যাবত্তার অনস্বীকার্য প্রমাণ দিতেও ছাড়ল না।

শচীনের চতুর্থ কি পঞ্চম চিঠিটা নিয়ে একটু গোলমাল বাধল। স্নান করে ফেরার পথে চিঠিখানা হাতে পেয়েছিল সুনন্দা। ঘরে এসে তাড়াতাড়িতে চিঠিখানা বিছানার তলায় গুঁজে রেখে ছাদে গিয়েছিল কাপড় মেলতে। সেই অবকাশে চিঠিখানা মনোরমার হাতে গিয়ে পড়ল। স্নান করে একেবারে ছাদ হয়ে সুনন্দা ঘরে ফেরে। কিন্তু সেদিন আগেই ঘরে ফিরতে দেখে মনোরমার কেমন খট্‌কা লাগল। বিছানার কোণটায় জলের চিহ্ন দেখলেন। কাজেই চিঠিখানা সহজেই বার করতে পারলেন মনোরমা।

অজস্র ভুল বানান আর ভুল ভাষায় লেখা শচীনের শ্লীলতা-বর্জিত

চিঠিখানা পড়ে স্বভাবতঃই মনোরমা চিন্তিত হলেন। দেশের বাড়িতে হলে এ সব ব্যাপারে অভিভাবকদের কর্মপন্থা খুব সহজ ছিল। মেয়েকে আচ্ছামত বকুনি আর মার-ধর করে তাকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঘরে বন্দী করে ফেলা। সম্ভব হলে দূরবর্তী কোন আত্মীয়-বাড়ি চালান করে দেওয়া। কিন্তু যে-কোন অবস্থাতেই সবচেয়ে কার্যকারী ব্যবস্থা ছিল একটি ভালো ছেলে দেখে-শুনে সাত-তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া।

ঐ মোক্ষম ব্যবস্থাটাই যে এখন নাগালের বাইরে। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মত টাকা কোথায়? অথচ বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত না নিয়ে আর যা-ই করা যাক, তাতে কাজ হওয়ার ভরসা কম। মেয়েটাকেও অসুখী করা হবে। হয়তো সে বেপরোয়া হয়ে উঠবে। সোরগোল করায় জানাজানি হয়ে গেলে তাতে অনর্থক মেয়েটার দুর্নাম হবে। অথচ লাভ কিছু হবে না।

ছেলে-মেয়েদের গালমন্দ মারধর করে শাসন করার সনাতন রীতির উপর মনোরমার বেশী আস্থা নেই। অসহ্য হয়ে উঠলে এক-আধ সময় অবশ্য এ-পথ না নিয়ে উপায় থাকে না। কিন্তু ফল ভালো হয় কিনা সন্দেহ আছে। এই তো পটলের ব্যাপার নিয়ে সত্য-মিথ্যে সন্দেহের উপর নির্ভর করে দিনকতক আগে মেরেছিলেন পর্যন্ত স্নুনন্দাকে। তারই ফলে মেয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে কিনা কে জানে? বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে, এখানে আর একটি ছেলে এসে জুটেছে। শচীন ছেলেটাকে এমনিতেও তাঁর বিশেষ ভালো লাগে না। তা ছাড়া, কোন মেয়ে একাধিক ছেলের সঙ্গে ছেলেমানুষী করছে এ সংবাদটা স্বভাবতঃই ন্যক্কারজনক।

আরও মুস্কিল এই যে, এই ব্যাপারে খুব কড়া শাসনের পথ নেওয়াতেও বাধা আছে। আত্মীয়-স্বজন মহলে খুব ব্যাপকভাবে প্রচারিত যে, কল্যাণবাবুর সঙ্গে তার বিয়েটা প্রেম-মূলক! ছেলে-মেয়েরা অবধি ব্যাপারটা শুনেছে। আসলে অবশ্য যা ঘটেছিল তা খুবই সামান্য। তাঁর প্রতি আকর্ষণ বশতঃই কল্যাণবাবু ঘন ঘন তাঁদের বাড়িতে আসতেন এ কথা ঠিক। তিনিও পছন্দ করতেন কল্যাণবাবুকে। কিন্তু তাই বলে যাকে প্রেম বলে, তা-ই বলা যায় কি সে-ঘটনাটাকে? বিয়ের আগে কদাচিৎ-ই তিনি কথা বলেছেন কল্যাণবাবুর সঙ্গে। আর তাও—বসুন, দাদা এখুনি আসবেন, বা, চা না খেয়ে যাবেন না—গোছের দুচারটে মামুলী কথা মাত্র। নেহাৎ দাদা তার

পক্ষপাতটা জানতে পেরে জোর-জবরদস্তি করে বিয়েটা ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটুকুনেরই নাম হয়েছিল প্রেম-মূলক বিয়ে।

কিন্তু এই ইতিহাসটা পিছনে থাকার ফলে মেয়ের উপর এখন জোর খাটানো অসুবিধে। ভাববে, বয়স হওয়ার ফলে মা নিজে যা এককালে করেছেন, মেয়েকে তা করতে দিচ্ছেন না।

কী যে হচ্ছে দিন দিন দেশ-কালের অবস্থা! আগের দিনের মাপা-জোকা চিন্তাধারা একেবারে পাল্‌টিয়ে যেতে বসেছে। যে পরিবর্তনটা হচ্ছিল খুব আস্তে আস্তে, চোখ সইয়ে সইয়ে, দেশ ভাগ হয়ে যেন সেটা একেবারে দুর্বার হয়ে উঠেছে। তাঁর ছোট-বেলায় কেউ কখনো ভাবতে পেরেছে যে সোমত্ত অনূঢ়া মেয়ে রাজ্যের বকাটে ছেলেদের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশা করছে? অথচ তাঁর নিজের মেয়েই আজকে অনায়াসে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছে পরের ছেলেদের সঙ্গে! কী করতে পারছেন তিনি?

এ বাড়িতে ঘরের বৌ সুধা ট্যুশানী করে রাত এগারোটায় বাড়ি ফেরে। কোন রাতে ফেরেও না। তটিনী মেয়েটা কলেজে পড়ে, আবার শোনা যায় রাজনীতিও নাকি করে। মাস্টার কার্তিকবাবুর বৌ নাচের মাস্টারী করে। আবার নাকি বদ্‌মাইশীর রাজত্ব সিনেমায় ঢুক্‌বে। এ বাড়ির আরও অনেক মেয়ে অফিসে-অফিসে ঘুরছে চাকরির জন্যে, বা যাচ্ছে অক্‌ল্যাণ্ড হাউসে সাহায্যের প্রত্যাশায়। না, মেয়েদের আব্রু একেবারে ঘুচে গেল। আর সেই সঙ্গে নৈতিক মানদণ্ড?

চারদিক থেকে সমস্যা এসে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে মনোরমাকে। টাকার চিন্তা, ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর চিন্তা, আর এই এসে জুটল সুনন্দার চিন্তা। কল্যাণবাবু তো পুরোনো সমস্যা। মাস্টারী না কী ছাই করছেন! দুদিন বাদে যখন ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে, তখন বুঝতে পারবেন, মনোরমা যা বলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয় কিনা!

মানুষটা মনোরমা বিবেচক। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কাজ করতেই ভালোবাসেন। সুনন্দার চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে দিয়ে দুদিন ধরে শুধুই ভাবলেন। আশ্চর্য! তবু কল্যাণবাবুর কাছে কথাটা তুললেন না পরামর্শের জন্য। তাঁর কোন কথার দাম যে দেয় না, তাঁর কাছে গায়ে পড়ে তিনি যাবেন

পরামর্শ চাইতে? তা হয় না। খুবই গুরুতর সমস্যা—তবু তিনি একাই তার বোঝা বয়ে বেড়াবেন।

দুদিন পরে, সেদিন বিকেলের দিকে স্থনন্দাকে ডাকলেন মনোরমা।

স্থনন্দা, শোন্!

কেন মা?

কাছে এসে বোস্ না। কথা আছে।

স্থনন্দা বসল প্রায় মায়ের কোল ঘেঁষে। অত্যন্ত নিস্তেজ আর নরম শোনালো মায়ের গলা। এরকম গলা অনেক দিন শোনেনি স্থনন্দা।

কী কথা না কি বলবে বলছিলে মা?

হ্যাঁ। জানিস্, তোর বয়সে আমি শ্বশুর ঘর করেছি? মেয়েদের এ-বয়সটাতে শ্বশুর বাড়িতেই মানায় ভালো। কিন্তু কী করব? বাপ-মা হয়েও তোর বিয়ে দিতে পারছি না।

সেই কথাই তো স্থনন্দা অবাক হয়ে ভাবে। তাহলে তারও সমস্যা অনেক সহজ হতে পারত।

বিয়ের কথা কেন ভাবছ মা? আমার বয়সের কোন্ মেয়েটারই বা বিয়ে হচ্ছে আজকাল!

পয়সার অভাব। তাই বিয়ে দিতে পারা যায় না। যার-তার হাতে তো দেওয়া যায় না। কিন্তু তোর খুব সাবধানে থাকা দরকার মা। তোর বয়সটা যে খুব খারাপ!

মা'র বলার ধরণ দেখে স্থনন্দা না হেসে পারল না।

আমার জন্য তোমার খুবই ভাবনা হচ্ছে যেন আজকাল মা? কিচ্ছু ভেবো না। আমি সামলিয়ে চলতে জানি। আমাকে কি তুমি বিশ্বাস কর না মা?

তা করি। কিন্তু তোর বয়সটাকে বিশ্বাস করি না। এ-বাড়িতে অনেক ছেলের ভীড়। পটল ছেলেটা গোঁয়ার হলেও মানুষটা তবু ভালো ছিল। কিন্তু এই শচীনকে আমার ভালো বলে মনে হয় না একদম। ওর টাকা থাকলে কি হবে?

মা কি তবে শচীনের ব্যাপারটাও জানেন নাকি? কী করে জান্‌লেন? তবে মায়ের ও-মন্তব্যটা স্থনন্দা মানে না, শচীনকে অবশ্য গণনার মধ্যেই

আনেনি সে। শচীন একটা অবান্তর প্রসঙ্গ। তবে টাকাটা যে এ-বাজারে তুচ্ছ করার জিনিস নয়, তা কি এতদিন সংসার করেও মা বোঝেন নি!

একটা কথা তোমাকে বলি মা। একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। তোমার মেয়ের নজর এখনো এত নীচুতে নামেনি যে, এ-বাড়ির কোন ছেলে তার নজরে পড়বে! একটাও কি ছেলের মতো ছেলে আছে এ বাড়িতে?

সুনন্দা বুঝেছে, মা নিশ্চয়ই শচীনদার চিঠিটা দেখেছেন সেদিন। চিঠিটা হাতে নিয়েই কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তবে কিচ্ছু এসে যায় না তাতে। সুনন্দা এখন মাকে যা বলল, তা তার মনের নির্ভেজাল সত্য কথা। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার নাটক-নভেলেই পড়তে ভালো, বাস্তবে ও-জিনিস যে বিশেষ সুবিধের নয়, মা'র জীবনটা এতকাল ধরে দেখে দেখেও তা কি তার শিখতে বাকী আছে?

কিন্তু শচীনই বা তার কাছে এত চিঠি লিখবে কেন? এর একটা বিহিত করতে হয়।

পরদিনই সুনন্দা শচীনকে পাকড়াও করল একতলার বারান্দায়।

শচীনদা, আপনি আমার কাছে এত চিঠি লিখছেন কেন? জবাব পান না, তবু চিঠি লেখার কামাই নেই, কেন?

খুব কাছাকাছি কেউ না থাকলেও এত খোলা জায়গায় নিশ্চয়ই কেউ দেখছে। শচীন ঘেমে উঠল!

মানে—আপনি—তুমি—কি সেইজন্য রাগ করেছো? আমি কিন্তু—

ভেবেছিলেন যে আমি খুব পছন্দ করছি—এই তো? কেন, আপনাকে তো লিখেছিলাম আর চিঠি না লিখতে? আর এখন আবার বলছি, ভবিষ্যতে আর কখনো চিঠি লিখবেন না। মনে থাকবে তো?

শচীন এতক্ষণে একটু সাহস বোধ করছে। প্রেম করতে হলে সাহস চাই যে।

কিন্তু চিঠি না লিখলে আমি যে মরে যাব সুনন্দা। আমার মনে যে—

এবারও কথা কেড়ে নিয়ে সুনন্দা বলল: কতখানি ভালোবাসা আছে তা আমি জানি। কিন্তু ভালোভাবে বলে দিচ্ছি, আবার যদি চিঠি লেখেন তবে বিপদে পড়বেন।

গট্‌ গট্‌ করে হেঁটে চলে গেল সুনন্দা। তেজ দেখ মেয়ের! শচীন তো জীবনে আর মেয়ে দেখেনি কোনদিন!

সুনন্দা-শচীন সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা কেউ কেউ দেখে ফেলেছিল। শচীন সেটা বুঝতে পেরে একটা নতুন চাল চালল। সে বলে বেড়াতে লাগলো যে, সুনন্দার সঙ্গে তার রীতিমত চিঠি লেখালেখি চলছে। সুনন্দার থেকে পাওয়া একমাত্র চিঠিখানা সে দূর থেকে বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়ে দিলো। আরও জানালো যে, সুনন্দা তার কাছে সামনাসামনি প্রেম-নিবেদনও করেছে। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে, সে হয়তো সুনন্দাকে বিয়েও করতে পারে। তবে হঠাৎ-ই নয়। মেয়েটা কতটা নিষ্ঠাবতী আগে জেনে নিতে হবে ভালো করে। পটল-ঘটিত ব্যাপারটা জানে তো সে।

এতগুলো চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়ার ফলে রবি-তপনদের দল কথাটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। কথাটা ছড়িয়ে পড়ল মেয়ে-মহলে। সেখান থেকে মেয়ের মা-দের মহলে। তাঁরা আরও সহজে কথাটা বিশ্বাস করলেন। শচীনের মত রোজগেরে ছেলের উপর তাঁদেরও চোখটা সহজেই পড়েছিল কিনা। কথাটা শুনে মনোরমার দুশ্চিন্তার বোঝাটা আরও একটু ভারী হলো। সুনন্দা একটু মুচকিয়ে হাসল শুধু।

বাইশ

নতুন পেশায় সুধা যে খুব অনায়াস-সাফল্যের পথে চলছিল তা নয়। পেশা হিসাবেই সুধা কাজটা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অবাক হয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হলো, আর-পাঁচটা পেশার মতো এটাও সত্যি একটা পেশা। এরও বিশিষ্ট টেক্‌নিক্ আছে যা চেষ্টা করে জানতে হয়। সবচেয়ে কঠিন কাজ মানুষ চেনা। পাশেই দু'আনা কাপ চা থাকতে মানুষ একই চা চার আনা দিয়ে খায় কোন অভিজাত রেঁস্তোরায় গিয়ে। এখানেও তেমনি। মানুষ বেশী পয়সা দেয় কিছু বাড়তি পাওনার জন্য। সেই আরও কিছুর তত্ত্বটা সুধা কিছুতেই বুঝতে পারল না। বা বুঝতে চাইল না।

পিণ্টুবাবু অনেক কিছু আশা করেছিলেন সুধার থেকে। অনেক হিসেব করেই তিনি সুধাকে তাঁর আয়ত্তের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় বসিয়েছিলেন। শ্যামবর্ণা মেয়েটি এমন কিছু রূপসী নয়। কিন্তু তিনি ভালই জানতেন, রূপটাই যে বাজারে সবচেয়ে ভালো কাটে তা নয়। এমন কিছু থাকা চাই চেহারার মধ্যে, খানিকটা ব্যক্তিত্ব, খানিকটা চলন-বলনের বৈশিষ্ট্য, যাতে মনে হয় এ-মেয়ে পড়ে-পাওয়া শস্তা-মেয়ে নয়। তেমন মেয়ে বলেই মনে হয়েছিল সুধাকে। আর পিণ্টুবাবুর লোক চিনতে সাধারণতঃ ভুল হয় না।

কিন্তু বাছা বাছা খদ্দেররা সুধার দরজায় একবার পেরিয়ে এসে আর সে পথ মাড়াতে চাইল না। প্রথম প্রথম এ-রকম দু'চারটে ঘটনা ঘটা খুব আশ্চর্যের নয়। কিন্তু মাস পার হয়ে গেল। খদ্দেররা যায়। কিন্তু আর ফিরে আসে না। এরকম হলে মাসের আড়াইশো টাকা ঘর ভাড়াই বা উঠবে কি করে?

এখানে যে-সব খদ্দের আসে, তারা হঠাৎ-খেয়ালে বাজারে যাওয়ার খদ্দের নয়। এক মাস কি পনেরো দিন আগে তারা বন্দোবস্ত করে টাকা জমা দিয়ে যায়। কিন্তু নির্ধারিত সেই রাত্রিটিতে ষোল আনা পাওনা তাদের পাওয়া চাই। একটা রাত্রের দাম আছে তাদের কাছে।

কিন্তু এ সব অভিজাত প্রথম শ্রেণীর খদ্দেররা সুধার কাছ থেকে ফিরে এসে যা বলে, তাতে তাজ্জব না হয়ে উপায় থাকে না। যে-সব মানুষের বুট পালিশ করার যোগ্যতাও নেই সুধার, সেই সব মানুষের অঙ্কশায়িনী হওয়া,—এ যে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই সম্ভব সুধা তা বুঝতে চায় না। কত সব পয়লা নম্বরের 'মাল' মেথর-মুর্দাফরাশদের লাশ বইতে বইতে যৌবন কাবার করে দিল এ লাইনে এসে! সুধা কোন্ ছার! অথচ কে বোঝায় সে-কথা, আর কেইবা বোঝে—

সুধার সম্পর্কে কেউ বলে পাগল, কেউ বলে পুতুল, কেউ বলে রাক্ষসী। অর্থাৎ খদ্দেরের মর্জিমতো সুধা চলবে না। তার মর্জি অনুযায়ী চল্‌তে হবে খদ্দেরদের। অপরাধ, তারা পয়সা দিয়েছে! কত খদ্দের সারা রাত থাকবে বলে এসে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা থেকেই চলে গেছে। এক শাঁসালো মারোয়াড়ী খদ্দের সইতে না পেরে সুধাকে খুব পিটিয়েছিল। সুধাও তেমনি। সোহাগ করে চুমু খেতে গিয়ে হতভাগী ঠোঁট কাম্‌ড়িয়ে রক্ত বের করে দিয়েছিল!

পিণ্টুবাবু ব্যবসা করতে বসেছেন। মানুষের সঙ্গে কতরকম বিচিত্র ব্যবহার করা যায় তার পরীক্ষাগার খোলেননি। কাজেই একদিন সোজাসুজি কথা বলতে হল সুধার সঙ্গে।

তুমি যদি এমনিভবে চলবে ভেবে থাক সুধা, তবে তোমাকে নাম লিখিয়ে বাজারে বসতে হবে।—পিণ্টুবাবু সুধাকে আপনি বলা ছেড়ে দিয়েছেন অনেক কাল।

সুধা বলেছিল: কিন্তু মনে রাখবেন, জোর করে আমাকে দিয়ে কিছু করাতে পারবেন না।

আর এক মাস সময় দিলাম তোমাকে। এর মধ্যে নিজেকে শুধরে নাও। নইলে কী করতে হবে আমি জানি।

এই ভীতি-প্রদর্শন অবিশ্যি সুধার উপর একটুও রেখাপাত করেনি। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল, জনকয়েক খদ্দের ফিরে আস্‌ছে সুধার কাছে। সুধার রুক্ষ ব্যবহার, অনমনীয় চাল-চলন, কেমন করে যেন এই ক'জন লোককে আরও বেশী করে টান্‌তে লাগল। পিণ্টুবাবু হিসাব করে দেখলেন, এই হারে চললে আরও কিছুদিন সুযোগ দেওয়া যেতে পারে সুধাকে।

এই ভাবেই সুধার 'মাটির তলার' কারবার চলতে লাগল। অনুতাপ নেই,

কিন্তু ক্লান্তি আর বিরক্তিরও শেষ নেই। মানুষগুলোকে কখনো মনে হয় ভেড়ার পাল, কখনো মনে হয় মাতাল ষোষ। ভেড়া ভেবে হয়তো খেলা করে খানিকক্ষণ যতক্ষণ না বিরক্তি আসে। ষোষ ভেবে হয়তো বিষম তাড়া করে রূঢ় ব্যবহার দিয়ে! ষোষ পিছন ফিরলে খেয়াল হয় তাই তো, এমনি করে কি ব্যবসা চলে! তবু অনেক ভেবে দেখেছে সুধা, নিজেকে সে এর চেয়ে বেশী আর পাল্টাতে পারবে না।

একটি ছোকরা গোছের 'বাবু' মাঝে মাঝে তার কাছে আসে। সুধা বেশ বুঝতে পারে, তার কাছে আসার পর থেকে সে অন্য জায়গায় যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছে। তবু বাবুটির প্রতি তার এতটুকু মায়া বা আগ্রহ জাগে না। নিজের আকর্ষণ-ক্ষমতার পরিচয় পেয়েও খুশি বোধ করে না।

একটি সোফার কোণে গুটি-শুটি মেরে সুধা হয়তো বসে আছে। ছেলেটি আচমকা ঘরে ঢুকে আর একটি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলে উঠল: আঃ! কী আরাম!

খদ্দের এল বলে এতটুকু আগ্রহ দেখালো না সুধা।

ভদ্রমহিলার ঘরে ঢুকতে হলে আগে জানান দিতে হয়। আপনাকে এ-কথা বোধ করি আগেও বলেছি। যাক্ গে, তারপর কী মনে করে?

এ-সব কথা ছেলেটি একেবারেই বুঝতে পারে না। কেমন বোকা বোকা মনে হয় নিজেকে। বাজারের মেয়ে আবার ভদ্রমহিলা হয় কী করে! একটু চুপ করে থেকে মুখ ভেঙচিয়ে বলল ছেলেটি: ভদ্-দ্র-মহিলা! লেডী! হবেও বা। কলেজে-পড়া মেয়ে তো!

ছেলেটি পরিচ্ছন্ন বটে, কিন্তু কাপড়-চোপড়গুলো অল্প দামের। পাম্পশু জুতোটা চক্‌চকে বটে, কিন্তু তাতে যে অনেকবার হাফসোল দেওয়া হয়েছে সুধা তা-ও লক্ষ্য করে দেখেছে। ঘন ঘন সিগারেট টানে, দামী কেস নেই; যে-প্যাকেটে ভরে সিগারেট বিক্রি হয় তাতে করেই সিগারেট নিয়ে আসে। ছেলেটি এমনিতে হয়তো বেশী সিগারেট খায়ও না; এখানে আসবে বলেই কিনে নিয়ে আসে। তবু অল্প পয়সায় অন্য জায়গায় যাওয়ার বদলে ছেলেটি বেশী পয়সা খরচ করে আসবে সুধার কাছে! এই জন্যই সুধার আরও রাগ হয়।

নিজের চরিত্তিরের মাথাটি খেয়েছেন বলে সারা ছুনিয়াটাকেই সেই চোখে দেখেন, না? ঐ অভ্যেসটা ছেড়ে দিন, বুঝেছেন?

আমি চরিত্তিরের মাথা খেয়েছি আর তুমি শোভনা বুঝি সতী-সাবিত্রীর আপন বোন? একেবারে এক মায়ের পেটের?

সুধা একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠল: আবার এ-সব কথা বলছেন? আমার সম্পর্কে কোন কথা বলতে আপনাকে নিষেধ করেছি না? আমার সঙ্গে আপনার কোন তুলনা হয়? আমি এসেছি পয়সার জন্য, আর আপনি?

মাইরী বলছি শোভনা, রাগলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়!—ছেলেটি বলল, হঠাৎ খুশি হয়ে: কিন্তু, দোহাই তোমার শোভনা, আজকের রাতটাও অমনি করে নষ্ট করো না। অনেক পয়সা খরচ করে এসেছি।

সুধা কিছুক্ষণ ভাবল।—মদ খাবেন?

না খেলে হয় না? আমার খুব ঝোঁক নেই ওদিকে জানো তো?

অল্প করে খান তবে?

তা হলে তুমিও খাবে একটু সঙ্গে?

আবার? বলেছি না, আমাকে এসব অনুরোধ করবেন না কখনো?

ঝিকে বলে সুধা এক পাইট জীন আনিয়ে নিল। খানিকটা মদে অল্প খানিকটা সোডা মিশিয়ে ছুটো গ্লাসে ঢালাঢালি করে তার মধ্যে বাবু'র হাতের সিগারেট-টা নিয়ে তার ছাই একটু ঝেড়ে দিয়ে কী যে তুক্ করল সুধা, ছেলেটি অল্প পরেই একেবারে বেহুঁস মাতাল হয়ে গেল, মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল। অর্থহীন কথা বলতে লাগল বিড়বিড় করে। ঝিকে ডেকে ছু'জনে মিলে ধরাধরি করে নীচে নিয়ে 'বাবু'কে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এল সুধা।

তিন-চার দিন পরেই আবার ছেলেটি এসে উপস্থিত হলো।

এর মধ্যে আবার ফিরে এসেছেন? পয়সা খুব বেশী হয়ে গিয়েছে বুঝি? কোন সস্তার জায়গায় গেলেও তো পারেন?—সুধা ছেলেটিকে সম্বর্ধনা জানালো এইভাবে।

আমি পয়সা নষ্ট করছি বলেই তো তোমার চলছে শোভনা।

ভালো একটা কথা বলতে পেরেছে ভেবে খুশি হয়ে ছেলেটি বিছানার উপর আরাম করে বসে জুতোসুদ্ধ পা তুলে দিল।

সুধা হা হা করে উঠল: করছেন কি? করছেন কি? বিছানা

নোংরা হয়ে গেল যে। কী আপদ! চরিত্তির নোংরা বলে কি স্বভাবও নোংরা হতে হবে নাকি?

সুধা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হাত দিয়ে ঠেলে নামিয়ে দিল ছেলেটির পা। এ ঘটনায় মেজাজটা একেবারে খিঁচিয়ে গেল সুধার।

আজকে আমার মনটা ভালো নেই। বেশীক্ষণ থাকতে দেব না কিন্তু আপনাকে।

একটু মদ খাব ভাবছিলাম যে।

না! সামলে চলুন। শেষে মদে আপনাকে খাবে।

ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার অভিপ্রায়ে সুধা তাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকল, আর ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ঘন হ'য়ে বসে সে তার লুব্ধ কম্পিত আঙুল দিয়ে সুধাকে আঁকড়ে ধরল। যেন সম্ভব হলে সে সুধাকে গিলে ফেলতেও পারে।

সুধা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। দু'একবার ঠেলে শিথিল করে দিতে চেষ্টা করল ছেলেটির বাহু-বেষ্টনী। তার শরীরে সেই পরিচিত যন্ত্রণা-বোধটা সুরু হয়েছে!

শেষ অবধি নিজেকে ছাড়িয়ে না নিয়ে সুধা পারল না। বগলে সুড়সুড়ি দিয়ে হ'ল না। তলপেটে চিমটি দিতেই ছেলেটি সরে গেল।

মদ খাবেন বলছিলেন না? খদ্দেরের কোন ইচ্ছা অপূরণ রাখতে নেই। মা-লক্ষ্মী রাগ করেন। দাঁড়ান, আগে মদ আনিয়ে নি।

মদ পরিবেশন করার সময় সুধা গোপনে একটা কড়া ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিল। ছেলেটি ঝিমিয়ে গেলে তাকে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে এল।

সব বারই যে সুধা এমনি করে এড়িয়ে যেতে পারে তা নয়।

সেই সব অভিজ্ঞতার স্মৃতি এবং আতঙ্ক তার মনে স্থায়ী হয়ে আছে।

প্রথমটায় ব্যথা বোধ হয়। সমস্ত শরীর গরম হয়ে ওঠে। চঞ্চল রক্ত দাপাদাপি সুরু করে দেয়। তারপর সমস্ত স্নায়ুগুলো অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড়াতে থাকে। অনেকক্ষণ স্থায়ী এই যন্ত্রণা।

সাধারণ মেয়েরা এ-পথে আসতে বাধ্য হলে অনুতাপ করে, ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়, কাঁদাকাটা করে। এইভাবে তাদের পীড়িত মন শান্ত হয়।

কিন্তু সুধা তেজী শক্ত মেয়ে, অর্থনৈতিক অসহায়তা এবং সমাজের প্রতি একটা তীব্র অভিমান-বোধ থেকে নিজে যেচে স্বেচ্ছায় এসেছে এখানে। কোন অপরাধ-বোধকে সে মনে প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু সেটা লুকিয়ে আছে মনের গোপনে, আর সেইজন্য তার ক্ষয়ও নেই।

বহুদিন আগে থেকেই সুধা জেনে রেখেছিল যে তার যৌবন মরে গিয়েছে। তার মনের সমস্ত কামনা-বাসনা মরে গিয়েছে। ভাল খাওয়া, শাড়ী-গয়না, সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি যে-সব জিনিসের প্রতি সাধারণতঃ মেয়েদের আসক্তি থাকে, তা তার নেই। অপরের কাছে অভাব অভিযোগের কথা বলে সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা সে কোনদিন করেনি। এই ধরণের দুর্বলতা প্রকাশকে সে ঘৃণা করে। সে দেখেছে, অনেক বৌ-ঝিরা তাদের স্বামী এবং অন্যান্য অপদেবতাদের লাথি ঝাঁটা নির্বিবাদে হজম করে শুধু তাদের অজস্র কামনা-বাসনার সামান্য ছিটে-ফোঁটা পরিতৃপ্তি মিলবে বলে। কামনা মানুষকে দুর্বল করে, মানুষকে অপমান সহ্য করতে বাধ্য করায়। সুধা তাই কামনাকে প্রশ্রয় দেয় না কোনদিন। জীবনে কিছু সে না পাক ক্ষতি নেই; কিন্তু কারও অপমান সে সহ্য করবে না।

আর সেই জন্যই তার মনের জোর অসাধারণ, কাউকে সে ভয় পায় না। যে-কোন অবস্থার জন্য সে তৈরী।

সাধারণতঃ বৌরা প্রত্যাশা করে, স্বামীরা তাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব নেবে। সুধা এই চিরাচরিত নিয়মটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে ভাসুরের অনুগ্রহের দান যাতে না নিতে হয় সেইজন্য। যে-কোন উপায়ে হোক স্বামীকে সে খাওয়াবে। এটা তার জেদ। স্বাভাবিক উপায়ে অর্থোপার্জন করতে দিতে সমাজ যখন অস্বীকার করল, তখন সে অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করেছে। শুধু মনের জিদের জন্য। কারও কাছে যাতে ছোট হতে না হয়, কারও দরজায় যাতে ভিক্ষে করতে না হয়, শুধু সেইজন্য।

কিন্তু এই অভিনব পন্থায় রোজগার করতে এসে সুধা হঠাৎ আবিষ্কার করল তার যৌবন মরে যায়নি, তার কামনারা লুকিয়ে আছে মনের কোণে। তার দেহটা পাথরের তৈরী নয়, রক্ত-মাংসের তৈরী। দেহ-মনের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে দারুণ রাগে বিষিয়ে উঠল সুধার অন্তরাত্মা। কামনা আছে বলেই অপরাধ বোধকে টিপে মেরে ফেলা যায় না। যতক্ষণ সে

পিণ্টুবাবুর কারখানায় থাকে, তার মনে একটা তীব্র সংঘাত চলতে থাকে। আর তারই ফল এই দৈহিক যন্ত্রণা।

অথচ এ পথ ত্যাগ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই একমাত্র পথ সে খুঁজে পেয়েছে, যে পথে সে নিজের আত্ম-মর্যাদাকে বজায় রাখতে পারে। নিষ্ঠুরতা-প্রিয় সমাজকে সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারে।

সত্য বলতে কি, ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন তার মনে একবারও উঁকি দেয়নি। অথচ তার জীবন দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক জায়গায় সে সুখী, আত্মসমাহিত, সুপ্রতিষ্ঠিত। বাড়ির লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। ছোট মেয়েরা সময়ে পড়া বুঝে নিতেও আসে তার কাছে। সবচেয়ে বড় কথা, ভাসুরের সাহায্য না নিয়েও সে ধরণীবাবুকে খাওয়াতে পারছে, তার রোগের ওষুধ কিনে দিতে পারছে। ধরণীবাবুর মুখ-নাড়ার সুযোগ কমেছে। নিজের জিদকে সে যে বজায় রাখতে পেরেছে এ সুখটা কম নয়।

কিন্তু আর এক জায়গায় সে ভয়ানক অসুখী, বিক্ষুব্ধ, অশান্ত। কিছুতেই নিজেকে পণ্য হিসাবে ভাবতে পারছে না। আর তা পারছে না বলেই প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করছে, সে বঞ্চিত, প্রতারিত। তাকে বঞ্চনা করছে খদ্দেরের দল, বঞ্চিত করছেন পিণ্টুবাবু। তার আয়ের বেশীর ভাগই নানারকম হিসাব-নিকাশের জটিলতার ভিতর দিয়ে যে শেষ পর্যন্ত পিণ্টুবাবুর পকেটেই যাচ্ছে তা সে লক্ষ্য করেছে।

কতকাল এইভাবে চলবে কে জানে? তার চেয়েও বড় কথা, কতকাল পাঁচজনের মধ্যে জানাজানি না হয়েও সে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে তার পেশায়? এখন পর্যন্ত তার আসল পেশা কি, এমন কি ধরণীবাবুও তা' অনুমান করতে পারছেন না।

অবশেষে একদিন সেই ছোকরাবাবুটি সুধার কাছে তার হৃদয়টি উন্মুক্ত করে ধরল।

সেদিন বিকেল বেলা থেকেই দু'পাঁচমিনিট অন্তর অন্তর এক পশলা করে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তা-ঘাট ভিজে প্যাচ্‌পেচে হয়ে গেছে। কোন কোন পাড়ায় জল জমে গিয়েছে রাস্তায়। যারা বেড়াতে বেরিয়েছিল, জামা কাপড় ভিজে তাদের অবস্থা করুণ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই উপরের দিকে তাকিয়ে শুধু এক দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কালো দেওয়াল ছাড়া আর কিছু

দেখা যাচ্ছে না। তারারা আজ যে আর আকাশে উঠবে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমনকি, রাস্তার দুপাশে পৌরসভা পোস্টের মাথায় মাথায় যে তারার শোভাযাত্রা বসিয়েছে, তাদের জ্যোতিও আজকে ম্লান। উজ্জ্বল রঙের বাড়িগুলো আজ কুয়াশা-মলিন। আনন্দের পাড়া চৌরঙ্গীতে আজ যেন ভাল করে হাসি ফুটছে না।

বাড়ি থেকে পিন্টুবাবুর কারখানা অবধি আসতে আসতে সুধার কাপড়-চোপড় ভিজে গেল। মাণিকতলার মোড়ে এসে সুধা ট্যাক্‌শি ধরতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রয়োজনের সময় কলকাতায় সাধারণতঃ ট্যাক্‌শি পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত ভিজে ভিজে খানিকটা বাসে, খানিকটা হেঁটে তাকে জায়গামত পৌঁছুতে হয়েছে।

তার শাড়ীর অবস্থা দেখে ঝি খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কোত্থেকে একখানা শুক্‌নো ধোয়া মোটামুটি ভাল শাড়ী এনে দিল। শাড়ী না পালটিয়ে উপায় ছিল না বলে সুধা অগত্যা সেই শাড়ীখানাই পরল। কিন্তু সেই থেকে মনটা খচ্‌ খচ্‌ করছে এই ভেবে যে, শাড়ীখানা হয়তো ঝির নিজের ব্যবহারের। হয়তো ডিউটির সময় ছাড়া অন্য সময়ে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে বেড়াতে যাওয়ার সময় সে এই শাড়ীখানা পরে। কথাটা মনে আসতেই শাড়ীর নিচে সুধার দেহটা কেমন শিরশিরিয়ে উঠছে এক ধরণের অর্থহীন ঘৃণায়।

মনের খচ্‌খচানিটা আরও বেড়ে গেল যখন সন্ধ্যেবেলার নির্ধারিত খদ্দেরটি এল না। খদ্দেরমাত্রকেই সে নিজের শত্রু বলে মনে করে। তাদের দেখলেই তার আপাদমস্তক জ্বলতে শুরু করে। এবং মাঝে মাঝে আলাপে ব্যবহারে সে মনের সেই নিরুদ্ধ রাগকে প্রকাশ না করে পারে না। কিন্তু তাই বলে খদ্দের না এলে যে খুব স্বস্তি বোধ হয় তা নয়। নিজেকে পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অসহায় বলে মনে হয়।

কোন হঠাৎ-আগন্তুক খদ্দেরের প্রতীক্ষায় ঘরে বসে থাকতে থাকতে সুধা আশপাশের ঘরে হাসি ও গেলাসের টুঙ্‌ টাঙ্‌ শব্দ শুনতে পেল। মনে মনে সেই সব ঘরের মেয়েদের অবিলম্বে নরকে যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো সুধা। কিন্তু তাতেও মনটা শান্ত হল না। আজকে যে ঘরের নিরাপদ উষ্ণতা ছেড়ে কোন অনির্ধারিত খদ্দের সুধার কাছে মাথা মুড়াতে আসবে তা মনে হচ্ছে না।

এমন সময় বর্ষাতি গায়ে বগলে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে 'জীবনের মোড়ে মোড়ে কত পলাশফুল' গাইতে গাইতে সেই ছোকরাবাবু ঘরে ঢুকল। আগে ঝি দরজা ফাঁক করে বলল, বাবু এসেছে। তারপর কাপ্তেন ঢুকলেন মদ না খেয়েও মাতালের ভঙ্গীতে।

আজকে প্রথম একটা মানুষকে ঘরে ঢুকতে দেখে সুধা খুশী হল। ভিজে প্যাচপেচে ঠাণ্ডা দিনে মন যখন হিম হয়ে জড়ত্বপ্রাপ্তির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে, তখন এই মানুষটা তবু খানিকটা সঙ্গ দিতে পারবে।

মানুষটাকে আকারে ছোটখাটো বলে সুধা তাকে ছোকরাবাবু বলে নিজের কাছে উল্লেখ করে। কিন্তু সে জানে, মানুষটার বয়স আসলে খুব কম নয়। চল্লিশের কাছাকাছি হবে নিশ্চয়ই। অভিজ্ঞতা থেকে সুধা বুঝেছে যে তাদের কাছে যারা সাধারণতঃ আসে, তাদের মধ্যে সদ্য-যৌবন-প্রাপ্ত দু'চার জন থাকলেও বেশির ভাগই হল তারা, যাদের জীবন ভাঁটির দিকে। যারা জানে যে তাদের জীবনের উৎসবের দিন শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই।

বাবুটি ঘরে ঢুকে প্রথমে বোতলটা ছোট্ট প্রসাধন টেবিলটার উপর রাখল, তারপর বর্ষাতি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল একটা চেয়ারের উপর। তারপর ট্রাউজারও একটু ভিজে ভিজে বোধ হওয়ায় খুলে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রেখে শুধু অন্তর্বাস পরেই খাটের উপর আরাম করে বসল।

মাইরী বলছি শোভনা! আজকে শরীরটা একটু গরম করতে না পারলে মরে যাব।

সুধা বাবুর মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

তা তো বুঝতেই পারছি। গরম হওয়ার জন্য আয়োজনও তো সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এর তো দরকার ছিল না। বাড়িতে বসে থাকলে তো গরমে থাকতে পারতেন।

পারতাম। আসতে হল তোমার জন্যে।

আমার জন্য ?

আমি না এলে তো তোমাকে একা একা থাকতে হতো।

সুধা ভেবে দেখল, কথাটা আসলে সত্য। সেইজন্য আরও রেগে গেল।

আমার জন্য যদি হয় তো আপনি এক্ষুনি বেরিয়ে যান। আমার জন্য কারও চিন্তা করার কোন দরকার নেই।

না—না—রাগ করছ কেন শোভনা? তোমার জন্য নয়। আমার নিজেরই জন্য আমি এসেছি।

সুধা বিজয়িনীর হাসি হাসল: এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা। আমার কাছে যখনই আসবেন, নিজেকে ছোট মনে করে আসবেন। নিজেকে যে আমার চেয়ে বড় বলে মনে করে, আমি তাকে সহ্য করতে পারি না।

ছোকরাবাবুটি অম্লানবদনে বলল: তাই ভেবেই তো আসি। যখনই তোমার কাছে আসি, মনে মনে একথা জেনে আসি যে আমি ভিখিরি, তুমি দাতা।

বাইরে বোধ করি বৃষ্টিটা একটু চেপে এসেছিল। জানালা দিয়ে জলের ঝাপটা আসছে দেখে সুধা জানালা বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের যে দাপাদাপির শব্দটা এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল তা অনেক মৃদু হয়ে এল।

ঝি ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর সোডা আর গ্লাস রাখল।

আর কিছু লাগবে দিদিমণি!

ছোকরাবাবু বলল: না। আচ্ছা, যদি শিক্‌কাবাব পাও কাছাকাছি, দু'চারখানা নিয়ে এস।

দেখছি।—বলে ঝি চলে গেল।

সুধা হঠাৎ কী ভেবে আপন মনে হাসল। জিজ্ঞেস করল: একটা কথার ঠিক ঠিক জবাব দেবেন?

কী কথা?

আপনি আমার কাছে আসেন কেন বারবার করে?

রোজ রোজ তুমি এই একই প্রশ্ন কর শোভনা! আমি আসি আমোদের জন্য।

জানি। সেইটেই তো স্বাভাবিক। সেই জন্যই আপনি এলে আমার কেমন লজ্জা লজ্জা করে। আপনি যা চান তা তো আমি দিতে পারি না। যাদের হাসিতে মুক্তো ঝরে, যাদের কথায় বেলের সরবতের স্বাদ, আপনি কেন তাদের কাছে যান না? আমার স্বভাবের মধ্যে তো সেই মিষ্টত্ব নেই।

তোমার এই প্রশ্নের আজকে জবাব দেব শোভনা। কিন্তু তার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া দরকার।

নিশ্চয়, নিশ্চয়।—সুধা তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে গ্লাসে মদ আর

সোডা ঢালল। ছোকরাটির দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দিতেই সে বলে উঠল: লক্ষীটি, তুমি এক চুমুক খেয়ে দাও।

বলেছি না—আমাকে কক্ষনো এ অনুরোধ করবেন না।

না—আমি খেতে বলছি না। শুধু ঠোঁট দিয়ে একটু ছুঁয়ে দাও। আমার ভাল লাগবে।

বৃষ্টির দিন বলে আজকে বোধকরি সুধার মনটা একটু নরম ছিল। সে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে মুখটা একটু বিকৃত করে গ্লাসটা এগিয়ে দিল। ছেলেটি লোভীর মত এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের চার ভাগের তিন ভাগ নিঃশেষ করে ফেলল।

এবার বলুন—কেন আমার কাছে বারবার আসেন?—সুধা জিজ্ঞেস করল।

তোমাকে ভালবাসি বলে।

পৃথিবীতে ভালবাসা বলে কোন জিনিস নেই। সত্যি কারণটা কি তাই বলুন।

বিশ্বাস করলে না? কিন্তু আর কোন কারণ তো আমার জানা নেই।

তার মানে, আসল কারণটা আপনি বলতে চাইছেন না।

হয়তো আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য মেয়েদের যন্ত্র বলে মনে হয়, তোমাকে মানুষ বলে মনে হল।

তবু ভাল যে আমাকে মানুষ বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু মানুষ হলেও আমি একটু বদ্‌রাগী।

জীবনে এত আঘাত পেয়েছি না শোভনা, যে ঐটেই অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। একটু আধটু আঘাত যে না দেয়, সে আমার মনে কোন সাড়া জাগায় না।

ছোকরাবাবু বাকী পানীয়টুকু এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা সুধার দিকে বাড়িয়ে দিল। সুধা গ্লাসটা আবার মদ আর সোডায় ভর্তি করল। এবার আর অনুরোধ করতে হল না। সে নিজেই গ্লাস থেকে এক চুমুক খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল। সেই বৃষ্টি-ভেজা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা রাতের মধ্যে কী জাদু ছিল কে জানে! জীবনে এই প্রথম সুধা আর একজনের কথার মধ্যে দুঃখের আভাস পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হল।

জীবনে আপনি বুঝি অনেক দুঃখ পেয়েছেন?

ছোকরাবাবু গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলতে লাগল: গরীবের ঘরে বাবার পাকা হাতের মার খেয়ে খেয়ে বড় হয়েছি। ইস্কুলে মার খেয়েছি মাস্টারমশাইদের হাতে—খুব ভাল ছেলে তো ছিলাম না। পড়া শেষ করে যখন বেকার হয়ে রাস্তায় বেরুলাম, তখন যে দরজায় গিয়েছি সেখানেই সবাই লাঠি নিয়ে তাড়া করে এসেছে। অনাহারের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করে অবশেষে যখন চাকরি পেলাম, দেখলাম, অফিস একটা প্রকাণ্ড মারণ-শালা।

সুধা অভিভূত হয়ে কথা শুনছিল। জিজ্ঞেস করল: কিন্তু এখন তো আপনি একটু আরামের মুখ দেখেছেন?

আরাম? হবেও বা। জীবনে দু' তিন বার চাকরি খুইয়েছি। চাকরি পেয়ে হারানো যে কী জিনিস, সে তুমি বুঝতে পারবে না শোভনা। তারপর সত্যি সত্যি যখন একটা মোটামুটি ভাল গোছের চাকরি পেলাম, তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, জীবনের কাছে আমার অনেক কিছু চাহিদা আছে। এতকাল জানতাম, শুধু বেঁচে থাকাটাই জীবনের একমাত্র কর্তব্য। এখন দেখলাম, না। আমার অনেক কামনা আছে। ভাল খাওয়া, ভাল পরা। বাড়ি চাই, প্রেম চাই।

আপনি বিয়ে করেন নি? বৌ আছে না আপনার?

তারপর আমি বিয়ে করলাম। এতকাল একা মানুষ, মেসে মেসে থাকতাম। এবার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। কিন্তু বৌ আমার সঙ্গে বেশী দিন থাকতে রাজী হল না।

কেন?

সে বড়লোকের মেয়ে। এত গরীবানাভাবে সে থাকতে অভ্যস্ত নয়। আমার মধ্যে সে অনেক ত্রুটি দেখতে পেল। আমার অভিজাত রুচি নেই। আমার লেখাপড়া কম। ভাল করে টাই বাঁধতে শিখিনি। পাঁচ জনের সামনে আমাকে স্বামী বলে পরিচয় দিতে তার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কাজেই সে বাপের বাড়ি থাকে। আমাকে বলে দিয়েছে, আমি যেন মাঝে মাঝে সেখানে যাই আদব কায়দা শিখতে। আমি মাঝে মাঝে বছরে দু'একবার যাই।

আর মাঝে মাঝে ভালবাসার খোঁজে এ-পাড়া সে-পাড়া ঘুরে বেড়ান?

ছোকরাবাবু লজ্জিতভাবে হাসল। তারপর বলল: কিন্তু শোভনা, এ কি খুব বেশী চাওয়া? জীবনের কাছে আমি অনেক কিছু চাইনি। অর্থ চাইনি, অট্টালিকা চাইনি। শুধু একটু ভালবাসা চেয়েছিলাম। জীবনে কেউ আমাকে কোনদিন ভালবাসেনি। বাবা-মা ভালোবাসতেন কিনা জানি না। আমি অন্ততঃ কোনদিন টের পাই নি। শুধু একটুখানি ভালবাসা—তা দিলে কি পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যেত?

হাসতে হাসতে সুধা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সত্যি এই বৃষ্টি-ভেজা রাত কত মায়া জানে! সুধার অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘেরা পাষাণ-কঠিন হৃদয় যেন নরম হয়ে গিয়েছে আজ। ছোকরাবাবুর হৃদয়ের আয়নায় সুধা যেন নিজের অন্তরকে দেখতে পাচ্ছে। তার এই সাংঘাতিক দম্ভ, কারও কাছে মাথা নত না করার এই দুর্জয় সঙ্কল্প—এ সবের নীচে যেন একটি ক্রন্দনের ক্ষীণ সুর শোনা যায়। কান পেতে শুনলে টের পাওয়া যায়। সুধার অন্তরেও কি তবে কামনারা লুকিয়ে আছে? যে কামনা মানুষকে দুর্বল করে!

এতক্ষণে ঝি শিক্‌কাবাব নিয়ে এল। ছোকরাবাবু একটা তুলে নিয়ে বলল—তুমিও একটা খাও শোভনা। লক্ষ্মীটি!

এ সব অনুরোধে সুধা কখনো কান দেয় না। আজ কিন্তু একটা খণ্ড সে তুলে নিয়ে মুখে পুরল। তারপর কী ভেবে গ্লাসে খানিকটা নির্জলা মদ ঢেলে নিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল।

বৃষ্টি আর বাতাসের বেগটা বোধ করি বেড়েছে। জানালাটা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ছোকরাবাবুর কাছে আজ সর্বপ্রথম সুধা নিজেকে ধরা দিল। স্বেচ্ছায়। পয়সার জন্য নয়, সম্পর্কের জন্য নয়, ভালবেসে নয়। শুধু এক দুর্বল কামনা-ভীরু মানুষকে কিছু দেওয়ার জন্যে। আজ একরাত্রের জন্য সুধা দাতা। একমাত্র যে জিনিস সুধার দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাই সে দিল।

সুধার চরিত্রে একটা জিনিসের অভাব ছিল। সহানুভূতি তার কোথাও ছিল না। আজ সে প্রথম আবিষ্কার করল, তার যেমন বেদনাবোধ আছে, অন্য অনেকের মনেও তা আছে।

চলে যাওয়ার সময় সুধার হাতে ছোকরাবাবু পঁচিশটা টাকা দিল। সুধা দশটা টাকা রেখে বাকীটা ফিরিয়ে দিল।

ফিরিয়ে দিচ্ছ যে? পিণ্টুবাবু রাগ করবেন না?
পিণ্টুবাবুকে বুঝ দেওয়ার জন্যই তো দশটা টাকা রেখে দিলাম।

কিন্তু সুধাকে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যেতে হল একজনের কাছে! ভাগ্যের বিড়ম্বনা আর কাকে বলে? অমলেন্দুবাবু মাত্র একদিনই দেখেছিলেন সুধাকে। কিন্তু বিশেষ পরিবেশের মধ্যে সেই দেখা এর মধ্যেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

না, সেদিন সন্ধ্যায় ধর্মতলা অঞ্চলের একটি গলিতে, কোন স্ফীতোদর ব্যক্তি, বোধ করি কোন মারোয়াড়ী বেনিয়ার হাত ধরে যে মেয়েটি দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে ট্যাক্‌শিতে উঠল, সে সুধা না হয়ে যায় না। আর এই সময়ে এমন একজন লোকের সঙ্গে একজন সাধারণ বাঙালী ঘরের বৌকে মাত্র একটি কারণেই যে দেখা যাওয়া সম্ভব, তা অমলেন্দুবাবুর পক্ষে অনুমান করা কঠিন হল না।

কী উপলক্ষে যে অমলেন্দুবাবু পথ চলছিলেন তা তিনি ভুলে গেলেন। গুপ্ত রাজনৈতিক দলের সভ্য বলে সন্দেহভাজন এই মেয়েটিকে এই অবস্থায় দেখতে পাওয়াটা—অদ্ভুত ব্যাপার! তবে অদ্ভুত হলেই বা অমলেন্দুবাবুর তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী আছে? এই কলকাতা শহরে, শরীরই একমাত্র বিত্ত, যা ভাড়া খাটিয়ে পয়সা রোজগার করতে পারে এমন মেয়ের তো অভাব নেই? তাদের সমস্যা-সমাধানের প্রশ্ন নিয়ে অমলেন্দুবাবু মাথা ঘামাননি কোনদিন। সমাজের বৃহত্তর সমস্যার সমাধানের উপর এটার সমাধানও নির্ভরশীল, একথা জেনেই তো নিশ্চিন্ত আছেন তিনি। দৈবক্রমে সেই সমস্যা-পীড়িতদের একজন তাঁর পরিচিত বলেই তার সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করার এমন কী কারণ ঘটেছে তাঁর?

এই সমস্যা ভারাক্রান্ত দেশে নষ্ট করা যায় এমন অপর্যাপ্ত সময় কারও নেই। সবচেয়ে কম আয়াসে সর্বাধিক ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা যেখানে রয়েছে, বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই সকলের আগে নিজেকে সেইখানে নিয়োগ করবেন। শুধু অমলেন্দুবাবু কেন, যে কোন রাষ্ট্রীয় কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিই এ কথা বলবেন। যে সময়ে দশজনের কাজ করা যায়, সে সময়টা একজনের পিছনে ব্যয় করার কোন অর্থ হয় না। আমাদের সহজ গাণিতিক বুদ্ধিই এ কথায় সায় দেবে।

সমষ্টি—সমষ্টিই হচ্ছে আসল কথা। সমষ্টির জীবনে রূপান্তর এলে ব্যক্তির রূপান্তর স্বতঃসিদ্ধ সত্য হয়ে উঠবে। কিন্তু একজন ব্যক্তির মধ্যে রূপান্তর ঘটলে তাতে সমষ্টির কতটুকু লাভ!

তা ছাড়া, সামগ্রিক রূপান্তর ছাড়া এ সব খণ্ড সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। একটা সমস্যার জট ছাড়াতে গেলে দশটা সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়তে হয়।

আপন মনে কী ভেবে হাসলেন অমলেন্দু। বুদ্ধির অহঙ্কার নিয়ে তিনি সুধার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন কিনা তা নিয়ে কত কি চিন্তা করছেন! কিন্তু তিনি যদি বিপ্লবী চিন্তানায়ক অমলেন্দু না হয়ে সুধার কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মীয় বা বন্ধু হতেন, তা হলে বোধ করি তিনি খুব অনায়াসে তাঁর কর্তব্য ঠিক করে নিতে পারতেন। সুধার মত আরও হাজার হাজার মেয়ে রয়েছে, যাদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ নেই আপাতত। কিন্তু তাতে কি? একটি মাত্র মেয়ে সুধার সামনাসামনি হওয়া যায় পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে। তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলে দোষ কি? এক হাজার জনের আমি ভাল করতে পারি না, কিন্তু এক জনের ভাল করতে পারাটাই বা তুচ্ছ কেন?

কিন্তু এ চিন্তা সংস্কারপন্থীর। অমলেন্দুবাবু বিপ্লবে বিশ্বাসী।

কিন্তু ওগো বিপ্লবী—অমলেন্দু নিজেকে প্রশ্ন করলেন: যে লোকটা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সাহায্যের প্রত্যাশায় করুণ নেত্রে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, তার দিকে তুমি ফিরেও তাকাবে না? আর যাদের তুমি চেন না, চোখে দেখ না, তাদের জন্য তুমি জীবনপাত করবে? এ তোমার কোন্ ধরণের কল্যাণ ব্রত?

এই অদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্বে অমলেন্দু নিজেকে ইতিপূর্বেও পীড়িত বোধ করেছেন। সামনের মানুষটিকে পাশ কাটিয়ে যেতে তাঁর মানবতাবোধে বাধে। আর বৈপ্লবিক কর্ম এড়িয়ে একটি মানুষের পিছনে সময় নষ্ট করতে তাঁর বিপ্লবের নীতিতে বাধে।

অমলেন্দুবাবু নিজের মনে তাঁর প্রশ্নের কোন সদুত্তর পেলেন না। কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা না করেও তিনি পারলেন না। আর তার ফলে পরদিন বিকেলেই তাঁকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল সাহেব-পাড়ার কোল-ঘেঁষা

পিন্টুবাবুর সেই কারখানাটার কাছ দিয়ে, যার মধ্যে যত খুশী মেয়েকে কাজ দেওয়া যায়, যেখানে নো ভ্যাকেন্সী বলে তাড়িয়ে দিতে হয় না কাউকে।

অমলেন্দুবাবু সুধাকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যেতে দিলেন। এক মিনিট পরে নিজেও সেই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন।

সিঁড়ির মাথায় ঝি দাঁড়িয়েছিল। অপরিচিত মুখ দেখে সাবধানে প্রশ্ন করল: কাকে চান বাবু?

সুধাকে।

সুধা বলে এখানে কেউ থাকে না। আপনি বাবু নিচে গিয়ে দাঁড়ান। এখানে মেয়েছেলেরা থাকে।

অমলেন্দু অনুভব করলেন, হয় ঝি ভয় পেয়েছে, নয়তো সুধা এখানে অন্য নামে পরিচিত, নয়তো দুই-ই।

যে-মেয়েটি এইমাত্র উঠে এল, আমি তাকেই চাই। তুমি গিয়ে বল।

কিন্তু সে তো সুধা নয়। সে শোভনা।

তার আসল নাম সুধা। তোমার কোন ভয় নেই ঝি। শোভনা যার নাম বললে, সে আমার বিশেষ চেনা।

ঝির তবু ভয় গেল না। না বাবু, আপনাকে আগে কোনদিন এখানে দেখিনি। কেউ দেখে ফেলবে—আপনি নিচে গিয়ে দাঁড়ান।

অমলেন্দুবাবু একটু ভাবলেন কি করে ঝিয়ের মনে প্রত্যয় জাগানো যায়। শেষে বললেন: শোন ঝি। আমি তোমার দিদিমণির নিয়মিত মক্কেল। আমার নিজের জায়গা আছে, সেখানে ও রোজ যায়। তুমি গিয়ে বল, তাহলেই ও বুঝতে পারবে!

বুঝলাম বাবু। কিন্তু আগে থেকে সময় না ঠিক করলে শোভনা দিদিমণিকে পাওয়া শক্ত। এক্ষুনি এক বাবুর আসবার কথা আছে।

ব পশার বুঝি তোমার শোভনা-দিদিমণির।

একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে ঝি বলল: সে আর আমি কী করে বলব! তারপর কাছে কেউ না থাকলেও গলার স্বর অনেকটা খাদে নামিয়ে বলল: মাগীর না আছে ছিরি, না আছে রূপ! কথা শুনলে মনে হয় মরদের বাবা। তবু ওর কাছেই যাওয়া চাই!—পুরুষগুলোর পছন্দ দেখে ঘেন্নায় মরে যাই।

আপনি যদি চান, আমি খুব ভাল মেয়েমানুষ দিতে পারি। এক্ষুনি পাবেন। সময় আগে ঠিক করে নিতে হবে নাকো।

এমন সময় স্যুট-পরা হাড্ডিসার চেহারার একটি লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। ওদের দিকে একবার তাচ্ছিল্যের তীর্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বিজয় গর্বে সটান সামনের ঘরটায় ঢুকে পড়ল। তার পিছনে স্বতঃস্পন্দনশীল দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

ঝি ফিস্ ফিস্ করে বললে: কাপ্তেন চলেছেন—দেখলেন তো? আপনাকে যার কথা একটু আগে বলছিলাম। শোভনা দিদিমণিকেই দরকার তো এক দেড় ঘণ্টা দেরী করতে হবে। আর অন্য মেয়েমানুষে চলে তো বলুন।

না গো হে ঝি। আমি পাঁচ জায়গায় চেখে বেড়ানো পছন্দ করি না। আমি বরং একটু অপেক্ষাই করব।

চার আনা পয়সা ঝির হাতে দিয়ে অমলেন্দুবাবু নীচে নেমে এলেন। ঝির মনে বিশ্বাস আনার জন্য অনেক বানিয়ে বলতে হল। কেমন ভাল লাগছে না কথাগুলো বলে। যে-নৈতিকতার প্রতি তাঁর কোন আস্থা নেই, অথচ তবু যা তাঁর মনে বাসা বেঁধে আছে, এ ভাল-না-লাগা তারই কারসাজি। নিজের মনে হাসলেন অমলেন্দুবাবু।

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক পরে সেই লোকটি বিশ্বের বিরক্তি মুখে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। সুধা নিশ্চয়ই খুশী করতে পারেনি মানুষটাকে।

ঝি কোন রকম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার আগেই অমলেন্দু সটান ঢুকে পড়লেন সুধার ঘরে।

মাথা হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুয়েছিল সুধা। পায়ের শব্দে চোখ খুলল। কিন্তু শব্দের মালিকের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে দরজার কাছে গিয়ে রুক্ষ গলায় ডাকল: ঝি?

ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে অমলেন্দু ঝির ভীত জবাব শুনলেন: দিদিমণি!

খবর না দিয়ে লোক ঘরে ঢুকিয়েছো যে?

বাবু নিষেধ শুনলেন না দিদিমণি।

এইজন্য তোমার চাকরি গেলে আমাকে দোষ দিও না।

ঘরে ফিরে এসে সুধা এবার অমলেন্দুর দিকে তাকানোর অবকাশ পেল।

তার মুখের ক্রোধের আভাস তখনো মেলায়নি। কিন্তু অমলেন্দুকে সে এক মুহূর্তেই চিনতে পারল।

আপনি?

খুব আশ্চর্য বোধ হচ্ছে নাকি সুধা?

সুধা নয়, শোভনা। না, আশ্চর্য বোধ করার ক্ষমতা আমার কম। কিন্তু আপনি এ জায়গার খোঁজ পেলেন কী করে?

তার আগে বল, আমি খোঁজ পাওয়ায় তোমার কতখানি বিপদ ঘটল!

তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে বলছি না। বলছি কি, আপনি এখন যান। আমার বিশ্রাম দরকার।

কিন্তু কথাটা প্রকাশ করে দিয়ে আমি তোমাকে সত্যিই বিপদে ফেলতে পারি সুধা।

জানি। তবু বলছি, আপনি বরং কালকে আসবেন। দেখলেন না, একটা লোক এইমাত্র বেরিয়ে গেল? বড্ড জ্বালিয়েছে আমাকে! এখন আর কিছু ভাল লাগছে না।

অনুরোধ-কোমল কণ্ঠে অমলেন্দু বললেন: লক্ষ্মী মেয়ে, আমাকে নিরাশ করো না। বুঝতে পারছো না, আমিও একজন পুরোনো পাপী! এখন চলে গেলে আমার আজ রাত্রে ঘুম হবে না। বিশ্বাস করো, সত্যি বলছি।

সুধা দাঁতে ঠোঁট চেপে ভাবতে লাগল। হঠাৎ বিরক্তির মধ্যেও একটা ঝিলিক হাসি খেলে গেল ঠোঁটের পাশ দিয়ে।

ডবল রেট লাগবে কিন্তু—

দেবো। কিন্তু এখানে নয়। আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।

সুধা আবার ভাবতে লাগল। অমলেন্দুর সঙ্গে প্রথম আলাপের ঘটনাটা মনে পড়ল। কৌতূহল জয়ী হল শেষ পর্যন্ত।

ভারী মুস্কিলে ফেললেন দেখছি আপনি। এদিকে পয়সাও দেবেন বলছেন। তবে কোথায় নিয়ে যাবেন, চলুন।

অমলেন্দুবাবু একখানা ট্যাক্‌শি নিলেন। পিছনের সীটে ব্যবধান বজায় রেখে বসলেন অমলেন্দু। ব্যবধান হ্রাস করার চেষ্টা করল না সুধা।

এই নীরব নৈশ-যাত্রার মধ্যে এতক্ষণে অমলেন্দু লক্ষ্য করলেন যে সুধার অহঙ্কার কম নয়। তার অত পশার (অমলেন্দু তাই অনুমান করলেন),

কিন্তু সাধারণ একখানা তাঁতের শাড়ী পরেছে। দু'হাতে দু'গাছা সরু চুড়ি ছাড়া সে সম্পূর্ণ নিরাভরণ। ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক্‌ মাখেনি, পান খেয়েও ঠোঁট লাল করেনি।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে এসে তাঁরা নামলেন। পার্কের ভিতরের আবছা অন্ধকারে একটি ছায়াচ্ছন্ন গাছের নীচে ঘাসের নরম বিছানায় সুধাকে এনে বসালেন অমলেন্দু।

এতক্ষণ পরে সুধা প্রশ্ন করলে: এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন?

আপনি কি আশা করেছিলেন, আমি আপনাকে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে তুলব সুধা দেবী?

অমলেন্দু যে অকস্মাৎ আপনি বলতে সুরু করলেন তা সুধার দৃষ্টি এড়ালো না।

না, যেখানটায় আশঙ্কা করেছিলাম, ঠিক সেইখানটাতেই আমাকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু অমলেন্দুবাবু, (নামটা ঠিক বলতে পারছি তো?) একটা কথা আপনাকে স্পষ্ট করে বলি। যদি পতিতা-উদ্ধারের সাধু-সংকল্প নিয়ে আমাকে এনে থাকেন তো ভুল জায়গায় হাত দিয়েছেন। তার চেয়ে বরং আপনি ফিরে যান।

অমলেন্দু বুঝলেন, সুধাকে আর একটু বুদ্ধিমতী বলে ভাবা উচিত ছিল। অত সহজে ধরা দেওয়াটা হয়তো ভাল হ'ল না।

ফিরে তো যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করার আছে, সুধা দেবী। ধরে যখন ফেলেছেন, তখন সোজাসুজি কথা বলি। সত্যি করে বলুন তো, আপনি এই জঘন্য বৃত্তি ছেড়ে কোনো সৎ বৃত্তিতে ফিরে যেতে চান কিনা? নরকযাত্রা থেকে মুক্তি চান কিনা?

সুধা হাসল।—ঠিক লাইন মতই কথাটা তুলেছেন অমলেন্দুবাবু। সৎ অসৎ, স্বর্গ নরক কোনটাই বাদ দেন নি। আপনি সাধু লোক। শুনলে হয়তো আপনার দুঃখ একটু বাড়বে। তবু সত্যিটা জানা ভাল। কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছল-চাতুরী করে আমাকে এর মধ্যে এনে ফেলেনি। আমি জেনে-শুনে ধরা দিয়েছি। বোধকরি মানুষটাই আমি পাপ-প্রবণ। পাপ-পুণ্যের কথা সেদিনও ভাবিনি। আজও ভাবব না।

জবাবে অমলেন্দুবাবুকে ছোট-খাটো বক্তৃতাই দিতে হল: আপনি

আমাকে গোড়া থেকেই ভুল বুঝতে শুরু করলেন সুধা দেবী। পাপ-পুণ্যের কথা আমি বলিনি ; ও-জিনিসের ওপর আমার আস্থা খুব কম। পাপ-পুণ্যের কথা নিয়ে সোরগোল তোলে সমাজ। মানুষের বিভিন্ন কাজের ওপর পাপ বা পুণ্যের স্ট্যাম্প বসিয়ে দিয়েছে সমাজের উপরতলার লোকেরা তাদের নিজেদের সুখ-সুবিধার বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আপনার নিজের জীবনের ইতিহাসটাই ধরুন না। মুখে আপনি যাই বলুন, আর কোন উপায়ে জীবনের নিম্নতম প্রয়োজনগুলি মেটানোর কোন পথই যখন আর অবশিষ্ট ছিল না, শুধু তখনই আপনি এপথে পা দিয়েছেন। এ-পথ যে পাপের পথ, সমাজ এ কথা গলা বড় করে বলবে। কিন্তু আর কোন্ পথে আপনি বাঁচতে পারতেন, সমাজ তা দেখিয়ে দেওয়ার কোন দরকার বোধ করেনি, কোনদিন করবেও না! মানুষের জীবনের দায়িত্ব ওরা নেয় না। কিন্তু মানুষের কাঁধের উপর অজস্র বিধি-নিষেধের বোঝা ওরা চাপিয়ে দেয়, যাতে ওদের কায়েমী স্বার্থের দিকে লোকের চোখ না পড়ে। কাজেই বুঝতেই পারছেন, পাঁচজনে আপনার কাজটাকে পাপ বললেও আমি তা বলব না ওদের কারসাজিটা আমি জানি বলে। বোধহয় লক্ষ্য করেছেন, আমি আপনার কাজটাকে জঘন্য কাজ বলেছিলাম, পাপের কাজ বলিনি। জঘন্য কাজ এটা নিশ্চয়ই,—আপনি নিজেও তা স্বীকার না করে পারবেন না, কারণ এতে আপনার শরীর মন দুয়েরই ক্ষতি।

কথাগুলো সুধার কাছে নতুন, শুনতেও ভালো লাগল। তবু সুধা প্রতিবাদ করল : আপনি পণ্ডিত মানুষ। আপনার সঙ্গে যুক্তিতর্কে সামান্য মেয়ে আমি পেরে উঠব না। তাছাড়া পাপ-পুণ্যের আপনি যে ব্যাখ্যা দিলেন, নিজে পাপ করে তার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া—পাপী মানুষের কাছে তা নিঃসন্দেহে সুবিধাজনক! কিন্তু কী জানেন, কাজটা পাপের হোক, পুণ্যের হোক, আমার কাছে এটা মোটেই জঘন্য বলে বোধ হয় না। আমি তো ভাবি, কাজটা বেশ সম্মানজনক।

তাই ভাবেন? কথাটা আপনার পরিচিতদের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ুক তা আপনি চান?

না। তারা শুনলে অনর্থক যাচ্ছেতাই নিন্দা করে বেড়াবে, শুধু এই জন্যে। আমাকে যখন একের পর এক লোক এসে লাথি-ঝাঁটা মারছিল,

তখন কেউ ফিরেও দেখেনি। কিন্তু আজকে আমি নিজেই নিজের পথ বেছে নিয়েছি, এ কথা জানলে তারা আমাকে আস্ত রাখবে না।

খুব সত্যি কথা বলেছেন; আমিও তাই বলছিলাম। তবেই দেখুন, কাজটা সত্যিই সম্মানজনক নয়। অনন্যোপায় হয়ে তবেই এ-কাজে হাত দিয়েছেন আপনি। এখন ধরুন, আমি,—আমিও তো সমাজেরই একজন,—আমি যদি আপনাকে একটা সম্মানজনক কাজ দি, তবে এ কাজটা ছেড়ে দিতে পারেন না কি আপনি? না, মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না, সত্যিই আমার হাতে একটা কাজ আছে। অবিশ্যি সামান্য কাজ, অল্প মাইনে। রিফিউজী মেয়েদের উলের কাজ শেখাবেন, আর তার জন্য সরকার থেকে ষাট টাকা করে মাইনে পাবেন। উলের কাজ আপনি নিশ্চয় জানেন। আর নয়তো সপ্তাহ-খানেক খুব খেটেখুটে শিখে নেবেন।

উলের কাজ জানি, কষ্ট করে শিখতে হবে না। এ সুযোগ যদি আপনি কয়েক মাস আগে দিতেন, তবে হয়তো আমার জীবনের গতি অন্যরকমের হত। কিন্তু আজ আর আপনার সাহায্য আমার কোন কাজে আসবে না অমলেন্দুবাবু। যে-কাজে হাত দিয়েছি সেখান থেকে ফেরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মুখে কোন প্রশ্ন করলেন না, কিন্তু অমলেন্দুবাবুর মুখে প্রশ্ন-বোধক চিহ্ন ফুটে উঠল! তা দেখে সুধা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে সুরু করল: তবে শুনবেন? হয়তো বিস্মিত হবেন, হয়তো দুঃখিত হবেন। তবে কথা উঠল যখন, না হয় শুনেই যান। এ-কাজ আমার খুব ভাল লাগে। আপনাদের সমাজের যাঁরা গণ্য-মান্য লোক, সাধারণ অবস্থায় যাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস পেতাম না, এখন আমি তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলি। এ কী কম সুখ! কুমারী ছিলাম যখন, বিয়ের বর জুটছিল না গরীবের মেয়ে ছিলাম বলে। শুধু মেয়ে হলেই হয় না; বিয়ের জন্য আরও অধিকন্তু লাগে পণ,—শাদা বাজারে নারী-মাংসের দাম এত কম! আর আজ কালো-বাজারে এসে অবাক হয়ে দেখছি, নারী-মাংসেরও চাহিদা আছে দেশে। ভাল দাম পাওয়া যায়। না—না—অমলেন্দুবাবু, আপনি বাদ সাধবেন না। নিজের মূল্য বুঝতে পেরেছি। আমাদের দেশের মেয়েমানুষের এই একমাত্র সম্মানজনক বৃত্তির থেকে আমাকে সরাতে চেষ্টা করবেন না।

অমলেন্দুবাবু ভাবতে চেষ্টা করলেন, সুধার হঠাৎ উত্তেজনার কারণ কি? কারণ যাই হোক, এ-রকমটাই অবিশ্যি স্বাভাবিক। সাধারণতঃ এ-পথে একবার এলে মেয়েদের ফেরানো খুব মুস্কিল! এ-সব কাজের মধ্যে মোহ আছে; তার চেয়েও বড় জিনিস, টাকা আছে। সমাজের ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়া এ-কাজ বন্ধ করা যায় না। এ অসম্ভব প্রচেষ্টায় সময় নষ্ট করতে পারেন একমাত্র সংস্কারপন্থীরা। আর সেইজন্য সংস্কারপন্থীদের উপহাস করে থাকেন অমলেন্দুবাবু। সুধার পিছনে যে-সময়টা নষ্ট করা হল এটা নিতান্তই অপচয়। আর সব জানা থাকা সত্ত্বেও, সব বোঝা থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞ মানুষ অমলেন্দুবাবু কি না সেই অপচয়টাই করলেন! দৈবাৎ সুধা তাঁর পরিচিত মেয়েদের মধ্যে একজন বলেই কি এই কুইক্সোট-মার্কা দুর্বলতা তাঁর পক্ষে শোভা পায়? না, নিজের কাজের জন্য কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ-ই খুঁজে পেলেন না বিপ্লবের পন্থায় বিশ্বাসী অমলেন্দুবাবু।

আর তার ফলে, সমস্ত আলোচনাটা, সমস্ত পরিবেশটাই অত্যন্ত বিস্বাদ বলে মনে হল অমলেন্দুবাবুর কাছে। সুধার উপর পর্যন্ত রাগ হতে লাগল। দু-পাতা লেখা-পড়া শিখে কেমন গুছিয়ে নিজের কাজের সাফাই গাইছে মেয়েটা দেখ! শকুনী মড়ার সন্ধান পেয়েছে, তাকে কি ফেরানো যায় কখনো?

অমলেন্দুবাবু তখুনি উঠে পড়তে পারলে খুশী হতেন। কিন্তু আলোচনার মাঝখানে উঠে পড়লে বেমানান দেখায়। তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ করবে সুধা। কাজেই কোন ফল হবে না জেনেও আরও বারকয়েক পথ-পরিবর্তনের অনুরোধ করলেন সুধাকে। সুধাও, যেমন আশা করা গিয়েছিল, প্রতিবারই নিজের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করল। প্রগলভা মেয়েটি এমন কি অমলেন্দুবাবুর বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ জানাতেও ছাড়ল না।

অবশেষে ওঠার জন্য মনে মনে তৈরী হয়ে অমলেন্দুবাবু তারই ভূমিকা হিসেবে বললেন: রাত হয়ে যাচ্ছে সুধা দেবী। তাহলে ওঠার আগে আর একবার অনুরোধ করি, আমার প্রস্তাবটা আরও দু'চার দিন সময় নিয়ে না হয় ভেবে দেখুন। এতবড় গুরুতর ব্যাপারে মাত্র দু'এক ঘণ্টার মধ্যে কি সিদ্ধান্তে আশা চলে?

আপনার মনোভাব যখনই জানতে পেরেছি, আমার সিদ্ধান্ত তখনই

নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তবে আপনার দয়ার কথা আমার মনে থাকবে অমলেন্দুবাবু। সত্যিকারের ভদ্রলোক আপনি। হাসপাতালের গেটের সামনে যে-সব দাতা সহৃদয় ভদ্রলোকদের নাম পিতলের উঁচু হরফে লেখা থাকে, আপনার নামও তাদের পাশেই স্থান পাওয়ার যোগ্য! এত দয়াই যখন করলেন, তখন আর একটু দয়া করে মুখরোচক খবরটা রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়ীতেও পৌঁছে দেবেন না হয়। সমাজের নীতি-রক্ষাও তো ভদ্রলোকের দায়!

অমলেন্দুবাবুর সদিচ্ছার কি বিকৃত জঘন্য ব্যাখ্যা তৈরী করেছে এই শালীনতা-বর্জিতা মেয়েটি! কী ভুলই করেছেন তিনি এ মেয়েটির পিছনে এসে! একজন করে বেছে বেছে উপকার করা বহুর অর্থ অপহরণকারী ধনীদেরই বিলাস। আর যারা ধনীদেরও মাথায় হাত বুলোতে পারে সেই প্রাতঃস্মরণীয় সাধু-মোহান্তদের। সমস্যা সমাধানের এটা পথ নয়, সমস্যাকে জীইয়ে রাখার পথ। অথচ সব জেনে-শুনে বিপ্লবের পাঠক অমলেন্দু কিনা সেই ভুলই করে বসেছেন! আর সেই সুযোগে মেয়েটা কিনা অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে!

সে-ভয়টা না-ই করলেন সুধা দেবী। মেয়েমানুষের কেচ্ছা নিয়ে আলোচনা করে আমি সুখ পাই না! চলুন, তবে ওঠা যাক আজকের মত।

অমলেন্দুবাবুর গলার স্বরটা বোধ করি একটু রুক্ষ শুনিয়েছিল। জবাব দিতে গিয়ে সুধার গলাও রুক্ষ হয়ে উঠল: ও, শুধু মেয়েমানুষের উপকার করেই পুণ্য অর্জন করতে চান? ···ওকি, উঠছেন যে? ভদ্রলোকের কর্তব্য শেষ হয়েছে তবে? পতিতা-উদ্ধারের পবিত্র ব্রত এর মধ্যেই পালন করা হয়ে গেল? যাক্, বাঁচা গেল তবু!

কুঁচকিয়ে, আরও ভিতরে ঢুকিয়ে, চোখের দৃষ্টিকে ধারালো আর অন্তর্ভেদী করে তুলেছে সুধা। অল্প পুরু ঠোঁট-জোড়া আরও ছুঁচলো করে মনের কোণে জমানো যত রাগ আর আগুন যেন পিচ্‌কারি দিয়ে ঢেলে দিতে চাইছে অমলেন্দুবাবুর গায়ে। সারা মুখে, কর্ণমূল অবধি, বিদ্রোহী রক্ত যেন জমাট বেঁধে ফেটে বেরুতে চাইছে! হঠাৎ এত বেশী রাগল কেন সুধা? কী এমন ক্ষতি তিনি করেছেন সুধার? উঠতে চাইছেন বলে? তাঁর প্রস্তাবে যখন সুধার কোন দরকার নেই, তখন উঠে পড়লেই তো তার পক্ষে ভাল!

এক মিনিটের বিরতি দিয়ে সুধা বলে চলল: একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন অমলেন্দুবাবু, না? কী করব! আপনার মত ভদ্রলোকদের যে আমি অনেক দেখেছি,—আমাকে ঠকানো খুব শক্ত। বলতে গেলে, আপনার মত ভদ্রলোকদের অন্নেই যে আমি আজীবন প্রতিপালিত। কৃতজ্ঞতার ঋণ ভুলতে পারি নি, তাই মাঝে মাঝে রেগে উঠি। একটু না হয় শুনলেনই আমার কথা, আর তো দেখা হবে না আপনার সঙ্গে কোনদিন। ওঠার জন্য অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? যত রাত করেই বাড়ি ফিরুন, বৌ-মাগী ঠিক বসে থাকবে আপনার জন্য দরজা আগ্‌লিয়ে (সুধা জানে না যে অমলেন্দু অবিবাহিত)। শাদাবাজারে বিকিয়েছে নিজেকে, পালিয়ে যাওয়ার পথ কোথায় হারামজাদীর? সস্তার সওদা! আসতো আমার মত কালোবাজারে, তবু কিছু দাম পেতে পারত! যাক্‌গে, যেজন্য আপনাকে বসতে বললাম, ভদ্রলোকদের কথা বলি শুনুন। ছোট বেলায় বাবা মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু কাকা ছিলেন ভদ্রলোক, আমার অন্ন যোগানোর দায় গ্রহণ করলেন। দুটো ঝিয়ের মত কাজ করতাম সংসারে। চড়টা-চাপড়টা-ধমকটাও উপহার জুটত; তবু শুনেছিলাম, ভাতের দাম তার চেয়ে অনেক বেশী। লুকিয়ে লুকিয়ে রাত জেগে পড়ে পড়ে ম্যাট্রিক পাস করলাম। জানতে পেরে কাকার সে কি রাগ! লেখাপড়া শিখে আমার নাকি পাখা গজিয়েছে, ভদ্রলোকেরা আমাকে নাকি আর বিয়ে করতে চাইবে না। কিন্তু মা-ও ভদ্রলোকের মেয়ে, আমাকে নরকযাত্রা থেকে উদ্ধার করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন। দেখলাম, গ্রামে নিঃস্বার্থ পরোপকারী ভদ্রলোকের অভাব নেই। আমাকে পার করার জন্য কত যে ঘাটের মড়া আর শনের নুড়ি এনে জোটালেন তাঁরা! একেবারে নিখরচায় দায় উদ্ধারের ব্যবস্থা, তবু হয়ে ওঠে না। শেষে ভদ্রলোকদের সেরা আমার মহানুভব স্বামী আমাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিলেন বিনি পয়সায়। চির-রোগা মানুষ, রোজগার করতে পারেন না, তবু আমাকে খাওয়ানোর ভার নিতে ইতস্তত করলেন না। দেশের বাড়িতে চলছিল একরকম। পাকিস্তান হওয়ার পর এদেশে এসে বড়লোক ভাসুরের গলগ্রহ না হয়ে আর উপায় ছিল না। ভদ্রলোকদের আর-এক জমকালো রূপ দেখলাম। গাড়ী, গয়না, ঝি-চাকরে গিজগিজ করছে বাড়িটা! জায়গার এত অভাব—তবু ভদ্রলোক আমাদের ফেলে দিতে

পারলেন না। গাড়ী রাখার ঘরের কোণে জায়গা দিলেন, খেতেও দিলেন। বলে দিলেন, ঘর থেকে যেন বের না হই, কেউ দেখে ফেললে এত দয়ার জন্য তাঁকে হয়তো বকবে। সহ্য করতে পারলাম না অত দয়া। পালিয়ে চলে এলাম বাগান-বাড়িতে। ভদ্রলোকদের দয়ার আরও কত খতিয়ান যে আমার মনের ঝুড়িতে জড়ো হয়ে আছে, সব শুনতে গেলে আপনার বিরক্তি ধরে যাবে! শুনলাম, সরকার নামে দেশের সেরা ভদ্রলোকদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে। ঝরণার ধারার মত অফুরন্ত ধারায় তাঁরা নাকি উদ্বাস্তুদের সাহায্য করেছেন। সেখানেও গিয়েছিলাম উদ্বাস্তুর ছাড়পত্র যোগাড় করে। কিন্তু এত উঁচুতে থাকেন সেই সেরা ভদ্রলোকের দল, তাঁদের করুণার জল আমার মুখ অবধি আসার আগেই শুকিয়ে গেল। শেষটায়, কি বলব অমলেন্দুবাবু, ভদ্রলোকদের দয়ার রাজ্য থেকে পালাব বলেই চলে এলাম এখানে, আমার এই নতুন কাজে! এখানে যে-সব ভদ্রলোকেরা আসেন, সুযোগ পেলে তাঁরাও হয়তো দয়া দেখাতে পারেন। ঋণের বোঝায় পিঠের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবার ভয়ে আমি তাদের সে সুযোগ দিই নি।

সুধার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। এত উত্তেজিত হয়েছে যে নিশ্বাস জোরে জোরে বইছে। সমস্ত শরীর নড়ছে নিশ্বাসের তালে তালে। প্রথমটায় অনিচ্ছা থাকলেও, শেষ পযন্ত মন দিয়েই সুধার কথাগুলো শুনলেন অমলেন্দু। সুধার চরিত্রকে বোঝার খানিকটা সূত্র যেন পাওয়া গেল মনে হচ্ছে।

সুধা দেবী! আপনার ইতিহাস কিছুই জানতাম না। একটুখানি শুনেই মনে হচ্ছে, বর্তমান সমাজের বিরুদ্ধে আপনার মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জমে আছে। আপনার খুবই অভাব ছিল। কিন্তু শুধু অভাবের জন্যই আপনি এ-পথে আসেন নি। সমাজের প্রতি ঘৃণা আপনাকে সমাজ-বিরোধী পথে আসার প্ররোচনা দিয়েছে। কিন্তু আপনি ভুল পথে এসেছেন সুধা দেবী! যে ভদ্রলোকদের কথা বললেন, এখান থেকে তাঁদের সিংহাসনে একটি আঁচড়ও কাটতে পারবেন না আপনি! শুনুন, আমার কথা বিশ্বাস করুন, এই ভদ্রলোক-তন্ত্র উচ্ছেদ করাই আমারও জীবনের ব্রত। অবশ্য ভদ্রলোকদের শ্রেণী-বিচারেও আপনার ভুল হয়েছে। আপনার স্বামী বা আপনার মা ঠিক এই একই দলের ভদ্রলোক নন। হয়তো তাঁরা আপনাকে

বঞ্চনা করেছেন, কিন্তু সারা জীবন ধরে তাঁরা নিজেরাও বঞ্চনা পেয়ে এসেছেন। ভদ্রলোক-তন্ত্র যদি সত্যিই উচ্ছেদ করতে চান তো তারও পথ আছে। আমি জানতে সাহায্য করতে পারি। লেখাপড়া জানেন, বই পড়েই অনেক জানতে পারবেন! কিন্তু সকলের আগে দরকার আপনার এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা।

সুধা হঠাৎ প্রশ্ন করল: আপনি যে কাজের কথা বলছিলেন—সত্যিই আপনার হাতে কাজ আছে নাকি?

অমলেন্দুবাবু সাগ্রহে বললেন: আমি আপনার সঙ্গে তামাসা করতে আসিনি সুধা দেবী। বলুন, আমার প্রস্তাবে আপনি রাজী?

না। এমনি জেনে নিলাম কথাটা। আপনাকে তো আগেই বলেছি আমার ফেরার ইচ্ছে নেই। বাঁদি থেকে বেগম হয়েছি, এত সুখের রাজত্ব আমি ছাড়ব কেন?

পথ নির্জন হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। একটি কন্‌ষ্টেবল মুখে মৃদু হাসি নিয়ে মন্থর গতিতে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

পার্কের ভিত্‌রে রেতে থাকবার নিয়ম নেই বাবু। হাবড়া ইষ্টিসনে যান। পেলাটফার্মে ভি থাকতে পারবেন। কুছ্‌ জায়গায় যাবেন তো ট্রেইন ভি পাবেন।

কন্‌ষ্টেবলটি বোধ করি ভেবেছে, ওঁরা যুক্তি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু পরবর্তী কর্তব্য ঠিক করতে পারছেন না। বে-আইনী কাজ, সে জানে: তবু তার সহানুভূতি আছে

তেইশ

লক্ষ্মণদের সঙ্গে একই দিনে পটলও হাজত থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বেরিয়ে এসে দেখল, ইতিমধ্যে বাড়ির আবহাওয়ায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

প্রথমেই জানতে পারল তার সদ্য-পাওয়া চাকরীটি গিয়েছে। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীর মালিক তার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। পটলের জন্য তিনি দিন সাতেক অপেক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নতুন কারবার। কাজের খুব ক্ষতি হয়। বাধ্য হয়ে তাঁকে নতুন লোক নিতে হয়েছে। পটলকে দুঃখ না করার জন্য তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। এতদূর পর্যন্ত তিনি বললেন যে, আর কোন জায়গায় যদি তিনি কাজের সন্ধান পান তো পটলকে জানাতে ভুলবেন না।

এমপ্লয়মেণ্ট্ এক্‌শ্চেঞ্জ থেকে তার নামে একখানা চিঠিও এসেছিল। কোথায় কি একটা চাকরীর জন্য তাকে ইণ্টারভিউতে যেতে লিখেছিল। তারিখটা অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছে, না হলে এ কাজটা যে নির্ঘাৎ হতো তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ খুঁজে পেল না পটল। এই নিয়ে দু'বার তার ডাক হল। আগের বারে ডেকেছিল একটা প্রাইভেট কোম্পানী তার দরখাস্তের জবাবে। অনেক উমেদারের ভীড়ে সেবার সে তলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে সে-রকমটা ঘট্‌ত না। নিশ্চয়ই,—একই ঘটনার তো বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

চাকরী হারানো এবং অবধারিত চাকরী ফস্কে যাওয়া,—এত দুঃখও পটলের সইত। কিন্তু এক মাস অনুপস্থিতির ফলে এ-বাড়ীতে তার পূর্বেকার অপ্রতিহত মর্যাদার আর এতটুকুও অবশিষ্ট নেই। এ-বাড়ীর তরুণ-মহলের অলিখিত নেতা ছিল সে; আজ তার জায়গাটা আর একটা ছেলে এসে দখল করে বসেছে। সে শচীন। অকৃপণ সিগারেট বিলিয়ে, সময়ে চা-যোগ মিষ্টি-যোগ করে সে এখন ছেলেদের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। চাকরী যাওয়ার চেয়েও এই দুঃখটা তীব্রতর বলে মনে হল পটলের কাছে।

কল্যাণদার ইস্কুলের কাজে শচীন নাকি যথেষ্ট সাহায্য করছে। পটলের ভারী আশ্চর্য মনে হয় ঘটনাটা। ভালো-মন্দ যে-কোন বারোয়ারী কাজে উৎসাহ করে নেমে পড়া সময়ে খাওয়া-শোয়ার সুখ শিকেয় তুলে রেখে—এ বাড়ির ছেলেদের এ-শিক্ষার মূলে ছিল পটল। নিজে সে খাটতে পারত বলে হুকুম দিয়ে খাটাতেও পারত। তখন তো বরাবর দেখা গেছে, কাজটা কঠিন হলেই শচীন পলাতক। ভিতরের খবর রবির থেকে অবশ্য কতকটা পাওয়া গেল। কাজের ঝামেলায় শচীন যায় না আরও কিছু! ছেলেদের সঙ্গে শচীনের চুক্তি হ'ল, তারা কাজ করে এসে শচীনের নাম করবে, আর সে বিনিময়ে তাদের খাওয়াবে।

রবি চিরদিনই এ-বাড়িতে পটলের বিশ্বস্ততম বন্ধু। অনুগত অনুচরও বটে। এখনও একমাত্র তারই শচীনের সঙ্গে বনে না। দুই বন্ধুতে বসে অনেক সুখ-দুঃখের আলোচনা হলো।

রবিই পটলকে জানিয়েছে: সুনন্দার দিকে এখন আর চোখ দিস্ না রে পটলা। শচীনের সঙ্গে ওর প্রেমের ব্যাপারটা একবারে পাকাপাকি হয়ে গেছে। কাজ কি নিজেদের মধ্যে মিছিমিছি ঝগড়া করে? সামান্য একটা মেয়ের ব্যাপার বইতো নয়!

চিঠি-পত্র লেখা-লেখি চলে ওদের মধ্যে নিয়মিত, তা-ও রবি জানিয়েছে।

নাঃ, সুনন্দার দোষ কি?—পটল নিজেই যে ভারী বোকা! মুখে-মুখে যে-কথাটা থাকে তার বনেদটা কাঁচা হয়, আর লেখাপড়ার মধ্যে গেলে সে-কাজটা পাকাপোক্ত হয়, এই সোজা কথাটা কোনদিন পটলের ভোঁতা মাথায় আসেনি। না হ'লে ইনিয়ে বিনিয়ে সুনন্দার কাছে দু'চারখানা চিঠি লেখা খুব কঠিন কাজ ছিল না। আর স্বয়ং পটলের চিঠি পেয়েও সুনন্দা জবাব দেবে না, এমন বুকের পাটা সুনন্দার নিশ্চয়ই নয়। অথচ আজকে সুনন্দার চিঠির মালিকানা স্বত্ব তার থাকলে সুনন্দার সাধ্য ছিল আর কারও দিকে নজর দেয়?

একটা চাকরী হাতে থেকেও গেল। আর একটা চাকরী হাতে এসেও ফস্কে গেল। দলের ছেলেগুলো কেটে পড়েছে যার যার মত। একটা মেয়ে ছিল; মাঝে মাঝে তার সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করা যেত। তা সে-হারামজাদীও সটকান দিয়েছে সময় বুঝে! নিজের হালফিল্ অবস্থাটা পটল

এক এক করে বিশ্লেষণ করে আর অবাক হয়। মানুষের ভাগ্য পাল্টায়; কিন্তু সে কি এমনি করে?

পটলের দৈনন্দিন কর্মসূচিতে অভাবনীয় পরিবর্তন এল। যে-মানুষটা চব্বিশ ঘণ্টা এ-ঘর ও-ঘর, এ-পাড়া ও-পাড়ায় সারাদিন চরকির মত ঘুরে বেড়ায়, সে-মানুষটা কোথাও গেল না, কারও সঙ্গে দেখা করল না, কোন কাজে মন দিল না। মনোরমাকে একদিন প্রণাম করতে গিয়েছিল বটে; কিন্তু প্রণাম সেরে বেরিয়ে এসে খেয়াল হল, মনোরমা কী একটা প্রশ্ন করেছিলেন, জবাব দেওয়া হয়নি। কল্যাণদার সঙ্গেও একদিন অকস্মাৎ দেখা হয়েছিল। কাজে সাহায্য করবার জন্য তাঁর সাগ্রহ আবেদন পটলের মনে কোন প্রেরণা জাগায়নি। যে-বাড়িতে পটল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াত, সে বাড়িতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিস্তর ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে পটলের সাড়াও পাওয়া গেল না। সে কোণে-কোণে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ চেষ্টা করেও নাগাল পাচ্ছে না।

ছেলের দল প্রথমটায় সঙ্কোচে লজ্জায় ওকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। সে একবার তাদের ডেকে কারণটাও জানতে চাইল না। নিঃশব্দে নিঃশেষে সরিয়ে নিল নিজেকে। পটল এ-বাড়িতেই আছে, কিন্তু অত্যন্ত দরকারের সময় ছেলের দল সারা বাড়ি পাতি-পাতি করে খুঁজেও পটলের সন্ধান পেল না।

পটল ফিরে এসেছে অবধি সুনন্দার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। যে-সব জায়গায় সাধারণত পটলের সঙ্গে দেখা হত সুনন্দার, দিনের মধ্যে বারবার করে সুনন্দা সেই সব জায়গাগুলিতে আনাগোনা করে। সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এই আতঙ্কেই পটল বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে সেই জায়গাগুলো এড়িয়ে চলে।

অবশ্য সুনন্দাকে পটল মনে মনে ক্ষমা করেছে। এটাও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয় ওর জীবনে। ক্ষমা করার কথা পটলের কুষ্ঠিতে লেখা নেই। ওর জীবনের মূলনীতির মধ্যে এই বহু-বিজ্ঞাপিত আর্ষ উপদেশটির কোন স্থান নেই। কেন ক্ষমা করবে? পৃথিবীতে তারা হল অবাঞ্ছিত, অপ্রয়োজনীয়, নিছক বিড়ম্বনা। কেউ হাতে করে একটা ফুটো পয়সাও তুলে দেবে না তাদের হাতে। যা কিছু পাওনা, টেনে-ছিঁড়ে কেড়ে-কুড়ে নেওয়া ছাড়া তাদের

আর কোন গত্যন্তর নেই। চারদিকে সবাই সঙ্গীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্ষমা করলাম বলে বসে থাকলে ছেড়ে দেবে না। হয় মারতে হবে, নয়তো মরতে হবে। বরং ডবল মার ফিরিয়ে দিয়ে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলতে হলে তাও ভাল বলে মনে করে পটল।

তবুও সুনন্দার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রশ্নে মনে কোন সাড়া মেলে না। পটল অনেক ভেবে দেখেছে, অনেক রকমে কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে, কোন ফল হয় নি। কী যে হয়েছে তার মনে, অত বড় দুর্ঘটনাতেও এতটুকু রাগ হচ্ছে না। অথচ রাগতে না পারলে প্রতিশোধ কী করে নেওয়া চলবে? সমস্ত মন, সমস্ত অবয়ব যেন বিদ্রোহ করছে, যেন বলছে: সুনন্দা, ছেড়ে দিলাম, সরে দাঁড়ালাম। যাকে তোমার পছন্দ তারই গলায় নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় বরমাল্য দাও। পটলকে ভয় নেই। তোমার শত্রু কেউ থাকলে বরং পটল তাকে দরজা আগলিয়ে রুখবে।

অথচ পটল তো মহাভারতের কর্ণ নয়! জীবনে যে কোন-কিছুই পায়নি,— সব-কিছু ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ভারতবর্ষীয় আদর্শ তো তার কাছে পরিহাস!

এ-কথা অবশ্য ঠিক, সুনন্দাকে দোষ দেওয়া যায় না। সে যদি অলক্ষ্মীর চেয়ে লক্ষ্মীকে, বন-বাদাড়ের চেয়ে বাগানকে বেশী পছন্দ করে থাকে তো সে-দোষ যে-বিধাতা মানুষের রুচিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর। পটল তো নির্ভেজাল সেই জিনিস, চুলো জ্বালার আগে মানুষ যা ঝেড়ে ফেলে দেয়। সত্যি, নিজের সম্বন্ধে কোন উচ্চ ধারণা নেই পটলের। অনেক দোষের মধ্যে ঐ একটা গুণ এখনো আছে অবশিষ্ট।

শেষ পর্যন্ত, প্রেমট্রেম সবই তো ফাঁকি। আসল কথা, কে কতখানি দিতে পারো। নিশ্চিন্ত-নির্ভাবনায় নীড় বাঁধবার রসদ কে কতখানি জোগাতে পারো। সেই প্রতিযোগিতায় পটল যে হেরে গিয়েছে শচীনের কাছে।

দিনকতক পরে বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটল। হরেকেষ্ট মারা যাওয়ার পরে এক মাসও পার হয়নি। অথচ শোনা গেল, সদ্য-বিধবা-বৌ রুক্মিণী নাকি এরই মধ্যে আবার বিয়ে করছে প্রতিবেশী একটি তারই সমান বয়সী ছোক্‌রাকে। ছেলেটা নাকি ভাল, খুব কর্মঠ। নিজেই খেটে-খুটে স্বাধীনভাবে কাজ ক'রে সংসার নাকি গুছিয়ে নিয়েছে।

অন্তর্দাহটা লক্ষ্মণেরই সবচেয়ে বেশী। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তার ছেলে পরানের অন্তর্ধানের জন্য একমাত্র রুক্মিণীই দায়ী। উপর তলায় গিয়ে ঘরে ঘরে সে বলে বেড়াতে লাগল: হারামজাদী বজ্জাত মাগী আমার সোনার পোলাডারে ঘরছাড়া কইর‍্যা তবে ছাড়ছে। সোয়ামীডার মাথাগা খাইছে। তাইতেও খুশী হওন নাই। ইবারে ফান্দে লটকাইছে মনসা ছোঁড়াডারে। মাগী সাক্ষাৎ কামিখ্যের ডাকিনী। ছোঁড়ার রক্ত চুষ্যা খাইয়া তবে নিষ্কৃতি দিব।

কল্যাণবাবু জানালেন: বিধবা বিয়ে আমরা সমর্থন করি লক্ষ্মণ ভায়া। ওরা যদি বিয়ে সাদী না ক'রে আর কিছু ক'রে বসত, তবে তোমার কিছু বলার যুক্তি থাকত।

জেরায় পড়ে অবশ্য লক্ষ্মণকে স্বীকার করতে হয়েছে, দেশের বাড়িতে প্রচলন না থাকলেও, এ-দেশে আসার পর ওদের জাতির মধ্যে বিধবা বিয়ে দুটো চারটে চলছে।

কিন্তু তাই বইল্যা কি অত বড় শেয়ান পোলা ঘরে থাকতে ফের বিয়া করন লাগব? আপনারা ইডা কী কন? আর যে দুরমুখী সোয়ামী বাঁচ্যা থাকনের কালেই অন্যের পোলার সব্বনাশ করতে পারে, তাক বিশ্বাস করন যায়?—লক্ষ্মণ জিজ্ঞেস করল।

লক্ষ্মণের সবচেয়ে বড় সমর্থক জুটলেন মনোরমবাবু।

আপনার ওসব অচল কংগ্রেসী আদর্শবাদ রেখে দিন তো কল্যাণবাবু! দেখছেন না, দুর্নীতি আর ব্যাভিচারই মাগীটার পেশা? বিয়েটা তো ওর ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু না। শাস্তিতে থাকতে পারলে অমন গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করতে পারে এ-সব মাগীরা। যা বলছি শুনুন। ঝাঁটা মেরে বিদায় করুন মাগীটাকে এক্ষুনি বাড়ি থেকে। নচেৎ বৌ-মেয়ে নিয়ে ধর্ম-কর্ম বজায় রেখে এ-বাড়িতে আর কারও থাকতে হবে না বলে দিচ্ছি।

প্রথম দু'-এক দিন মনে হলো মনোরমবাবুর যুক্তিই অকাট্য। নৈতিক প্রশ্ন এমনি একটা জিনিস, যা পূর্ববঙ্গের মানুষেরা অবহেলা করতে পারে না। রুক্মিণী তো বাবুদের ভয়ে ঘরে দরজা দিয়েই রইল।

বাঁচোয়া এই যে, ছেলের দল এই ব্যাপারে নির্বিকার। শচীন তাদের বুঝিয়েছে: ছোট লোকের ব্যাপারে নাক গলিয়ে আমাদের লাভটা কি? শেষে পথে-ঘাটে মার খেয়ে মরব নাকি? তাও ছোট লোকদের হাতে?

একটা মেয়েকে একেবারে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে, এই অমানুষিক দাবীর বিরুদ্ধে প্রথম মৃদু প্রতিবাদ উঠল মেয়ে-মহল থেকে। তাঁরা অবশ্য প্রথমে ঘটনাটা শুনেই, গালে, নয় তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

ওমা! কোথায় যাই! এ কোথায় এলাম গো! একটা মেয়েছেলে তিনটে ব্যাটাছেলেকে নিয়ে লোফালুফি করে, এমন কথা তো বাপের বয়সেও শুনিনি।

পরে, কানের কাছে মুখ নিয়ে, একান্ত চুপিচুপি, পরস্পরের একান্ত ব্যক্তিগত মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ বললেন: দিদি, কারও কাছে যদি না বলেন তো প্রাণের কথাটা বলি। মেয়েছেলেটা যে বিয়ে করবে না,—ও তবে যাবে কোথায়? থাকবে কার কাছে? খাবে কি? ব্যাটাছেলেরা সব যে চেঁচামেচি লাগিয়েছে, বলুক না কেউ খেতে দিতে রাজী আছে নাকি মেয়েটাকে? ওর নাকি একটা ভাই আছে, সে তো স্রেফ বলে দিয়েছে, বোনের বোঝা বইবার ক্ষ্যামতা তার নেই! তবে দেখুন তো দেখি দিদি, বিয়ে করলে তবু তো একটা গতি হয় মেয়েটার।

রবি গিয়ে খুঁজে পেতে পটলকে বের করে বলল: ভাই পটলা, যেমন করে হোক, রুক্মিণীর বিয়েটা যাতে হয় তা তোকে করতে হবে।

ব্যাপারটা সামান্য। হরেকেষ্টর সৎকারের ব্যাপারে রবি খুব সাহায্য করেছিল। চাঁদা-তোলা থেকে শ্মশানঘাটে যাওয়া পর্যন্ত আগাগোড়া ব্যাপারে সে অগ্রণী ছিল। অত শোকের মুহূর্তেও রুক্মিণীর চোখে তা এড়ায়নি। তার ফলে এই অল্প ক'দিন আগে কোন এক ডাইং-ক্লীনিং-এর দোকানে একজন লোক নেবে জানতে পেরে রুক্মিণী সংবাদটা দিয়েছিল রবিকে। রবিকে সঙ্গে করে দোকানের মালিকের কাছে নিয়েও গিয়েছিল। ফলে কড়কড়ে ষাট টাকা মাইনের চাকরীটা রবি পেয়ে গিয়েছে।

সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ রবি শোধ দিতে চায় এই বিপদের সময় রুক্মিণীকে রক্ষা করে।

বাধ্য হয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠতে হল পটলকে। আর নির্লিপ্ততা বজায় রাখা সম্ভব নয়। অন্তরঙ্গ বন্ধু রবির ডাক সে উপেক্ষা করতে পারে না।

অন্য ছেলেদের পক্ষেও চুপ-চাপ থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। এ বাড়িতে কোন কাজে তারা অংশগ্রহণ না করলে সুসম্পন্ন হয় না। রুক্মিণীকে তারা

খুব ভাল করে জানে। তার সাহসের জন্য সে অভিনন্দিত। তার দুর্ভাগ্যের জন্য সে সহানুভূতির পাত্রী। বুড়োর দল গায়ের জোরে তার উপর একটা অমানুষিক আচরণ করবে এ কি সহ্য করা যায়? ঘরে বসে বাঘ মারে তো বুড়োরা! জানে না তো এই কলকাতা শহরে নাকের ডগার উপর কত অনাচার কদাচার ব্যাভিচার ঘটে যাচ্ছে! অলিতে গলিতে কুমারী মা আর অবিবাহিত বাপের দল লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরছে। আর এ তো নিতান্ত সাধারণ একটা বিয়ে।

পটল এবং ছেলেদের মধ্যে যে ব্যবধানটা গড়ে উঠেছিল, একটা কাজের অছিলা পেয়ে তা উবে গেল। দু'পক্ষই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পটল এবং ছেলেদের চেষ্টায় দু'চার দিনের মধ্যেই বাড়ির আবহাওয়া ঘুরে গেল! কল্যাণবাবু লজ্জিত হয়ে স্বীকার করলেন, একটা অসহায় মেয়েকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ ব্যাপারটা নীরবে মেনে নেওয়াটা তাঁর অন্যায় হয়েছিল। সুধীনবাবু বললেন: তিনি তো বরাবরই জানেন যে এ-রকম বিয়েতে আইনগত কোন বাধা নেই। একমাত্র মনোরমবাবুই খাঁটি পুরুষসিংহের মত প্রথম দিন যা বলেছিলেন, শেষদিন অবধি তাই বলে গেলেন। ছেলেরা আড়ালে টিট্‌কারী দিল।

যথাসময়ে সানুষ্ঠান বিয়ে হয়ে গেল রুক্মিণীর। শোনা গেল, যে-মেয়েকে পরানের মত ছেলে আয়ত্ত করতে পারেনি, তাকে বৌ-হিসাবে পেয়ে মনসা নাকি খুব গর্বিত।

পাশাপাশি হাসিখুশী বর-কনেকে দেখে নিজের প্রতি কী যে অনুকম্পা হলো পটলের! কত দুঃখী ওরা, কত গরীব ওরা—তবু ওরা বিয়ে করে ঘরে আনে বৌ, নীড় বাঁধে! সারা দিন অক্লান্ত খেটে তবু ওরা দিনান্তে সুখী হয় দু'জন দু'জনকে দেখে! পটল কি পৃথিবীর ব্যতিক্রম?

পটলের ভাগ্য বোধ হয় আস্তে আস্তে ফিরছে। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীর সেই মালিকটি একদিন তাকে পথে পেয়ে একটা ঠিকানা বলে দিলেন। কাছাকাছি এলাকারই একটা সাবানের কারখানা। পটল গিয়ে বলতেই, তার স্বাস্থ্যবান চেহারা দেখে ওঁরা তাকে নিয়ে নিলেন। মাইনের অঙ্কটা অবশ্য কারও

কাছে বলা চলে না, মাত্র পঁচিশ টাকা! বাইরে ঘোরাঘুরির কাজ। পটল কিন্তু এতেই যারপরনাই খুশী হয়ে ভাবতে বসল। চাকরীতে আর সে কতদিন থাকবে? চাকরী নেওয়ার উদ্দেশ্য হল পাঁচটা কারবারীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নেওয়া, ব্যবসার ভিতরকার গুমোরগুলো জেনে নেওয়া। তারপর তো ও নিজেই ব্যবসা শুরু করে দেবে। মূলধন না-ই থাক। এই কলকাতার বাড়িতে কত লোক স্রেফ দালালী করে হাজার হাজার টাকা রোজগার করছে। অবশ্য বড়লোক হয়ে নিতে ওর সময় লাগবে। হয়তো ততদিনে সুনন্দার বিয়ে হয়ে যাবে শচীনের সঙ্গে। তা হোক। সে যখন নিজের গাড়ীতে বসিয়ে সুনন্দাকে নিয়ে যাবে মেট্রোর বক্সে সিনেমা দেখাতে, আর সিনেমা অন্তে ফারপোতে নিয়ে বসিয়ে ক্যাবারে নৃত্য দেখতে দেখতে ডিনার খাওয়াবে, সুনন্দা তখন কি না-ভেবে পারবে, জীবনে কত বড় ভুলই করেছে পটলকে প্রত্যাখ্যান করে?

দ্বিতীয় দিন রাত্রে কাজ থেকে ফিরে এসে পটল মেঝেতে বসে পড়ে জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল। ঠিক কুকুরগুলো যেমন অনেকখানি দৌড়ে এসে জিভ বের করে হাঁপায়। অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। ভোর সাতটা থেকে রাত দশটা অবধি অনবরত ছোটাছুটি করা। রোজদিন দুপুরে যে বাড়ি থেকে খেয়ে যাওয়ার ছুটি মিলবে তারও নিশ্চয়তা নেই। আজকেই তাই হয়েছিল। জলখাবারের জন্য চার আনা পয়সা দিয়ে মালিক দাঁত বের করে হাসছিলেন।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যের দিকে পটলকে পাঠিয়েছিল এক-গাড়ী মাল দমদমে নিয়ে ডেলিভারী দিতে। জায়গামত পৌঁছে মাল গুনতি করে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল, চালানে লেখা অঙ্ক থেকে দু'পেটি মাল বেশী এসেছে গাড়ীতে? অন্ততঃ মণ দেড়েক মাল রয়েছে দু'পেটিতে।

মালিক বললেন: বাড়তিটা আর চালানে লিখব না মশাই। আদ্ধেক আদ্ধেক বখরা। আপনার আদ্ধেক হিসাব করে এক্ষুনি নগদ টাকায় দিয়ে দিচ্ছি।

পটল শুনে তৎক্ষণাৎ গরম হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেছন থেকে ওরা ডাকছে:

ও মশাই, শুনুন, শুনুন। চালান নিয়ে গেলেন না সই করিয়ে?

পটল আবার ফিরে এলে ভদ্রলোক বললেন: অত চটে যাচ্ছেন কেন মশাই? জানেন, ওরা আমার কী করেছে?

ভদ্রলোক একখানা গোল সাবান নিয়ে মাঝখান দিয়ে কেটে ফেললেন। বাইরেটা দেখতে সুন্দর, ভিতরে গুঁড়ি গুঁড়ি ছাই-এর মত কী বেরুল।

দেখছেন? ডিস্পোজ্যালের পচা নষ্ট সোপ-পাউডার কিনে তাই মিশিয়ে সাবান বানিয়েছে। অথচ সেরা সাবান বলে সবচেয়ে বেশী যে দাম, তাই নিয়েছে আমার থেকে। ভেবেছে, রিফিউজী কারবারী, কিছু তো করতে পারবে না। কি করতে পারি না-পারি দেখুন না—দুটো বছর যেতে দিন না!

পটল আর আপত্তি করল না। হিসাব করে অর্ধেক টাকা বুঝে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে বেরিয়ে আসার সময় দেখা গেল তার মুখে চাপা দুষ্টু হাসি। আজ থেকে তার অভিযান শুরু হ'ল। ধর্ম নেই, নীতি নেই, অনুশাসন নেই! বেঁচে থাকার জন্য নির্মম নিরঙ্কুশ সংগ্রাম। যা কিছু সামনে পাবে, দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে, কেড়ে কুড়ে নেবে। প্রথম পরীক্ষায় পটল আজ পাশ করেছে।

পরদিন সকালে গিয়ে পটল কাজে ইস্তফা দিয়ে এলো। আর প্রবৃত্তি হলো না কাজে লেগে থাকতে। মালিককে বলল, এত পরিশ্রমের কাজ তার স্বাস্থ্যে কুলুবে না। না, তার চুরি ধরা পড়েনি। বাঙালী প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ব্যবস্থা এত টনটনে নয় যে, এত ছোট্ট একটা চুরি এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবে।

অনেক দিন পরে আজকের দুপুরবেলা পটল তার পুরোনো পরিচিত পুকুর পাড়ে গিয়ে বসল। মনটা খুব উদাস হয়ে গিয়েছিল, তাই মনে হল, পুকুরধারে ঝিরঝিরে হাওয়ায় বোধ করি ভাল লাগবে। গরম বোধ হওয়ায় গায়ের চাদরখানা খুলে মাটিতে রাখল। না, চাকরীটার কথা পটল একবারও ভাবছে না। ওটা একটা নিতান্ত সাময়িক সাধারণ ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে চুকে বুকে গিয়েছে।

পুরোনো জায়গায় পুরোনো স্মৃতিগুলিই বারবার মনে জাগে। সুনন্দার কথাটাই মনে আসছে বারবার করে ঘুরে ফিরে। জীবনের সব দরজাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সব ঘরের লোকেরাই 'দূর ছাই' বলে তাড়িয়ে দিয়েছে কাউকে পটল ক্ষমা করেনি। প্রতিশোধ নিয়েছে, প্রতিশোধ নেবে সুযোগ পেলেই। কিন্তু সুনন্দার কথা স্বতন্ত্র। সুনন্দার বিরুদ্ধে তার মনে

কোন রাগ নেই, তার মনের অভিপ্রায় সে মেনে নিয়েছে। মনে মনে আবার উচ্চারণ করল : সুনন্দা, ছেড়ে দিলাম, সরে দাঁড়ালাম, তোমার শত্রু কেউ থাকলে বরং দরজা আগলিয়ে রুখব।

এমন সময় সুনন্দা এল। দুপুরবেলা পুকুর ঘাটের দিকে বড় একটা কেউ আসে না। কিন্তু সুনন্দা এসেছে কলসী কাঁখে নিয়ে জল নেবে বলে। কে জানত, এতদিন পরে পটলের আবার পুকুরপারের কথা মনে পড়ে গিয়েছে!

এক মাসের উপর হয়ে গেল পটল ফিরে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে সুনন্দার দেখা এই প্রথম। সুনন্দা বুঝতে পেরেছে, পটল কেন এড়িয়ে চলছে। শচীন-ঘটিত গুজবটা পটল যথারীতি শুনেছে আর বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করে নিয়েছে। আর তার ফলে রেগেছে, ভীষণ রেগেছে পটল। পটলের রাগটা অনুমান করে সুনন্দা এই প্রথম বুঝতে পেরেছে, মেয়েদের জীবনে এ-ধরণের গুজব রটনাটা খুব ভাল জিনিস নয়।

পটলের থমথমে মুখ, তার অবিন্যস্ত চুল আর রুক্ষ চেহারা দেখে সুনন্দার মুখ শুকিয়ে গেল। আরেকদিনের পুকুর-ঘাটের ইতিহাস মনে পড়ল। সেদিনের ব্যাপারটা ছিল ছেলেখেলার পর্যায়ের। আজকে কিন্তু কি যেন সাংঘাতিক অশুভ কিছু পটলের চেহারার মধ্যে অপেক্ষা করছে। কি করবে এখন সুনন্দা? পালিয়ে যাবে? দৌড়ের প্রতিযোগিতায় পটলের সঙ্গে পারবে?

দুপুরের নিস্তরঙ্গতায় নির্মল নীল আকাশে নিঃসঙ্গ অলস সূর্য একাকী পথ পরিক্রমায় বেরিয়েছে। নির্বায়ু আবহাওয়ায় গাছগুলো ঘুমুতে ঘুমুতে রোদ্দুরে ভিজছে। অনেক উঁচু দিয়ে একটিমাত্র কাক উড়ে যাচ্ছে। কাক, না চিল কে জানে? পৃথিবীর এই নিদ্রামগ্নতার মুহূর্তে পটলের সঙ্গে দেখা হওয়াটা কি ভাল হল? পটল যে বড় কাছের লোক, সেইজন্যই তাকে এত ভয়।

কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল সুনন্দা। ভীতচকিত দৃষ্টিতে তাকালো পটলের দিকে।

আর সুনন্দাকে দেখেই পটলের মনে হল, ঠিক এর জন্যই সে এতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছিল। সুনন্দার থমকে দাঁড়ানো, ওর ভীত চাহনি দেখেই পটল চিনতে পারল অপরাধীকে। যুগ যুগ ধরে কতবার কত বেশে

এই মেয়েটি তাকে বঞ্চনা করেছে, করে এনেছে অপমান, ভেঙে মুচড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে দুপুর-রোদ্দুরের পীচ-গলা রাস্তার উপরে। অফিসে, কারখানায়, কাছারিতে,-অকল্যাণ্ড হাউসে, এম্প্লয়মেণ্ট এক্স্চেঞ্জে, দোকানে-বাজারে, কতবার কত বিচিত্র বেশে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এই চিরন্তনী বঞ্চনা ভেঙে দিতে তার ঘর, অট্টহাসিতে উড়িয়ে দিতে তার সুখের কল্পনা।

না, পটল ছেড়ে দেবে না। পটল ক্ষমা করবে না। প্রতিশোধ নিতে হবে। যা-কিছু সামনে পাবে দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে কেড়ে-কুড়ে নেবে। দু'গুণ করে মার ফিরিয়ে দেবে। ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়তো তা-ও ভাল। পটলের জীবনের এই মূলনীতিকে আজ সে প্রয়োগ করবে অকুণ্ঠিত চিত্তে।

পটল এগিয়ে এসে সুনন্দার হাত ধরল।

সুনন্দা আকুল হয়ে বলল: হাত ছাড় পটলদা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে বল তো?

অত ভয় পেলে কি চলে সুনন্দা? পান খেয়ে পিক ফেলেছো, ছিট্‌কে গিয়ে কাপড়ে লাগবে না?

লাল হয়ে উঠল সুনন্দার মুখ। টানাটানিতে রক্ত জমে গেল হাতে।

পটলদা, বিশ্বাস করো, আমার কোন দোষ নেই। যা শুনেছো সব মিথ্যে। বিশ্বাস যদি না-ই করতে পারো, তবে অন্তত ক্ষমা করো পটলদা।

পটল হাসল: আগে যদি ভাবতে পারতে সুনন্দা যে গুণ্ডা, বদ্‌মাইশদের সঙ্গেও ভালবাসা হয়তো করা যায়, কিন্তু ছেলেমানুষী করা যায় না। আগে যদি বুঝে সাবধান হয়ে গুণ্ডা-বদ্‌মাইশদের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে পারতে, তবে হয়তো আজকে তোমার কপালে এ-দুর্ভোগ জুট্‌ত না। আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে। গুণ্ডার হাতে পড়েছো, সে তোমাকে এমন কিছু শিক্ষা দেবে, যা জীবনে কোনদিন কোনখানে কোন অবস্থাতেই তুমি ভুলতে পারবে না।

পুকুরের এক পারে একখানা চালাহীন পোড়ো ঘর ছিল। শুধু ধুলো, আবর্জনা আর পোকা-মাকড়ের বাস সেখানে, মানুষ-জন সেদিকে ভুল করেও যায় না। সেই ঘরে পটল সুনন্দাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল।

যেন হাত ধরে নিয়ে চলেছে সুনন্দাকে। কোন পরিত্রাণ নেই, অব্যাহতি লাভের কোন আশা নেই।

ঘরে ঢুকতেই অনধিকার-প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানালো পোকা মাকড়ের দল। কিন্তু জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই সরে পড়ল শেষ পর্যন্ত। এক হাতে সুনন্দাকে ধরে রেখে আর এক হাত দিয়ে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করল পটল। নিজের গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিল মাটীর উপর।

চাদরের উপর সুনন্দা নিজেই গিয়ে বসল। আর একবার করুণ আবেদন জানালো: পটলদা, ক্ষমা করো।

করবো। আর একটু পরে। একটুক্ষণ বাধ্য হয়ে কথা শুনে চলো তো লক্ষ্মী মেয়ে।

পটল গিয়ে ধরতেই নিরুপায় বাধ্যতায় সুনন্দা শুয়ে পড়ল, এতক্ষণে সুনন্দার চোখের কোণে সুস্পষ্ট জলের রেখা দেখা গেল। অপ্রতিরোধ্য নিয়তিকে প্রতিরোধ করা যায় না, সুনন্দা ভাবল। সুনন্দার চোখের জলের মধ্যে রয়েছে যেন এক অশুভ ষড়যন্ত্রের আমন্ত্রণ, পটল ভাবল। আরও জোরে প্রতিবাদ করছে না কেন সুনন্দা? আরও জোরে চিৎকার করছে না কেন?

তাড়াহুড়ো করে কিছু করে ফেলা পটলের হয়ে উঠল না। হাত লাগালো বটে কিন্তু সুনন্দার হাতের প্রত্যাঘাতে বারবার ফিরে এল হাত। টানাটানি করতে করতে জোর ফুরিয়ে এল। তবু ভাগ্য ভাল, একটা আচমকা টানে সুনন্দার বুকের উপরকার পুঞ্জীভূত শাড়ীর জট একপাশে সরে গেল অকস্মাৎ। পটল অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, তার একেবারে সামনে অবিবাহিত পুরুষের স্বপ্ন কামনা, সেই শিখর-শোভিত বন্ধুর উপত্যকা, সাগরের ঢেউয়ের তালে কান্না হয়ে কাঁপছে যেন তারই অবোধ বিষণ্ণ বঞ্চিত যৌবন।

মাথাটা যেন কেমন করে উঠল পটলের। সমস্ত পরিবেশটাই যেন কেমন অবাস্তব বলে মনে হলো। সুনন্দাকে কেন টেনে এনেছে এখানে তাও যেন বিস্মরণ হয়ে গিয়েছে। বিশৃঙ্খল চিন্তাসূত্রগুলোকে জোড়া দিতে চেষ্টা করল পটল। ভাবতে চেষ্টা করল,' একটি অসহায় মেয়ে কেন এখানে এমন করে শুয়ে? এমন অস্বাভাবিক ঘটনার নিষ্ক্রিয় দর্শক কেন সে? এমন কি দুর্লভ

কামনা তার ছিল, যার জন্ত এরকম একটা প্রকৃতির বিপর্যয় সৃষ্টি করা তার প্রয়োজন হয়েছিল ?

নিস্তরঙ্গ দুপুর গড়িয়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে। বিষন্ন রোদ্দুর গড়িয়ে চলেছে। পটল গড়িয়ে চলেছে। সুনন্দা গড়িয়ে চলেছে। তারা পুতুল সময়ের চাকায় বাঁধা অসহায় পুতুল গড়িয়ে চলেছে। গড়িয়ে চলেছে গড়িয়ে—

পটলের হাত কখন নিশ্চল অসাড় হয়ে গিয়েছে সে টেরও পায়নি। এদিকে সময় বয়ে চলেছে। যাই তার উদ্দেশ্য থাকুক, সে-কাজের মহেন্দ্রক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সুনন্দার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার চোখের জলের ধারা গালের সব-চেয়ে উঁচু জায়গাটা পেরিয়ে ঢালুর দিকে নেমে এসেছে। কিন্তু সুনন্দা এখন কাঁদছে না। চাপা হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত।

সুনন্দাকে ছেড়ে দিয়ে পোড়ো-ঘরের ময়লা মেঝের উপর ধপ করে বসে পড়ল পটল। সারা শরীর কাঁপছে জ্বরের রুগীর মত। টক্‌টকে লাল মুখ ঘামে ভিজে উঠেছে। ঘাম গড়িয়ে পড়ছে কাঁধ বেয়ে লোমশ বুকের ভিতর দিয়ে পথ খুঁজতে খুঁজতে। নিশ্বাস ফেলছে হাতুড়ী পেটার মত করে। খুব বেশী পরিশ্রম করেছে কি পটল ? খুবই বেশী ?

পুকুর-ধার থেকে একটা শব্দ কানে আসছে না ? শব্দটা কি মানুষের ? ভাল করে ভাববার অবকাশ দিল না পটল নিজেকে। দারুণ ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটল। সুনন্দা সরে না গেলে অনায়াসে মাড়িয়ে যেতে পারত তাকে।

আর, পটলের পায়ের শব্দ যখন নিঃশেষে মিলিয়ে গেল, তখন সুনন্দা উঠে বসে খিল খিল করে হেসে উঠল। কী বোকা মানুষ ! কী ভীরু মানুষ ! এই সাহসের বড়াই নিয়ে বিয়াল্লিশ-ইঞ্চি বুকের ছাতি ফোলায় পটল ?

এই মানুষটাকে দেখে ভয় পেয়েছিল সুনন্দা ? আশ্চর্য তো ! শুধু একটুখানি শক্ত হওয়া, চোখের ভ্রূর একটুখানি আকুঞ্চন, চেঁচানো নয়, শুধু চেঁচাবো বলে একটু ভয় দেখানো,—অনধিগম্য নারী-দেহকে পাওয়ার দুঃসাহসী পরিকল্পনার সমাধি রচনার পক্ষে তাই তো যথেষ্ট ছিল !

পটলের ফেলে-যাওয়া চাদরখানা তুলে নিয়ে সযত্নে ঝেড়ে-ঝুড়ে ভাঁজ করে

আঁচলের আড়ালে নিয়ে সুনন্দা বেরিয়ে এল। শাড়ীটা গুছিয়ে পরল। চোখের জল, মুখের ঘাম মুছে ফেলল। হাত দিয়েই যতটা পারল চুল ঠিক করে নিল। তারপর শান্ত ধীর পদে বাড়িতে ঢুকল সুনন্দা। কিন্তু পটল কোথায়? একতলায় নেই, দোতলায় নেই। শেষে ছাদে গিয়ে দেখল, কার্নিশের ওপর বিপজ্জনকভাবে বসে আছে পটল, ভাঙা-চোরা অবিন্যস্ত বিশৃঙ্খল একটা সত্তা।

তোমার চাদর, পটলদা।

পটল হাত বাড়িয়ে চাদরখানা নিল, কিন্তু তাকিয়ে দেখল না কে দিচ্ছে।

অমন করে বসে থেকো না পটলদা, হঠাৎ পড়ে যেতে পারো।—সুনন্দা আবার বলল, আরও মোলায়েম করে, দুষ্টু অবোধ ছেলেকে উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গীতে।

তখন কিছু মনে হয়নি, কিন্তু রাত্তির বেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুনন্দার কী যে রাগ হ'ল পটলের উপর! অত বড় শরীর পটলের,—সে শুধু দেখার শোভা! না-আছে এতটুকু সাহস, না-আছে সামন্য এক বিন্দুও বুদ্ধি। মুখে আস্ফালনের অবধি নেই, কিন্তু ফেউয়ের ডাক শুনলে বাঘের ডাক ভেবে অমনি গর্তে পালানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে!

না, পটল একটা গর্হিত মতলব নিয়ে এসেছিল বলে যে রাগ হচ্ছে, তা নয়। একটা জোয়ান মরদ শচীনের মত দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয়ে চুপ মেরে যাবে তাই কি ভাল লাগে? কিন্তু সে-ও বরং ভাল ছিল এরকম করে এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাওয়ার চেয়ে। কী কাপুরুষ পটলটা! কী জঘন্য কাপুরুষ! একটা দড়ি দেখে এমন দৌড় মারল যেন সাপে তাড়া করেছে! সত্যি বলতে কি (জিনিষটা খুবই দুর্নীতির, কিন্তু নিজের কাছে সত্যি স্বীকারে দোষ নেই), পটলের বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ খুব খারাপ লাগছিল না সুনন্দার কাছে। একটা চরম বিপর্যয়ের জন্য নিজেকে একরকম তৈরী করেই নিয়েছিল সে। কিন্তু এমনভাবে যে পটল হেরে যাবে, কে জানত? কালবৈশাখীর দিনে প্রচণ্ড কালো মেঘ আর সোঁ-সোঁ বাতাস মনে চরম দুর্যোগের দুর্ভাবনা নিয়ে আসে। সে-মেঘ আর বাতাস যদি অমনি মিলিয়ে যায় বিনা বর্ষণে, ভাবনা-মুক্ত মন তবু এক ধরণের নৈরাশ্য বোধ করে। সুনন্দারও হয়েছে অনেকটা সেই অবস্থা।

সুনন্দার জীবনে এমনি একটা ঝড়েরই যেন আজ দরকার ছিল। মেয়েমানুষের জীবনে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটতে পারে, যা সমস্ত দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার অবসান ঘটায়। তারপর আর ভাববার কিছু থাকে না, বিচার-বিবেচনার কোন অবকাশ থাকে না, অমোঘ বিধিলিপিকে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করে তখন শুধু পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলা। এমনি একটা ঘটনার সুন্দর আয়োজন করে নিয়েছিল পটল। যদি ঘটত, তবে আর এ-প্রশ্নের বালাই থাকত না যে পটল বাউণ্ডুলে, বেকার, পটলকে নিয়ে সংসার করা চলে না। কিন্তু হায়! পটল হেরে গেল! আর হেরে গিয়ে সেই প্রশ্নগুলোকেই আরও প্রত্যক্ষ করে তুলল। আজকে এই প্রশ্নগুলোর শেষ চূড়ান্ত মীমাংসা না করে তো সুনন্দার উপায় নেই। একটা প্রশ্নের সামনে এসে তো চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। একদিন না একদিন তার জবাব দিতেই হয়। সুনন্দার জীবনের সেই চরম দিনটি আজ উপস্থিত,—সুনন্দা যে মেয়েমানুষ। হয়তো তার সিদ্ধান্ত কোন আনন্দ আর সুখের সম্ভাবনা নিয়ে আসবে না। হয়তো এই কঠিন কঠোর ধরণীতলে অপ্রিয় কর্তব্য পালনের আহ্বানকেই মেনে নিতে হবে তার। তবু উপায় নেই। যতক্ষণ সে বিচার করতে পারছে, যতক্ষণ বুদ্ধি-প্রয়োগ করার পথ খোলা আছে, ততক্ষণ অবধি সে ভাবাবেগের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে না। মায়ের উদাহরণ রয়েছে সামনে—কী করে সে অন্ধ হবে?

সারা রাত ভাল করে ঘুমুতে পারল না সুনন্দা। যতবার একটু তন্দ্রা আসে, যেন মনে হয়, ফুলের সমারোহ, পাখীর গান আর আলোর ঝলমলানি-ভরা স্বর্গরাজ্য থেকে কে একটা শক্তিশালী পুরুষ তাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। সুনন্দা পা জড়িয়ে ধরে কত কাঁদছে, কিন্তু পুরুষটির দয়া হচ্ছে না। যেন বলছে: এখানে তোর স্থান নেই—তুই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, সামান্য, মাটীর মানুষ। তুই চলে যা হিসাবী বুদ্ধির পাঁচিল-ঘেরা নরকে। এই পুরুষটিই কি বিধাতাপুরুষ?

পরবর্তী ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। স্বয়ং মনোরমবাবু দেখে ফেললেন ঘটনাটা। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নীচের সম্প্রতি-পরিত্যক্ত অস্থায়ী ঘরটার

মধ্যে কেমন একটা শব্দ হওয়ায় তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। দরজা ফাঁক করে তাকিয়ে দেখলেন, একটা খুব আপত্তিকর অবস্থায় বসে রয়েছে একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। সুনন্দা আর শচীন।

সুধীনবাবু আর কালীকান্তবাবুকে সামনে পেয়ে তাদের কাছেই ঘটনার সবিস্তার বিবরণ দিলেন মনোরমবাবু। দু'জনেই শুনে দস্তুরমত হকচকিয়ে গেলেন। ঘটনা যত মর্মান্তিকই হোক্, তার চেয়ে আরও বেশী মর্মান্তিক, ঘটনাটা মনোরমবাবুর চোখে পড়ে যাওয়া। মাত্র কয়েক দিন আগে রুক্মিণীর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে মনোরমবাবু যা ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, তা কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া চলে? আর সেটা তবু সাদাসিধে আইনসঙ্গত বিয়ের ব্যাপার ছিল। সে-তুলনায় সুনন্দার অপরাধের তো কোন পরিমাপই করা যায় না। ইতিহাস নিয়ে যদি টান দেওয়া যায় তো অমন ইতিহাস তো সুনন্দারও আছে!

দুই বন্ধু পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন শুধু।

মনোরমবাবু বললেন: অত ভাবছেন কি? ভাবনার যা আছে পরে ভাববেন। এখন এক কাজ করুন, সাত-তাড়াতাড়ি দুই হারামজাদা-হারামজাদীকে ছাদ্নাতলায় দাঁড় করিয়ে দিন তো।

সুধীনবাবু কালীকান্তবাবু দু'জনেই কল্যাণবাবুর শুভাকাঙ্ক্ষী। গোপনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন দু'জনেই। দু'জনের মনেই একটা খটকা তবু রয়েই গেল।

কালীকান্তবাবু ফাঁকা-গোছের একটা হাসি হেসে বললেন: যা বলেছেন মনোরমবাবু। ও ছাড়া আর আমাদের পথ কোথায়? আজকালকার বজ্জাতের ঝাড় মেয়েগুলো বিয়ে করার মতলব নিয়েই তো এ-সব করে। বুড়ো হয়েছি বলে এ সব শয়তানী কি আর বুঝি না?

সুধীনবাবু গম্ভীরভাবে বললেন: ওরা কিন্তু খুব ভুল করে কালীকান্তবাবু। ছেলেগুলো যদি বেঁকে দাঁড়ায়, তবে আইনের সাধ্যি নাই জোর করে বিয়ে করায়। বল প্রয়োগ তো নয়, কাজেই আইনে তাদের শাস্তি হওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই।

অনেকক্ষণ আলোচনা হল, কিন্তু মনোরমবাবুর উদাশয়তার কারণ কেউ বুঝলেন না। কারণটা খুব সহজ। ভিন্ন জাতের মেয়ে রুক্মিণীকে যে ব্যবস্থা

দেওয়া সহজ, নিজের জাতের মেয়ে, বিশেষতঃ নিজের বন্ধু-বান্ধবের মেয়ের ক্ষেত্রেও কি সে-ব্যবস্থা দেওয়া চলে? তা ছাড়া আরও একটু কারণ আছে। মনোরমবাবুর ছোট মেয়েটা সম্প্রতি বড়ই বারমুখো হয়ে উঠেছে। সকালে, দুপুরে, রাত্রে যখন-খুশি উধাও হয়। ধমকিয়ে ফল হয় নি। ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার কথায় প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প জানিয়েছে। সে-ও যে একদিন এমন একটা কেলেঙ্কারী করে বসবে না, কে বলতে পারে? পারবেন কি মনোরমবাবু তখন তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে?

আগের দিনে আমাদের দেশের মানুষেরা অবশ্য তা পারত। নিজের মেয়ের মুখের উপর বাপ দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। নিজের বোনের চুল ধরে টেনে পথে নামিয়ে দিয়েছে এক-মায়ের পেটের ভাই। না, তাঁরা আধুনিক মানুষ, অত নিষ্ঠুর হতে পারেন না।

এক বাড়িতে আড়াইশো লোক। আগুনের পাশে ঘি পড়ে থাকবে, দপ করে জ্বলে উঠবে না, তা কি কখনো হয়? বাস্তবকে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল।

কল্যাণবাবু শুনে যেন বোকা হয়ে গেলেন। ঘরে এসে ঝিম্ মেরে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বললেন: অমন ফুলের মতন মেয়ে সুনন্দা, অমন ভাল ছেলে শচীন,—ওরা শেষকালে এই করল মনোরমা?

আর দারুণ বিরক্তিতে অধৈর্য, তিক্ত গলায় বললেন মনোরমা: হ্যাঁ, সব আধ-পাকা খোকা-খুকীর দল! ভাজা মাছ উল্‌টিয়ে খেতেও জানে না! চোখে ঠুলো আর কানে তুলো দিয়ে থাকোগে, কিছু ভাবতে হবে না।

মেয়েকে রান্না-ঘরের কোণে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: এ তুই কী করলি রাক্ষসী? শেষটায় শচীনকে—

সুনন্দা তৎক্ষণাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে মায়ের আঁচলে মুখ লুকালো।

এ-বিষয়ে তুমি আমাকে কিছু বলতে পারবে না মা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমি তোমার কথার কোন জবাব দিতে পারব না।

যেন ঝড়ে-বিপর্যস্ত একটা বৃক্ষ-শিশু। মনোরমা শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বিয়ের ব্যাপারটার কিন্তু সহজে নিষ্পত্তি হ'ল না। শচীনের বাবা বিষয়ী

লোক। সোজা জানিয়ে দিলেন, কায়েতের ঘরে বস্তির মেয়ের বিয়ে, সে আবার কেমন কথা! ছেলেমানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, তাই বলে তিনি জাত খোয়াবেন? তাছাড়া তাঁর রোজগেরে ছেলে অনায়াসে দু'এক হাজার টাকা পণও তো পাবে বিয়ে করতে গেলে! বিনি পয়সায় মেয়ে ঘরে তুলবেন, চোরের চাকর নাকি তিনি?

বুড়োর দল হয়রাণ হয়ে গেলেন। অনুরোধ, উপরোধ, হাত ধরা; শেষে চোটপাট, রাগারাগি ;—ছেলের বাপ তবু নির্বিকার। নবনীত কোমল হ'লে পুরুষ মানুষ কি আর সংসার করতে পারে? আর বাপের সুবোধ ছেলে শচীন মুখটি চুন করে ঘরের কোণে বসে রইল চুপচাপ। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করেও তার মুখ দেখার সুযোগ পেল না কেউ।

পটল বুঝতে পারল, সে হস্তক্ষেপ না করলে এ ব্যাপারের কোনদিনই মীমাংসা হবে না। ও-লোকটা তো বাস্তহারা নয়, বাস্তঘুঘু। মামার বাড়ি পেয়েছেন এটা—যা আদেশ করবেন তাই হবে! উপযুক্ত দাওয়াই পড়লে একদিনে রোগ সেরে যাবে, ভাবনা কি?

পটল ইতিমধ্যে নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে। সুনন্দার উপর তার আর কোন রাগ নেই। সর্বান্তঃকরণে সুনন্দাকে সে সমর্পণ করেছে তার ঈপ্সিত দয়িতের হাতে! ভয় নেই, নিজের মনের কাছে সে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা সে রাখবে। সুনন্দার পথের কাঁটা দূর করে দেবে সে।

কী যে মন্ত্র পড়ে এল পটল শচীনের বুড়ো বাবার কাছে, কেউ জানল না। কিন্তু তারপর বাকি রইল শুধু পুরোহিত ডাকা, পাঁজি জোগাড় করা, আর সাক্ষী জড়ো করা।

বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। পটল অনেক ভেবে-চিন্তে সুনন্দার কাছে একবার গেল শেষ-বিদায় নিতে। খানিকটা কৃতজ্ঞতাও তো তার প্রাপ্য হয়েছে নিশ্চয়ই।

সুনন্দা নতমুখে বসে কী যেন সেলাই করছিল।

তোমার কাছে একবার এলাম সুনন্দা।

দেখেছি।—সুনন্দা কিন্তু মুখ তুলে তাকাল না।

এখন বোধকরি আমার সঙ্গে একটু ভালভাবে কথা বলতে পারো সুনন্দা। শুনেছো বোধ হয়, আমা-হতে তোমার কিছু উপকার হয়েছে।

সেজন্য আমারো কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই পটলবাবু। কিন্তু আপনার ব্যাজর-ব্যাজর শোনার আমার সময় নেই—মাপ করবেন। দয়া করে চলে গেলে আমি খুব খুশি হই।—ঠাট্টার মত শোনাল না, গম্ভীরভাবেই আপনি করে বলছে সুনন্দা।

ঈশ! কী ভুলই না করেছে পটল! উচিত ছিল এই মেয়েটাকে টানতে টানতে নিয়ে রেলগাড়ীতে চাপিয়ে উধাও হওয়া! এত বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করল সে নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে! সে কি এই কথাগুলো শোনার জন্য?

এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছেন? কী হ্যাংলা রে বাবা পুরুষমানুষগুলো!

সুনন্দা মুখ তুললে পটল অবাক হয়ে দেখল, অকৃত্রিম রাগ আর বিরক্তি ছাড়া সে-মুখে আর কিছু নেই।

এই চমকপ্রদ নাটকটির শেষ অধ্যায়ে সুনন্দা-শচীনের বিয়েতে যবনিকাপাত ঘটলেই ভাল ছিল বোধ করি। কিন্তু শেষ দৃশ্যটা ছিল অঘটন-ঘটন-পটিয়সী পুলিশের হাতে। তাই সব কিছু ওলোট-পালট হয়ে গেল।

এ-বাড়ির লোকেরা প্রাণপণে ভাবতে চায়, রাজ্যের আর পাঁচজন বাসিন্দার মত তারাও নিতান্ত সামান্য সাধারণ সহজ মানুষ। তাদের মতই ছোটখাটো অভাব-অভিযোগ দুঃখ-দৈন্যের সংসার নিয়েই ষোল আনা জড়িত হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক বড় বড় যাঁদের মাথা, তাঁরা অন্যরকম ভাবেন। যাঁরা দেশের শান্তি আর শৃঙ্খলার মালিকানা স্বত্বের অধিকারী, আর যাঁরা সসাগরা গিরিরাজ-দুহিতা ভারতভূমিকে নিজেদের কয়েকজনের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন, তাঁরা শয়নে-স্বপনে ককটেল-পার্টি আর ক্যাবেরা-নাচের ফাঁকে ফাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন না যে কতকগুলো অবাঞ্ছিত অপরাধ-প্রবণ মানুষ প্রতিনিয়ত আইনভঙ্গ করে চলেছে!

কাজেই, এ-বাড়ির লোকেরা যদিও ভাবল অস্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু স্বাভাবিক রুটিনের কাজ হিসাবেই আবার একদিন বাড়ির চত্বরের সামনে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়াল। আর বিশ-পঁচিশ জন পুলিশের দলটি বড় দারোগার নেতৃত্বে সশব্দ-পদক্ষেপে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বাড়ির লোকেরা এবারে একটু সতর্ক হয়েছে। ওয়ারেন্টে দশ-বারো জনের নাম ছিল, কিন্তু বাড়ির সবাই এক বাক্যে একই ভাষায় জানাল, এই সব নামের কাউকে তারা জানে না, বা, কেউ এ-বাড়িতে থাকে না। সনাক্ত করবার জন্য সাধারণ-পোষাক-পরা যে-লোকটি সঙ্গে ছিল, লোক চিনে বের করতে গিয়ে সে হিমসিম খেয়ে গেল। কার্তিকবাবুকে দেখিয়ে সে হয়তো বলল, ইনিই ত্রিলোচনবাবু। সবাই হো হো করে হেসে উঠল। কাত্যায়ণী দেবীকে দেখিয়ে হয়তো বলল, ইনিই তটিনী। সবাই আবার হাসল। থতমত খেয়ে এবারে সুধার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে জানালো, তবে ইনিই তটিনী হতে পারেন। এবারে সুধাই আরও প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল।

থানা-পুলিশের ব্যাপার যেন এ-বাড়ির মানুষের কাছে ছেলেখেলা মাত্র। বাচ্চারা অনায়াসে পুলিশের দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে কখনো রাইফেলের তাপ পরীক্ষা করছে, কখনো-বা খাকীর পোষাক কতখানি শক্ত টেনে টেনে দেখছে। মেয়েরা-মহিলারা ঠেলাঠেলি ভীড় করে চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন একটা উপভোগ্য খেলা চলছে এখানে। পুরুষের দল একটু গম্ভীর। তাঁরা বাড়ির অভিভাবকও বটে আর ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কেও বেশী ওয়াকিবহাল। দারোগার সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা কাচ্চা-বাচ্চাদের লক্ষ্য করে দু'টো চারটে ধমক এবং মেয়েদের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

পদ-মর্যাদা যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, দারোগা-সাহেব তা বুঝতে পারছিলেন। বেশী সময় নষ্ট করা বিপজ্জনক বুঝতে পেরে আদেশ দিলেন : না, পুলিশের কাজে সহযোগিতা এদের থেকে পাওয়া যাবে না! তোমরা এক কাজ কর। এলোপাথাড়ি সকলকে ধরে নিয়ে লরি বোঝাই কর। যতদূর অবধি লরিতে জায়গায় কুলোয়। এদের শয়তানী কতদূর অবধি গড়ায় আমি দেখব।

এবার মেয়েদের মুখের চাপা হাসি নিবল। ছোট ছেলে-মেয়েদের দুষ্টুমী বন্ধ হয়ে গেল।

কল্যাণবাবু আর সুধীনবাবু খুব সকালে বেরিয়েছিলেন চলতি মোকদ্দমাটার তদ্বিরের ব্যাপারে। পাইকারী গ্রেপ্তারের থেকে তাঁরা রেহাই পেলেন।

যদিও গ্রেপ্তারী পরোয়ানার মধ্যে কল্যাণবাবুর নামও ছিল, তবু তাঁকে বিকেলে যেতে হল থানায়, সুধীনবাবু এবং পাড়ার দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে। দারোগার কাছে ভিন্ন নামে নিজের পরিচয় দিলেন। অনেক কথা কাটাকাটির পর দারোগা সাহেব ওয়ারেণ্টের সংখ্যা হিসেব করে বারো জনকে রেখে আর সবাইকে পরদিন ছেড়ে দিলেন। রবির নামে ওয়ারেণ্ট ছিল। কিন্তু রবি ছাড়া পেয়ে গেল; তার জায়গায় রইল শচীন। তটিনীর নামে ওয়ারেণ্ট ছিল। কিন্তু নিরীহ দেখে তাকে ছেড়ে দিয়ে দারোগাবাবু মনোরমবাবুর চটুল চেহারার ছোট মেয়েটিকে রেখে দিলেন। অন্যান্যের ক্ষেত্রেও এমনি ব্যাপার ঘটল।

এতদিনে যেন বাড়িওলার পরিকল্পনাটি কতকটা বোঝা যাচ্ছে। তিনি চাইছেন, একের পর এক ফৌজদারী মামলা দায়ের করে এ বাড়ির বাসিন্দাদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত করে ফেলা। এক সঙ্গেই অনেকগুলো মামলা দায়ের করতে পারতেন বাড়িওলা। কিন্তু তাঁর অসুবিধা হল বাড়ির লোকগুলোর নাম তিনি জানেন না। যেমন যেমন নাম জোগাড় হচ্ছে, তেমন তেমন মামলা সাজাচ্ছেন তিনি। রেণ্ট-কণ্ট্রোলারের কাছে অবশ্য বাকি ভাড়ার দায়ে তিনি উচ্ছেদের মামলা তুলতে পারতেন। কিন্তু, সেখানে বিচার-পর্ব বহু-বিলম্বিত হয় বলেই বোধ করি এই ব্যবস্থা!

কিন্তু রেণ্ট-কণ্ট্রোল থেকেও শিগগিরই একখানা সমন এল কল্যাণবাবুর নামে।

চব্বিশ

দিন পনেরো আগে একদিন অটল এসেছিল কল্যাণবাবুর কাছে। পাশে মাটীতে একটা গোটা ইলিশ মাছ নামিয়ে রেখেছিল। আর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল কল্যাণবাবুকে।

কল্যাণবাবু দস্তুরমত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই অটল বিশেষ আসে না এসব দিকে। আজকে শুধু যে এসেছে তাই নয়; তার উপর আবার সঙ্গে এনেছে মূল্যবান ভেট।

একটা খবর জানাতে এলাম কল্যাণদা। সরকারী লোনটা পেলাম আজকে। বলতে গেলে আপনার দয়াতেই।

আমার দয়াতে কী হে? সে কী কথা বলছ অটল?

তা ছাড়া কি? আপনি সন্তোষবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে দিলেন। তবেই তো পাওয়া গেল।

ও—একখানা চিঠি দিয়েছিলাম বটে লিখে মনে পড়ছে এতক্ষণে। তারই নাম বুঝি দয়া?

অকৃত্রিম খুশী হয়েছিলেন কল্যাণবাবু খবরটা পেয়ে। অটলকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। পরে অবশ্য যখন শুনলেন, দু'শো টাকা উড়ে গিয়েছে শুধু লোনটা তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য, তখন একটু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করেছিল।

কল্যাণবাবুর কাছে আসার আগে অটল নিজের ঘরে গিয়েছিল। তটিনীকে উপহার দিয়েছিল শালপাতায়-মোড়া খানিকটা মাংস।

অনেকটা যেন মনে হচ্ছে দাদা? দেড়সেরের কম নয় নিশ্চয়ই?—তটিনী বিস্ময়ের ভাণ করে বলেছিল, যদিও সে হাতে নিয়েই বুঝেছিল একসেরের বেশী নয়।

না রে। এক সের।

তা-ও যে অনেক। খাইয়ে তো মোটে দু'জন! আমার দাদা তো এমন বেহিসেবী কাজ করে না কোনদিনই! কি ব্যাপার বলবে না?

ব্যাপার তটিনী মাংস দেখেই বুঝেছিল। তবু দাদার মুখ দিয়ে বলানো চাই।

অনুমান কর্, দেখি তোর বুদ্ধি।

বুদ্ধি আছে না ছাই আছে মাথায়। কেবল গোবর-ভরা। না দাদা, বল তাড়াতাড়ি। নয়তো পেট ফেটে মরে যাব।

তারপর খবর শুনে আনন্দের সে কি উচ্ছ্বসিত প্রকাশ! কত যে শুভেচ্ছা জানালো তটিনী! মুখে মুখে কত আকাশ-কুসুম রচনা করল!

শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছা বুকে নিয়ে অটল এবার দোকানের মালিক হবে! একান্তভাবে কিছু চাইলে তা পাওয়া যায়। ভগবান আছেন তো!

দিন তিনেক আগে এসেছিল রুক্মিণী। তার হাতে একখানা খাকী রঙের লেপাফা। কল্যাণবাবু দেখেই বুঝেছিলেন, সরকারী দপ্তরের চিঠি না হলে অমন কদর্য চেহারা হয় না।

আউজকার ডাকে আইছে বাবু। কী লিখছে একটুন্ পইড়্যা ত্থান।

কল্যাণবাবু পড়লেন। অনাহার-ক্লিষ্ট উদ্বাস্তুদের এককালীন-ভাতা হিসাবে হরেকেষ্ট আর তার স্ত্রীর জন্য কুড়ি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। হরেকেষ্ট নিজে গিয়ে যেন অফিস থেকে নিয়ে আসে।

মনে পড়ল, ভাতার জন্য দরখাস্তখানা কল্যাণবাবুই লিখে দিয়েছিলেন। এতদিনে তার মঞ্জুরী এল? লোকটা মরে ভূত হয়ে যাওয়ার দেড় মাস পরে?

কী লিখছে বাবু কইলেন না তো?—রুক্মিণী তাগিদ দিল।

কল্যাণবাবু লজ্জিত হলেন জবাব দিতে দেরী করার জন্য। কেমন অন্যমনস্ক স্বভাব হয়েছে আজকাল!

চিঠিটা ফেলে দাও রুক্মিণী। ওটা তোমার কোন কাজে লাগবে না।

অটল দরখাস্ত দিয়ে টাকা পেয়েছে, এ-কথাটা প্রচার হয়ে যাওয়ার পর এ-বাড়িতে দরখাস্ত পাঠানোর হিড়িক পড়ে গিয়েছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে অন্তত আটদশখানা দরখাস্ত লিখে দিয়েছেন কল্যাণবাবু। অধিকাংশই কল্যাণবাবুকে দিয়েই দরখাস্ত লেখায়। যারা লেখায় না, তারাও অন্তত খবরটা দিয়ে যায় কল্যাণবাবুকে।

দু'তিনশো টাকা ফালতু খরচ করলে তাড়াতাড়ি টাকা পাওয়া যায়

এ-খবরটা কাউকে বলেননি কল্যাণবাবু। শিশুরাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ নতে যদি শেখে দেশের লোক, তাতে দেশের দুর্দশা কমবে না।

এইসব কথাই ভাবছিলেন কল্যাণবাবু সকালবেলা বিছানায় বসে বসে। এত লোক দরখাস্ত করছে, কেউ কেউ নিশ্চয়ই টাকা পাবে। কিন্তু টাকা পাওয়াটাই বড় কথা নয়। কলে কাগজ ফেলে দিলেই নোট ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। কাজেই টাকা খরচ করাটাও বড় কথা নয়। টাকা পাওয়াতে এবং টাকা খরচ করাতে সত্যি সত্যি উদ্বাস্তুদের উপকার হচ্ছে কিনা সেইটেই বড় কথা। অটলের নাকি উপকার হবে বলছে। রুক্মিণীর স্বামীর জন্য টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, উপকার হয়নি।

কল্যাণবাবুদেরও একখানা দরখাস্ত দেওয়া আছে। কোলিয়ারীর জমকালো পরিকল্পনার জন্য এক লক্ষ টাকার আবেদন-পত্র। পাঠানোর পর অনেকগুলো মাস কেটে গিয়েছে। প্রাপ্তি-স্বীকারের সই-করা ফর্মটা ঘুরে এসেছে। কিন্তু তারপর এতদিনের মধ্যে অফিস থেকে এটুকুনও জানায়নি যে দরখাস্ত তারা পেয়েছে এবং বিবেচনা করছে। ইতিমধ্যে দরখাস্তে স্বাক্ষরকারীদের একজন নিখোঁজ। একজন দিন চালাতে না পেরে গিয়েছে কটকে তার চাকুরে ভাইয়ের কাছে। অমলেন্দু যেমন বলেছিল, সত্যিই যদি এ-দরখাস্তের মঞ্জুরী আসতে দু'তিন বছর লাগে তো তখন ক'জন অবশিষ্ট থাকবে তার ফল ভোগ করার জন্য?

ইস্কুলের কাজের ভীড়ে আর ব্যস্ততায় দরখাস্তের কথাটা আজকাল আর বড় একটা মনে পড়ে না। ইস্কুলের কাজটা প্রায় পরিকল্পনা-মত অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনয়ন পাওয়া যাবে দু'চার দিনের মধ্যেই। চাঁদা খুব খারাপ ওঠেনি। কোন একজন অনেক টাকা দেয়নি, অনেকে অল্প অল্প করে দিয়েছে। দু'তিন খানা নতুন কোঠা তোলা হচ্ছে। আসবাব কেনা হয়েছে। সব কাজ চাঁদার টাকায় হবে না, ধার হবে। তবে ভরসা আছে, সরকারী গ্র্যান্ট পাওয়া গেলে ধার শোধ হবে সহজেই। দরখাস্তটার কথা কল্যাণবাবু ভুলেই গিয়েছেন একরকম। এক-আধ সময় মনে পড়ে, যখন বাড়িতে বসে থাকেন একা। যেমন আজকে।

ওদিকে দেবুটা মুখ বুজে বই নাড়াচাড়া করছে। টুনটুন এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। ও-ঘরে সুনন্দা আর মনোরমা যন্ত্রের মত কাজ করে চলেছে।

একটা গোটা-সংসার এতটুকু জায়গার মধ্যে, তবু কোন শব্দ নেই। এ-বাড়িতে এমনি হয়েছে আজকাল। এত ডিসিপ্লিন যে, দম আটকে আসে। কেউ কারও মুখের দিকে তাকায় না। খুব দরকার না হলে কেউ কথা বলে না যেন প্লাটফর্মে রেলগাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে কতকগুলো অচেনা লোক! সুনন্দা নাকি বলেছে: ভূতের-বাড়িতে মন টেঁকে না বলেই বিয়ে করছি। শচীন তবু মানুষ। কলাগাছ হলেও আপত্তি ছিল না।

সুনন্দার কথাটা মিথ্যে এই জন্যে যে, সে নিজেও ভূত হয়ে গিয়েছে। ভূতের কাছে ভূতদের সংসর্গ খারাপ লাগার কথা নয়।

ভূতুড়ে বাড়ি বলেই দরখাস্ত-ভূতটার কথা মনে পড়ে বাড়িতে বসে থাকলে। দরখাস্তের জবাবে যদি কিছুও সাড়া পাওয়া যেত, তবে হয়তো মনোরমা একবার হাসতেন; এ-বাড়ির লোকেরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচত!

বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকেন না কল্যাণবাবু। ইস্কুলের কাজ কি এত বেশী? না, তবে দরকার হলে কাজ সৃষ্টি করে নেওয়া যায়। তবু ফাঁক পেলেই মনটা হু-হু করে। মনে হয়, অনেক মানুষের মধ্যেও কল্যাণবাবু একা। একা মানুষের যে কী-ভীষণ একা-একা লাগে!

মনোরমা একবার এ-ঘরে এলেন, একটু পরে আবার বেরিয়ে গেলেন। সারাটা গতিপথ কল্যাণবাবু দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলেন। শুধু একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা হিসাবে,—মানুষ মানুষের দিকে তাকায় কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। না, তাকায় না। মানুষের পূর্বপুরুষেরা হয়তো তাকাতো। কিন্তু মানুষ এখন আর-একটু সভ্য হয়েছে।

চা-টা পরিবেশন হয়ে গেলেই কল্যাণবাবু বেরুবার সিগ্‌ন্যাল ডাউন পান। চা আজকাল আর চেয়ে নেন না তিনি। সেটা সভ্যতা-বিরোধী। আজকে কি ওরা অনেক দেরী করবে চা দিতে?

দরজার উপর কার যেন ছায়া পড়ল।

সুধা? তোমার কথাই ভাবছিলাম। (মিছে কথা!) দেখে নিও, শতবর্ষ পরমায়ু হবে তোমার।

সুধা ঘরে ঢুকে মেঝের উপর বসল।

কিন্তু আমার কথা কী করে ভাবলেন কল্যাণদা? আমি তো আপনার কাছে সচরাচর আসি না।

শুনেছিলাম, লোনের জন্য তুমি একটা দরখাস্ত দিয়েছ। প্রসঙ্গটা ভাবছিলাম। তাই তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তারপর কিছু খবর-টবর পেলে?—সুধার কথা ভাবার একটা শোভন কৈফিয়ৎ দিতে পেরে কল্যাণবাবু আশ্বস্ত হলেন।

সুধা হেসে বলল: সে-ব্যাপার অনেককাল আগেই চুকে গেছে। কিছু দেবে না বলে দিয়েছে।

তোমার খবরটা তবে ভালো নয়?

সুধা জবাবে কিছু বলল না। কিছু বলছে না কেন সুধা? বলবে বলে এসেছে, অথচ না বলে বসে বসে কী ভাবছে?

অগত্যা কল্যাণবাবুই আবার জিজ্ঞেস করলেন: কি বলে লোন চেয়েছিলে সুধা?

একটা সেলাইয়ের কলের জন্য।

কী আশ্চয্যি! সামান্য একটা সেলাই-কলের জন্য? আমাকে বলনি কেন? আমার ঘরে তো পড়ে আছে একটা কল—কেউ ব্যবহার করে না।

জানতাম না তো কল্যাণদা। তা'ছাড়া মনোরমাদির তো লাগে।

এই সময়ে সুনন্দা ঘরে ঢুকে দু'কাপ চা রেখে চলে গেল। নিঃশব্দে এল, তেমনি নিঃশব্দে ফিরল। সুধা এসেছে বলে একটু হেসেও সম্বর্ধনা জানালো না।

চায়ের রং-টা লাল—দুধ-বিহীন চা। তাকিয়ে দেখতে দেখতে কল্যাণবাবুর অনেক কাল আগের একটা দিন মনে পড়ে গেল। দুধ-বিহীন চা সেদিন প্রকাণ্ড দুর্ঘটনা বলে মনে হয়েছিল—বাড়িতে কুরুক্ষেত্র লেগে গিয়েছিল। আর আজ? আজ বলে নয়। এমন চা আজকাল মাঝে মাঝেই আসে। তেমন গুরুতর ব্যাপার বলে মনে হয় না কারও কাছে।

র' চা তোমার খেতে কষ্ট হবে, না সুধা?

তবু তো এ চা। অনেক মাস যে আমি একেবারে চা না খেয়ে ছিলাম কল্যাণদা।

এ-কথার পৃষ্ঠে অনেক প্রশ্ন করা চলত। কল্যাণবাবু করলেন না। করতেই ইচ্ছে হল না। কিন্তু এর পর আর কী নিয়ে কথা বলা যায়?

কল্যাণদা, একটা কথা জানব বলে এসেছিলাম।

তবু ভাল। সুধা শেষ পর্যন্ত কাজের কথায় এসেছে

কি কথা?

অমলেন্দুবাবু—আপনার বন্ধু—তাঁর ঠিকানাটা আমার দরকার। তিনি একটা কাজের কথা বলেছিলেন। তাই খোঁজ নেব।

অমলেন্দুর ঠিকানা—তা দেব। কাজ চাও তো আমার কাছে বলছ না কেন? জানুয়ারীতে আমাদের ইস্কুলে যে জনকয়েক মাষ্টার-মাষ্টারণী নেওয়া হবে।

সুধা একটু ভাবল, তাড়াতাড়ি জবাব দিল না। পরে বলল:

সে তো খুব ভাল হয় কল্যাণদা। কত কাছাকাছি হবে। সবচেয়ে বড় কথা আপনি আছেন ওখানে। তবে অমলেন্দুবাবুর ঠিকানা না হয় থাক।

থাকবে কেন? দেখা করায় দোষ কি?

এতক্ষণে সুধার অস্তিত্বটা একটু সহজ হয়ে এল কল্যাণবাবুর কাছে। তাঁর কাছে যারা আসবে, কোন প্রয়োজন নিয়ে আসবে। প্রয়োজন মিটে গেলে ফিরে যাবে। যতক্ষণ ঘরে থাকবেন ব্যবস্থাটা এইরকম হলেই ভাল হয়। ঘরে কেউ এলে সবসময় ভয় হয়, এই বুঝি টের পেয়ে গেল, এ-বাড়ির লোকগুলো মানুষের মত, তবু ঠিক মানুষ নয়। হয়তো কান পেতে শুনবে এ-বাড়ির লোকদের সেই অত্যাশ্চর্য ঠাণ্ডা লড়াই, যা বাতাসে শব্দের ঢেউ না তুলেও শব্দময়।

হয়তো অনেকে টের পেয়েছে। না হলে লোক এত কম আসে কেন ঘরে? এ-ঘরে তো আড্ডা জমে না আজকাল! পটল ভুলেও আসে না। ছেলের দল কদাচিৎ-ই আসে। সুধীনবাবু বা কালীকান্তবাবু আসেন শুধু ডেকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে। বাড়ির লোকের কোন দরকার পড়লে তিন পা হেঁটে এ-ঘরে না এসে সিকি মাইল হেঁটে ইস্কুলে যায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, ঘরের আবহাওয়ার স্মৃতি মন থেকে মুছে গেলে, কল্যাণবাবু তখন স্বাভাবিক মানুষ। সেই চিরকালের সদা-হাস্যময় কল্যাণবাবু। এ-রকমটা আগে ছিল না—দু'জন কল্যাণবাবু কখনো ছিলেন না। কল্যাণবাবু চিরকাল এক ও অকৃত্রিম বলেই মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন।

পঁচিশ

পিণ্টুবাবুর কারখানার কাজটা ছেড়ে দিয়েছে সুধা। অনেক ভেবে-চিন্তে নয়। ভাল-মন্দ সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিক্তি পোড়েনে মাপ-জোঁক করে নয়, মাপ নির্ভুল হল কি না তার জন্য দুর্ভাবনায় রাতের ঘুম নষ্ট করে তো নয়ই। হঠাৎ এবার দেড়দিন থানায় আটকা থাকার জন্য দু'দিন কামাই গেল। পরদিন শরীরটা কেমন ম্যাজ্-ম্যাজ্ করল বলে গেল না। তৃতীয় দিন যাওয়ার আগে ভাবল, একেবারেই আর না গেলে কেমন হয় কারখানার দিকে।

সুধার সিদ্ধান্তগুলো এমনি আকস্মিকই হয়। পিণ্টুবাবুর কারখানায় একদিন যোগ দিয়েছিল এমনি হঠাৎ। তেমনি হঠাৎ আজ ছেড়ে দিয়েছে। সিদ্ধান্তগুলো মনের মধ্যে আর-কেউ যেন তৈরী করে দেয়। সুধার শুধু মনে হয়, এইটে করি। তারপর থেকে তাই করতে শুরু করে দেয়।

সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস সম্পর্কে বা ভদ্রলোক-তন্ত্রের উচ্ছেদ সম্পর্কে অমলেন্দুবাবু সেদিন যা বলেছিলেন, তা যে সুধার মনে খুব কাজ করেছিল তা নয়। তবে অমলেন্দুবাবুর সঙ্গে আলোচনায় একটা উপকার হয়েছিল। সুধা বুঝেছিল, তার অত মরীয়া হওয়ার সত্যিই তেমন কোন কারণ নেই। পিণ্টুবাবুর কারখানায় ছাড়াও মেয়েদের কাজ জোটে। এক সময় চেষ্টা করেও জোটেনি বলে কোনদিনই যে জুটবে না এমন কোন কথা নেই। আর, দু'চার মাস দেরি এখন সুধার সইবে।

সুধাকে দেখে অমলেন্দুবাবু শুধু তাকিয়েই রইলেন। যেন ভূত দেখছেন।

খুবই অবাক হয়েছেন, না?

খুব। একেবারে কল্পনাই করতে পারিনি। বরং রাজ্যপালের স্ত্রী এলেও কম অবাক হতাম।

কিন্তু এই দেখুন আমার গা ছুঁয়ে। আমি সত্যিই ভূত নই।

সুধা হাত বাড়িয়ে দিল। অমলেন্দুবাবু সত্যিই ছুঁয়ে দেখলেন। সুধা খিল-খিল করে হেসে উঠল।

মিনিট পাঁচ-ছয় আলাপ হল তাঁদের মধ্যে। সেই উল-বোনা শেখানোর কাজটায় আর একটা মেয়ে ঢুকেছে। তবে অমলেন্দুবাবু কাজ দিতে পারেন সুধাকে। তাকে দিনকয়েক খাটতে হবে সেজন্য বুঝিয়ে বললেন, কী করতে হবে।

অমলেন্দুবাবু কিছুতেই ছাড়লেন না। দ্বারিকের একটা শাখা দোকানে নিয়ে গেলেন সুধাকে। আড়াই টাকা দামের দু'খানা প্লেটের অর্ডার দিলেন।

কেন অত খরচ করছেন মিছিমিছি? আপনার রোজগার কি খুবই বেশী?

আপনি ঠিক বুঝছেন না সুধা দেবী। আপনি যে আমার জীবনের কত বড় সাফল্য, কল্পনাও করতে পারবেন না।

কল্যাণবাবুদের ইস্কুলের মনোনয়ন পাওয়া উপলক্ষে সেদিন একটা সভা ছিল। বাড়ির অনেক মেয়ে গেল বলে লজ্জায় পড়ে মনোরমাকেও যেতে হল।

সভায় গিয়ে মনোরমা বুঝলেন, এ-অঞ্চলের লোকেরা কল্যাণবাবুকে কতখানি শ্রদ্ধা করে আর ভালবাসে। ভদ্রলোক কিছুতেই সভাপতি হবেন না। সবাই জোর করে ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। একের পর এক বক্তা বক্তৃতা করতে উঠে বিশেষ করে কল্যাণবাবুর নাম উল্লেখ করলেন। ইস্কুলের ইতিহাসে কল্যাণবাবুর নাম নাকি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। একটা পচা ঘুনে-ধরা ইস্কুল যে ম্যাট্রিক-ইস্কুলে পরিণত হবে কোনদিন, কেউ নাকি ভাবতেও পারেনি। এত বড় কৃতিত্বের গৌরব নাকি একমাত্র কল্যাণবাবুর।

পুরনো অভিজ্ঞ বক্তা কল্যাণবাবু ভালই বক্তৃতা দিলেন। বললেন, তিনি উপলক্ষ মাত্র। পুরনো বাসিন্দারা যেন কিছু মনে না করেন, ইস্কুলটা আসলে গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তুদের উৎসাহে। তাদের কাছে ইস্কুল শুধু ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেখার আখড়া নয়, তাদের কাছে ইস্কুল একটা জীবন-যাত্রা', ইস্কুল একটা আন্দোলন! যেমন প্রতিদিনের ডাল-ভাত খাওয়া, যেমন বিশেষদিনের স্বাধীনতা-যুদ্ধ।

ছেলেরা গান গাইল, তারপর মেয়েরা গান গাইল। তারপর দুই দল এক সঙ্গে জন-গণ-মন গাইল। সভা শেষ হতেই ছোট বড় মাঝারি নানা সাইজের ছেলের দল মঞ্চে উঠে কল্যাণবাবুকে ঘিরে দাঁড়াল। কিচির-মিচির লাগিয়ে দিল পাখীর মত। এমন না হলে শিক্ষক? ছাত্রের দল যার কাছে মন উজাড় করে দিতে না পারে সে আবার শিক্ষক কিসের?

স্বামীর এমন প্রতিষ্ঠা দেখে যে-কোন সাধ্বী রমণীর গর্ব বোধ করা উচিত। অনেক ঠকেছেন, অনেক হোঁচট খেয়েছেন কল্যাণবাবু। অবশেষে তাঁর নিজের জায়গাটি খুঁজে পেয়েছেন যেন আজ। কল্যাণবাবুর এ-আসন স্থায়ী হোক। কল্যাণবাবুর হাতের আলোক-বর্তিকা ছড়িয়ে পড়ুক দূরে দূরে। এ ছাড়া আর কী কামনা থাকতে পারে মনোরমার?

কল্যাণবাবু বেদী থেকে নেমে ভদ্রলোকদের মধ্যে মিশে গেলেন। বেদীর সামনেই মেয়েরা বসেছে; কল্যাণবাবু যাওয়ার আগে একবার তাকালেন। না, মনোরমার উপর তাঁর চোখ পড়েনি। এত সব মেয়েরা আর পুরুষেরা এসেছে তাঁর কথা শুনতে; রাজাবাহাদুরের বাগানবাড়ির একটা তুচ্ছ বৌয়ের উপর চোখ না পড়াই তো স্বাভাবিক। কল্যাণবাবুর কত কাজ! আজকে তাঁদের নতুন কমিটি তৈরী হবে। এ-বছর অস্থায়ী কমিটি নিজেরা-নিজেরা সভ্য মনোনয়ন করে ঠিক করবেন। যথাসময়ে নির্বাচন হয়ে স্থায়ী কমিটি হবে।

কত সমস্যা ছিল তাঁর সংসারে! মনোরমা একদিন ভেবেছিলেন, সমস্যার চাপে তাঁর মেরুদণ্ড বুঝি ভেঙেই যাবে। আজকে আশ্চর্যভাবে সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেছে। কারও চেষ্টায় নয়, আপনা-আপনি। কল্যাণবাবু সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সংসারে যত অভাবই থাক, নির্দিষ্ট আয়ের নিয়মানুবর্তিতা এসেছে। সুনন্দা নিজের বিয়ে নিজেই ঠিক করে নিয়েছে। শচীনকে হাজত থেকে ছাড়িয়ে তার বাবা তাকে সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা হোক, শচীন একদিন ফিরে আসবে, আর সেদিন তার বিয়েও হবে সুনন্দার সঙ্গে।

সংসার সম্পর্কে আর কিছু ভাববার নেই, আর কিছু করবার নেই। ছুটি, এবার ছুটি মিলেছে মনোরমার। শুধু একটু ভাবনা আছে। তাঁর বেকারত্ব ঘুচবে কি করে? কল্যাণবাবু কাজ নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন, মনোরমাকে

দিয়ে তাঁর আর কোন দরকার নেই। মনোরমাকে বাদ দিয়েই, মনোরমাকে জীবন থেকে একদম মুছে দিয়েই, কল্যাণবাবু দিব্বি চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কল্যাণবাবুর সংসারকে ছেড়ে দিয়ে মনোরমার দিন কাটবে কী নিয়ে?

এখনো বসে আছেন মনোরমাদি? মাঠ যে প্রায় খালি হয়ে গিয়েছে।

মনোরমা চমকে উঠে তাকালেন। সুধা কথা বলছে। মাঠ সত্যিই খালি, শুধু তাঁদের বাড়ির জন-কতক মেয়ে রয়েছে সুধার সঙ্গে।

লজ্জিত হয়ে বললেন: তাইতো! সত্যিই, কী ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম আমি! চল সুধা, বাড়ি যাই।

এত ভাবেন কেন মনোরমাদি? ভাবলেই ভাবনা বাড়ে। না, এখুনি বাড়ি যাবেন কি? চলুন, পার্কের ও-ধারটায় গিয়ে বসি, কথা আছে আপনার সঙ্গে।

পার্কের একটা নির্জন প্রান্তে তাঁরা গিয়ে বসলেন। সুধা ছাড়া এই দলে রয়েছেন কাদম্বিনী, মাধুরী, অমিতা, লীলা, মনোরমবাবুর মেয়েরা, ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় দশ-বারো জন। নাম-করা কুনো মেয়ে তটিনী যেচে এই দলে যোগ দিয়েছিল বলে সবাই অবাক হয়েছিল। তারা আরও অবাক হত যদি শুনত, তটিনী বাড়ি থেকে খবর পায়নি, পেয়েছিল বাইরে থেকে; যোগ দিয়েছে সেখানকারই নির্দেশে।

আমরা একটা মহিলা-সমিতি করছি মনোরমাদি,—সুধা বলল: আপনাকেও যোগ দিতে হবে। শখের সমিতি নয়, পয়সা রোজগারের।

সুধা বেশীটা বলল, অন্যান্য মেয়েরা খানিকটা-খানিকটা বলল। সেলাইয়ের কাজ আর উল-বোনার কাজ নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু হবে। সেলাইয়ের কাজটা বাইরে থেকে অর্ডার যোগাড় করে করা হবে। যাঁদের মেশিন আছে, তাঁরা করতে পারবেন। যাঁরা সেলাই জানেন না, তাঁদের শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে! উলের কাজটা চলবে সরকারের সাহায্যে। সরকার বিনা-মূল্যে উল দেবেন! তৈরী-কাজ মজুরী দিয়ে নিয়ে নেবেন। উলের কাজ শেখানোর জন্য একজন শিক্ষিকাকে সরকার মাইনে দেবেন। কারও আপত্তি না থাকলে সুধা কাজটা নিতে পারে। বাইরের ঘোরা-ফেরার কাজের জন্য অল্প মাইনের একজন পুরুষও থাকবে। সে কাজের জন্য পটল তো আছেই!

রোজগার হয়তো খুব সামান্য হবে। তবু তা নিজের শ্রমের রোজগা[র]
কারও দয়ার দান নয়। এমনি একটা সুযোগের জন্যই যেন এতদিন প্রতীক্ষা
করছিলেন মনোরমা। একটা কাজের খুবই দরকার তাঁর। না হলে মনে
হচ্ছে, তিনি যেন সংসারে ফালতু লোক, অনাবশ্যক। জোর করে তাড়িয়ে
দেওয়া যায় না, ঘরে রেখেও অনর্থক খরচান্ত, বোঝা-বৃদ্ধি। নিজে[র]
খরচটাও যদি সংসারকে দিতে পারেন, সে যে কত বড় আরাম!

অনেকদিন আগে পটল বলেছিল, ভাল করে সেলাই শিখতে ইস্কুলে গিয়ে।
বৌ-মানুষ, লোক জানাজানি করে কাজ শিখবেন রোজগারের জন্য, ভাবতেও
লজ্জা বোধ হয়েছিল। সে-সব চিন্তা আজ মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকিও মারে
না। অনেকে মিলে কাজ করলে জানাজানি হওয়ার ভয় কোথায়?

পুরুষের বোকামীর জন্য ধমকাতে পারব, নিজে কাজ করব না, এ কেমন
যুক্তি? নিজে হাতে-কলমে করে দেখিয়ে দিতে হবে, তবে তো গর্বিত
পুরুষের প্রমাণ মিলবে, ধমকানোর যোগ্যতা আছে মেয়েদের।

বাইরে গিয়ে বিড়ি খেয়ে এসেছেন ধরণীবাবু। ঘরে এসে তাড়াতাড়ি
একটা পান মুখে দিলেন। ঘরে আজকাল পানও থাকে।

রান্না-বান্না শেষ করে সুধা বসে আছে। কপালে-মুখে ঘাম লেগে আছে
এখনও। কয়েক গোছা ওড়া-চুল মুখের ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

সুধাকে আজকাল যেন আরও কচি-কচি দেখায়। একটু যেন চপল,
এমন কি, একটু চটুলও যেন মনে হয়! সাত ঘাটের জল-খাওয়া মেয়ের বয়স
কমছে দিন দিন!

এমন করে রান্না আর ক'দিন চলবে?

যখন চলবে না, একবেলা খেয়েও থাকতে পারি, জান তো?

ধরণীবাবু মনে মনে বললেন: তোর খাওয়ার কথা কে ভাবছে ছুরমুখী?
আমি তো এক বেলা খেয়ে থাকতে পারি না।

ট্যুশানিটা ছেড়ে দিয়েছো নাকি? ছাড়িয়ে দিল বুঝি?

ঈশ! ছাড়িয়ে দেয় অমন কাজ আমি করি? ভাল লাগল না তাই
ছেড়ে দিলাম।

রোজগার করে বলে ধরণীবাবু আজকাল সাবধানে কথা বলেন সুধার

সঙ্গে। তা বলে রাগ কি আর হয় না? নিজে অক্ষম বলে ফোঁস মনসাকে মন্ত্র পড়ে তুষ্ট রাখতে হয়!

যদি কিছু মনে না করো তবে একটা কথা বলি সুধা। কাজটা তুমি না ছেড়ে দিলেই ভাল করতে।

সুধা হাই তুলল। আড়মোড়া ভেঙে গায়ের আলসেমী দূর করল। এ-সব কথার জবাব দেওয়া নিতান্তই যেন অবান্তর তার কাছে।

ভাল লাগলো না বলে ছেড়ে দিলাম। আবার আর একটা জুটিয়ে নেব।

তা বই কি! গুণবতী মেয়ের জন্য রাস্তায় কাজ গড়াগড়ি যাচ্ছে!

কাজ জুটলে তারপর ছেড়ে দিলেই পারতে। ট্যুশানি তো অন্য কাজের সঙ্গেও করা যায়।

এত জেরা করলে আমি জবাব দিতে পারব না বাবু!—সুধা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল।

খানিক পরে ঠাণ্ডা হয়ে বলল: এক কাজে আর কতদিন থাকব বল? নতুন কাজে যাব, কত নতুন মানুষের সঙ্গে জানা-চেনা হবে। কত নতুন জিনিস জানব, শিখব! তবে তো বুঝতে পারব আমি বেঁচে আছি।

ধরণীবাবু অবাক হয়ে সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষে বললেন: কেন, এতকাল আমরা কি বেঁচে ছিলাম না?

এ আর-একরকমের বাঁচা। ভাগ্যিস পাকিস্তান হয়েছিল! আর ঘর বাঁধতে এসেছিলাম কলকাতা। তাই-তো চিনলাম এই আশ্চর্য কলকাতাকে, রাজপথ, অট্টালিকা, বস্তী। বাড়ি-গাড়ির মালিককে দেখলাম, ডাস্টবিনে খাবার খুঁজে বেড়ায় যে-মানুষ তাকেও দেখলাম।

বুঝতে পারছি না তোমার কথা।

কী করে যে বোঝাই তোমাকে? আচ্ছা ধর, কাঁকর-ভরা পাহাড়ের বন্ধ্যা মাটি ছিল পড়ে হাজার বছর ধরে। ঘাসের একটা শীষও জন্মায় না সেখানে। তারপর একদিন হঠাৎ এল উর্বরতা। শুরু হল মাটির ইতিহাস। ঘাস জন্মালো, তারপর আগাছা জন্মালো, তারপর বড় বড় মহীরুহে ছেয়ে গেল সারা অঞ্চলটা। তারপর এল মানুষ। গাছ কাটা পড়ল। সবুজ ধানের শীষে হেসে উঠল রুক্ষ পার্বত্য উপত্যকা।

আমি কি তোমার ছাত্রী যে এ সব বলছ!

অথবা ধরো, একটা গ্রাম। বছরের পর বছর ধরে সেখানে রাজত্ব করছে আঁসশ্যাওড়ার বন আর খানা ডোবা। মানুষ জন্মেছে, বিয়ে করেছে, আবার মরেছে সেই একই জায়গায়। তারপর হঠাৎ একদিন এল প্রাণের জোয়ার। ডোবা বুজল, জঙ্গল কাটা পড়ল, শেয়াল গেল পালিয়ে, উঠল গড়ে আকাশের মত উঁচু ইমারত আর প্রসারিত পীচের রাস্তা। শুরু হল শহর কলকাতার ইতিহাস।

ধরণীবাবু যেন বোকা হয়ে গেছেন! এসব কী বলছে সুধা?

অথবা ধরো, একটি মেয়ে। চব্বিশ বছর বয়স অবধি সে জানত বাঁচা মানে মার খাওয়া। সে জানত যেখানে তার জন্ম, তার বাপের ভিটে, তার থেকে একশো গজ দূরে তার মরণ হবে তার স্বামীর ভিটেতে। সেই একশো গজই হল তার পৃথিবীর সীমানা। তারপর একদিন সে চলতে শুরু করল। কত আলোকিত পথ, কত অন্ধকারের পঙ্কিল গলি সে পার হলো তার ইয়ত্তা নেই। মাত্র একটা বছর কাটল। পঁচিশ বছর বয়সে সে-মেয়েটা জানতে পারল, সে-ও মানুষ, তারও ইতিহাস আছে। তার পৃথিবী মাত্র একশো গজের নয়। এত বড় দিগন্তবিশারী সে পৃথিবী যে সারা জীবন ছুটে-ছুটেও তার শেষ মিলবে না।

ঘামের আড়ালে হাসি-হাসি মুখখানা চকচক্ করছে। কথা বলতে গিয়ে মাথা নড়েছিল, অগোছালো চুল ভেঙে গড়িয়ে পড়েছে কাঁধের উপর, মুখ বেয়ে গলার উপর। কী অলস, অনায়স ভঙ্গিতে মেয়েটা বসে আছে! আঁচলটা জড়ো হয়ে কোলের উপর পড়ে আছে,—তুলে দেওয়ার দিকে মন নেই। ছড়ানো পায়ের উরু অবধি শাড়ীর প্রান্তে উঠে গিয়েছে, অত তুচ্ছ জিনিসের দিকে নজর কে দেয়? সে ভাবছে, স্বপ্ন দেখছে।

এ-সুধাকে ধরণীবাবু চেনেন না। যে-সুধা রাতদিন ঝগড়া করত, অপমান করত, সে বজ্জাত পাজী মেয়েটাকে নিয়ে তবু ঘর করা চলত। এ-সুধা অনেক দূরের পথে কুড়িয়ে পাওয়া। ধরণীবাবুর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে এ ঢ্যাঙা মেয়েটার মাথা। একে নিয়ে কি ঘর করা চলবে?

পিণ্টুবাবুর কারখানায় নিয়মিত সময়ে যাওয়ার তাগিদ না থাকলেও রোজ বিকেলে সুধা একবার করে বাড়ি থেকে বার হয়। বিনা প্রয়োজনে, বিনা উদ্দেশ্যে, রাস্তা দিয়ে শুধু চলার আনন্দে চলতে সুধার বেশ লাগে। কোন রকম

প্রয়োজন বা অন্ততপক্ষে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া বাড়ি থেকে না বেরুনোটা বাঙালী ঘরের বৌ-ঝিদের প্রায় অভ্যাসের সামিল। দিনের মধ্যে কিছুটা সময় অন্তত বাড়ি থেকে না বেরুতে পারলে বাঙালী পুরুষের যেমন মন কেমন-কেমন করে, শরীরেরও জড়তাটা কাটতে চায় না। এই অভ্যেসটাকে সুধা যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে সে-জন্য মনে মনে সে একটু আত্মপ্রসাদ বোধ না করে পারে না।

নিছক খেয়ালের বশে খানিকক্ষণ বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান একটা ঘটনা মাত্র। মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতার পথে যতগুলো প্রতিবন্ধক আছে, তার সবগুলোই সুধা একে একে অতিক্রম করেছে। একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করতে পারে বৈকি সুধা। সে সঙ্কল্প করেছিল যে অনিচ্ছুক ভাসুরের কৃপা, দয়া ও ঘৃণার বস্তু হয়েও অক্ষম অসহায় বাঙালী বধূর মত সে তাঁর পা ধরে অন্ন-ভিক্ষা করবে না। সে সঙ্কল্প করেছিল, শুধু নিজের নয়, যে-স্বামীকে সে ভালবাসে না, তারও আত্মসংস্থানের ব্যবস্থা সে করবে। কেবল নিজের জিদের পরিতৃপ্তির জন্য। আর এক গরীবের ঘরের স্বল্প-শিক্ষিত বৌয়ের এই উদ্ধত অহঙ্কার দেখে সারা সমাজ তর্জনী উঁচিয়ে তাড়া করে এসেছিল। সমাজ শাসিয়ে বলেছিল, সুধা, তোমাকে প্রবল পুরুষের পায়ের তলায় মাথা নীচু করে নাক ঘষতে হবে ; আর নয়তো না খেয়ে মরার বিধিলিপিকে মেনে নিতে হবে। সুধা অবশ্য আত্মসমর্পণ করার চেয়ে বরং বিকল্প ব্যবস্থাটা মেনে নিতে রাজী ছিল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী জয় সে অর্জন করেছে। নিজের হাতে চিঠি লিখে সে ভাসুরের সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে ; নিজেও সে না খেয়ে থাকেনি, আর অক্ষম স্বামীকেও সে ক্ষুধার অন্ন, রোগের ওষুধ জুগিয়ে যেতে পেরেছে। এ কী কম আনন্দের কথা! নারীকে জব্দ করার জন্য সমাজ আবহমান কাল থেকে অনেক নীতি আর অনুশাসনের বেড়া তৈরী করে রেখেছিল। সুধা অনায়াসে সেই মিথ্যার প্রাচীরকে পা দিয়ে মাড়িয়ে গিয়েছে। সুধা আজ জয়ী। এতবড় শক্তিশালী আর পর-পীড়ন-কামী সমাজের বিরুদ্ধে সামান্য একটা মেয়ে আজ জিতে গিয়েছে। একটু আত্মসন্তুষ্টি সুধা বোধ করতে পারে বৈকি!

বেশ লাগে একা একা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে। শীতের বিকেলে রাস্তায় রাস্তায় ছায়া নেমেছে। শুধু বড় বড় বাড়ির চিলেকোঠায় এখনো সূর্যের

আলো চিক্‌চিক্‌ করছে। সেই চিলেকোঠার ছাদে দু'চারটে রোঁয়া-ওঠা কাক বসে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে ভাবছে, সন্ধ্যা হতে এখনো দেরী আছে। পাখীদের যে-সব ছোট ছোট দল এখুনি বাড়ির পথে রওয়ানা দিয়েছে, তাদের দিকে তাকিয়ে কাকগুলো কা কা করে সে কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বর কী মিষ্টি! অন্য যে-কোন পাখী থেকে কাক বেশী সময় ডাকে। ডেকে ডেকে সে প্রমাণ করে যে, তার ডাক মানুষ যত অপছন্দই করুক, কারও সাধ্য নেই সে ডাকার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবে।

খাল-পুলের কাছে এসে রাস্তাটা ক্রমশঃ উঠে গিয়েছে উঁচুর দিকে, তারপর আবার ক্রমশঃ নেমে গিয়েছে। এই ওঠা-নামাটা দেখতে সুধার খুব ভাল লাগে। কেমন একটা পাহাড়-পাহাড় ভাব আছে জায়গাটার। ওপাশ থেকে যখন গাড়িগুলো আসে, প্রথমে শুধু মাথাটা দেখা যায়। পরে আস্তে আস্তে যখন সেটা পুলের উপরে উঠে পড়ে, তখন তার চাকাগুলোও দেখা যায়। ঢালু পথে গাড়ির ওঠা-নামার দৃশ্যটার মধ্যেও কেমন একটা নতুনত্ব আছে।

মাণিকতলার বাজার অবধি সুধা সাধারণতঃ পায়ে হেঁটেই যায়। পিন্টুবাবুর কারখানায় সময়মত পৌঁছানোর যখন তাগিদ ছিল, তখন অবশ্য ওই সামান্য পথটার জন্যেও সে বাসে উঠত। এখন আর সে প্রয়োজন নেই। রাস্তা দিয়ে মাথা উঁচু করে হাঁটতে হাঁটতে সে অনুভব করে, আর যে-সব স্বাধীন স্বাবলম্বী মানুষেরা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে সেও তাদের একজন।

পিন্টুবাবুর কারখানায় সুধা আর ফিরে যাবে না। যাবে না বলে একবার যখন ঠিক করেছে, তখন সে সিদ্ধান্ত নড়-চড় হওয়া সহজ নয়। তা ছাড়া, দরকারই বা কি? সমাজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য একদিন পিন্টুবাবুকে খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। জয়-লাভ সম্পূর্ণ হয়েছে; পিন্টুবাবুর মত একটা নীচ স্বার্থপর বাজে লোককে এড়িয়ে গেলেও সুধার এখন কোন অসুবিধে নেই।

তবু আশ্চর্য! প্রায় রোজই সে অন্যমনস্কভাবে মাণিকতলার মোড়ে এসে ধর্মতলায় যাওয়ার ট্রামে বা বাসে চেপে বসে। চাকরির জায়গার কাছাকাছি জায়গায় সে অভ্যাসবশে নেমে পড়ে। তারপর সে সচেতন হয়ে রাস্তা দিয়ে সোজা এগিয়ে যায়।

কিন্তু সুধা নিজের মনে ভাল করেই অনুভব করে, সেই ঘৃণিত কারখানার

দিকে যাওয়ার একটা তীব্র অবুঝ ইচ্ছা এই সময় তার মনকে পেয়ে বসেছে। পা যেন আপনা থেকেই এগিয়ে যেতে চায় সেদিকে। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। যে জীবন-যাত্রাটাকে সে কোনক্রমেই কোনদিনই সহজ স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, যেখানে সারাক্ষণের অস্তিত্ব একটা নির্ভেজাল যন্ত্রণাদায়ক অস্তিত্ব, সেখানকার সেই অস্বস্তি যন্ত্রণার প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণের কোন কারণ সুধা বুঝতে পারে না। প্রতি মুহূর্তে মনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে সেখানে। বর্বর পুরুষের অন্যায় অসঙ্গত ব্যবহারের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য সব সময় মনকে সক্রিয় রাখতে হয়েছে। আর সেই সঙ্গে মনের মধ্যে এ বোধটুকুও ছিল যে, খদ্দের ধরে না রাখতে পারলে কেউ তাকে বসিয়ে বসিয়ে টাকা দেবে না। সেই অমানুষিক মানসিক দ্ব.ন্দ্বর মধ্যেও ছিল একটা উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার লোভ তাকে আজও টানে পিণ্টুবাবুর কারখানার দিকে।

কিন্তু নিজের তৈরী অভ্যেসের জালে সুধা নিজেকে জড়িয়ে পড়তে দেবে না। সে একটা বন্ধন কেটে বেরিয়ে এসেছে আর একটা বন্ধনের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য নয়। তা ছাড়া, সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে আবার ফিরে গেলে তো সেই আশ্চর্য মানুষটার কাছে মুখ দেখানো যাবে না। যে মানুষটা তার পেশার খবর জেনেও তাকে ঘৃণা করে নি, নীতি আর ধর্মের দোহাই দিয়ে তাকে ধিক্কার দেয় নি, সুধার চোখে সে আশ্চর্য বৈ কি! সুধাকে সে ভিন্ন পেশায় যেতে বলেছে কোন নৈতিক কারণে নয়। ভিন্ন পেশায় তার মন আরও সহজ স্ফূর্তি লাভ করবে বলে।

অদ্ভুত দীপ্তিমান সেই মানুষটি। তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি, শাণিত তার ভাষা। সুধার উপর দয়া করে সে আপন মহানুভবত্ব প্রমাণ করতে চায়নি। সুধা মেয়েটির মধ্যে কিছু মনুষ্যত্বের উপাদান আছে বলে বোধ করে সে সুধাকে আরও ভাল একটা পথ দেখাতে চেয়েছে শুধু। জীবনে আর কখনো আর কোথাও সুধা এরকমের মানুষ দেখেনি।

পিণ্টুবাবুর কারখানায় ফিরে যাওয়ার পথে যদি আর কোন বাধা না-ও থাকে, তবু শুধু এই মানুষটার জন্যই সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না। মানুষটা সেদিন খুশী হয়ে বলেছে, সুধা তার জীবনের এক অভাবনীয় সার্থকতা। সুধা কি সে কথার মূল্যকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে?

বাড়ির পথে ফিরতে ফিরতে সুধা অনুভব করে এক অপরিচিত অনাস্বাদিত-পূর্ব রসে তার অন্তর সিক্ত হয়ে উঠেছে। এই আশ্চর্য মনুষ্য জীবন তাকে শুধু নিষ্ঠুরভাবে আঘাতই দেয়নি; তাকে অন্য কিছুও দিয়েছে। সে আবিষ্কার করেছে, শুধু ঘৃণা, শুধু ক্রোধই মানুষের কাজের একমাত্র প্রেরণা নয়। শুধু নিজের অহঙ্কারের দুর্গে আত্ম-সমাহিত হয়ে থাকাতেই জীবনের চরম সার্থকতা নয়। সে দেখেছে, মানুষ শুধুই যে ঘৃণার পাত্র তা নয়। মানুষকে করুণাও করা যায়; এমন কি ভালও বাসা যায়।

অবশেষে সেদিন পিণ্টুবাবু সুধাকে পাকড়াও করতে পারলেন। বেলা দশটার সময় সুধা বাজার করে ফিরছিল। সাধারণতঃ ধরণীবাবুই বাজারে যান; আজ সে নিজে গিয়েছিল শখ করে। বাগানবাড়ির গেটের সামনে পিণ্টুবাবুকে পায়চারী করতে দেখে সে চমকে উঠল।

পিণ্টুবাবুর উপস্থিতিটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। একটি জালে আটকানো মেয়ে জাল কেটে বেরিয়ে গিয়েছে, অথচ পিণ্টুবাবু একবার তার খোঁজ নেবেন না,—এমন ঘটনা ঘটলে সেটা সুধার যোগ্যতা প্রমাণ করে না। তবু পিণ্টুবাবুকে দেখে সুধার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। একটা তীব্র যন্ত্রণার আতঙ্ক, একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণের ইশারা ঘিরে রয়েছে পিণ্টুবাবুর রহস্যজনক চরিত্রটাকে।

সুধা দাঁড়িয়ে রইল; পিণ্টুবাবুই এগিয়ে এলেন হাসতে হাসতে।

যা হোক, তবু তোমার সঙ্গে এদ্দিনে দেখা হল সুধা। এর আগে তিন চার দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গিয়েছি।

ভিতরে গিয়ে খোঁজ করলেই পারতেন। আমি তো বাড়িতেই থাকি।

পিণ্টুবাবু দাঁত দিয়ে জিভ্ কাটলেন!

আমাকে সে রকম লোক পাওনি সুধা। ভিতরে গিয়ে কথা বললে যদি কেউ কিছু সন্দেহ করে? তা হলে তো তোমার দারুণ ক্ষতি। আমার দ্বারা কোনদিন কোন মেয়ের একফোঁটা ক্ষতি হয় নি বা হবে না।

তা তো বটেই। তা কী মনে করে এসেছেন?

বাঃ! কদ্দিন ধরে তুমি আসছ না,—খবর না নিয়ে পারি? তা যাচ্ছ না কেন? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না অসুখ-বিসুখ হয়েছিল।

না, অসুখ-বিসুখ নয়। যাব না বলেই যাই নি। ভেবে দেখলাম, ঐ

ঘরটায় যদি আর কোন মেয়েকে বসান, তবে আপনার অনেক বেশী রোজগার হবে। আপনি যেমন কারও ক্ষতি করতে চান না, আমিই বা আপনার ক্ষতি করতে চাইব কেন?

পিণ্টুবাবু এ-কথায় যেন খুবই আহত হয়েছেন এমনি মুখভাব করে বললেন: ছি! ছি! আমাকে তুমি মুনাফাখোর বলে মনে করলে সুধা? আমি কি আমার লাভের জন্য এ কারবার করি? দু'চারটে অনাথা মেয়ে দুটো পয়সা রোজগার করে নিজের পায়ে দাঁড়াক—শুধু এইজন্যই কারবার দিয়েছি। তোমাদের আয়ের একটা অংশ নিই বটে; কিন্তু তা শুধু এস্টেব্লিশমেণ্ট খরচটা চালাবার জন্য।

বলতে হবে না। সব জানি। কিন্তু আমার আর যাওয়া সম্ভব নয় পিণ্টুবাবু।

সুধার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পিণ্টুবাবু বললেন: অন্য মাসাজ ক্লিনিকে অনেক লম্বা লম্বা লাভের ফিরিস্তি দেবে সুধা, কিন্তু পিণ্টুবাবুর মত এত সুযোগ সুবিধা আর কেউ দিতে পারবে না। এ তুমি ধ্রুব সত্য বলে জেনে রেখ।

রাখলাম। কিন্তু কী করে জানলেন আমি অন্য জায়গায় কাজ নিয়েছি?

আমি সব জানতে পারি। এমন কি, কোথায় কাজ করছো তা পর্যন্ত বলে দিতে পারি।

থাক। না-ই বললেন।

না বলছ যখন, বলব না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। যেখানে কাজ করছ সেখানে যখন পোষাবে না, তখন বিনা দ্বিধায় আমার কাছে ফিরে এস। একটা কথা মনে রাখবে—পিণ্টুবাবুর কারখানার দরজা সব সময় খোলা থাকে। অনেক দিন পরেও যদি যাও—কেউ এ-কথা জিজ্ঞেস করবে না, কেন কাজ ছেড়ে গিয়েছিলে।

আমার একথা মনে থাকবে পিণ্টুবাবু। কিন্তু এখন যাই। আমরা যে কথা বলছি, তা অনেকে লক্ষ্য করছে।

প্রকাণ্ড গেটটা দিয়ে ভিতরে ঢুকে সুধা হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল। পিণ্টুবাবু তাঁর বিড়াল-চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলেন।

ছাব্বিশ

ইংরাজী কবিতা পড়াতে গিয়ে শেলী আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। প্রসঙ্গত কল্যাণবাবু ফরাসী বিপ্লব নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। শুধু এই কবিদের বোঝার জন্যই নয়, আধুনিক যুগের রাজনীতিকে বুঝতে হলেও ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। এই কথাগুলো বুঝিয়ে বলছিলেন কল্যাণবাবু।

যে ঘরটায় কল্যাণবাবু ক্লাস নিচ্ছিলেন এটা নতুন-তৈরী ঘরগুলোর একটা। আসবাব-পত্রগুলো নতুন। জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে নতুন-চুণকাম-করা শাদা উজ্জ্বল দেওয়ালের গায়ে। দশ বছর আগে এই ইস্কুলের কাজ প্রথম শুরু হওয়ার পর থেকে আজ এই প্রথম আবার ইস্কুলে সূর্যের আলো ঢুকল কল্যাণবাবুর হাতের স্পর্শ পেয়ে।

একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল: স্যার, ফরাসী বিপ্লবের কথা আমাদের জেনে লাভ কি? ও সব কি পরীক্ষায় আসবে?

কল্যাণবাবু বললেন: না আসুক। পরীক্ষায় পাস করার জন্য পড়া নয়। পড়া জানার জন্য।

আগে পরীক্ষায় পাস করে নিই স্যার। জানার জন্য পড়ার পরে অনেক সময় পাব।

ঐ ধরনের মামুলী পড়ার জন্য আমার কাছে খুব সুবিধে হবে না।—কল্যাণবাবু রেগে বললেন।

কিন্তু ক্লাসের অন্যান্য ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণবাবুর মনে হ'ল অধিকাংশ ছেলেই ঐ ছেলেটির মতেরই সমর্থক।

পরে যখন কল্যাণবাবু লাইব্রেরী ঘরে বসেছিলেন, ঐ ক্লাসের অন্য একটি ছেলে তাঁর কাছে এল।

আপনি কি রাগ করেছেন মাষ্টারমশাই?—ছেলেটি সাবধানে প্রশ্ন করল।

এটা তো রাগের কথা নয় সলিল, ভাববার কথা।

না স্যার, আপনি রাগ করবেন না। চম্পকটার স্বভাবই ঐ রকম। আপনার পড়ানো আমাদের খুব ভাল লাগে।

কল্যাণবাবু বুঝলেন, তাঁকে খুশী করাই ছেলেটির উদ্দেশ্য। আসলে চম্পকের মতের সঙ্গে তার মতের যে খুব পার্থক্য আছে, তা নয়। হাসলেন একটু।

চম্পকের মত যদি তোমার মত নয়, তবে ক্লাসে প্রতিবাদ জানালে না কেন?

এ কথার জবাব দিতে না পেরে ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কল্যাণবাবু আবার হেসে বললেন: আচ্ছা, যাও।

স্কুলের গঠনমূলক কাজের সময় যে উৎসাহ ছিল, তা ক্রমশঃ ঝিমিয়ে আসছে। আসলে এতদিন যে-কাজটা হয়েছে তাকে গঠন-মূলক কাজও বলা চলে না। বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদি শিক্ষার আনুসঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? আসলে শিক্ষার ক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজের বিশেষ সুযোগ আছে বলে কল্যাণবাবু বোধ করতে পারছেন না। সম্পূর্ণ নতুন একটা শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে বোধ করি কল্যাণবাবুর সুবিধা হত। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। ডক্টর আর্নল্ডের মতো মনের খুশিমত ইস্কুল-গঠনের আমন্ত্রণ তো তিনি পাননি। একটা অত্যন্ত পুরনো পচা ঘুনে-ধরা পরীক্ষা-পাসের যন্ত্রকে কোনরকমে একটু মেরামত করে চালু করে দেওয়ার ভার তিনি পেয়েছেন। এর মধ্যে যা কিছু নতুনত্ব করতে যাবেন, তার সার্থকতার একমাত্র নিরিখ হল পরীক্ষা-পাসের ব্যাপারে তা কতটুকু সাহায্য করবে।

এ-কাজ তো কল্যাণবাবুর নয়। যন্ত্রের মতো বাঁধা-ধরা কাজ করার জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্য লোকের তো অভাব নেই। কেরাণীর দেশে কেরাণীর কাজ করার লোক অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু সেই গতানুগতিক কাজের চেয়ে যদি বেশী কিছু করতে হয়, যদি স্বাধীন ভারতের যোগ্য শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়, তবে তার পক্ষে একটা পাস করানোর যন্ত্র বড় সংকীর্ণ ক্ষেত্র। শিক্ষা-সংস্কারের কাজ শুরু করতে হলে আগে দরকার সমাজ-সংস্কার। শিক্ষা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন না আনতে পারলে শিক্ষা-সংস্কার শুধু একটি আমলাতান্ত্রিক বিপ্লবে পর্যবসিত

হবে। শিক্ষাব্রতী কল্যাণবাবু না হয়ে যদি সমাজ-সেবক কল্যাণবাবু হতেন, তবে বোধ করি তিনি আর একটু তৃপ্তি লাভ করতে পারতেন।

কল্যাণবাবু মনে মনে হাসলেন। তাঁর আশে-পাশের লোকদের ধারণা, এই শিক্ষার কাজটা বিশেষভাবে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু এ-কাজের তিনি একেবারেই অনুপযোগী এই তাঁর নিজের ধারণা। তাই ভেবেই হাসলেন।

স্কুল-সংস্কারের জন্য কিছু কিছু কাজ যে তিনি করেন নি তা নয়। স্কুল-ম্যাগাজিন, কমনরুম, বিতর্ক-সভা প্রভৃতি কিছু কিছু নতুন জিনিসের আমদানী তিনি যে না-করেছেন এমন নয়। সবাই এ সব কাজ সমর্থন করেছেন, কিন্তু কোন কার্যকরী উৎসাহ পাননি কোন মহল থেকে। এমন কি, ছাত্ররাও এই বাড়তি দায়িত্বগুলো গ্রহণ করেছে খুব যে খুশী হয়ে তা নয়। নেহাৎ কল্যাণবাবুর ব্যক্তিত্ব ছিল পিছনে তাই তারা পিছিয়ে যেতে পারে নি। কিন্তু তাদের কাছে এ-কাজও যেন পাঠ্য-তালিকার বোঝার উপর নতুন করে শাকের আঁটি যোগ করা। কেন যে এত যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে ছেলেদের মন কল্যাণবাবু বুঝে উঠতে পারেন না।

সবচেয়ে কল্যাণবাবু বাধা পেয়েছেন আবশ্যিক শরীর-চর্চা প্রবর্তন করতে গিয়ে। আশ্চর্য এই যে, মনের শিক্ষা আর শরীরের শিক্ষাটা যে সমানই দরকারী, এ-বিষয়ে এ-দেশে কারোই চেতনা নেই। তাঁর আদেশ-নামা শুনে ছাত্ররা অসন্তুষ্ট হল, অভিভাবকরা ক্রুদ্ধ হলেন। অনেকে জানতে চাইলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য এত বেশী দরদ দেখানোর অর্থ কি? এমনকি, কমিটির সভ্যরা পর্যন্ত মোলায়েম করে বললেন : ধীরে চলুন কল্যাণবাবু। অত জোরে স্টিম রোলার চালালে সবাই কি চাপ সইতে পারবে?

তারপর একদিন নতুন হেডমাষ্টার এসে উপস্থিত হলেন। ঝানু পাকা একজন প্রবীণ এম্-এ-বি-টি-কে মন্মথবাবু অনেক বিবেচনা করেই পাঠিয়েছেন। মাইনে একটু বেশীই দিতে হবে। কিন্তু স্কুল-তরণীকে নির্বিঘ্নে ঝড়-বাদলার মধ্যে দিয়ে তীরে নিয়ে যেতে তার জুড়ি নাকি মিলবে না।

কৌতূহলের সঙ্গে প্রাণেশবাবু, অর্থাৎ নতুন হেডমাষ্টার মশাই ঘুরে ফিরে সারা স্কুল-বাড়ি দেখলেন। যে-দিকেই তাকান, কল্যাণবাবুর হাতের ছাপ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়! ক্লাসে পড়ানোর রুটিন থেকে ঘর সাজানোতে পর্যন্ত।

দেখলেন, রুটিনের মধ্যে নিয়মিত পড়ার বিষয়গুলো ছাড়াও বাইরের বই পড়ার জন্য সময় নির্দেশ করা আছে। প্রাণেশবাবু একটু হাসলেন।

আপনার খুব উৎসাহ আছে কল্যাণবাবু!

কথাগুলোর উদ্দেশ্য কল্যাণবাবুকে প্রশংসা করা কিনা বোঝা খুব দুষ্কর। ঝানু পাকা মানুষের হাসি বা কথা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য নয়।

কিন্তু ছাত্রদের পত্রিকাটা নেড়ে চেড়ে প্রাণেশবাবু আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না।

এ কী করেছেন কল্যাণবাবু? ছাত্রদের লেখা হুবহু ছেপে দিয়েছেন যে? ছাপানো পত্রিকা, পাঁচ জায়গায় যাবে—তারা সব কী ভাববে বলুন তো?

কল্যাণবাবু প্রথমে কথাটা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন প্রাণেশবাবুর মুখের দিকে। পরে তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বলেছিলেন: ছাত্রদের ম্যাগাজিনে ছাত্রদের লেখাই ছাপা হবে—সেটাই তো সকলে পছন্দ করবে। নয় কি?

প্রাণেশবাবু অজ্ঞ মানুষকে প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গীতে হেসেছিলেন। বলেছিলেন: যাক্, যা করেছেন করেছেন। ভবিষ্যতে সামলে নিতে হবে। মনে রাখবেন, ইস্কুলের ম্যাগাজিনে ছাত্রদের নামে লেখা বের হয়, কিন্তু তাদের নিজেদের লেখা বের হয় না।

মোটের উপর কিন্তু প্রাণেশবাবু কল্যাণবাবুর প্রবর্তিত বিধি-ব্যবস্থায় খুব বেশী পরিবর্তন আনার চেষ্টা করলেন না। তবু কল্যাণবাবুর আর তাঁর চিন্তার মধ্যে যে তফাৎ অনেক সেটা কারও বুঝতে বাকী রইল না। বাইরে খুব বেশী মতান্তর না ঘটলেও একটা চিন্তা কল্যাণবাবুর মনে খচ খচ করে বিঁধতে লাগল। শত হলেও এই সনদ-পাওয়া ভদ্রলোকটি এ ইস্কুলের সর্বময় কর্তা, আর তিনি এখন থেকে একজন সাধারণ শিক্ষক মাত্র। ইস্কুলের সর্বময় পরিচালক হলেও তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একটি আদর্শ-শিক্ষা-কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তবু তিনি চেষ্টা করতে পারতেন। একজন সাধারণ শিক্ষক হিসাবে সেই চেষ্টাটাই কি সম্ভব?

আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে নিছক পেটের দায়ে মাস্টারী করাই কি তাঁর বিধিলিপি? সেই কলম-না-পিষে-মুখবাজী করার কেরাণীগিরি?

মোটের উপর ভাবষ্যতের গর্ভে কল্যাণবাবুর জন্য কী যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তা খুব অনিশ্চিত। শুধু একটা জিনিস নিশ্চিত বলে বোধ হচ্ছে। ভবিষ্যতে ভাল হবে বলে আশা করলে নিরাশ হওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা আছে।

আজ কল্যাণবাবুর বোধ হচ্ছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর একটু বিবেচনা করে তাঁর এ-কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। প্রাণেশবাবু হয়তো খুব খারাপ লোক না-ও হতে পারেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে ভয়ের কথা হল, তাঁকে চেনা যাচ্ছে না। আর তাঁর অবস্থাটা সবচেয়ে খারাপ এই জন্য যে, সেই লোকটার অনুগ্রহের উপর তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ভর করছে।

কল্যাণবাবুর আশঙ্কার কথা শুনে সুধীনবাবু বললেন: চিন্তা করে দেখা উচিত ছিল কমিটি তৈরী করার আগেই।

হরেনবাবু বললেন: কিচ্ছু ভাববেন না, কল্যাণবাবু। আপনার প্রতিপত্তি এতটুকু হ্রাস যাতে না পায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। হেডমাস্টার একা কি করবে! এটা তো আমাদের পাড়ার ইস্কুল।

ছুটির পরেও কল্যাণবাবু ইস্কুলে বসে। নতুন কমিটির প্রথম মীটিং আজকে। অন্যতম সভ্য হিসাবে তাঁকে উপস্থিত থাকতে হবে।

ইস্কুলের লাইব্রেরী-ঘরে মীটিং-এর আয়োজন হয়েছে। নতুন টেবিল-চেয়ার-আলমারীতে ঘরখানা ঝলমল করছে। দেওয়ালের গায়ে ভারতবর্ষের একখানা মানচিত্র। তা ছাড়া রয়েছে গান্ধীজী আর রবীন্দ্রনাথের দু'খানা তৈল-চিত্র। আর কোন ছবি রাখতে দেননি কল্যাণবাবু। অনেক ছবির ভীড়ে ঘরের বাতাস ভারী করা তিনি পছন্দ করেন না। আলমারীগুলিতে অল্প কয়েকখানা মাত্র বই। তবে কল্যাণবাবুর ভরসা আছে, একদিন এটা একটা উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরীতে পরিণত হবে।

আগে মনে সামান্য সংশয় ছিল। মীটিং-এর প্রাক-মুহূর্তে মনটা বেশ খুঁৎ খুঁৎ করছে। নতুন কমিটিতে মন্মথবাবুর মনোনীত সদস্যরাই দলে ভারী। মন্মথবাবুর উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল; তাঁর ইচ্ছায় কোন বাধা দেন নি কল্যাণবাবু। সুধীনবাবু অবশ্য গজর গজর করেছিলেন—উকিল মানুষ তো! এখন কল্যাণবাবুরও মনে হচ্ছে, তুরুপের তাস হাতে রাখাই ভাল। বিশেষ করে, নতুন হেডমাস্টারটি আসা অবধি মনে আশঙ্কা বেড়েছে। ইনি আবার মন্মথবাবুর ভাগনে!

সভ্যরা একে একে সবাই উপস্থিত হয়েছেন। এক মন্মথবাবু ছাড়া। প্রেসিডেন্ট মন্মথবাবু যে অনেক দেরী করে আসবেন তা একরকম জানাই। সেক্রেটারী হরেনবাবু প্রস্তাব করলেন: সভার কাজ তবে শুরু করা যাক।

প্রাণেশবাবুও উপস্থিত ছিলেন। পদাধিকার বলে তিনিও সভ্য। প্রেসিডেণ্টের অনুপস্থিতিতে তিনিই চেয়ারে বসে মীটিং-এর কাজ শুরু করলেন।

টেবিলের উপর রক্ষিত কাগজপত্রগুলো নিরীক্ষণ করতে প্রাণেশবাবু অনেকটা সময় নিলেন। কাজের লোকের কায়দাই আলাদা। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে দাঁড়িয়ে উঠে শুরু করলেন: ভদ্রমহোদয়গণ, সুযোগ্য স্থায়ী-সভাপতির অনুপস্থিতির দরুণ আমার মত অক্ষমের উপর সভা-পরিচালনার ভার পড়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, পক্ষপাতহীন সততার সঙ্গে আমি যেন এ গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারি। ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের সভার কর্মসূচীতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান লাভ করেছে। আপনাদের কাছে একান্ত প্রার্থনা, কোনরকম সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধির বশীভূত না হয়ে, ন্যায়ের ভিত্তিতে, বিষয়গুলির উপর আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন বোধ হয়, সভাপতি হিসাবে কর্মসূচীতে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে গুরুত্ব অনুযায়ী যে-কোন একটিকে আমি অগ্রাধিকার দিতে পারি। সেই ন্যস্ত-ক্ষমতা অনুযায়ী কর্মসূচীর তিন নম্বর বিষয়টিকেই আমি প্রথম আলোচনার জন্য উপস্থিত করছি। বিষয়টি ইস্কুলে শ্রীযুত কল্যাণ সেনের অবস্থান সম্পর্কিত। এ-বিষয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে প্রথমে আমি একটু বলি। ইস্কুলে প্রথম প্রবেশ করেই এখানকার হাল চাল দেখে আমার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করেছিল। এখানে গ্রাজুয়েট শিক্ষক আছেন। অথচ তা সত্ত্বেও, কাগজে-পত্রে না হলেও, কার্যতঃ একজন ম্যাট্রিকুলেট যে কী করে ইস্কুলের প্রধান-শিক্ষকের দায়িত্বগুলি এতদিন পর্যন্ত পালন করে এসেছেন, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। অধিকন্তু যখন জানতে পারলাম, এই ম্যাট্রিকুলেটটি উঁচু ক্লাসের, এমন কি, নাইন-টেনের ইংরাজী বাংলা প্রভৃতি ভাষা-শিক্ষার ক্লাশগুলি পর্যন্ত গ্রহণ করছেন, তখন আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে মনে মনে ভগবানকে প্রশ্ন করলাম, হে করুণাময়,

তোমার পৃথিবীতে ক্ষমতার অধিকারীরা প্রতিদিন যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে চলেছেন, তার কি কোন প্রতিকার নেই? যে দেশের গ্রাজুয়েট-শিক্ষকগণ মাসান্তে ষাট-সত্তর টাকার বেশী মাহিনা পান না সেখানে একজন ম্যাট্রিকুলেট পুরোপুরি শতমুদ্রা অনায়াসে বিনা দ্বিধায় পকেটস্থ করছেন! হে ধরণীতল, এখনো তোমার গাত্রাবরণে ফাটল সৃষ্টি হয়নি? ধন্য তোমার ধৈর্য! ভদ্রমহোদয়গণ, এই কদর্য পক্ষপাতিত্বের যদি অবিলম্বে প্রতিকার না করেন, তবে আমি গ্রাজুয়েট-শিক্ষকগণকে বনবাস-ব্রত গ্রহণের জন্য সকাতর আহ্বান জানাব!

যেন একটা বড় মাঠে বক্তৃতা করছেন প্রাণেশবাবু। গলা কাঁপিয়ে, গলা কখনো উঁচুতে তুলে, কখনো খাদে নামিয়ে, এমন বক্তৃতা দিলেন যে ছোট্ট ঘরটা গম্‌গম্ করতে লাগল!

হরেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন: আপনার হয়েছে প্রাণেশবাবু? তবে এবার আমি একটু বলতে চাই। এই ইস্কুলের সঙ্গে আমি এর জন্মের সঙ্গে জড়িত। সে আজ দশ বৎসরের কথা। কিন্তু কল্যাণবাবু যোগ দিয়ে মাত্র পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে স্কুলের যা উন্নতি-সাধন করেছেন, তা বিস্ময়কর। সমস্ত এলাকায় একটা সাড়া জাগিয়েছে ইস্কুলটা। অনেক কিছুই এ ইস্কুলে নতুন। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা, লাইব্রেরী, ম্যাগাজিন, ডিবেটিং সোসাইটি, স্পোর্টস্, জিম্‌ন্যাসিয়াম্, কত আর বলব। এ-সবই কল্যাণবাবুর পরিশ্রমের ফল। কমিটির সব সভ্যই এখানে উপস্থিত আছেন। এ-স্কুল কল্যাণবাবুর কীর্তির স্বাক্ষর, এ-কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন?

প্রাণেশবাবুর ফ্যাকাসে মুখের পাতলা ঠোঁটের প্রান্তে এক টুকরো হাসি সাপের মত লিক্‌লিক্ করে মিলিয়ে গেল।

ধীরে, বন্ধু, ধীরে! আমি জানি, মদীয় মাতুল, স্বনামধন্য দেশনেতা শ্রীযুত মন্মথনাথ এই স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর স্কুলটির আশাতীত উন্নতি সাধন হয়েছে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের অধীনে কল্যাণবাবু এবং আরও অনেকে কর্মী হিসাবে যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তা স্মরণ করছি। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, নেতার মর্যাদা নেতার মত, কর্মীর মর্যাদা কর্মীর মত। একজনের অর্জিত মর্যাদা কি আর একজনে কখনও বর্তায়?

অন্য পাড়ার একজন স্বল্প-পরিচিত সভ্য চেঁচিয়ে উঠলেন: হিয়ার! হিয়ার!

সুধীনবাবু এতক্ষণ রাগে ফুলছিলেন। এবারে সুযোগ পেয়ে বললেন: প্রাণেশবাবু, আপনি এখানে নতুন এসেছেন। কার কতখানি মূল্য বা সম্মান, জানেন না। আর একটু শালীনতা বজায় রেখে আপনার কথা বলা উচিত ছিল। কল্যাণবাবুকে জানেন না বলেই বারবার ম্যাট্রিকুলেট বলে তাঁর অসম্মান করেছেন। পাসের মাপকাঠি দিয়ে কি সব লোকের যোগ্যতার বিচার করা চলে? কল্যাণবাবুর যে ব্যাপক পড়াশুনা আছে, যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আছে, একজন সামান্য গ্রাজুয়েট তাঁর কাছে কি? কল্যাণবাবু ম্যাট্রিকুলেট বটে, কিন্তু তিনি অবিসংবাদীভাবে এই ইস্কুলের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। ছাত্রদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানবেন সে-কথা। অন্ততঃ এটুকু তো আপনার ভাবা উচিত ছিল, আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, বা, এখানে অনুপস্থিত যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তি এই ইস্কুলের পৃষ্ঠপোষক—আমরা সবাই মিলে যে একজন ম্যাট্রিকুলেটকে উঁচু-পিঁড়ি দিয়েছি তার নিগূঢ় কারণ আছে! আর শুনুন, কল্যাণবাবু শুধু এ-স্কুলের নন, এ-পাড়ার সর্বজন-স্বীকৃত নেতা।

আবার উঠতে হল প্রাণেশবাবুকে: সভ্যগণ, আমি আপনাদের দয়া করে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি, এটা একটি পবিত্র শিক্ষণ-কেন্দ্র, নির্বোধের আস্ফালনের স্থান নয়। অপ্রাপ্তবুদ্ধি ছাত্র এবং শিক্ষণ-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ উকিল-ডাক্তারের সাক্ষ্য নিয়ে আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করব না। এ-নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এবারে আমি আলোচনা প্রস্তাবাকারে উপস্থিত করছি: যদিও বর্তমান কমিটির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, স্কুলে ম্যাট্রিকুলেট শিক্ষককে স্থান দেওয়া স্কুলের শিক্ষার মানের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া অনভিপ্রেত, তবু কমিটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে শ্রীকল্যাণ সেনকে স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষকতার জন্য বহাল রাখিবেন। তাঁহার বেতন ম্যাট্রিকুলেটদের গ্রেড অনুযায়ী মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা ধার্য হইল।

মিনিটখানেক সভাকক্ষ একেবারে চুপচাপ। তারপর সুধীনবাবু রাগে অন্ধ হয়ে ভোটাভুটি দাবী করলেন, যদিও নেপথ্য থেকে কল্যাণবাবু বিরত হওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করছিলেন। সভাপতির কাস্টিং ভোটে প্রস্তাব পাস হয়ে গেল!

আর কোন বাক্যালাপ হলো না সভায়। কল্যাণবাবু ঘস্ ঘস্ করে কম্পিত হাতে পদত্যাগ-পত্র লিখে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর সমর্থকরাও বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার সময় দরজার বরাবর দাঁড়িয়ে হঠাৎ পিছন ফিরে হরেনবাবু ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বললেন :

তবে মহাশয়গণ, যাওয়ার আগে একটি কথা আপনাদের বলে যাই, এ-স্কুল আমার পাড়ার ইস্কুল। দশ বছর ধরে একে সযত্নে লালন-পালন করেছি। বাইরে থেকে উটকো লোক এসে দু'দিনের মধ্যে রাজা হয়ে বসে আমাদের উপর ছড়ি ঘোরাবে, এ-ব্যভিচার বেশী দিন চলবে না!

আর অক্ষমের সেই আস্ফালন শুনে আগন্তুক সভ্যের দল হেসে গড়িয়ে পড়তে চাইলেন।

রাস্তায় নেমে এসে সুধীনবাবুর সে কী রাগ! এই স্বভাব-কোমল শান্তিপ্রিয় মানুষটি যে এতখানি রাগতে পারেন তা কল্যাণবাবুর ধারণাই ছিল না। কল্যাণবাবুর কাঁধটা থাবা দিয়ে চেপে ধরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখ বিকৃত করে সুধীনবাবু বললেন: শুনুন কল্যাণবাবু। রাগুন আর যাই করুন, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এখানেই শেষ হয়ে গেল! আপনি আদর্শ পুরুষ, নমস্য ব্যক্তি, হিমালয়ে গিয়ে বাস করুন, কি বেহেস্তে গিয়ে বাস করুন, আপত্তি করব না। এই মাটির পৃথিবীতে আপনার মত সাধুপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আমাদের মত পাপী-তাপীদের কাজ নয়। পই-পই করে হাজারবার বলেছিলাম আপনাকে ঐ সব ক্ষমতাপ্রিয় বাস্তুঘুঘুদের সঙ্গে দরদস্তুরীর সময় হুঁশিয়ার হয়ে চলবেন! না, খুব ভাললোক, অমন দেবতুল্য লোক কি হয়? যান না এখন, দেবতার পাদোদক খেয়ে আসুন না একটু?.

কল্যাণবাবু অপ্রতিভ ভাবে হাসলেন। বলার ধরন দেখে হরেনবাবুও এত দুঃখেও হেসে ফেললেন। বললেন: অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন সুধীনবাবু। যা হয়ে গিয়েছে গিয়েছে। বেশী ভরসা দেব না, শুধু একটা কথা বলি, এটা আমাদের রাজ্য। আমরাই এখানকার কিং-মেকার, আবার আমরাই কিং-ব্রেকার। এক মাঘে শীত যায় না, বুঝেছেন ব্রাদার?

কল্যাণবাবু বেশ বুঝতে পারছিলেন, তাঁর দুই কান দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। শিরদাঁড়া বেয়ে কী যেন একটা তরল পদার্থ সির সির করে নেমে যাচ্ছে। তিনি কি ঘামছেন নাকি? জামার তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে

ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন, না শরীর শুকনো। যতক্ষণ সুধীনবাবুরা সঙ্গে রইলেন, মুখে একটু মৃদু হাসি বজায় রাখলেন কল্যাণবাবু। মুখে হাসির কয়েকটা রেখা ফুটিয়ে রাখার জন্য যে এত কষ্ট করতে হয় কে জানত? এত চেষ্টা করে যে হাসিটা বজায় রাখতে হচ্ছে সেটা তবু সত্যি-সত্যি হাসির মত দেখাচ্ছে কিনা কে জানে?

সুধীনবাবুরা চলে গেলে কল্যাণবাবু মুখের কষ্টকর হাসিটাকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে দিলেন। যে-গরমটা এতক্ষণ অবধি কর্ণ-মূলে সীমাবদ্ধ ছিল, এবারে তা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। প্রথমে মুখে-মাথায়, তারপর শরীর বেয়ে পা পর্যন্ত। তারপর কল্যাণবাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর পা কাঁপছে। ঠিক মাতালের মত তাঁর এখনকার অবস্থাটা।

বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে কল্যাণবাবু তাঁর শরীরের ক্রম-রূপান্তর লক্ষ্য করছিলেন। অশ্বিনীবাবুর 'ভক্তিযোগে' ক্রোধ সংবরণ করার জন্য কতকগুলো মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা আছে। অশ্বিনীবাবু তাঁর জীবনে ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন কি? সুভাষবাবু হয়েছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতিত্বে পদত্যাগ করার পর তিনি খুব প্রফুল্লভাবে সাংবাদিকদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সুভাষবাবু কি মন্ত্র জানতেন?

মনস্থির করে কিছু ভাববার চেষ্টা করছিলেন না কল্যাণবাবু। শুধু অনুভব করছিলেন, তাঁর মানস-আকাশে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত এক একটা চিন্তা খেলে যাচ্ছে। একটা জিনিস আজকে এইখানে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গেল। জনকল্যাণকর কোন প্রতিষ্ঠানে বা কাজে কল্যাণবাবুকে আর কেউ দেখবে না কোনদিন। কল্যাণবাবুর জীবন-চক্রের একটা পূর্ণ আবর্তন ঘটল এতদিনে। স্বাধীন সুখী ভারত গড়ে তোলার অসার অলীক কল্পনা আজ এই মুহূর্তে সিন্ধু-নীরে বিসর্জন দিলেন তিনি। যে আদর্শ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কাজ করে না, যে আদর্শ শুধু বক্তৃতা মঞ্চের শোভন বুলি হিসাবে বাতাসে সাময়িক শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে মাত্র, যে আদর্শ তাঁর জীবনে বার বার নিয়ে এসেছে বিপর্যয় আর অনাহার আর অসম্মান, এমন কী দায় পড়েছে কল্যাণবাবুর যে সেই রামধনুর মত মিথ্যা যৌবন স্বপ্নের পিছনে ছুটে চলবেন সারা জীবন ধরে? আজ থেকে আর এক কল্যাণবাবুকে দেখবে দেশের লোক। ভারতবর্ষের মাটিতে এক নতুন কালাপাহাড়ের জন্ম হল। তাঁর

এতে চিন্তার কি আছে? পুরোনো সহকর্মী আছে সন্তোষ। আছেন বন্ধুস্থানীয় ঝানু ব্যবসাদার বোস্ সাহেব। তাঁর এত অজস্র জানা-চেনা মানুষ ছড়িয়ে আছে উঁচু-মহলের চারদিকে যে সে-জন্য সবাই ঈর্ষান্বিত! পয়সা কী করে রোজগার করতে হয়, কী করে অজস্র অজস্র পয়সা, আরও আরও পয়সা, বন্যার ধারার মত গড়িয়ে গড়িয়ে এসে পাহাড়ের মত স্তূপ হয়ে যায়—তার রন্ধ্রপথ খুঁজে বের করা খুবই কি কঠিন তাঁর পক্ষে? তিনি জানেন না? তিনি কি বোকা? পার্মিট-কনট্রোল রেশনিং-এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট-কণ্টকিত এই সাম্প্রতিক অর্থনীতিতে কোথায় ঝড়ের মুখে বেলা-ভূমির বালুকণার মত অজস্র অজস্র পয়সা শিবনৃত্য শুরু করে দিয়েছে তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর কি তিনি রাখেন না? বিবেক নামক শিশুটিকে চোখের ইশারায় আড়ালে দাঁড়াতে বলে তিনি অনায়াসে খুঁজে বার করতে পারবেন সেই রন্ধ্রপথটি, যা বস্তি বাড়ি ভাড়াটে বাড়ি আপন জীর্ণতার লজ্জায় ধিক্কৃত বাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে সেই প্রাসাদপুরী কলকাতায়, যেখানে মানুষের হাড়ের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে পাহাড়ের মত বাড়িগুলো উদ্ধত গর্বে বিধাতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে।

তেমনি বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তাঁর মানস-ক্ষেত্রে সেই নিয়তি-রাক্ষসী, পৃথিবীতে তাঁর স্ত্রী বলে পরিচিত সেই নারীর মুখটি ভেসে উঠল। অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার! ভুল করেও একবারও নিষ্ফল হল না এই নারীর সামান্য মুখের কথা! ছোট্ট ঘরের সেই ক্ষীণাঙ্গী নারী যেন দিব্যচক্ষে কল্যাণবাবুর অবধারিত পরিণামকে দেখতে পায়। যতদিন যতবার সে কল্যাণবাবুর ভাবী পরাজয়ের কথা ঘোষণা করেছে, ততবারই কল্যাণবাবু পরাজিত হয়ে ম্লান মুখে ফিরে এসেছেন। আর সেই নারী-রাক্ষসী তাঁর ম্লান মুখ দেখে নিশ্চয়ই আড়ালে মুখ লুকিয়ে হেসে উঠেছে হিংস্র আনন্দে। না, মনোরমার কাছে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবেন না বর্তমানের কল্যাণবাবু। মুখ তুলে দাঁড়াবে বাড়ি-গাড়ি-অর্থ-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির মালিক সে আর এক কল্যাণবাবু।

কল্যাণবাবু অনেক রাত্রে বাড়িতে ফিরলেন। পরদিন খুব সকালে আবার বেরিয়ে গেলেন। আবার ফিরে এলেন কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বাজলে।

হাঁক দিয়ে বললেন: ভাত দিয়ে যাও। বেলা হয়ে গেছে।

মনোরমা রান্না-ঘর থেকে এ-ঘরে এলেন। ধীরে-সুস্থে, গুনে গুনে পা ফেলে-ফেলে।

এত তাড়া কিসের ?

কী বিপদ! তাড়া দেব না? লেট করে ইস্কুলে যাই দেখেছ কোনদিন?

বোসো একটু!—আশ্চর্য মমতাময় আর নরম শোনালো মনোরমার গলা।

কল্যাণবাবু বোকার মত বসলেন। একখানা হাতপাখা নিয়ে এসে মনোরমা বসলেন পাশে।

আমি তোমাকে খুব বকি, না? সেইজন্য আমার কাছে গোপন করতে চাও, না?

এ-বাড়িটাই যে খবরের কাগজ! তবু কল্যাণবাবু বোকার মত খবর গোপন করতে চেয়েছিলেন!

একটু থেমে মনোরমা আবার বললেন: এত মুশড়ে পড়ছো কেন? আমরা মরব না।

কল্যাণবাবু ভেবে নিয়ে বললেন: ঠিক মুশড়ে পড়ি নি মনোরমা, আমার রাগ হয়েছিল। কী যে রাগ হয়েছিল, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। চাকরি গেল বলে নয়,—চাকরি তো কতবারই গেল। কিন্তু মন্মথবাবুর মত অত বড় একজন নেতা যে এমন চালাকির খেলা দেখাবেন কোনদিন কল্পনাতেও আসে নি।

আমি জানি। জানতাম। তোমাকে তো আমি বলেছিলাম সে-কথা। মন্মথবাবু উপলক্ষ মাত্র। চাকরি তোমার যেতই। মন্মথবাবু ছেড়ে দিলেও উপর থেকে চাপ আসত। তুমি যে সেই কথাটাই ভুলে যাও, উপরতলার কয়েকটা লোক শুধু পাল্‌টিয়েছে। আসলে তো ইংরেজের তৈরী ব্যবস্থা, সেই দৃষ্টিভঙ্গীই রয়েছে। এখন নিরেট নিখাদ সোনার কোন দাম নেই। ওপরের মার্কাটা ঠিক থাকলে পেতলও সোনা বলে চলে যায়।

তুমি কি বলতে চাও য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রীর বাইরে কোন শিক্ষা থাকতে পারে না?

আছে। আমি জানি, আছে। আমি জানি, জেলখানায় বারো বছরে তুমি যত বই পড়েছিলে, বি-এ, এম-এ-রা তার বারো ভাগের এক ভাগও পড়ে না। কিন্তু তাদের মার্কা আছে। তার দামে বিকিয়ে যায়।

তোমার মার্কা নেই, তোমার দাম নেই। কিন্তু তা বলে ভাববার কিছু নেই। ধীরে-সুস্থে ভেবে-চিন্তে একটা কিছু করতে পারবেই তুমি। শুনেছ হয়তো, আমরা একটা সমিতি করেছি। পনের দিনে আমি দশ টাকার কাজ করেছি। হাত চললে হয়তো আরও কিছু বেশী করতে পারব। আমি জানি, প্রয়োজনের তুলনায় এ কিছু নয়। কিন্তু এইটুকুন যে আমার মনে কত ভরসা এনে দিয়েছে, তা বলে বোঝাতে পারব না। আগে নিজেকে অসহায় বলে জানতাম। তোমার মুখের দিকে চেয়েছিলাম! তুমি একটু বেসামাল হলেই চোখে অন্ধকার দেখতাম। সংসারের হা অতলস্পর্শী বলে মনে হত। প্রাণপণে তোমার উপর চাপ দিতাম। আর তুমিও আদর্শবাদ আর সংসারের চাপের মাঝখান দিয়ে ছুটতে গিয়ে বারবারই গর্তে পা দিয়েছে। এবার থেকে আর আমি তোমাকে তাড়া দেব না। জানি, আমার রোজগারে সংসার চলবে না। তবু একটা দিনও অন্তত সবাইকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাতে পারব। সেই একটা দিন তো তুমি সময় পাবে ধীরে সুস্থে ভাববার।

কল্যাণবাবু শুধু অবাক হয়ে মনোরমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইদানীং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটা এমন পর্যায়ে এসেছিলো যে, দেশটা ইউরোপের হলে তাঁরা দু'জন দু'কোর্টে গিয়ে ডাইভোর্সের দরখাস্ত পেশ করতেন! আর সামান্য আয়ের সম্ভাবনা আজ এমন কি পরিবর্তন আনল মনোরমার মধ্যে? কী করে আজ সে এমন অনায়াসে কল্যাণবাবুর মূর্খতাকে ক্ষমা করল?

অত দুঃখিত হ'য়ে বসে থেকো না।—মনোরমা আবার বলে চললেন: তুমি বারবার হেরে গিয়েছো, সে-দোষ তোমার নয়। পাঁচজনের ভাল আর তোমার ভাল মিলিয়ে কাজ করতে গিয়েছো। সেটা কোন অপরাধ নয়। অপরাধ তাদের, যারা সমাজটাকে এমন পর্যায়ে এনেছে যেখানে পাঁচজনের ভাল চাওয়াটা আজকে পাপের সামিল। আমি তো এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি। ভেবে দেখো, তুমিও সান্ত্বনা পাবে।

উঃ! এ যে কত বড় সান্ত্বনা! তাঁর জীবন-ব্যাপী পরাজয়ের জন্য শুধু তিনিই দায়ী নন! এ-পরাজয় শুধু তাঁরই বুদ্ধির ভুল নয়! শুধু তাঁরই বোকামীর মাশুল নয়!

কল্যাণবাবু বললেন: জানো, আমি কি ঠিক করছি? এবার আমি

পয়সা রোজগার করব। শুধু পয়সা। পার্মিট বার করব, আর বেচব। এক বছরে বড় লোক হই কিনা দেখে নিও!

মনোরমা হাসলেন: ও-সব বুদ্ধি ছাড়ো, ও তুমি পারবে না। মানুষের মনে বেপরোয়া লোভ না থাকলে শুধু কি সুযোগ পেলেই কাজে লাগানো যায়? রাজা-মহারাজা-জমিদারের বাচ্চারা এককালে বড় বড় দেশনেতা হয়েছিলেন। রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল মানুষ-ঠকানো পয়সার লোভ। জোয়ারের সময় বড় বড় আদর্শের পোষাকের আড়ালে চাপা পড়েছিল, জোয়ার সরে গেলে দাঁত বের করে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তাঁরা তাই সব রকম পারেন, কিন্তু মরা মানুষের পকেটে পয়সা থাকলেই সবাই কি তা হাতাড়িয়ে তুলতে পারে?

কথায়-কথায় খেয়াল ছিল না, কখন তাঁরা ঘন হয়ে বসেছেন। মায়ের দেরী দেখে সুনন্দা রান্নাঘরের দরজার গোড়া অবধি এসে দেখল, বাবার কাঁধের উপর মার মাথা। জিভে কামড় দিয়ে সুনন্দা সরে গেল চট করে।

সুধীনবাবু ও-ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন: কল্যাণবাবু আছেন? বাইরে এসে দেখে যান ছাত্রদের মিছিল। কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে বেরিয়ে এসেছে ছেলেরা!

ছাত্ররা এসেছে? তাঁর প্রিয় ছাত্ররা! নিশ্চয়ই এক্ষুনি যাবেন কল্যাণবাবু। কিন্তু এখন তো ধর্মঘট করা চলবে না! এখন তো বিদেশী সরকার নেই দেশে!

তাড়াতাড়ি করে উঠলেন কল্যাণবাবু। মনটা কত যে হাল্কা বোধ হচ্ছে! আবার যেন সেই আগের দিনের উদ্যম ফিরে এসেছে। যে-উদ্যম দিয়ে পর্বতকে স্থানচ্যুত করা যায়।

মাঝখান থেকে মুস্কিলে পড়ে গেল পটল। কল্যাণবাবু তাকে ইস্কুলের প্রাইমারী সেকসনে নিয়ে নেবেন এই ভরসায় মহিলা-সমিতির সাধা চাকরিটা সে দাতব্য করে দিয়েছিল জুড়ানকে। আর এদিকে কল্যাণবাবু নিজেই চাকরি খুইয়ে বসে রইলেন! কবি কি আর সাধে বলেছেন, অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়?

জুড়ান এসে বলল : চাকরিটা ফিরিয়ে নেবে পটলদা ? তোমার হক্কের চাকরি। নিজেদের মধ্যে ব্যাপার। কোন অসুবিধে হবে না।

পটল জুড়ানের পিঠে সজোরে একটা চড় বসিয়ে বলল : তোমার উদারতা দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম, বৎস। আশীর্বাদ করি, শোভনা স্ত্রী লাভ করিয়া পুত্র-কন্যাদির জনক হইয়া সুখী হও। তবে কি জানিস, এই পটল শর্মার সামান্য বিশ-পঁচিশ টাকায় কোন কাজ হবে না। দাঁড়া না, ছাখ না কী করি। এবার একটা কাপ্তান বধ করে দশ-বিশ হাজার নিয়ে ডুব মারব।

পটলের এ-সব চাল পুরোনো হয়ে গেছে। ওসব কথা আর ছেলেরা এখন বিশ্বাস করে না।

তটিনীর উপর একটা নতুন কাজের ভার পড়েছে দিনকতক হল! বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা বা অমনি কোন একটা সংস্থা উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু গুঁড়ো দুধ পাঠিয়েছে। কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সংগঠন ঠিক করেছে, গুঁড়ো দুধটা শিয়ালদা স্টেশনে যে সব উদ্বাস্তুরা আশ্রয়চ্যুত হয়ে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে বিলি করা হবে। এটা সহজেই অনুমান করা গিয়েছে যে জিনিসটা যেমন-ভাবে এসেছে, তেমনিভাবে উদ্বাস্তুদের হাতে দিলে তারা বিক্রি করে দেবে। তাতে গোয়ালাদের বা মিষ্টির দোকানদারদের কিছু ভেজাল দেওয়ার সুবিধে হবে বটে, কিন্তু যাদের জন্য জিনিসটা পাঠানো হয়েছে, তাদের কোন উপকারে লাগবে না। যারা প্রায় অর্ধাহারে বা অনাহারে আছে, তাদের দেহে দুধটা গেলে তবু কিছুটা পুষ্টি সরবরাহ হবে। কাজেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, দুধটা জ্বাল দিয়ে তরল অবস্থায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলি করা হবে এবং লক্ষ্য রাখা হবে যাতে দুধটা তারা সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেয়।

যে-সব স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকার উপর দুধ তৈরী করে বিলি করার ভার পড়েছে তাদের মধ্যে তটিনী একজন। আর একটি সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠান উদ্বাস্তুদের মধ্যে চিঁড়ে বিলি করছে। তারা এবং তটিনীরা একসাথে মিলে-মিশে কাজ করছে।

প্রথম যেদিন তটিনী শিয়ালদা দেখতে এসেছিল সেদিন তার কী যে খারাপ লেগেছিল! মানুষ যে কখনও এমন অবস্থায় পড়তে পারে তা যেন ভাবা যায় না! রাজাবাহাদুরের বাগানবাড়িতে বা অন্যত্র যে সব উদ্বাস্তুদের তটিনী দেখেছে তারা খুব দুঃস্থ অবস্থায় আছে। তাদের ছেঁড়া ময়লা পোষাক, তাদের ক্ষীণ শুকনো চেহারা, মুখের গভীর নৈরাশ্য আর দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তার ছাপ দেখেই তাদের চেনা যায়। তাদের মুখের ভাষা না শুনলেও রাস্তার ভীড়ের মধ্যে থেকে তাদের উদ্বাস্তু বলে বেছে নেওয়া যায়। কিন্তু তবু তাদের মানুষ বলে ভাবতে কোন অসুবিধে হয় না।

কিন্তু তটিনী শিয়ালদায় যাদের দেখল তারা যেন মানুষ নয়। কিছুদিন-

আগে দেখা একটি দৃশ্য মনে পড়ে গিয়েছিল। কলকাতার কোন রাস্তায় পর্বত প্রমাণ আবর্জনা-রাশির দুর্গন্ধের মধ্যে চার পাঁচটি দীর্ঘ অনাহারে জীর্ণ খেঁকী কুকুর ঘুমুচ্ছিল। তাদের পেটের জায়গাটায় ছিল গভীর গর্ত, আর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই গর্তটা ওঠা-নামা করছিল, দেখে চেনা যাচ্ছিল যে তারা জীবিত প্রাণী। কুকুরগুলো একে অপরের উপরে গা দিয়ে শুয়েছিল, যেন চামড়া দিয়ে জোড়া দেওয়া কতকগু:লা হাড়ের একটা স্তূপ।

শিয়ালদার উদ্বাস্তুদের দেখে তটিনীর মনে এই দৃশ্যটা ভেসে উঠেছিল। ছোট বড় নানা সাইজের এক একটা গোটা পরিবার তিন চার পাঁচ ফুট পাশ এবং দৈর্ঘ্য-যুক্ত জায়গায় বাসের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তটিনীর সামনে যে পরিবারটি বসেছিল, তাদের সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। রাস্তার আবর্জনার মতই দুর্গন্ধযুক্ত কতকগুলো কাপড়ের পোঁটলার সাহায্যে তারা তাদের সাময়িক আস্তানার সীমানা নির্দেশ করে নিয়েছে। সেই পোঁটলা-গুলির ওপর বসে রয়েছে দুটি পুরুষ ভাবলেশহীন কোটরাগত এক জোড়া করে চোখ নিয়ে। পরনে একখানা করে ন্যাতা শুধু। কতদিন ধরে মুখের দাড়ি কামায়নি কে জানে! মাথার চুল যেন শালিক পাখীর খড়ের তৈরী বাসা। সমস্ত শরীরের সারিবদ্ধ হাড়গুলির চেয়েও বেশী করে চোখে পড়ে পেটটা, পেটটা যেন শরীরের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়েছে, প্রায় পিঠের সঙ্গে লেগে গিয়েছে। তাদের পাশে নিচুতে বসে রয়েছে গুটি দুই বৌ। দেখে অনুমান হয়, তাদের যৌবন এখনো অতিক্রান্ত নয়। কিন্তু সে কথা তারা ভুলে গিয়েছে। তারা যে স্ত্রীলোক এ-বোধ তাদের নেই। স্টেশনের অজস্র লোকের দিকে তারা শূন্য অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে; অথচ তাদের দেহের অনেক আপত্তি-কর অংশই অনাবৃত। আর ঠিক সেই আবর্জনাস্তূপের উপরকার কুকুরগুলোর মতই গায়ের উপর গা দিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে আট দশ বারো বছর বয়সের চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাদের অস্নাত গায়ের নোংরার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অজস্র মাছি তাদের ছেঁকে ধরেছে। তাদের চোখের উপর দিয়ে, নাক ও ঠোঁটের উপর দিয়ে মাছিরা হেঁটে বেড়াচ্ছে অকুতোভয়ে, আর এই উৎপাতে এতটুকু বিব্রত না হয়ে বাচ্চাগুলো ঘুমুচ্ছে অকাতরে।

বাচ্চাগুলো এই বিকেল বেলাতেও ঘুমুচ্ছে। ওরা বোধকরি প্রায় সারাদিনই ঘুমোয়। যত বেশী ওরা ঘুমোয় ততই ওদের বাপ মায়ের সুবিধে।

কী দেখছেন?—অমিয় জিজ্ঞেস করল।

দেখছি।—তটিনী জবাব দিল সংক্ষেপে।

তটিনী সত্যিই দেখছে। চোখের যেন পলক পড়ছে না। জীবনের এক নগ্ন নিরবয়ব কুশ্রীতার গায়ে চোখের দৃষ্টি যেন লেপ্টে গিয়েছে।

অমন করে দেখবেন না। এগিয়ে চলুন।

কেন?

দেখতে নেই। দেখতে দেখতে হঠাৎ হয়তো এক সময় আপনি যে বেঁচে আছেন, আপনি যে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছেন এ-জন্য লজ্জা বোধ হবে।

লজ্জা বোধ করাই তো স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক? কিন্তু কই, এই কলকাতার রাস্তায় যারা সুদৃশ্য ঝকঝকে গাড়িতে করে যাতায়াত করছে, যারা অনেক, পয়সার মালিক তাদের তো লজ্জাবোধ হয় না। কলকাতায় ষাট হাজার প্রাইভেট গাড়ি আছে। এই গাড়ির মালিকেরা যদি একশ' টাকা করে দেয় তবে ছ'লক্ষ টাকা হয়। ছ'লক্ষ টাকা হলে এখানকার দু'হাজার লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, তাদের রোজগারের রাস্তা ধরিয়ে দেওয়া যায়।

তটিনী এগিয়ে গেল। তার পিছনে পিছনে অমিয়ও।

তবে ওরা দেয় না কেন?—তটিনী জিজ্ঞেস করল।

জানি না। বোধকরি ওরা দিতে পারে বলেই দেয় না।

একটি বছর বারো বয়সের সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়ে এসে হাত পেতে দাঁড়াল। হাড় জিড়জিড়ে চেহারা, বুকের উপর জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত দুটো বৃন্ত ঈষৎ ফুলে উঠেছে। তটিনী ব্যাগ খুলে তার হাতে একটা সিকি দিল। হঠাৎ তার মনে হল, অটল যদি ফিরিওলার কাজ না করত, তবে তটিনী নামক মেয়েটিকেও হয়তো এ রকম দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।

পয়সা দিতে দেখে একপাল ন্যাংটো ছেলেমেয়ে চারদিক থেকে কিলবিল করে এসে তটিনীকে ঘিরে দাঁড়াল। তটিনীকে লজ্জিত হতে হল। তার ব্যাগে আর পয়সা নেই। কোনরকমে তাদের এড়িয়ে বেরিয়ে এল।

আমি ঠিক ওদের কথা ভাবছি না।—তটিনী বলল।

কাদের কথা?

বড়লোকদের কথা। কুশ্রীতা দেখে ওদের লজ্জা করে না। তাই ওরা দেয় না।

তবে কার কথা ভাবছেন? সরকারের?

না। সরকার এদের কী করবে? এরা শুধু না খেয়ে আছে; যদি এরা চুরি ডাকাতি, করত তা হলে সরকার এদের জেলে পাঠাতে পারত।

এ কথা শুনে অমিয় হাসল না।

তবে আপনি কার কথা ভাবছেন?

ভাবছি নিজের কথা। লজ্জা বোধ করেই বা আমি এদের জন্য কী করতে পারছি?

সেইজন্যই তো বলছিলাম। ওদের দিকে তাকাবেন না; লজ্জাকে প্রশ্রয় দেবেন না। জীবনে এমন অনেক লজ্জা আছে যা ঢাকার জন্য মানুষ আত্মহত্যা করে।

পরদিন থেকে দুধ বিলি করা শুরু হবে। সেজন্য স্টেশনের মধ্যে কিছু জায়গা দরকার। রেলওয়ের এলাকার মধ্যে এতগুলো লোক কাজ করবে সেজন্য একটা অনুমতি দরকার। যাতে পুলিশ তাদের কাজে কোন রকম বাধা সৃষ্টি না করে। সরকার যাদের মৃত্যুর পরোয়ানায় সই করে দিয়েছে, অন্য লোক তাদের খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবে এটা সরকার পছন্দ না-ও করতে পারে। কাজেই নিরাপদে কাজ করার জন্য অনুমতি দরকার।

তটিনীরা আর একটু এগিয়ে যেতেই দলের অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চপলাদিও দলের মধ্যে ছিল। তারা অনেকক্ষণ ধরে এ-অফিস সে-অফিস ঘুরে অনিচ্ছুক বিরক্ত অফিসারদের থেকে অনুমতি আদায় করল শেষ পর্যন্ত।

ফেরার পথে সমস্ত দলটি একটি উদ্বাস্তু পরিবারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্টেশনে যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে চাষী-বৃত্তিজীবী, মধ্যবিত্ত সব শ্রেণীর মানুষই আছে, কিন্তু কাউকেই আলাদা আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। সকলেরই চেহারা কালো হয়ে গিয়েছে, সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে এমন এক ধরনের বিশীর্ণ মালিন্য যে, মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘুচে গিয়েছে। জীবনের এক প্রাথমিক ক্ষুধার প্রয়োজনের সামনে দাঁড়িয়ে সকলেই তাদের শিক্ষা সংস্কার সব ভুলে গিয়েছে। মানুষের চেহারা তাদের বটে, কিন্তু মানুষের সমস্ত গুণ হারিয়ে গিয়েছে। বেঁচে রয়েছে শুধু পশু—পশুত্ব।

কিন্তু যে মানুষটির সামনে দলটি দাঁড়িয়েছে, তিনি অনেক অনাদর অযত্ন সত্ত্বেও শিয়ালদার জন-সমুদ্রে মিশে যাননি। খালি গায়ে, ময়লা কাপড়েও তাঁকে একজন বিশিষ্ট লোক বলে চেনা যাচ্ছে। তাঁর গায়ের ফরসা রঙ বিবর্ণ তামাটে হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কালো রঙের সর্বজনীনত্বে হারিয়ে যায়নি। তটিনী দলের একজন সঙ্গিনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করে জানল, ভদ্রলোক একটি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন।

হেড্‌মাস্টার মশাইটি একটি ট্রাঙ্কের উপর বসে ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক দলের সকলে মিলে তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করল।

স্টেশনে আপনার তো নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে ?

অপরের যা হচ্ছে আমার তার চেয়ে বেশী হচ্ছে না।

চান করেছিলেন।

গঙ্গায় গিয়ে চান করে এসেছি। হেঁটে গিয়েছি, হেঁটে ফিরেছি।

কি খেয়েছেন ?

চিঁড়ে। কারা যেন চিঁড়ে বিলি করছে সবাইকে।

আচ্ছা, আপনার কি পশ্চিমবঙ্গে আত্মীয়-স্বজন বলতে এমন কেউ নেই, যার বাড়িতে দু'চার দিনের জন্য আশ্রয় নিতে পারতেন ?

আছে। তা আছে বৈকি। কিন্তু আত্মীয় বাড়িতে উঠতে হলে নিজের পকেটে কিছু বস্তু থাকা দরকার। আমি পাকিস্তানে সব খুইয়ে এসেছি। খালি হাতে কি কারও বাড়ি ওঠা যায় ?

দু'চার দিনের জন্য উঠতেন। তারপর একটা কাজ-কর্ম খোঁজ করে নিতেন। আপনি তো অক্ষম নন।

দ্যাখ, আমিও মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ। এক ইঞ্চি আরাম পেলে তাকে টেনে দু'ইঞ্চি করে নিতে ছাড়ি না। আমি জানি, আত্মীয়ের বাড়ি উঠলে অন্তত এতটা কষ্ট পেতে হত না। তারা হয়তো মুখ কালো করত, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারত না। তবু অনেক ভেবে দেখেছি, খালি হাতে এ বাজারে কারও বাড়িতে ওঠা যায় না। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি ?

তা ছাড়া আমি জানতে চাই, যাদের কথার ভরসায় আমরা দেশবিভাগের প্রস্তাবের পক্ষে সই দিয়েছিলাম, তারা আমাদের দায়িত্ব স্বীকার করে কিনা।

চপলাদি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার হঠাৎ বলে বসল: না, করে না। কেন করবে? দেশে মৃত্যুর সংখ্যা কিছু বাড়লে তাতে তাদের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে না।

সেইটে নিঃসংশয়ে জানার জন্যে অপেক্ষা করছি। অনেকে অনেক রকম আশ্বাস দিচ্ছে বলে একবারে ভরসাহীন হতে পারছি না আর সরকারের কথা বলে কী হবে? তোমরাই বা আমাদের জন্য কী করছ?

না, কিছু করছি না তো। কেন করব? আমাদের অত চক্ষুলজ্জা নেই। কেউ না খেয়ে মরছে দেখলে আমরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যাই। লজ্জা করে না আপনার সরকারের মুখের দিকে অথবা দেশবাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে? আপনারা নিজেদের জন্য নিজেরা কিছু করতে পারেন না?

ভদ্রলোক চপলাদির উত্তেজনা দেখে হাসলেন: না। পারি না। কী করব তুমি বলে দাও মা।

আর কিছু না পারেন, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, রাজভবনে, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বলুন, আমরা এর প্রতিবাদ করি। অনাহারের বিরুদ্ধে, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করি।

সরকারের অনেক পুলিশ আছে, তা জানো?

থাকলই বা। এখনো মরতে ভয়? প্লাটফর্মে তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারে মরা কি ভাল নয়?

বলতে বলতে চপলাদি ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল। তার পিছনে পিছনে সমস্ত দলটি আবার সচল হল। কে একজন চপলাদিকে বলল: ওরকম করে বলা তোমার উচিত হয়নি চপলাদি। উত্তেজনা সৃষ্টি করা আমাদের কাজ নয়। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করব, সকলের সেবা করব। আর কিছু নয়।

তটিনী ভাবল, বেশ বলেছে চপলাদি। তার যদি গলার জোর থাকত, যদি সে মনের আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে উঠতে পারত, তবে সে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে, জি-পি-ও-র চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাত। তাতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে তা চিন্তা করে দেখত না।

শীতের সন্ধ্যা কখন যে এসে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে কেউ টের পায়নি।

ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় মিশে সমস্ত অঞ্চলটায় একটা অস্বচ্ছ দম-আটকানো আবরণ সৃষ্টি হয়েছে। আকাশের এক কোণে নিষ্প্রভ চাঁদকে প্রায় চিনতেই পারা যাচ্ছে না যেন। চাঁদের পাণ্ডুর ঔজ্জ্বল্য যেন কাসির রুগীর মুখের অসুস্থ দীপ্যমানতা। শিয়ালদা স্টেশনে ঝাঁকে ঝাঁকে ডেলী প্যাসেঞ্জারেরা ঢুকছে মোটা মোটা ম্যাটমেটে বিবর্ণ চাদর গায়ে দিয়ে। কুয়াশার মধ্যে তারা যেন জমাট বাঁধা কুয়াশা। দূরে দূরে হিন্দুস্থানীরা কাঠ জ্বালিয়ে আগুনের কুণ্ড তৈরী করেছে শীতকে জব্দ করার জন্য। কুয়াশার মধ্যে আগুনের শিখাকে যেন আরও বেশী লাল দেখাচ্ছে, যেন সাপের লকলকে ছুরির মত শাণিত জিভ। আর ঠিক এমন সময় একটা দামী গাড়ি থেকে নামলেন এক সুবেশ ভদ্রলোক শৌখীন কাজ করা পাট-ভাঙা শাল গায়ে জড়িয়ে, আর পিছনে পিছনে নামলেন এক আশ্চর্য সুন্দরী তরুণী, তাঁর গায়ে ফার লাগানো লাল ভেলভেটের ওভারকোট। স্টেশনের গভীর বিষণ্ণতার গায়ে যেন এক ঝলক হাসি ঝিকমিক করে উঠল।

পৃথিবীর সমস্ত লোক কেন ওরকম সুন্দর হয়ে ওঠে না, তটিনী ভাবল।

গেটের বাইরে এসে দলটি ভেঙ্গে গেল। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দিকে যার যার বাড়ি বা অন্য কোন লক্ষ্যস্থলের দিকে চলে গেল।

অমিয় বলল তটিনীকে: চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

তারা দু'জন রাস্তা পার হয়ে এসে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ তটিনীর শরীরটা কেমন গুলিয়ে উঠল। পেট মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে বমি ঠেলে আসতে লাগল। পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে হাতের কাছে একটা ইলেকট্রিকের পোস্ট পেয়ে সেইটে চেপে ধরল।

অমিয় উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল: কী হল তটিনী?

শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে।

আমার কাঁধের উপর হাতের ভর রেখে দাঁড়াও। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।

তটিনী দু'হাত দিয়ে অমিয়র কাঁধ চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলল, কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল: অমিয়! অমিয়! মানুষের যে এমন অবস্থা হতে পারে, তা আমি জানতাম না! আমি কোনদিন এরকম দেখিনি।

তটিনীর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অমিয় বলল: শান্ত হও তটিনী। মনকে শক্ত না করলে কোন কাজ করতে পারবে না।

তটিনী তেমনি আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলল: আমি বোকা মূর্খ! কী অক্ষম—কী অসহায়! মানুষের এত দুর্দশা আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি। এদের কোন উপকার আমি করতে পারি না। প্রতিকারের কোন উপায় আমি জানি না। আমি এমন অপদার্থ যে, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতেও পারি না। আমার বেঁচে থেকে লাভ কি অমিয়?

ওরকম করে ভাবতে নেই তটিনী। আমরা কিছু তো করতে চেষ্টা করছি।

যেখানে নদীর জল দরকার, সেখানে কূয়ো কেটে কতটুকু কাজ হবে অমিয়?

অনেকক্ষণ অমিয়র কাঁধের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তটিনী একটু সুস্থ বোধ করল। বলল: এবার আমি যেতে পারব। চল অমিয়।

দাঁড়াও। বাস আসুক।—তারপর একটু থেমে অমিয় আবার বলল: এইজন্যই আমি তোমাকে এত ভালবাসি তটিনী।

কি জন্য?

ফুল দেখেছো? আমরা দেবতাকে নির্মাল্য দি ফুল দিয়ে। সুন্দর বলে নয়। ফুল বড় পবিত্র, কোনরকম মালিন্য তার গায়ে লাগে না,—সেইজন্য। তটিনী, তোমার মনটা ঠিক ফুলের মত।

তবে মহাকালের পদপ্রান্তে ফুলের মতই তটিনী কি ঝরে পড়তে পারে না অনাহারের বিরুদ্ধে, অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, একটি ক্ষুদ্র প্রতিবাদের চিহ্ন হিসাবে?

সেই সন্ধ্যেবেলা, সেই খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে, তটিনীর হঠাৎ মরতে সাধ হল। তার অক্ষমতা নিয়ে সে যদি বেঁচে থেকে মানুষের কোন উপকারে না লাগে, তবে অন্তত আত্ম-বলিদান দিয়ে সে কি নিজের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে পারে না?

কদিন ধরে কাপড়ের বাজার ভাল যাচ্ছে না। বেচা-কেনা অনেক কমে গিয়েছে। অটল দোকান দিয়ে বসেছে অবধি খদ্দেরের দল যেন যুক্তি করে কেনাকাটা কমিয়ে দিয়েছে। কাপড়ের দামও কমছে ক্রমশ—বাড়তি স্টকে

বড়বাজার একেবারে ভরতি! আর পড়তি-বাজারের অসুবিধা এই যে বিক্রিও কম হয়, যাও বা বিক্রি হয় তাতে লাভও কম থাকে।

অটল হিসেব করে দেখেছে, ফেরিওলা হিসাবে আগে তার যা আয় ছিল, দোকানের মালিক হয়ে এখন তা-ও নেই। সেই যে কথা আছে, লাভে ব্যাঙ, অপচয়ে ঠ্যাঙ, তাই হয়েছে অটলের। এদিকে ব্যবসার এই হাল, ওদিকে জগদ্দল পাথর চেপে রয়েছে বুকে—সরকারের দেনা। টাকা দেওয়ার আগে ইনস্পেক্টর-শালা একবার দেখতে আসবে, তাইতেই কত গাঁই-গুঁই। আর টাকা দেওয়ার পর শালা এর মধ্যেই এসে হিসেব-পত্তর দেখে গিয়েছে। কিস্তির তারিখ কবে পড়েছে, ভাল করে বারবার শুনিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

খুব সকালে অটল এসে দোকানে বসেছে! শীত বেশ জমিয়ে পড়েছে এবার, সুতির চাদরটা গায়ে বেশ জড়িয়ে-সড়িয়ে নিয়েও কেমন শীত-শীত করছে।

দু'জন শোভন পোষাক-পরা ভদ্রলোক আসতেই অটল চটপটে হয়ে উঠল। বউনিটা যদি ভাল হয়।

আসুন স্যার, বসুন!—অটল সাড়ম্বরে সম্বর্ধনা জানালো।

ভদ্রলোক দু'জন বসলেন চাদর মোড়া তক্তাপোশের উপর।

ভালো শাড়ি দেখাতে পারো?

পারব স্যার।

কয়েক বোঝা অতি মিহি শাড়ি অটল টেনে নামিয়ে সামনে রাখল। এই মালগুলো অটলের গলার কাঁটা হয়েছে এখন। কন্ট্রোল দামের চেয়ে বেশী দিয়ে মালগুলো কেনা। তখন বাজারে এগুলোর বেশ চাহিদা ছিল। এখন এগুলো কন্ট্রোল দামে কাটাতে পারলেই ও বেঁচে যায়।

কী জমিন দেখেছেন? কী পাড়ের বাহার! বাসন্তী মিলের মাল কিনা। বাজারের একেবারে সেরা!

একজন ভদ্রলোক একজোড়া শাড়ির উপর আঙুল রেখে বললেন: কত দাম?

চোদ্দ টাকা।

ভদ্রলোক কাপড়ের উপরে দামের ছাপটা দেখলেন।—তেরো টাকা দু'আনা লেখা আছে যে হে?

আজ্ঞে স্যার, সেল ট্যাক্সটা ধরুন ওর সাথে।

ঠিক বলেছো। সেলস-ট্যাক্স দাঁড়াচ্ছে—তিন-তেরং উনচাল্লিশ—ধরো গিয়ে দশ আনাই। তবু যে চার আনা কম থেকে যাচ্ছে তোমার দামের থেকে!—ভদ্রলোক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সঙ্গীর দিকে তাকালেন।

স্যার, মাত্তর চার আনার জন্য আপত্তি করছেন? জানেন, ঐ দামেই আমার কেনা? বউনির সময় মিছে কথা বলছি না। চান তো খাতা দেখাতে পারি।

সে হলে তো আরও ভাল হয়।—ভদ্রলোক আবার সঙ্গীর দিকে তাকালেন।

অটল একখানা লম্বা খাতা বের করল। খুঁজে খুঁজে একটা পাতা সামনে মেলে ধরল।

এই দেখুন স্যার। নেহাৎ বাজার ডাউন, তাই কেনা দামে ছেড়ে দিচ্ছি। কি আর করি?

অটলের হাত থেকে খাতাখানা নিয়ে ভদ্রলোক বললেন: ব্যস। এতেই আমার কাজ চলবে। শোন, তোমাকে ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর অপরাধের জন্য এ্যারেস্ট করছি! আমি পুলিশের লোক।

অটল যেন কেমন বোকা হয়ে গেল। কী যে ঘটছে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না। ইতিমধ্যে ভদ্রলোক পকেট থেকে একখানা চাকতি বের করে দেখালেন।

এবার বিশ্বাস হল?—ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

স্যার, এ-কথা আগে বলেন নি কেন? নিন না শাড়িজোড়া—আমি কণ্ট্রোল দামেই দেব।

সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন: কী রকম পাক্কা বদমাইশ দেখছেন? আবার হাত-সাফাই করতে চায়! কণ্ট্রোল দামে দেওয়া তোমার বের করছি, দাঁড়াও না? হারামজাদা, পাজী, বদমাইশ!

ভদ্রলোকের ইঙ্গিতে রাস্তা থেকে দু'জন কনস্টেবল এসে দাঁড়াল।

ইসকো হাতকড়া লাগাও।

অটল মরিয়া হয়ে উঠল।

বা-রে! আমার কী দোষ? আমি যে বেশী দামে কিনেছি তা তো দেখিয়ে দিলাম।

ওটা তোমার দু'নম্বর অফেন্স মাই ফ্রেণ্ড! ব্ল্যাকে মাল কিনলেও শাস্তি হয়।

অটল চেঁচিয়ে বলল: এমনি করে চোরাবাজার বন্ধ করবেন স্যার? আমার মত চুনোপুঁটিগুলোকে ধরে? আমরা কী দোষটা করেছি। যেমন দামে কিনি, তেমন বেচি। দু'চার আনা লাভ রাখি বই তো নয়। যেখানে লাখ লাখ টাকার মাল কণ্ট্রোলের চেয়ে বেশী দামে কেনা বেচা হচ্ছে, যেখান থেকে আমরা কিনি, সেখানে যান না কেন স্যার?

ভদ্রলোক ধমকিয়ে উঠলেন: চোপরও স্টুপিড! আমাকে উপদেশ দিতে আসিস্ এত বড় আস্পর্ধা! শুয়োর, গাধা, পাঁঠা। চোর, গুণ্ডা, বদমাশ।

সঙ্গীটি একজন সাধারণ ভদ্রলোক, সাক্ষ্য দেবেন বলে সঙ্গে এসেছেন। এতক্ষণে তিনি প্রথম কথা বললেন: এইসব লোকগুলোর জন্যই দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। গড়ের মাঠে নিয়ে ফাঁসি দিলে ঠিক হয় এদের।

মাল-পত্তর যথারীতি আইন-মাফিক সীল করা হল। কাগজ বের করে সাক্ষীর সই-সাবুদ নেওয়া হল। তারপর নিজের কাজের সাফল্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে অটলকে নিয়ে সদলবলে চললেন ছদ্মবেশী দারোগা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অটল ঠাণ্ডা হয়ে অনেক অনুনয় বিনয়, ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। যখন অটল একেবারে পা ধরতে গেল, তখন সেটাও অসহ্য নেকামি বলে বোধ হওয়ায় দারোগাবাবু বুটজুতাটা সামান্য ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কোনদিন বাড়ির কোন ঝামেলায় অটল মাথা গলায় নি। কোন দলের সঙ্গে মেশে নি, আড্ডার মোহে ভোলে নি। এক পয়সা অপব্যয় করে নি। নিজের মত কাজ করে গিয়েছে একমনে। জীবনে দাঁড়াতে হবে! দোকান করবে, বোনকে মানুষ করবে। কত কাজ, কত কাজ ছিল তার! একটা মিনিট নষ্ট করার মত সময় ছিল না। বাড়ি করতে হবে, বিয়ে করতে হবে!

কেমন, এবার হয়েছে তো তোমার অটল? শখগুলো সব মিটেছে তো তোমার? দোকান করার শখ? বাড়ি করার শখ। আরও যেন কী কী সব শখ ছিল, সব মনেও পড়ছে না ছাই?

দু-পাশের অগুণতি লোক তাকিয়ে দেখছে। হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের

সঙ্গে যাদের নিয়ে যাওয়া হয়, লোকে তাদের চোর বলে ধরে নেয়। এমন কতজনকে অটলও কতবার চোর বলে মনে করেছে। আর অটল কি শুধুই চোর? তার আরও কী কী সব বিশেষ পরিচয়ের ফিরিস্তি দিলেন পুলিশ অফিসারটি, এখন আর মনে পড়ছে না!

অটল আপন মনে হাসল। চলার বেগ বাড়িয়ে দিয়ে পুলিশগুলোকে আরও জোরে চলতে বাধ্য করল।

সন্ধ্যার খানিক আগে অটল ছাড়া পেল। তার আগে পাঁচশো টাকার ব্যক্তিগত জামিনের মুচলেকায় সই করতে হল। তার সব মাল-পত্তর হিসাব-নিকাশ হয়ে থানায় জমা হয়ে গেল। বেরিয়ে এসে প্রথমেই অটলের মনে পড়ল, এখন আর তার কোন কাজ নেই। অনেক দিনের জন্য তার ছুটি মিলল। এর পর মোকদ্দমা হবে। তারপর অবধারিত জেল। তারপর বেরিয়ে এসে হাকিমের দয়ায় মালগুলো যদি সে ফেরৎ-ও পায়, তো ইতিমধ্যে ধূলো আর ময়লা, উঁই আর ইঁদুর, সে সোনার জিনিসগুলোকে ছেঁড়া-ন্যাতায় পরিণত করবে। সেই ছেঁড়া-ন্যাতাগুলি হবে তার সাকুল্যে মূলধন। কোন দিন একটা পয়সাও ভিখিরীদের দেয়নি। আজ যদি এ-কাপড়গুলো সে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যও পেত! পয়সা না মিলুক, তবু তো মানুষের ব্যবহারে লাগত!

খুব খিদে পেয়েছে,—সারাদিন তো পেটে কিছু পড়েনি। অটল একটা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকল চা খাবে বলে।

বয় এসে বলল: মাংস দোব বাবু? ভাল গরম মাংস আছে।

পকেটের ভারটা হাত দিয়ে অনুমান করে নিয়ে অটল হাফ ডিশ মাংস আর পাউরুটির অর্ডার দিল! তারপর আর একদফা একই পরিমাণ চেয়ে নিল। কেকগুলো দেখতে ভাল লাগল বলে খান চারেক কেকও নিল। পাকিস্তান থেকে এসেছে অবধি আর কোনদিন রেষ্টুরেণ্টে যায় নি অটল, কালে ভদ্রে এক-আধ কাপ চায়ের জন্য ছাড়া। আজ আর হিসাবের বালাই নেই। যত খুশি খাওয়া চলতে পারে। পকেটের পয়সায় যতদূর কুলোয়।

খাওয়া দাওয় শেষ করে দামী একটা সিগারেট ধরিয়ে অটল বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

বাড়ির গেট পার হয়ে অটল অবাক হয়ে গেল। এত ভীড় কেন এ-

বাড়িতে—বাইরে এবং ভিতরে? এলোমেলো ভীড়। সভাসমিতি হয় বটে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে, কিন্তু এ আরেক রকমের ভীড়। চেনা-অচেনা, এ-বাড়ির, এ-পাড়ার, কাছের, দূরের, কত মানুষ যে অটল দেখল!

সাধারণ মানুষ অটল, তবু সবাই সমীহ করে পথ ছেড়ে দিচ্ছে তাকে! তাকে দেখে জনতার মধ্যে যেন চাঞ্চল্য জাগল। এ আর এক রকমের চঞ্চলতা। কথার গুঞ্জন তুলে নয়, কথা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে। কেন? কী হয়েছে এ-বাড়িতে আজ?

সামনে ঘোষাল মশাইকে পেয়ে অটল জিজ্ঞেস করল: ডাক্তারবাবু, কী হয়েছে?

ভয়ানক অন্যমনস্ক ঘোষাল মশাই। তার কথা কানে শুনতে পেলেন না। অটল এগিয়ে গেল।

সিঁড়ির কাছে গিয়ে কল্যাণবাবু, মনোরমবাবু প্রভৃতি তিন-চার জনের সামনাসামনি পড়ে গেল।

কল্যাণদা, কী হয়েছে আজকে?

পাশের একজন অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলায় কল্যাণবাবু খুবই ব্যস্ত। ফিরে তাকানোরও ফুরসুৎ পেলেন না।

সিঁড়ি বেয়ে তড়তড় করে অটল উপরে উঠে এল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখল। তার ঘরের সামনে রাজ্যের মেয়েছেলে যেন জট পাকিয়ে রয়েছে। কয়েকটি অচেনা ছেলেও রয়েছে সঙ্গে।

মুখটা কেমন শুকিয়ে আসছে যেন। অটল এগিয়ে এসে একজনকে জিজ্ঞেস করল: কী হয়েছে বলতে পারেন মশাই?

পিছন থেকে একটি অল্প বয়সী ছেলে এগিয়ে এল: কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নামটা জানতে পারি কি?

আমার নাম? আমার নাম অটল।

ও! আপনি বুঝি তটিনীর ভাই?

হ্যাঁ। কিন্তু কী হয়েছে বললেন না তো?

আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দেওয়ার আছে। আপনার বোন তটিনী আজ দুপুরে মারা গেছেন পুলিশের গুলীতে।

না, কবিরা ও-সব মিথ্যে কথা বলেন, মাথায় বজ্রপাত হওয়ার মত কোন অনুভূতি হল না তো অটলের।

কী হয়েছিল সব বলুন, আমি শুনব।

বলব। কিন্তু আগে আপনি ঘরের ভিতর বসবেন চলুন।

ছেলেটিকে আশ্বস্ত করার জন্য এমন-কি অটল একটু হাসল।

না—না, এখানে দাঁড়িয়েই বলুন। কোন ভয় নেই! আমি ঠিক আছি।

অগত্যা ছেলেটি বলল: উদ্বাস্তুদের একটা মিছিল বেরিয়েছিল আজ শহরে। খুবই বড় মিছিল—প্রায় এক লাখ মানুষ ছিল মিছিলে। একজন খুব বড় নেতা এসেছেন কিনা কলকাতায়! তাই এরা এসেছিল দেশের নেতার সঙ্গে দেখা করতে, সুখ-দুঃখের কথা বলতে। হ্যাঁ, তটিনী এই মিছিলের মধ্যে ছিল একেবারে সামনের সারিতে ফেস্‌টুন হাতে করে। শিয়ালদার মোড়ে এসে পুলিশ ওদের পথ আট্‌কিয়ে দিল। না, তখুনি গুলী ছোঁড়েনি। তা নয়। কম্যাণ্ডিং পুলিশ অফিসারটি ওদের ফিরে যেতে বলেছিলেন। হাত জোড় করে, অত্যন্ত বিনয় আর ভদ্রতার সঙ্গে। লোকগুলো কথা শুনল না। বিশ্বাসই করতে চাইল না। এই দেশনেতা কতবার কত মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন: আজকে না আসার এমন কী কারণ থাকতে পারে? (তা হবে, অমনি গোঁয়ার বটে বাঙালরা!)

না, তখনও অফিসারটি গুলী করার আদেশ দেন নি। তিনি আরও বুঝিয়েছিলেন। দেশনেতা কী করে আসবেন? অনেক শ' বছর আগে মরে-হেজে গিয়েছেন যে দুই মহাপুরুষ, তাঁদের অস্থির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য তাঁর আগমন। তাঁর কত কাজ? বাজে কাজে নষ্ট করার মত সময় তাঁর কোথায়? জনতার নেতা পাঁচ মিনিটের জন্যও দেশের মানুষের কাছে আসতে পারেন না? না, দেশের একজন প্রধান নেতার কাছে পাঁচ মিনিটের দাম পাঁচ যুগের সমান। বোকা জনতা তবু বুঝতে চাইল না। দেশের মরা হাড়ের প্রতি যে-মানুষের এত দরদ, যারা বেঁচে থাকতেই হাড় হয়ে গিয়েছে, তাদের প্রতি সে-মানুষটার দরদ কি আরও অনেক বেশী পাওয়ার কথা নয়?

অফিসারটির তখন আর উপায় ছিল না। না, তা বলে তিনি রাগলেন না। জনগণের সরকার তো আসলে জনসাধারণের পিতা! জনতা অবাধ্য হয়েছে বলেই কি আর সরকার-বাবা পারেন নিজের সন্তানদের উপর রাগ

করতে? রাগ করলে প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা করলে, তো সরকার-বাবা এরোপ্লেন আনিয়ে বোমা মেরে লাখ মানুষকেই উড়িয়ে দিতে পারতেন। না, রাগ নয়, কিন্তু অবাধ্য বিপথগামী সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তো সরকার-বাবা অস্বীকার করতে পারেন না। ছেলেকে মেরে পিটিয়ে মানুষ করার দায়িত্ব তো বাবার। সরকার-বাবার প্রতিনিধি তাই গুলী ছোঁড়ার অর্ডার দিয়েছিলেন। আর কত বিবেচনা? বুলেটের তো অনেক দাম,— আর সে-দাম জনসাধারণের পকেট থেকেই আসে। বুলেটের অপচয় বাঞ্ছনীয় নয়। সেইজন্য আগে যে অর্ডার ছিল—shoot to scare away,—তাড়িয়ে সরিয়ে দেবে বলে গুলী কর,—তা পাল্‌টিয়ে এখনকার অর্ডার হয়েছে—shoot to kill—মেরে ফেলবে বলে গুলী কর। কত সুবিধা। শিক্ষার জন্য শাস্তি দেওয়াও হবে, আবার পুলিশের দলেরও হাতের নিশানা ঠিক করা হবে। একবারের বুলেট খরচে কত কাজ হবে।

কতজন মরেছিল? তা সাত-আট জন হবে বৈকি? হ্যাঁ, তটিনী এবং আরও গুটিকতক মেয়ে মিলিয়ে। বেঁচে থাকতেই ওরা হাড় হয়ে গিয়েছিল, এখন আসল হাড়ে পরিণত হয়ে ভালই হল। কয়েক হাজার বছর পরে এই হাড়ই কবর খুঁড়ে বের করবে তখনকার আর এক সরকার,—ঐতিহ্যের তো চিরকালই সম্মান থাকবে! আর সেই সব পূতাস্থিকে ফুল বিল্বদল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবেন তখনকার আর এক দেশনেতা। বেঁচে থাকলে তুমি দেশের জঞ্জাল, মরে হেজে ঐতিহ্য হয়ে গেলে তুমি দেশের সম্পদ!

অল্পবয়সী ছেলেটি যে এত নিরপেক্ষভাবে বলতে পেরেছিল তা নয়। তবে অটল ঠিক বুঝে নিয়েছিল। বুঝেছিল যে তটিনী—যাকে নিয়ে তার সংসার, সে মরেছে। সে ছিল জঞ্জাল; তার জীবনের যত হয়রানি ও ঝামেলার মূল। এবার মরে সে সম্পদ হয়ে গেল। তার ফটো টাঙানো থাকবে দেওয়ালে। ফটোর গলায় ঝুলবে ফুলের মালা।

অটলের যেন একটুও শোক বোধ হচ্ছে না। চারদিকের এত লোক তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারা কী ভাবছে! নিশ্চয়ই ভাবছে যে মানুষটা বোনটাকে এতটুকু ভালবাসত না।

শান্তভাবে অটল্ ঘরে ঢুকল। মা বোধ করি মূর্ছা গিয়েছেন। একটি মেয়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। মেয়েটি আবার পাখা দিয়ে

বাতাস করছে। মেয়েটিকে অটল চেনে। নিশ্চয় সুধা। পাশের ঘরের সেই কেশো রুগীর বৌটা।

আস্তে আস্তে অটল গিয়ে মায়ের পাশটিতে বসল। এবারে অনুভব করতে পারল, খুব গরম কী-যেন একটা জিনিস চোখের কোণ ফেটে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে।

আস্তে আস্তে অটলের মনে পড়ল, তার বোন তটিনী মরে গেছে। আশ্চর্য! এই কথাটাই ভুলে গিয়েছিল এতক্ষণ! তটিনী মরে গেছে। তার মানে সে আর ফিরে আসবে না। পৃথিবীতে অনেক সকাল, অনেক সন্ধ্যা ফিরে ফিরে আসবে। অনেক লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু আর কোনদিন ফিরে আসবে না একটি ছোট্ট সাধারণ সামান্য মেয়ে। আজ চারদিকে যেন বড্ড বেশী অন্ধকার। লণ্ঠনের মিটমিটে আলো যেন অনেক দূরের তারার আলোর বিন্দুমাত্র, অন্ধকারের গায়ে লেগে সে সামান্য আলো হারিয়ে যাচ্ছে যেন।

কেন মরতে গিয়েছিল তার বোনটা? এমন কী অভাব ঘটেছিল তার জীবনে, যার জন্য এই পথটাই তাকে বেছে নিতে হল?

হয়তো ভালই হয়েছে। তটিনীকে আর জানাতে হবে না তার দোকানের অপ্রীতিকর খবরটা, তার জেলে যাওয়ার ধ্রুব সম্ভাবনার খবরটা।

নীচের তলায় অনেক লোকের ভীড়ে মনোরমবাবু অবিরত চিৎকার করছেন: এই আমি আপনাদের বলছি। এই ভর সন্ধ্যেবেলা। আজকের এই ঘটনা হল Beginning of the End। উচ্ছন্নে যাওয়ার যাত্রা শুরু হল। এই ভারতবর্ষের ভূমিতে মেয়েমানুষের উপর আক্রমণ? জানেন, নারীর অপমান পিছনে ছিল বলে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈনিক মরেছিল কুরুক্ষেত্রের মাটীতে? আর মেয়েমানুষের হাতে টান পড়েছিল বলে একটা গোটা রাজ-পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল লঙ্কা দ্বীপে?

কী করে যে মানুষের জীবনে হঠাৎ পরিবর্তন আসে, ভাবলে অবাক হতে হয়! মনোরমবাবু ছিলেন এ-বাড়ির নামকরা স্বার্থপর মানুষ। এ-বাড়ির সকলের চেয়ে তাঁর রোজগার বেশী—এ-আভিজাত্য-বোধ তাঁর ছিল অত্যন্ত প্রবল.

এ-বাড়িতে পুলিশের আনাগোনা তো কতদিনের! যখন-তখন যাকে-তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা হয়রান করত। যাদের গায়ে আঁচড় লাগত না, তারা তবু ভাবত, তাদের ঘরে পুলিশ আসবে না কোনদিন। একে-ওকে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে এ ঘটনা তেমন অস্বাভাবিক অসাধারণ বলেও মনে হত না। তারপর একদিন পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল মনোরমবাবুর ছোট মেয়েকে, তটিনী বলে ভুল করে আটকে রেখে দিল তাকে। তিন চার দিনের অনেক পরিশ্রমের পর মেয়েকে ছাড়িয়ে আনলেন মনোরমবাবু। সেদিন প্রথম তাঁর মনে হল, এ-ঘটনা তো খুব স্বাভাবিক নয়: শান্তিপ্রিয় মানুষ সংসার করছে নির্বিবাদে, তার ঘরে অমনটা তো ঘটবার কথা নয়। একটা নতুন চোখ যেন খুলে গেল। একটা নতুন মানুষ বেরিয়ে এল।

কল্যাণবাবু ঘোষাল মশাইকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আচ্ছা বলতে পারেন ঘোষাল মশাই, এ মেয়েটার কিসের অভাব ছিল? আজকালকার দিনে এ-কথা কে না জানে যে মিছিল বের হলেই গুলী চলবে। জেনে শুনে প্রথম সারিতে যাওয়ার কী অপরিহার্য প্রয়োজন বোধ করেছিল মেয়েটা?

ঘোষাল মশাই জবাব দিলেন না। ভাবপ্রবণ কল্যাণবাবুকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। সাধ করে, ইচ্ছে করে, মরে গিয়ে যদি কেউ কেউ জাতীয় সরকারের পথের কাঁটা হতে চায়, তবে সেই আত্মহত্যা-প্রবণ মানুষগুলোর শবদেহের উপর দিয়েই জাতীয় সরকার অম্লান জ্যোতিতে এগিয়ে যাবে।

কল্যাণবাবু ভাবছিলেন। অনেকগুলো কাজ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ল। এ-মেয়েটার রাজনৈতিক গোত্র কী তিনি জানেন না। মেয়েটির কোন রাজনৈতিক মত ছিল না, নিছক একটি কল্যাণব্রতের আদর্শ নিয়ে সে প্রাণদানের সঙ্কল্প করেছিল, তা-ও তিনি জানেন না। জানবার প্রয়োজনও বোধ করছেন না। আদর্শের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করার নিরংকুশ সততা নিয়ে এ-মেয়ে প্রমাণ করেছে এ সেই জাতের মানুষ, যারা যুগে যুগে শহীদ বলে কীর্তিত হয়। এই মেয়েটির কিছু দায় তাঁর উপর পড়ল। বাড়ির লোকেরা তাঁকে মান্য করে। তাদের দেওয়া সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। ছেলের দলকে নিয়ে এবার যেতে হবে পুলিশের হাত থেকে শবদেহ উদ্ধার করতে। তারপর সৎকার। তারপর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ।

সন্ধ্যা সবে উত্তীর্ণ হয়েছে। শীতের সন্ধ্যায় কলকাতার সহরতলীর বাতাস ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সেই ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে পশ্চিমের আকাশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাল মেঘ যেন প্রকৃতির বুকে একটি দগ্‌দগে পচা ঘা। আজকের আবহাওয়ার শীতলতার মধ্যে কোন মোলায়েম মধুর স্পর্শের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না। শীতের রুক্ষ কঠিন বাতাস যেন জামা, কাপড়ের বেড়া ভেঙে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে দেহে ক্ষত সৃষ্টি করছে।

অনেক দুঃখ, বহু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কল্যাণবাবু আজ বুঝেছেন, জীবনের সত্যকে উপলব্ধি ও স্বীকার করতে হলে মনকে দলীয় আনুগত্যের উর্ধ্বে স্থাপন করতে হবে। আমি অমুক দলের সভ্য, অতএব সেই দলের সমস্ত নীতি ও পদ্ধতি আমাকে সমর্থন করতেই হবে, এ মনোভাবের অর্থ নিজের স্বাধীন চিন্তাকে বিসর্জন দেওয়া। অনেকদিন ধরে কল্যাণবাবু অন্ধের মত তাই করে এসেছেন, আর মনে মনে এই ভেবে পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন যে, তিনি সব সময় স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন। একটি মেয়ে আজ জীবন দিয়ে প্রমাণ করল যে কল্যাণবাবু ভুল করেছেন। অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠকে যারা শান্তি ও শৃঙ্খলার মামুলী অজুহাতে বন্দুকের গুলীতে ডুবিয়ে দিতে চায়, তাদের সব কিছুকে সমর্থন করার দায়িত্ব কল্যাণবাবু এতকাল স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু আর তা সম্ভব নয়। আজ কল্যাণবাবু অনুভব করছেন, সমাজের মধ্যে তাঁর সমস্ত রকমের অস্তিত্ব যখন ধিকৃত তখনও তিনি মানুষ। তাঁর কোন দল নেই, কোন জাত নেই, কারও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার কোন দায় নেই। যুগ যুগ ধরে মানবজাতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তিনি শুধু তারই এক নগণ্য অংশীদার মাত্র। এর চেয়ে আর কোন মহত্তর পরিচয় তাঁর নেই।

গুমোট ভারী আবহাওয়া। সকলের মুখই বিষণ্ণ, থমথমে। একটি মৃত্যু যেন এ বাড়ির সমস্ত হাস্য পরিহাসকে থাবড়া মেরে চুপ করিয়ে দিয়েছে। একটি অতলান্ত রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে সকলে যেন স্তম্ভিত। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সকলে জটলা করছে। কথা বলছে কম; বলতে হলে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, তাদের কথা বাতাস যেন না শুনতে পায়।

তরুণদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পটল জিজ্ঞেস করল: মৃত্যুর চেয়ে বেশী করে মরে এমন আর কী আছে, বলতে পারিস রবি?

রবি বলল: মেয়েটার সবই ভাল ছিল। চেহারায় সুন্দর। পড়াশুনায় ভাল। শুধু শেষকালটায় একটু ভুল করে ফেলল। একেবারে মরে না গিয়ে যদি জখম-টখমও হত!

ওদিকে মেয়েমহলে কাদম্বিনী দেবী জিজ্ঞেস করছিলেন: দু' চার লাইন পেছনে থাক্‌ল ক্ষেতিটা ছিল কি বলুন তো দিদি!

মনোরমা বলছিলেন: কি জানেন দিদি, আমরা যেখানে বাস করছি এটা আর-এক দুনিয়া। এখানে কারও জীবন নিরাপদ নয়। ঘরের কোণে লুকিয়ে চৌকির খুঁটি ধরে বসে থাকলেও নিস্তার নেই।

খবর পেয়ে অনেক রাত্রে অমলেন্দুবাবু এলেন এ বাড়িতে। কারও সঙ্গেই দেখা হ'ল না। সবাই বেরিয়ে গিয়েছে কোন-না-কোন কাজে। শুধু অটলের ঘরে সুধাকে পাওয়া গেল। অমলেন্দুবাবুকে দেখে মনোরমার উপর শোকগ্রস্তদের ভার দিয়ে সুধা বেরিয়ে তাঁকে নিয়ে এল নিজের ঘরে।

ঘরের দিকে আসতে আসতে সুধা প্রশ্ন করলে: তটিনী মরেছে পাঁচজনের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে। এমন দিনে আমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করব? সে কি ভাল লাগবে আপনার?

লাগবে। মৃত্যু যদি জীবনের কাছে নতুন শিক্ষা না নিয়ে আসে, তবে তো সে-মৃত্যু ব্যর্থ।

সেই যে সুধা একদিন অমলেন্দুবাবুব সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল মেসে তারপর এই আবার প্রথম দেখা কয়েক মাস পরে। ইতিমধ্যে সুধা এখানে 'উদ্বাস্তু মহিলা শিল্প-বিদ্যালয়' খুলেছে, কাজ চলছে পুরোদমে। অলক্ষ্যে থেকে অমলেন্দুবাবু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। একদিন একটি ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন কতকগুলো বই সঙ্গে দিয়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আর কোন সম্পর্ক রাখেন নি সুধার সঙ্গে।

ঘরে এসে যত্ন করে মাদুর বিছিয়ে দিল সুধা। অমলেন্দুবাবু হাসলেন: তারপর? খবর কি আপনার?

তটিনী বেচারার ভাগ্য ভাল। মরে যাওয়ায় তবু মহাপুরুষের পদচিহ্ন পড়েছে তার ঘরে!

সুধা বেচারার ভাগ্য আরও ভাল। সে সরাসরি মহাপুরুষের সঙ্গে আলাপ করতে পারছে!

অমলেন্দুবাবু জোড়াসন করে বসেছেন। সুধা তার পরিচিত ভঙ্গীতে পা ছড়িয়ে বসে গা এলিয়ে দিয়েছে দেওয়ালের গায়ে। চুলে যত্নের বালাই নেই। পথভ্রষ্ট অনেক চুল ছড়িয়ে পড়েছে নানা দিকে। মন্থর নৈশ-বাতাসে দলভ্রষ্ট কোন কোন চুল নড়ছে। গ্রাম্য মেয়ের মাটীর গন্ধে ভরা অচেতন মূল্যহীন সৌন্দর্যকে পরম স্নেহে যেন আগলিয়ে রেখেছে অজস্র অজস্র চুল।

সুধা বলল: কিন্তু সুধা বড় অহঙ্কারী। মহাপুরুষেরও দায়ে পড়া আলাপ সে চায় না।

হয়তো যা ভাবছেন আসল ব্যাপার তার বিপরীত। হয়তো মহাপুরুষের উপলক্ষ্য ছিল তটিনী। লক্ষ্য ছিল সুধা।

সুধা এবার হাসল। পণ্ডিত মানুষ হার মানতে সম্মানে বাধে, না? কিন্তু কথার জাল বুনে মেয়েমানুষের সঙ্গে পারবেন? মনে আছে, ওয়েলিংটন পার্কের সেই মেয়েটিকে? কথা বুনে বুনে কত লম্বা ফাঁদ পেতেছিলেন, জাল কেটে তবু বেরিয়ে গেল মেয়েটা। জাল বোনা এখন থাক। আমার প্রশ্নের জবাব দিন

প্রশ্ন করুন।

আচ্ছা, বলুন তো, তটিনীর জীবনে এমন কিসের অভাব ছিল? বই নিয়ে, ভাইয়ের ভালবাসা নিয়ে, সুখের যৌবন নিয়ে জীবন ছিল তার ভরন্ত। তবু এমন কিসের প্রয়োজন তার ছিল, জীবনের মূল্যে যার দাম শুধতে হল? মৃত্যুর চেয়ে বেশী করে মরে এমন আর কী আছে অমলেন্দুবাবু?

'আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। তটিনীকে কতটুকুই বা জানতাম? তবে ও-ধারণাটা আপনার ভুল সুধা দেবী। মৃত্যু সত্যিই মরা নয়। মৃত্যু জীবনকে নবযৌবন দান করে। মনে আছে আপনার, একদিন স্বদেশের বেদী থেকে কত লোক স্বাধীনতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল? সেই শহীদ হওয়ার প্রয়োজনটা আজও শেষ হয়নি। কোনদিন শেষ হবে কিনা জানি না। দরকার হলে মরতে হতে পারে এ-কথা জেনেই কিছু কিছু লোককে অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। নিজে মরে

তবে তো দেশবাসীকে মরার কায়দা শেখানো যায়! আর তবে তো মৃত্যুমুখী সভ্যতা নতুন জীবনের সনদ পায়!

আচ্ছা, বলুন তো, হতচ্ছাড়া মেয়েটা কেন মরতে শহীদ হওয়ার আদর্শ গ্রহণ করেছিল?

আচ্ছা, বলুন তো সুধা দেবী, আপনিই যে কোনদিন সে আদর্শ নেবেন না, এ-কথা হলফ করে বলতে পারেন?

সুধা অবিশ্বাসীর হাসি হাসল।

হাস্‌ছেন ?—অমলেন্দুবাবু আবার বললেন : নিজের ওপর অত ভরসা রাখবেন না। আপনি আজ যা করছেন, এর আগে তা করবেন বলে কোনদিন ভেবোছলেন কি?

সুধা তবু অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

আপনি আমাকে জানেন না অমলেন্দুবাবু, তাই এ কথা বলছেন। আমি যে শুধু বাঁচতে চাই। ভয়ঙ্করভাবে বাঁচতে চাই!

তাইতেই তো বিপদ বাধিয়েছেন। যারা শুধু বাঁচতে চায়, কেঁদে-কঁকিয়ে মড়ার বাড়া হয়ে, তারা অনেকদিন বেঁচে যায়। ভয়ঙ্করভাবে বাঁচতে যাওয়া যে অন্য জিনিস!

হাসি দিয়ে কথাটা বাতিল করে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে সুধা এবার উঠল। এতক্ষণে সুধার খেয়াল হল, গায়ে মাত্র পাতলা একটা ব্লাউজ। আর অমলেন্দুবাবু ধরণীবাবু নন। আঁচল দিয়ে শরীরটা ভাল করে ঢাকতে গিয়ে যৌবনকে আরও ফুটিয়ে তুলল। সচেতন হয়ে যেন ধরা পড়ে গিয়েছে এমনিভাবে হাসল, আর তীর্যকভাবে তাকিয়ে দেখল অমলেন্দুবাবুর মুখ। অমলেন্দুবাবুর মুখে কোন ভাবান্তর নেই। সুধা একটা নিশ্বাস চাপল গোপনে।

বসুন। আপনাকে চা করে দেব বলে উঠলাম।

ঘুঁটে এনে ঘরে একরাশ ধোঁয়া সৃষ্টি করে অত রাত্রে সুধা চা করতে বসল।

ধোঁয়ার জন্য কষ্ট হচ্ছে, না?

অমলেন্দু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। চমকে উঠে বললেন : তা হচ্ছে। দেখবেন এলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছে।

তবে নিষেধ করলেন না কেন?

নিষেধ করিনি বলেই তো এবার চা খেতে পারব।

ঘরের একমাত্র কাপটি যত্ন করে গরম জলে ধুয়ে আঁচলে মুছে সুধা সোনালী রঙের চা এনে রাখল সামনে। শুধু চা-ই নয়: ঘরে কেনা খাদ্যের মধ্যে দৈবাৎ ছিল একটি পেঁপে—একটিই। সেই পেঁপেটিও সুন্দর করে চাক চাক করে কেটে এনে রেকাবীতে করে সাজিয়ে দিল সুধা।

অমলেন্দু হেসে বললেন: আতিথেয়তার পরীক্ষায় আপনি পাসের নম্বর পেলেন সুধা দেবী।

চাই না। কোন পরীক্ষাতেই যে পাস করল না, তার এই একটা পরীক্ষাতে পাস না-করলেও চলবে।

নিজেকে এত ছোট করে ভাবেন কেন সুধা দেবী? আপনি কি জানেন না, আপনি কত পথ এগিয়ে এসেছেন?

কেন জানব না অমলেন্দুবাবু?—জানি। কিন্তু যে তীরটি লক্ষ্য অবধি না পৌঁছে আগেই মাটিতে পড়ে যায়, তার কী গতি হয় বলুন তো অমলেন্দুবাবু?

তা-ও নষ্ট হয় না। আর তীর বলতে যদি আপনি নিজেকেই বুঝিয়ে থাকেন, তবে লক্ষ্যেই-বা আপনি পৌঁছতে পারবেন না কেন? আপনার সামনে এখনো দীর্ঘ ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে—

ভবিষ্যৎ? সুধার আবার ভবিষ্যৎ? তবে শুনবেন, বেচারা সুধার ভবিষ্যতের সমস্যাটা কোন্ ধরণের।? ধৈর্যে কুলুবে?

অমলেন্দুবাবু আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন: শুনব বলেই তো এতক্ষণ বসে আছি সুধা দেবী। বলুন সব কথা।

সুধা নড়ে চড়ে বসে বলে চলল: বলছি। আচ্ছা অমলেন্দুবাবু, কোন বাড়িতে একটিমাত্র বেড়ালকে দেখেছেন কোনদিন? এক বাড়ির একমাত্র বেড়াল—কত নিঃসঙ্গ! একাই সে লুকিয়ে-চুরিয়ে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় ঘোরে। ধরা পড়লে নির্বিবাদে মার খায়। তাকে সাহায্য করার, পরামর্শ দেওয়ার কেউ নেই। তবু এই নিঃসঙ্গতাই সে পছন্দ করে। আর কোনো বেড়াল কখনো এ-বাড়িতে পা দিলে সে লোম ফুলিয়ে থাবা উঁচিয়ে ছুটে যাবে তাকে মেরে তাড়িয়ে দিতে। আমি ছিলাম ঠিক অমনি একটি বিড়াল। সারা পৃথিবীর

লোককে শত্রু বলে মনে করতাম,—কেউ কাছে এলে অমনিভাবে তাড়া করে ছুটতাম। দৈবাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে। অবাক হয়ে দেখলাম, শত্রুতাই মানুষের সঙ্গে মানুষের একমাত্র সম্পর্ক নয়। মানুষ মানুষের বন্ধুও হয়, উপকারও করে! তাতে ক্ষতি হয়েছে এই, এতকাল নিজের বুদ্ধিকেই চরম বলে মনে করতাম; আজ মনে হয়, আর কেউ যদি পাশে থাকত বুদ্ধি দেওয়ার জন্য!

অমলেন্দুবাবু চা'য়ের কাপে চুমুক দিলেন।

এইটেই তো শুভ লক্ষণ সুধা দেবী। বুদ্ধি দেওয়ার লোকের আপনার কখন অভাব হবে না।

কিন্তু অভাব হচ্ছে। ভেবেছিলাম, অন্ততঃ একজন মানুষ আছে যে আমার বন্ধু। কিন্তু সে শুধু আমার মনের ভ্রান্তি।

বলুন তো সে-মানুষটি কে? যদি আমার চেনা কেউ হয় তবে বলতে পারব, আপনার ভুল হচ্ছে কিনা।

সুধার মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বলল: তা বলব না। বলে কোন লাভ নেই।

না যদি বলবেন তবে আপনার সমস্যার সমাধান করব কী করে?

অমলেন্দুকে অবাক করে দিয়ে সুধা হঠাৎ রেগে উঠল: আপনার অহঙ্কার তো কম নয়? সুধার সমস্যার সমাধান করতে চান?

সুধা হঠাৎ উঠে পড়ল। কোত্থেকে খুঁজে খুঁজে একখানা জাঁতি আর এক টুকরো সুপুরি নিয়ে এসে কাটতে বসল। তারপর প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বলল:

বুঝতে পারলাম, আপনি তটিনীদের মতো। তটিনীর মতো আপনারও কাজের একটা বিশেষ ধারা আছে। কিন্তু আপনার ধারা যদি সকলে না নিতে পারে।

অমলেন্দুবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিলেন।

না পারলে ক্ষতি কি? আমি মানুষের মনের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নানা মত থাকবে, নানা পথ থাকবে। মতের সঙ্গে মতের লড়াই লাগবে। লাগুক।

কিন্তু আমার গতি কী হবে? আপনার পথ আর আমার পথ যদি আলাদা হয়ে যায়।

অমলেন্দুবাবু বুঝতে চেষ্টা করলেন, কোথায় সুধার অসুবিধা হচ্ছে।

তার জন্য ভয় কি? সকলের উপরে আমি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারে বিশ্বাসী। আপনাকে বুঝতে সাহায্য করব। কোনদিন জোর করব না। আপনার পথ আপনি বেছে নেবেন।

এ-কথাও সুধার মনঃপুত হল না।

আপনি আমার দায়িত্ব নেবেন বলেছিলেন। এর নাম আপনার দায়িত্ব নেওয়া? আমাকে উদ্ধার করে আপনার দায়িত্ব শেষ হয়েছে! তবে আমি সেখান থেকে চলে এলাম কেন? আমার তো সেখানে থাকাই ভাল ছিল।

অমলেন্দুবাবু বিপদে পড়ে গেলেন। কত হঠাৎ যে সুধা রাজনৈতিক যুক্তির খেই হারিয়ে ব্যক্তিগত প্রশ্নে চলে এসেছে ঠাহর করে উঠতে পারেন নি।

এ-কথা বলছেন কেন সুধা দেবী? আপনার কথা আমার সব সময় মনে থাকে। আপনার কোন্ কাজ না-করা অবস্থায় ফেলে রেখেছি? তবে বার বার আসতে পারি না নানান কাজের ভীড়ে।

জানি, অনেক কাজের মধ্যে আমিও তো একটা কাজ! আমারই বোঝার ভুল হয়েছিল।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েদের নিয়ে যে কী অসুবিধা? এখন যদি অমলেন্দুবাবু বলেন, না, শুধু কাজ নয় আরও কিছু বেশী,—তো অমনি সুধা তার অন্য অর্থ ধরে ফোঁস করে উঠবে।

আপনি তো জানেন না, বিশেষ করে আপনি পড়বেন বলে কত খুঁজে খুঁজে বই জোগাড় করে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।

সুধা এখন দস্তুরমত রেগে গিয়েছে।

ফিরিয়ে নিয়ে যান আপনার বই। কী হবে আমার বই দিয়ে? ছেলে-মেয়ে নেই যে পাতা ছিঁড়ে দুধ জাল দেব।

অমলেন্দু চুপ করে রইলেন।

আপনাকে মহাপুরুষ বলেছিলাম, না? ঠাট্টা করে নয়। সত্যই আপনি মহাপুরুষ। তবে পাথরের। ফুল বেল-পাতা দিয়ে পাথরের দেবতাকে পূজো করবে, সুধা তেমন মেয়ে নয়। আমার দায়িত্ব থেকে আপনাকে মুক্তি দিলাম। আপনি যেতেও পারেন, আবার ফিরে না-ও আসতে পারেন।

আপনার এত রেগে যাওয়ার মত আমি কিছু বলেছি বলে কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না।

সুধা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল।

কেমন হারিয়ে দিলাম তো। মেয়েদের সঙ্গে কখনও কথায় যুদ্ধ করতে যাবেন না। কথায় ওরা মায়াবী।

হাসতে হাসতে সুধা হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেল। কুচুনো সুপুরিগুলো যখন অমলেন্দুবাবুর হাতে দিতে গেল, হাতে ছোঁয়া লাগল। অমলেন্দুবাবুর মনে হল, সুধার হাত কাঁপছে। সুধা নিজেই ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুধার যাওয়ার পথের দিকে অমলেন্দুবাবু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। যে-জায়গাটায় সুধার হাতের ছোঁয়া লেগেছিল, সেখানটা এখনও গরম মনে হচ্ছে। সুধার হাত কি এতই গরম? অমলেন্দুবাবু হাত দিয়ে অনুভব করে দেখলেন, জায়গাটা ভিজে। সুধা কি তবে চোখের জল ফেলেছিল? সেইজন্য পালিয়ে গেল সুধা অমন করে? যে অমলেন্দুর কাছে সুধা সব সময় নিজের শক্তি জাহির করায় ব্যস্ত, তিনি ধরে ফেলবেন তার দুর্বলতা। এই ভয়ে?

সুধার এই পালিয়ে-যাওয়া, তার আজকের সারা সময়ের ব্যবহার, যেমন বিসদৃশ, তেমনি বেমানান। তটিনীর পবিত্র করুণ মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন এই বাড়িতে সারাটা সময় সে নিজের ব্যক্তিগত কথা নিয়ে মেতে রইল: তাই নিয়ে মান অভিমান, বিক্ষোভ প্রদর্শনেরও তার অন্ত রইল না। তবু সুধাকে ভুল বুঝবেন না অমলেন্দুবাবু। সুধার মন অসাড় নয়। মৃত্যু মানে যাদের কাছে শুধু কাঠ কেনা, ঘি কেনা, শ্মশান দফ্‌তরে নাম লেখানো ইত্যাদি কতকগুলো বাড়তি কাজের সমষ্টি মাত্র, তাদের মত বাস্তববাদী সুধা আজও হয়ে ওঠে নি। তটিনীর জন্য সে দুঃখ বোধ করেছে, গর্ব বোধ করেছে; তাদের ঘরে গিয়ে এতক্ষণ ধরে সে শোকার্তদের সামলাতে চেষ্টা করেছে। এ-সবই অনায়াসে অনুমান করা যায়।

তবু, সুধার কাছে আজ তার নিজের সমস্যাটা এতই বড় যে বিশ্বের আর সমস্ত সমস্যা তার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। তটিনীর মৃত্যুর মধ্যে, শোকার্তদের মধ্যে, সে শুধু এতক্ষণ ধরে নিজের প্রশ্নের জবাবই খুঁজেছে। অমলেন্দুকে পেয়ে তাই সে তৎক্ষণাৎ সব ভুলে নিজের কথা নিয়ে মেতে

উঠেছে। অমলেন্দু আবার কবে আসবেন, আর কখনো আসবেন কিনা, এই ভরসায় অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই।

সুধার নিজের ভাষায়, যতদিন সে এক বাড়ির একটি একক-বিড়াল ছিল, ততদিন তার সমস্যাটা অনেক সরল ছিল। যেদিন সে আবিষ্কার করল, সে মানুষ, সে দিন তার সমস্যা দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে। মানুষ বলেই আজ তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য প্রয়োজন,—শ্রান্তির সময় যে তাকে আরাম দেবে, দুঃখের সময় দেবে সান্ত্বনা, বিভ্রান্তির সময় দেবে সঠিক পথের সন্ধান। ধরণীবাবুকে দিয়ে এ-প্রয়োজন মিটবার নয়; প্রতিবেশীদের মধ্যে মেলা-মেশা করেও এমন মানুষের সন্ধান মেলেনি।

কিন্তু নিজের কথাই কি ঠিক করে বলতে পেরেছে সুধা? তা-ও মনে হয় না। নিজের কথা বলবে বলে ডেকে এনেছিল অমলেন্দুবাবুকে, কিন্তু ভাষার যত কারসাজি সে জানে, সঙ্কট মুহূর্তে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার নারী-সুলভ যত ছলা-কলা তার আয়ত্তে আছে, সব দিয়ে সে চেষ্টা করেছে নিজেকে দুর্বোধ্য করে তুলতে। সুধাকে অমলেন্দু সম্পূর্ণ বুঝেছেন, একথা বললে মিথ্যে বলা হবে।

সুধা কী চায় তার কাছে? কী তিনি দিতে পারেন সুধাকে? কেন তাঁর কাছে সুধার এত দাবী, এবং দাবী অপূরণ থাকার জন্য অভিযোগ পর্বত-প্রমাণ হয়ে উঠল? কোন এক সঙ্কট মুহূর্তে তিনি সুধাকে গুটিকয়েক উপদেশ দিয়েছিলেন বলেই কি সুধা ধরে নিল, এই মানুষটা তার দাবী মেটাতে বাধ্য; আর দাবী মেটানোর যোগ্যতাও এই মানুষটার নিশ্চয় আছে।

বড় জেলখানা থেকে ছোট জেলখানার খন্দের জোগড় করার প্রচেষ্টায় তাঁর সারা জীবন কেটে গেছে। ছেলে-মেয়েদের তিনি শুধু একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই দেখেছেন,—রাজনৈতিক কর্মে তাদের অংশ-গ্রহণ করার সম্ভাবনার দিক থেকে। সুধাকেও কি তিনি সেই চোখ দিয়ে দেখেন নি? সচেতন ভাবেই হোক, অর্ধ-সচেতন ভাবেই হোক, সুধার সঙ্গে আলোচনাকে কি তিনি সবসময়েই রাজনৈতিক সমস্যার কাছাকাছি নিয়ে আসতে চেষ্টা করেন নি? এটা যে তাঁর পবিত্র কর্তব্য, এ-কর্তব্য তিনি পালন করবেন সারা জীবন ধরে। কিন্তু মুস্কিল বাধিয়ে দিল সুধা। তিনি তার কাছে রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলেছিলেন; সে এগিয়ে এল তার সমগ্র জীবনের প্রশ্ন নিয়ে। এ-প্রশ্নের

জবাব তিনি কী করে দেবেন? যখন তাঁর যৌবন ছিল, ছিল আবেগ-অনুভূতি আর হৃদয়, সেদিন হয়তো অনেক সহজে তিনি সুধার মুখোমুখি হতে পারতেন। আজ যে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক কর্ম আর চিন্তার একাগ্রতায় আবেগ-অনুভূতির কুঁড়িগুলো কখন যে জল-সেচের অভাবে শুকিয়ে গিয়েছে, টেরও পাননি। আজকে অমলেন্দু বলতে শুধু যে কতকগুলি ছকবাঁধা চিন্তা ও কর্মের সমষ্টিকে বোঝায়! অঙ্ক-শাস্ত্রের কয়েকটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে যে অমলেন্দুকে অনায়াসে বুঝিয়ে দেওয়া চলে! আদর্শবাদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হলে এই শাস্তি গ্রহণ করতে হয়। এই সবচেয়ে বড় আত্মত্যাগের খবর রাখে না দেশবাসী, না উল্লেখ করে ইতিহাস।

কিন্তু সুধা এত দেরী করছে কেন? অমলেন্দুবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আর দেরী করলে এ-পাড়ায় বাস পাওয়া অসম্ভব হবে। সুধাকে কিছু বলে যাওয়া খুব উচিত ছিল, কিন্তু বাস পাওয়াটাও যে তেমনি দরকারী। সুধা কি বুঝবে না সে-কথা?

অমলেন্দু এক-পা এক পা করে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। সুধার সঙ্গে দেখা হওয়ার অস্বস্তিটা এড়ান গেল বলে নিজের অজ্ঞাতেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

হঠাৎ চোখে জল এসেছিল বলে সুধা পালিয়ে গিয়েছিল! হয়তো খুব বেশী ধোঁয়া গিয়েছিল চোখে, হয়তো কোন ভাসমান পোকা ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু অমলেন্দুবাবু যদি দেখে ফেলে থাকেন তো সেটা ভীষণ লজ্জার ব্যাপার! পৃথিবীতে বিশেষ করে এই মানুষটা তার ইতিহাস জানেন। জানেন, তার দেহে কত ক্লেদ জমে আছে। এই মানুষটা সুধাকে শুধু দয়াই করতে পারেন, এবং তার জন্য অনুযোগ দেওয়ারও কিছু নেই! ছি ছি! কী লজ্জার কথা, যদি তার ব্যবহারে অমলেন্দুবাবু ভিন্ন-কিছু মনে করে থাকেন!

আজকেই তটিনী মারা গিয়াছে। আর এমনি পবিত্র রাতে আজকেই কী বিশ্রী নাটক করে এল সুধা? ছি ছি ছি!

আটাশ

বাড়ির গেট থেকে কল্যাণবাবুকে ধরে নিয়ে গেলেন ঘোষাল মশাই, এনে তুললেন তাঁর ডিসপেন্সারীতে।

আজকাল কী হয়েছে আপনার বলুন তো কল্যাণবাবু? দেখা মেলাই ভার হয়ে উঠেছে?

কথাটা সত্যি। এক সময় ছিল কল্যাণবাবু এখানে রোজ আসতেন। কোনদিন একবার, কোনদিন বা দু'বার তিনবার। রাজনৈতিক তর্কই হোক, আর ভবিষ্যতের শলা-পরামর্শই হোক, আর স্রেফ গল্প-গুজবই হোক,— এখানকার আড্ডাটা ছিল জল-খাওয়া ভাত-খাওয়ার মতই অপরিহার্য। তারপর একদিন, যাওয়া-আসা কমতে শুরু করল। শেষে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুই হয় নি, ঘোষাল মশাই। যেমন আপনারও কিছু হয় নি। শুধু কি করে কে জানে যাওয়া-আসার অভ্যেসটা চলে গেছে।

ডিসপেন্সারীর ঘরটা ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন কল্যাণবাবু। কোথাও এতটুকুও বদলায়নি, ঠিক একই রকম আছে। তখন মনে হত না, আজ কিন্তু ঘরখানাকে বড়ই শ্রীহীন আর নোংরা বলে মনে হল। যেন অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরে এসে দেশের বাড়িতে ফিরে সমালোচকের চোখ দিয়ে সব দেখছেন কল্যাণবাবু।

ঘোষাল মশাই নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলেন: 'এ রকম হয়। একটা কাজের অছিলায় তখন যাওয়া আসা ছিল। সেই অছিলাটা হারিয়ে গেছে। কতদিন হয়ে গেল আমাদের দরখাস্তটার একটা খবর পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

ও সমস্ত জিনিস নিয়ে এখন আর ভাবিই না ঘোষাল মশাই! কি ঠিক করেছি জানেন? শিশুরাষ্ট্রের কাছে এখন আর যাবই না কোন কাজে। ওদের সময় দিলাম। সামলে নিক। ততদিন নিজেরা যা পারি করে যাব

কথাটার মধ্যে যে কতখানি প্রচ্ছন্ন অভিমান রয়েছে তা লক্ষ্য না করে ঘোষাল মশাই বললেন: আপনার মত এমন করে আর ক'জন চিন্তা করে? তা হলে আর দেশের দুঃখ ছিল কি? ভাল কথা, আপনার ইস্কুলের ধর্মঘটটা চলতে দিচ্ছেন কেন? কাজটা কি ভাল হচ্ছে?

কল্যাণবাবু পদত্যাগ করার পর থেকে ইস্কুলে ধর্মঘট চলছে। কল্যাণবাবু প্রথমটায় ছেলেদের নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শেষে তাদের ন্যায়সঙ্গত যুক্তির কাছে হার মেনেছেন। কল্যাণবাবু সেই ধরনের শিক্ষক নন, যাঁরা ছাত্র বলেই ছাত্রদের যুক্তি মেনে নিতে পারেন না।

কল্যাণবাবু হেসে বললেন: শুনুন ঘোষাল মশাই, ধর্মঘট করব বলেই তো ধর্মঘট কেউ করছে না। ওরা ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মেনে নিক না। এক মিনিটে গোল মিটে যাবে।

কল্যাণবাবু, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা। সেই জন্যই আপনাকে ডাকলাম আপনার মঙ্গল কামনা করি বলে। সরকার এখন আমাদের। এখন সব কিছু আপোসের ভিতর দিয়ে মিটিয়ে নেওয়া দরকার। মন্মথবাবু খুব ভাল লোক। আপনি গিয়ে বললে মাইনে সম্পর্কে নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন।

না—না, মাইনের জন্য নয়। মাইনেটা কোন প্রশ্নই নয়। প্রশ্ন হল, মার্কাটারই দাম বেশী, না আসল গুণটারই দাম বেশী। আমাকে প্রাইমারীতেই পড়াতে হবে, না, উঁচু ক্লাসগুলোতেও পড়াতে পারব।

এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি নিজেদের সরকারের সঙ্গে ঝগড়া করবেন?

সরকারের সঙ্গে আমার তো কোন ঝগড়া নেই ঘোষাল মশাই। আমি বরং সরকারকে সাহায্য করছি।

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পারবেন। বুঝিয়ে বলছি। আমাদের দেশে ইংরেজের আমলের অনেক পচা ঘুনে-ধরা ব্যবস্থা এখনো চলছে। সমস্ত কিছু উপর থেকে চাপ দিয়ে বদলানো অসম্ভব। কারণ একদল রক্ষণশীল লোক বিরুদ্ধে গিয়ে সরকারের অসুবিধে সৃষ্টি করবে। কাজেই বদলানোর কিছু কিছু দায়িত্ব যদি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেই, তাতে সরকারের কাজই করে দেওয়া হয় না কি?

ঘোষাল মশাই এমন ভাবে তাকালেন যেন তিনি অল্পবয়সী কোন ছেলের মুখে নীতি-বিগর্হিত কথা শুনছেন।

বুঝেছি। শুনুন কল্যাণবাবু, আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই বলছি। এ সব অদ্ভুত যুক্তি-পরামর্শ আপনাকে কে দিচ্ছে জানি না। কিন্তু সে আপনার শত্রুতাই করছে। স্ট্রাইক আপনি বন্ধ করে দিন, এবং অবিলম্বে। শেষে অনুতাপ করেও কোন কূল পাবেন না।

কল্যাণবাবু তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল।

এই কথা বলার জন্য বুঝি ডেকে এনেছিলেন ঘোষাল মশাই? আপনার শুভ-কামনার জন্য ধন্যবাদ। তবে একটা কথা বলে যাই, শুনে রাখুন। যা ন্যায় বলে বুঝি, তা করার জন্য জীবনে কখনও অনুতাপ করি নি। আজকেও করব না।

গট্ গট্ করে কল্যাণবাবু বেরিয়ে গেলেন। তাঁর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হাসলেন ঘোষাল মশাই। লোকটা একেবারে ভাবালুতার ফানুস! ভাবালুতা দিয়ে কি আর রাজনীতি করা যায়? না বোঝা যায়?

ঘোষাল মশাইও তবে কি তাই অনুমান করলেন? সত্যিই কি কল্যাণবাবুর জীবনে দিক্-পরিবর্তনের সূচনা এবং প্রয়োজন উপস্থিত হল আজকে, এতদিনে, এতবছর পরে? সেই চিরকালের কল্যাণ সেনের বদলে কি সত্যিই দেখা দিল আর এক নতুন কল্যাণ সেন? প্রশ্ন করে করে নিজের মনকে ক্লান্ত করে ফেললেন কল্যাণবাবু। প্রশ্নের জবাব প্রশ্নের মধ্যেই রয়েছে, —তবু একই প্রশ্ন নানাভাবে করেও যেন আস মিটছে না। নিজের মধ্যে নতুন কিছুকে আবিষ্কার করার সেই অপরিমিত বিস্ময়ের ঘোর যেন আর কাটতে চায় না। বুকটা একটু দুড়-দুড় করছে বৈকি—কল্যাণবাবুর অমন শক্ত বুকও। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

কতদিন কতবার কল্পনা করেছেন কল্যাণবাবু যে বিত্তে সম্মানে প্রতিপত্তিতে তাঁর জীবনে আসবে বিপুল পরিবর্তন। রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়িতে পা দেওয়ার মুহূর্তেই তাঁর মনে হয়েছিল—এই নতুন করে জীবন আরম্ভ করা নতুন পরিবর্তনের ইঙ্গিত হয়ে উঠুক। অবশেষে সেই পরিবর্তন এল কী অভাবিত অকল্পনীয় পথে! কোন দিন তিনি কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে তাঁর এত বছরের এমন একনিষ্ঠ রাজনৈতিক আনুগত্য একদিন ভেঙে

পড়বে? তিনি সাধারণ মানুষের সারিতে নেমে এসে নিছক মানুষ হিসাবে বিচার করবেন নিজের দলের কর্মগতিকে? এ যেন বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্‌গমের মতোই নিতান্ত সাধারণ, অথচ এক আশ্চর্য অভাবনীয় ব্যাপার। এ পরিবর্তন তাঁকে যশ দেবে না, প্রতিপত্তি দেবে না, তা তিনি জানেন। তবু নিজের মনের মধ্যে এই পরিবর্তনের খবর জানতে পেরে আজ কী পরম উল্লাসেই না অন্তর ভরে উঠেছে! যশ নয়, প্রতিপত্তি নয়, এক বিপুল মুক্তি তিনি আজ অন্তরে অনুভব করতে পারছেন। আজ তিনি নিজের অন্তরের তাগিদ অনুযায়ী একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন।

সকাল বেলার ঘন নীল আকাশ থেকে প্রশান্ত নির্মল সূর্য-কিরণ সহর-তলীর নোংরা বস্তিগুলোর উপর পড়ে ঝক্‌মক্ ঝরছে। কী মিষ্টি লাগছে শীতের সকালের এই শিশির-ভেজা রোদ! সূর্যের আলোর দিগন্ত অতিক্রান্ত ব্যাপ্তির মতই নিজের মনের এক অসীম ব্যাপ্তিকে কল্যাণবাবু অনুভব করলেন। শুধু অসীম আকাশে নয়, কল্যাণবাবুর মনের আকাশেও আজ ঝাঁকে ঝাঁকে মুক্তপক্ষ পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছে যেন।

যা ভাবা যায় না, যা অনুমান করা যায় না, এমন এক আশ্চর্য নাটক ঘটল আজ কল্যাণবাবুর জীবনে। একমাত্র জীবনের মোড়ে মোড়েই আছে এমন আশ্চর্য অপরূপ বিস্ময়। সেই জন্যই জীবন এত সুন্দর!

উনত্রিশ

থানা থেকে সকালের দিকে একটা পুলিশ এসেছিল চিঠি নিয়ে। সময়টা ছিল ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে যাওয়ার। সিপাইটি যখন সিঁড়ির কাছে, দেবু, কানাই, শম্ভু, অরুণ প্রভৃতি একদল ছেলে তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে। একক নিরস্ত্র সিপাইকে দেখে ওরা তৎক্ষণাৎ খুশী হয়ে উঠল! যথোচিত আদর-আপ্যায়ন করতে ইতস্তত করল না।

ক্যা মাংতা?—একজন জিজ্ঞেস করল।

চিঠ্‌ঠি হ্যায়! তুম্‌হারা বাবুজীকো বোলাও।

লোকটা যখন পকেট থেকে চিঠি বের করছে সেই অবসরে একটি ছেলে সিঁড়ির উপর থেকে নাগালের মধ্যে পেয়ে তার মাথার পাগড়ীটা উড়িয়ে দিল।

হা হা করে লোকটা ছুটতে যাবে, কিন্তু ততক্ষণ দু'তিনটি ছেলে তার হাঁটুর নিচের দিকটা ধরে বসে পড়েছে।

তোমার পায়ে ফিতে বেঁধে দিয়েছে কে গো সিপাইজী? আহাহা, কত লাগছে পায়ে! দাঁড়াও, দাঁড়াও, খুলে দিই।

সিপাইটি এদের যখন ছাড়াতে চেষ্টা করছে, ওদিকে তখন পাগড়ীটা নিয়ে ফুটবল খেলা শুরু হয়ে গেছে।

টানাটানি ছুটোছুটি করতে করতে এক ফাঁকে চিঠিটা হাত থেকে উড়ে গেল। খেয়াল হল একটু পরে। ততক্ষণ বিশ্বাসঘাতক বাতাস সেটা চোখের আড়ালে সরিয়ে ফেলেছে।

অথচ আদেশ আছে, চিঠিটা দিয়ে বাড়ির দু'তিন জনের সই নিতে হবে। আদেশ পালন করার আর সুযোগ নেই দেখে গজগজ করতে করতে সিপাইজী ফিরল।

কিন্তু দারোগার কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ারও একটা সমস্যা রয়ে গেল। তবে পুলিশের বুদ্ধি। উপায় বের করতে কতক্ষণ!

সিপাইটি থানায় গিয়ে রিপোর্ট করল, তাকে একা পেয়ে বাড়ির আটদশটি

গুণ্ডা-গোছের লোক মারপিট করেছে। চিঠিটা কেড়ে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছে। হাঁটুর উপর একটা পুরোনো ঘা ছিল। সিপাইজী দেখিয়ে বলল : এইখানটায় ইট মেরেছে।

পুরোনো ঘায়ের চেহারা আর সন্থ ইট-পড়া ক্ষতের চেহারা এক নয়। কিন্তু অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার কোন গরজ ছিল না দারোগাবাবুর।

দারোগাটি নতুন এসেছেন এই থানায়। কিন্তু তাতে কি? আগে থেকেই তিনি রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়ির অনেক খ্যাতি শুনে এসেছেন। এই বে-আইনী জনতা-অধ্যুসিত বাড়ির লোকগুলি শুধু বদ্‌মাইশই নয়, প্রচুর কূট-বুদ্ধিও রাখে। বাড়ির মালিক আইন-আদালত করে হয়রান হয়ে গেছেন। শেষে বহু কষ্টে মোটা-বুদ্ধি সরকারের মগজে গণ্যমান্য লোকেরা এইটুকুন ঢোকাতে পেরেছেন যে—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং—মাত্র একটাই পথ আছে। সরকারের পক্ষ থেকে বাড়িটা রিকুইজিসান করে নেওয়া চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে।

সেই নোটিশটাই পাঠানো হয়েছিল। আর পাজী লোকগুলো নিরীহ সিপাইটাকে মেরে সরকারের পবিত্র ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ভাল ব্যবহার করব প্রাণপণে ভাবলে কী হবে? অশুভ-বুদ্ধির বিরুদ্ধে কঠোর হস্তে আইন ও শৃঙ্খলা প্রয়োগ না করে উপায় থাকে না।

বাড়িটায় দারোগাবাবুরও একটু স্বার্থ আছে। রিকুইজিসান করা হচ্ছে কয়েকজন রিফিউজীর জন্য, আর তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর ভাইয়ের জন্য একখানা ঘর তারা রিজার্ভ রাখবে। কিন্তু সে-সব পরের কথা। আপাতত দুটো কাজের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে চাপল। দুটো কাজই দরকারী। নোটিশটা ঠিকমত সার্ভ করা, যাতে আইনের কোন ফাঁক না থাকে। আর সরকারী কর্তব্য-পালনে সিপাইকে বাধা দেওয়া ও মারপিট করার জন্য শাস্তি-বিধান করা। নিজে সারজমিনে যাওয়াই যুক্তি-সঙ্গত বোধ করলেন দারোগাবাবু। আসুক বিকেলবেলা।

এ-সব অঞ্চলে দারোগাবাবুর এই প্রথম আসা। সনাতন দারোগা-বুদ্ধি দিয়েই তিনি বিষয়টা বিবেচনা করলেন। এদেশের মানুষগুলোকে একজন দারোগা ধূলোর মত মুঠো-ভর্তি করে খুশিমত ছুঁড়ে ফেলতে পারে। বাড়িটার বদনাম শুনেছেন। কিন্তু শোনা-কথা আর দেখা-অভিজ্ঞতায় তফাৎ থাকে।

তিনি ভাবতেই পারলেন না, যেখানে বোমা তৈরী হয় বলে রিপোর্ট নেই, সেখানে একা যাওয়া যায় না। গোটা কয়েক আধ-পেটা-ভাত-খাওয়া বাঙালী মেষশাবকের কাছে যাওয়ার জন্য কি সাঁজোয়া গাড়ি লাগবে? নিজের পেশীবহুল রোমশ হাতখানির দিকে তাকিয়ে আত্ম-বিশ্বাসে হাসলেন দারোগাবাবু। পুরু ঠোঁটের উপরকার সূক্ষ্ম সুচারু গোঁফ-শিল্পটির উপর সস্নেহে হাত বুলোলেন একবার। হাফ্ প্যাণ্টের নীচের অনাবৃত উরুর উপর আদর করে চাপড় মারলেন গোটা কয়েক।

রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়ি সম্পর্কে যদি দারোগাবাবু আর একটু বেশী জানতেন!

আমাদের পরিচিত সিপাইটি এবং আর একজন সিপাইকে সঙ্গে নিলেন। একখানা করে বেঁটে গোছের লাঠি নিতে দিলেন সঙ্গে। তারপর বিকেলের পড়ন্ত রোদে সদ্য ভাঁজ-খোলা স্যুটে চক্চকে হয়ে এ-বাড়িতে এলেন।

নীচের তলার বারান্দায় দিল্লীর দরবার বসিয়ে ফেললেন। হাঁকডাকে লোকজন জড়ো হলে অফিসার বললেন: একখানা চেয়ার আনিয়ে দিন তো। আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা বলার আছে।

কল্যাণবাবু পটলকে ইঙ্গিত করলেন। পটল চোখ মট্কিয়ে বলল: দাঁড়িয়ে কাজ সারলেই যেন ভাল ছিল। পরের চাকরি। বসে বসে বাত ধরে গেলে ছাড়িয়ে দেবে।

মনে মনে গরম হলেন অফিসার। আজকালকার শিক্ষায় গলদ থেকে যাচ্ছে। পরের চাকরি করছেন, এ-কথা লোকের মুখে শুনতে হবে? তিনিই সসাগরা ভারত-ভূখণ্ডের মালিক, লোকের মনে এই বোধটা থাকাই স্বাস্থ্যকর!

ইতিমধ্যে পটল এক দৌড়ে চেয়ার এনে দিয়েছে। তিনি বসলেন। পেটটা কেমন আঁটো আঁটো লাগছে—দুপুরের খাওয়াটা একটু বেশী-ই হয়ে গিয়েছিল। প্যাণ্টের ওপরদিককার গোটা-দুই বোতাম খুলে দিলেন। ভাল করে শরীরটা লিয়ে দিতেই উদ্বাস্ত চেয়ারটা প্রতিবাদে ক্যাঁচ কোঁচ করে উঠল। হ্যাটটা খুলে হাঁটুর উপর রাখলেন। যাঁদের সম্ভ্রান্ত বলে মনে হল, তাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। ভাবটা এই, তোমাদের খানিকটা মূল্য দিচ্ছি, তোমরা আমাকে পুরো মূল্য দিও।

সকাল বেলাকার সিপাইটির দিকে তাকিয়ে বললেন: কে কে তোমাকে মেরেছিল দেখিয়ে দাও।

উপস্থিত সকলের চোখেই বিস্ময়। অফিসার অনুমান করলেন, সকলেই ঘটনাটি হয়তো না-ও জানতে পারে। সম্ভ্রান্তদের দিকে তাকিয়ে বুঝিয়ে বললেন: শোনেন নি বুঝি! আজ সকালে এ-লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম এখানে একটা নোটিশ সার্ভ করার জন্য। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আপনাদের বাড়ির কয়েকটি লোক সরকারের কর্তব্য পালনে বাধা দিয়েছে। লোকটাকে একা পেয়ে মার-ধরও করেছে। কালপ্রিট ক'জনকে আমরা চাই এখন।

পটল তৎক্ষণাৎ বলে উঠল: ও হরি! তাই আপনাকে বলেছে বুঝি পাজী লোকটা? ব্যাটা যখন আসে আমি তো বারান্দার উপরেই ছিলাম। বাচ্চা ছেলেরা ইস্কুলে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে খানিক রঙ-তামাসা করেই তো ব্যাটা শটকান দিল। নোটিশ ছিল তো আমাদের ডাকল না কেন?

সিপাইজি গরম হয়ে বলল: ঝুটবাত বলতা হায়। বিলকুল ঝুট।

তারপর আর একবার সকালের ঘটনাটা বলে গেল। তার হাতে লাঠিটাও যদি থাকত তবে অবশ্য দেখিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তার একেবারে খালি হাত, এদিকে এরা ইট-পাটকেল, লাঠি-শড়কী-ছোরা প্রভৃতি নিয়ে এসেছিল।

অফিসার বুঝলেন, গল্পটা ক্রমশ টেনে লম্বা করা হচ্ছে। হাসলেন একটু। ডিপার্টমেণ্টের কৃতিত্ব তো।

বুঝেছি। সকালে কে কে ছিল তুমি শুধু দেখিয়ে দাও।

এবারে সিপাইটি একটু অসুবিধায় পড়ে গেল। অনেক ভেবে-চিন্তে চারদিকে চোখ বুলিয়ে সে লক্ষ্মণকে পছন্দ করল। গায়ে-পায়েও ভারী —দেখলেই গুণ্ডা বলে বোঝা যায়। পড়া-লিখা জানা ভদ্দর আদ্মীও নয় যে পরে ঝামেলা করবে।

অফিসার একটি সিগারেট ধরালেন। তামাকের ধোঁয়ায় গলা ভাল সাফ থাকে।

তুমি এদিকে এস।—অফিসার তর্জনী নেড়ে লক্ষ্মণকে ডাকলেন।

লক্ষ্মণ ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল।

হুজুর, আমি বাড়িতেই আছিলাম না সকাল-বেলা।

অফিসার দেখেই বুঝলেন, লোকটা পাকা বদমাইশ। মুখ দেখে লোক চেনা শিখেছেন কত চেষ্টা করে!

জেল-টেল খেটেছ কোনদিন?

কোনদিন না।

সত্যি কথা বল, স্টুপিড!—ধমকিয়ে বললেন।

হাজতে আছিলাম দিন কয়েক। সে একেবারে মিথ্যা সাজান্তা মামলা।

বুঝেছি। আমি তোমাকে এ্যারেস্ট করলাম। পাকড়াও ইস্‌কো।

আদেশ পেয়ে একজন সিপাই গিয়ে লক্ষ্মণের হাত ধরল। লক্ষ্মণ অল্প চেষ্টায় হাত ছাড়িয়ে নিল। তাকে এমন আচমকা কেউ গ্রেপ্তার করতে পারে ধারণাই করতে পারছে না। তখন দু'জন সিপাই দু'দিক থেকে গিয়ে তার দুটো হাতই মুচড়িয়ে শক্ত করে ধরল।

কল্যাণবাবু জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কী করতে চাইছেন দারোগাবাবু? লোকটা যাদের-যাদের দেখিয়ে দেবে তাদেরই এ্যারেস্ট করবেন নাকি?

আপনাকে দেখে বিদ্বান বলেই বোধ হচ্ছে। কর্তব্য-রত সিপাইয়ের গায়ে হাত দেওয়া কত বড় গর্হিত অপরাধ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

আর ওর অভিযোগটা যদি মিথ্যে হয়?

সে-বিচার কোর্টে হতে পারবে। বিচার করার মালিক আমি নই।

বড় মুখেই সত্য-ভাষণ মানায়। এত বড় দোর্দণ্ড-প্রতাপশালী, তবু সর্বশক্তিমান নন, নিজ মুখেই স্বীকার করলেন অফিসার। লজ্জিত হলেন না, গর্ব করে হাসলেন।

কয়েকটি অল্প-বয়সী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কোত্থেকে সুধা এসে উপস্থিত হল। দারোগা, পুলিশ, ভীড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কী ব্যাপার? কী হয়েছে?—অনির্দিষ্ট প্রশ্ন। তবু ধোবাদের যে-ছেলেটা সামনে পড়ল সে বলল সংক্ষেপে।

তা এ-লোকটাকে এ রকম করে ধরে রাখার মানে? হাত লাল হয়ে উঠেছে! ডাকাত নাকি এ?

সকলে সাহসী বলে বলে সুধার মাথা গরম করে দিয়েছে। না হলে

মেয়েমানুষ হয়ে জলজ্যান্ত নর-রূপী যমের সঙ্গে সাধ করে ঝগড়া করতে যায়? এতগুলো ব্যাট-ছেলে তো রয়েছে! বললে বলতে পারে, তবু তো বলছে না কিছু?

সকালবেলাকার সিপাইটির মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল।

ই-জানানা ভী থা ঝামেলা-করনে-বালা আদ্‌মী লোগোকো সাথমে।

বুঝতে পেরেছি,—অফিসারটি মাথা নাড়লেন। নিশ্চয়ই সেই কুখ্যাত খাণ্ডার মেয়েটা।—এগিয়ে আসুন তো। আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

সুধা এগিয়ে এল না। বরং দু' এক পা পিছিয়ে গেল।

ছেলের হাতের মোয়া নাকি গ্রেপ্তার করা? আপনার ওয়ারেণ্ট কোথায়?

দুজন সিপাই-ই আটকে আছে। অবশ্য অর্ডার দিলে একজন এসে একে ধরতে পারে। কিন্তু কর্তব্য-পরায়ণ দারোগা নিজেই উঠে এসে সুধার হাত ধরলেন। মেয়ে হলেও এ সব মেয়ের বিষ থাকে। চক্ষুর নিমেষে উধাও হতে পারে।

পুলিশের কতখানি ক্ষমতা আছে একটা বাজারের মেয়ের মুখে শুনতে হবে নাকি আমাকে?

আর চারগুণ ওজনের মানুষটার থেকে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য টানাটানি শুরু করল সুধা।

হাত ছাড়ুন। লাগছে।

টানাটানিতে সুধার ঘামে-ভেজা হাত একটুখানি পিছলে গেল। অফিসারের হাতের মুঠো নেবে এল সুধার কব্জি অবধি। যতটুকুন নেমে এল ততটুকুন জায়গা টকটকে লাল হয়ে গেল। অফিসারের মুঠো এবার সুধার হাতের কাঁচের চুড়ির উপর চাপ দিল। মট্‌ মট্‌ করে চুড়ি ভেঙে গিয়ে নরম মাংসের মধ্যে প্রবেশপথ খুঁজে নিল। উষ্ণ তাজা রক্ত নেমে এসে হাতের আঙুল অবধি ভিজিয়ে দিল। ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে লাগল মাটিতে।

এ-ব্যাপারটা সুধা তখন টেরই পায়নি। 'বাজারের মেয়ে' এবং 'তুমি' সুধার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কোন এক অতীতে কথাটা সত্যি ছিল বলে রাগ হল শতগুণ তীব্রতর। সুধার মুখখানা যেন পলাশ ফুলের গুচ্ছ। যেন বিদায়ী-সূর্যের লাল আভা পড়েছে কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে।

হাত ছাড়ুন বলছি।

সুধা এত জোরে কথা বলল যে বুক ফুলে উঠল, সমস্ত শরীর দুলে উঠল গমকে-গমকে।

অনভ্যস্ত ধমক শুনে তেমনি গর্জন করে উঠলেন অফিসার: পুলিশের মুখের উপর চোখ গরম করিস্ হারামজাদী বজ্জাত মাগী!

বলতে বলতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন অফিসার। পালিশ করা মুখে কথাগুলো বেরিয়ে আসে ঝরণার মত। চাপতে গেলে কথা হোঁচট খায়। হোঁচট খেয়ে খেয়ে রাগ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু পাশে এতগুলো পুরুষ-মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে—এরা কি পাথর? সুধার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে ঝামেলা চলছে, কেউ তো আপত্তি জানিয়ে বলছে না: মাপ করুন, মেয়েছেলেকে ছেড়ে দিন?

এতখানি নিথর, এতখানি নিষ্প্রাণ কেন মানুষগুলো? দারোগার দাপট দেখে ওরা কি খুবই ভয় পেয়েছে?

তবু কেমন অস্বস্তি বোধ হওয়ায় সুধার হাত ছেড়ে দিয়ে জনতার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন দারোগা। লিখতে অনেক জায়গা লাগল। কিন্তু সুধাকে শেষ কথাগুলো বলা, এতগুলো জিনিস ভাবা এবং দারোগার ঘুরে দাঁড়ানো প্রায় একই সময়ে ঘটল।

আর সেই একই সময়ে একখানা আধলা ইঁট দারোগার কপালে এসে লাগল। খুব তাক্ করে ইঁটখানা মেরেছিল অটল, এ-বাড়ির সবচেয়ে নিরীহ মানুষটা। টাল সামলাতে না পেরে দারোগা বসে পড়লেন। সেই অবস্থাতেই কোমরের খাপটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন রিভলভারটা বের করবেন বলে।

ভাববার সময় ছিল না। এক সেকেণ্ড সময় পেলে অফিসারের রিভলভার গর্জে উঠবে, আর একের পর এক মাথার খুলিগুলো ভাঙতে থাকবে। সেই এক সেকেণ্ডের প্রতিযোগিতায় ওদের জিততেই হবে।

ওরা জিতল। বিশ-পঁচিশ জন মরদ ছেলে তৈরী সৈনিকের মত এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোন অস্ত্র ছিল না। শুধু কিল আর ঘুসি আর লাথির অবিরাম বর্ষণ চলল। মিনিট দুই-তিন মাত্র। কে একজন জুতো দিয়ে দারোগার মুখখানা মাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল: আর কখনো বলবি? এই ভারতবর্ষের মাটিতে মেয়েমানুষকে মাগী বলবি আর কখনো?

হঠাৎ কেমন একটা অস্বাভাবিক গোঙানি বেরিয়ে এল দারোগার মুখ দিয়ে। গলা থেকে নয়, পেট থেকে এল যেন শব্দটা। অতি দীর্ঘ গোঙানি শেষ হলে সমস্ত শরীরটা একটা অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল! ঘাড়টা কতদূর অবধি বেঁকিয়ে গেল এক পাশে।

কেমন অস্বাভাবিক বোধ হওয়ায় জনতা এক পা পিছিয়ে এল। তখনও সবাই মিলে থু থু ফেলছে নিশ্চল দেহটার উপর।

এই ফাঁকে পুলিশ দু'জন সরে পড়তে পারত। কিন্তু ব্যাপার কদ্দুর গড়িয়েছে বাইরে থেকে তারা বোঝেনি। প্রভুকে বাঁচাতে পারলে পদোন্নতি অবধারিত। হাতে লাঠি আছে, চিন্তা কি? লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে জনতার দেওয়াল ফাঁক করতে যেতেই জনতা সচেতন হল। পুলিশ দু'জন সহজেই বন্দী হল।

লোকগুলো বোঝেনি, ভয় পেয়েছে। বয়স্কের দল একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। না পেরেছেন নিবৃত্ত হওয়ার অনুরোধ করতে, না পেরেছেন সঙ্গে যোগ দিতে। মনোরমবাবু এগিয়ে এসে পরীক্ষা করলেন নিশ্চল দেহটা নাড়ী দেখলেন, বুকে হাত দিলেন, নাকের কাছে আঙুল ধরলেন। হতাশ হয়ে নিজের হাত দু'খানা টান করে চিত করলেন শুধু। উপস্থিত সবাই কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল যেন। এই জিনিসটা কারও সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

লোকটা অনেক জাঁক করে এসেছিল, আর ফিরে গেল না। কায়েমী স্বার্থের অল্প-দামে-কেনা জীব, তবু দম্ভ আর অহঙ্কার আর ঘৃণার হিমালয় পর্বত। এক মিনিট আগে মনে হয়েছিল, অপরাজেয়। জনতার ক্রোধের ফুৎকারে গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ল। যেন প্রকাণ্ড একটা ঘর-জোড়া বেলুন আঙুলের সামান্য টোকায় এক নিমেষে ফেটে গেল। পড়ে রইল একটুখানি কুঁচকে-যাওয়া রবার।

সমস্ত ঘটনাটা ঠিক এই রকমেরই মনে হয়েছিল কল্যাণবাবুর কাছে। হত্যা বলেও অনুশোচনা করার সুযোগ দেখলেন না : সাধারণ মৃত্যু বলে দুঃখ বোধ করারও অবকাশ পেলেন না। দূর থেকে শুনলে মনে হতে পারত বাড়াবাড়ি। চোখের সামনে দেখে মনে হল, অবধারিত পরিণাম।

মনোরমবাবু চিৎকার করে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলছেন : 'বন্ধুগণ! আমরা

একবারও এমন হবে ভাবিনি। কিন্তু মরে গেল বলে দুঃখ করব না। ওর প্রভুও ওর কাছে যা প্রত্যাশা করে না, তার চেয়ে বেশী দাপট নিয়ে লোকটা এসেছিল। নিজে চাকর বলে সারা দেশটাকেই চাকর বানিয়ে তুলতে চেয়েছিল। ও তো জানত না, ওর প্রভুও জানে না, মাটির দিকে টান থাকলে তবেই ওজন। টান সরে গেলে ধুলোরও অধম, কয়লার ধোঁয়ার মত বাতাসে ভর করে উড়ে যায়, মিলিয়ে যায়। না, আমরা একে হত্যা বলে মনে মনে অনুশোচনা করব না। দেশসুদ্ধ মানুষকে শেয়াল-কুকুর বলে ভাবা আর নিজেকে তিন হাজার আটশো ফিট দৈর্ঘ্যের অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার বলে কল্পনা করা—এ এক রকম রোগ। অনেক দিন ভুগছিল লোকটা। আজকের আক্রমণটা খুব জোর হওয়ায় বুকের তলার ঘড়ির কাঁটাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে রোগে ভুগে লোকটা মরল, আমরা তার দায় স্বীকার করব কেন?

উত্তেজনা ঝিমিয়ে এল আস্তে আস্তে। এ-বাড়ির লোকেরাও বাস্তব সচেতন হয়ে উঠল। ঘটনা তো এখানেই শেষ হল না। বরং শুরু হল বললেই ভাল হয়। অনিচ্ছাকৃত হত্যা বলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ আইন তাদের ছেড়ে দেবে না। তাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রাকে তিক্ত বিষাক্ত অভিশপ্ত করে তোলার মত অনেক অনেক অস্ত্র ওদের জানা আছে। কী করবে, তারা এখন কী করবে? সেই দুঃসহ ভবিষ্যৎকে এড়ানোর এমন কী সহজ পথ আছে?

তারা নিতান্ত শান্তিপ্রিয় ঘর-কুনো বাঙালী। আইন-ভঙ্গ করবে বলেই এ বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করেনি; পুলিশের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করবে বলেই ঠোক্কর লাগাতে যায়নি। ক্ষমতা আর কায়েমী স্বার্থের দ্বন্দ্ব আর ভাগ বাঁটোয়ারার মধ্যে তারা হয়ে গিয়েছিল বাড়তি মাল। ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারলে সকলে বাঁচে। তাড়া করে করে ঘরে এনে ঢোকালো ওরাই। ঘরে ঢুকল বলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে ছুটে এল ওরাই। আর আজ যে খোঁচা-খুঁচি করতে করতে ওদেরই একটা লোক নিজের দর্পের আগুনে পুড়ে মরল, তার জন্যও তো দায়ী হতে হবে তাদেরই! সেইটেই যে দস্তুর!

তারা কেউ রাজনীতি করে না যে জানবে এ রকম ঘটলে কী করা দরকার। দু'-একজন রাজনীতি-করা লোক থাকলেও তাঁরা সেকেলে। এ-যুগের জটিল

পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার মত বুদ্ধি রাখেন না। অবস্থার গুরুত্ব তারা যত বুঝতে লাগল, তত তারা দিশাহারা হয়ে পড়ল।

দারোগার পকেট থেকে রিকুইজিসানের নোটিশটা বেরিয়ে ছিল; এমন সময় সেটা পাওয়া গেল। তারা জানতে পারল, দেশের কর্ণধারেরা তাদের ভাগ্যলিপি ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। দারোগা অবশ্য আজকেই এ-নোটিশ জারী করার কোন সুযোগ পেলেন না। কিন্তু উপর-থেকে-আসা এই নোটিশ তাদের উপর প্রযুক্ত হবেই, এ-বিষয়ে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। খবরটা জানাতে কর্মপন্থা-নির্ধারণ অনেকটা সহজ হল।

কাজেই মানসিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আস্তে আস্তে একটা কর্মপন্থা দানা বেঁধে উঠল। কেউ তাদের নেতৃত্ব দিতে এল না, কেউ এক-দুই-তিন-চার করে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে বসল না। তবু এলোমেলো গুঞ্জনের মধ্যে দিয়ে একটা কর্মপন্থা নির্ধারিত হল সমবেত চেষ্টায়। তারা পালাবে। আজকে, এই রাত্রে। তিন-চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে, ট্রাম বাসের চলাচল অব্যাহত থাকতে থাকতে।

কিন্তু হুট্ করে যাব বললেই কি যাওয়া যায়? বুকে বাজে না? এ-বাড়িতে তাদের পনেরো মাসের জীবন-যাত্রার মধ্যে মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি ছিল না। তবু এ তো শুধু একখানা বাড়ি নয়। এখানে যে তারা ঘর বেঁধেছিল! জননী, জায়া আর কন্যা, সকলে মিলে স্নেহ আর মমতার আঁচল দিয়ে ঘিরে রেখেছিল নীড়গুলি। এত নোংরা, এত অসুবিধা—এ-বাড়ি ছাড়তে তবু মায়ায় বুক ফেটে যায়! হায়রে! বড়ই ঘর-কুনো ছা-পোষা বাঙালীর মন!

মেয়ের দল এবার আলাপ-আলোচনা ছেড়ে যার-যার ঘরে এসে কাঁদতে বসল। ছোট ছেলেরা কিছু বুঝল না, ভয় পেয়ে মায়ের কোলের পাশটিতে আরও ঘেঁষে বসল। কিন্তু সে খুবই অল্প সময়ের জন্য। তারপরই পূর্ণোদ্যমে কর্ম-যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল।

মজা এই যে, এ-বাড়ি যদি ছাড়তেই হয়, তবে কে যে কোথায় উঠবে এ-পনেরো মাসের মধ্যে তা কেউ ঠিক করতে পারেনি। আজ কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যার-যার গন্তব্যস্থান ঠিক হয়ে গেল। না, পথে কেউ পড়ে থাকবে না, ভেসে কেউ যাবে না। নতুন জায়গায় আরও অনেক বেশী কষ্ট হবে। অনেকের পক্ষেই নতুন জায়গা শুধু আজকের রাত্রে গিয়ে ওঠার জন্য।

তবু আরও বেশী দুঃখ তারা হাসিমুখে বরণ করবে ভবিষ্যতের সুখের দিনের আশায়।

ধোবার দল কোথায় যাবে ঠিক হয়ে গেছে। তারা সকলে মিলে এক সঙ্গে এক জায়গায় যাবে—এক-যাত্রায়-পৃথক-ফল করবে না। রেল-সড়ক ডিঙিয়ে, তিলজলা পার হয়ে অনেক অনেক ভিতরে, ম্যুনিসিপালিটির যেখানে শেষ। তাদের অনেক দেশের ভাইরা যেখানে ঘর বেঁধেছে। বাঁশের আগায় কাপড় টাঙিয়ে দু'চার রাত তারা কাটিয়ে দেবে। আস্তে আস্তে জায়গা ঠিক করবে, ঘর তুলবে। বাঁশ কেটে এনে, জঙ্গল ঘুরে ঘুরে হোগলা আর নল জোগাড় করে, নিজেদের ঘর তারা নিজেরাই তুলে নেবে।

কল্যাণবাবু আপাততঃ যাবেন বারুইপুরে তাঁর সম্বন্ধীর বাড়িতে। সেখান থেকে হয়তো আর কোথাও। যত কাজে হাত দিয়েছিলেন মাঝখানে থেমে রইল। ভরসা আছে কবিগুরুর বাণীতে, জীবনের অসম্পূর্ণ পূজাগুলোও হারিয়ে যায় না, ফুরিয়ে যায় না।

টুন্‌টুন্ মনোরমাকে চোখে-চোখে রাখছে। তার পুতুলের বাক্সটা মা ইচ্ছে করে ভুলে ফেলে না যায়। মার উপর এ-সব ব্যাপারে তার বিশ্বাস কম।

মনোরমবাবু গিয়ে উঠবেন তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে। ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব নেই। সেখানে থাকা চলবে না। আজ রাতে গিয়ে তো ওঠা যাক্। পরের কথা পরে।

মনোরমবাবুর ছোট মেয়ে ছন্দা বলছিল: জান বাবা, ঐ যুদ্ধবাজ সুধাদিটার জন্যই যত ঝামেলা। ঠিক যুক্তি করে সময় মত বাড়িতে ঢুকেছে। না আগে, না পরে। ও না এলে কিন্তু দারোগাও মরে না, ঝামেলাও হয় না।

মনোরমবাবু মেয়ের মুখ চাপা দিয়ে বললেন: ছি মা! ও রকম বলতে নেই! ছিঃ!

কালীকান্তবাবু যাবেন তাঁর মেয়ের শ্বশুর অঘোরবাবুর বাড়ি। এত লোকের পক্ষে কম হলেও তাঁর বাসায় কিছু জায়গা আছে। ভদ্রলোক লোকও ভাল। দু'চারদিন থাকা চলবে।

বোন হিমানী বৌদির পিছনে সমানে টিক টিক্ করছেন। বৌদি টুক্‌রো-টাক্‌রা জিনিস ফেলে যেতে পারেন এই আশঙ্কায়।

সুধীনবাবু যাবেন অনেক দূরে, মেদিনীপুরে। কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নয়। ওদিকে কোথায় তাঁদের দেশের জন-কয়েক ভদ্রলোক বাড়ি করেছেন, তাঁদের সাহায্যে কিছু একটা ঠিক করে নেবেন।

যাওয়ার ব্যাপারে অটলের দুর্ভাবনা সবচেয়ে কম। তটিনী মারা যাওয়ার পরে তার জীবনে আর কোন সমস্যা নেই। খুব খুশী হয়েছে আজ দারোগাটা মারা গেছে।

সে বৃদ্ধা মাকে নিয়ে সোজা শিয়ালদা যাবে। প্লাটফর্মে থাকবে তার মত আরও অনেক দুর্ভাগাদের সঙ্গে। তারপর কী হবে সে আর ভাবছে না।

ধরণীবাবু থাকবেন তাঁর দাদার বাড়িতে। সুধা সঙ্গে যাবে এটুকুন জানেন। জানেন না যে সুধা সঙ্গে থাকবে শুধু একটা রাত। কাল সকালে সে পালাবে। তাকে আশ্রয় দিতেই হবে অমলেন্দুবাবুর; আর কিছু না হোক, গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক তো তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

পটলের বাবা যাবেন যে ডিস্পেন্সারীতে কাজ করেন তার মালিকের বাড়িতে। জায়গা নেই। দু' একদিনের জন্য ওঠা চলবে শুধু।

কিন্তু ঘরের কাজের জন্য পটলকে খুব কমই পেলেন তার বাবা। পটল সারা বাড়িময় চরকীর মত ঘুরছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো সংসার গুছিয়ে-গাছিয়ে উঠিয়ে চালান দেওয়া বড় সোজা কথা নয়। কারও লোকের অভাব, কারও বিবেচনার অভাব, কারও সামর্থ্যের অভাব। অথচ প্রত্যেককেই তাড়া দিয়ে বের করতেই হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এমন নয় যে না পারা যায় তো কাল গেলেও চলবে। কেউ কি বুঝ্ছে, ভাবছে কত বড় দায়িত্ব? যত দায় পটলের!

অ দিদিমা, ও-কয়লা-ঘুঁটে দিয়ে আপনার চিতা সাজাতে কক্ষনো দেব না। ওগুলো থাক।

ও ভাঙা টিনের বাক্সটা না-ই বা নিলেন মাসীমা। বেচারা ইঁদুরগুলো যে একেবারে উদ্বাস্তু হয়ে যাবে।

এমনি সব পরামর্শ দিচ্ছে পটল ঘরে-ঘরে। এ-ছাড়া লোকগুলোকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার আর পথ নেই। বাঁধা-ছাঁদা আদ্ধেকও হয়নি, কুলী ডেকে পটল মাল তুলে দিল মাথায়। এমন সব মূর্খ গেঁয়ো বাঙালের পাল্লায়

পড়া গেছে! কালকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলবে কিনা ঠিক নেই। অথচ ভাঙা-চোরা জিনিসের মায়ায় বাবুদের চক্ষু ছল ছল!

রাত্রি গোটা আটেকের মধ্যেই পটল বাড়ি আদ্ধেক খালি করে ফেলল। এমন সময় একটা নতুন কাজের সন্ধান পেয়ে পটল সেদিকে ছুটল।

শচীন হঠাৎ এত রাত্রে এ-বাড়িতে এসেছে ভাঙা-হাটের মধ্যে। আজকেই ফিরেছে পাকিস্তান থেকে। তাকে টানতে টানতে নিয়ে পটল কল্যাণবাবুর কাছে হাজির হল।

কল্যাণদা, এত ভাল লগ্ন আর মিলবে না। সুনন্দার আজ বিয়ে।

কল্যাণবাবু বিস্ময়ে কথা বলতে পারেন না। খ্যাপা ছেলেটা বলছে কী? বাঙালীর ঘরের বিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে? এক মাসেও যার আয়োজন শেষ হয় না! নেই ফুল, নেই পুরোহিত, নেই আয়োজন।

এই তো কাছে মানিকতলার বাজার। দশ মিনিটের মধ্যে সব কিনে এনে দিচ্ছি। আপনার এত চিন্তা কিসের?

কল্যাণবাবু অগত্যা দু' একজনকে ডাকলেন পরামর্শের জন্য।

ও সুধীনবাবু, এক মিনিটের জন্য আসবেন একটু?

ও মনোরমবাবু! বিরক্ত করছি। এক মিনিটের একটা কথা শুনে যান।

আশ্চর্য। সবাই সায় দিলেন। উদ্বাস্তুদের আবার গতানুগতিক নিয়ম-কানুন কি? ওরা বাগদত্তা, ওদের কাজ সেরে দিন এই বেলা। মনের বিয়েই আসল বিয়ে। তাঁরা শুধু সকলে সামনে থেকে দু'হাত এক করে দেবেন।

ঘরে গিয়ে মনোরমাকে বললেন কল্যাণবাবু। মনোরমা হাসতে চেষ্টা করলেন। মায়ের মন, হাসি ভাল ফুটল না। সুনন্দা শুনে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল। সিঁড়ির কাছে দেখা হল পটলের সঙ্গে।

বড় ভাল ছেলে তুমি পটলদা। আমি তো ভেবেছিলাম বিয়েটা বুঝি ফস্কেই গেল। এ-বাড়ি ছাড়লে কি শচীনকে পেতাম?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়ে পটল বলল: তবে স্বীকার কর সুনন্দা, পটল একেবারে দুশমন নয়?

কার ঘাড়ে কটা মাথা এমন কথা বলে? কিন্তু শোন পটলদা, গেটের

ধারে গিয়ে একটু অপেক্ষা করবে। আমি যাব তোমার সঙ্গে বাজারে। হাঁদারাম তুমি কী-কিনতে কী-কিনবে ঠিক কি! সঙ্গে থেকে দেখে-শুনে বাজার করব। অমনি ফেরার পথে সেজেগুজে ফিরব। পথে বন্ধুর বাড়ি আছে। জীবনে একবারই বিয়ে করব, একটু সাজবও না নাকি?

পটল হাসতে হাসতে হাসি থামিয়ে চলে গেল। বিয়ের নামে মেয়েগুলো কেমন নাচে দেখ!

সুনন্দা ঘরে এসে মনোরমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল: মা-মণি! আমি পটলদার সঙ্গে একটু যাচ্ছি। কিছু ভেবো না।

মনোরমা কী বলতে যাচ্ছিলেন, সুনন্দা মুখ চেপে ধরল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি-চুপি বলল: শচীনদার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। বাবাকে বুঝিয়ে বোলো।

পটল উদ্বিগ্নভাবে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। সুনন্দা আসতে আসতেই বলল: অনর্থক দেরী করিয়ে দিলে তো সুনন্দা। জান না, আজকের দিনে সময়ের কত দাম?

সময়ের চেয়েও দামী জিনিস আছে পটলদা।

অন্ততঃ মেয়েদের যে আছে তা ঠিক। একগাছা কুটোর জন্যও তারা গাড়ি-ফেল করতে পারে অনায়াসে।

সুনন্দা ঘুরে এসে পটলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিল। যেন সে পটলের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে তৈরী হল।

তোমাদের না থাকতে পারে,—মেয়েদের আছে সময়ের চেয়েও দামী জিনিস। আচ্ছা পটলদা, বড় না বড়াই করে বলতে, তুমি সাংঘাতিক স্বার্থপর মানুষ? যা কিছু হাতের কাছে পাও, তাই নাকি দু'হাতে কেড়ে-কুড়ে নাও? নীতি মান না, আইনের পরোয়া করো না? এই বুঝি তোমার সেই সাংঘাতিক স্বার্থপরতার নমুনা! একান্তভাবে তোমার পাওনা যে-মেয়েটি তাকে অনায়াসে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারছ? নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেওয়ার ধরন বুঝি এই?

আক্রমণের আকস্মিকতায় পটল একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এ যে একেবারে পুরোনো পচা প্রশ্ন। অনেক কাল আগেই যে এ-প্রশ্নের শেষ-মীমাংসা হয়ে গেছে! সুনন্দা-শচীনের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে যাওয়ার পরই

এ-প্রশ্ন-সংক্রান্ত যা-কিছু ভাবনা-চিন্তা সমাধি লাভ করেছে। অন্যের কাছে বাগ্‌দত্তা যে কন্যা, সে আজ কেন স্বয়ং এসেছে কবর খুঁড়ে মজে-যাওয়া প্রশ্নের হাড়গুলো টেনে বার করতে? পটল তো চলেছে বিয়ের সওদা কিনতে! কই, একবারও তো সে পুরোনো প্রশ্নগুলো মনে আনতেও চেষ্টা করে নি!

সামলে নিতে সময় লাগল পটলের। জবাব দিল একটু দেরী করে:

আজ এতদিন পরে সে-প্রশ্ন কেন, সুনন্দা? কি লাভ? অনেক কাল আগেই তো এ-প্রশ্নের শেষ-মীমাংসা হয়ে গেছে।

না, হয়নি শেষ-মীমাংসা। যা-মীমাংসা হয়েছে, তার জের টেনে যদি বলি, পটলদা ভণ্ড? যদি বলি, মহৎ হওয়ার লোভে পটলদা তার নীতি পরিত্যাগ করেছে?

না, এতটুকু হাসছে না সুনন্দা। তার সুগোল বড় মুখখানাতে এতটুকুও কৌতুকের আভাস নেই। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সে প্রশ্ন করছে, জবাব দিতেই হবে। কিন্তু এ-প্রশ্নের কী জবাব দেবে পটল?

কী যে যা-তা বলছ সুনন্দা? পটল হবে মহৎ! আমার মত মানুষ কখনও মহৎ হতে পারে? অত দামী গয়না দিয়ে আমি কী করব, যখন আমার পেট খালি? মহৎ হওয়া তারই সাজে, যার পেট ভরা আছে, যে অনায়াসে আর-চাই-না বলতে পারে।

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে বলল: মহৎ হওয়া তোমার সাজে না, মহৎ হওয়া তোমার নীতি নয়,—এ কথা আমিও বুঝি। কিন্তু কেন তবে তোমার এই বিড়ম্বনা? কেন তবে নিজের পাওনা অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তোমার এত ব্যস্ততা?

দোহাই তোমার সুনন্দা, মাটি খুঁড়ে ও-সব প্রশ্ন টেনে তুলো না। বড় জটিল প্রশ্ন। দেখছ তো, কী অন্ধকার আজকের এই রাত! সাপকে যে বিশ্বাস করতে নেই,—এত বয়স হল, তবু কি আজও তা জানো না?

তুমি যদি সাপ পটলদা, আমি তবে সাপুড়ে। তোমার বিষের থলিটা কোথায় আজ তার সন্ধান আমাকে জানতেই হবে।

আশ্চর্য মেয়ে তো সুনন্দা! পটলের বিষের থলির সন্ধান চায়? পটল যদি এক ছোবল দিত, তবে কোথায় মিলিয়ে যেত আজ শচীনের সঙ্গে মিলন-

বাসরের স্বপ্ন? সেই ছোবলটা পটল দেয়নি। কেন, তার জবাব সে কী করে দেবে? তার জবাব সে নিজেই জানে না।

আকাশে কত তারা,—তবু তার মধ্যে পটল এ-প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না।

সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সুনন্দা। আজকের রাতে সময়ের বড় দাম।

সে আমি বুঝব না! আমি উত্তর চাইছি, তুমি তাড়াতাড়ি উত্তর দাও। তাড়াতাড়ি ছুটি মিলবে।

একখানা গরুর গাড়ি ওদের বাড়ির গেট পার হয়ে বেরিয়ে এল ঠিক ওদের গা ঘেঁষে! লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় পটল দেখল, বাচ্চা ছেলেটি কাঁদছে, তবু বৌ-টি তাকে কোলে তুলে নিচ্ছে না। তার কোলে একটি ছোট বাক্স, সযত্নে আঁচলে জড়িয়ে নিয়েছে। পটল জানে ঐ বাক্সের মধ্যে কি আছে। আছে যৎসামান্য কয়েক টুকরো গয়না।—দুর্দিনের সময় ক্ষয় পেতে-পেতে এখনো যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, তাই। এই নির্জন অন্ধকার রাস্তায় অনায়াসে ওটাকে কেড়ে নেওয়া যায়, পটল ভাবল।

আর ঠিক তক্ষুনি কঠিন প্রশ্নটার জবাব পেয়ে গেল সে। বলল: আচ্ছা সুনন্দা, রাজাবাহাদুরের বাগানবাড়িতে কেউ একা দু'তিনখানা ঘর দখল করে আছে, এ কি ভাবতে পার?

তাই কি হয়? যেখানে প্রত্যেকটি পরিবার এত কষ্ট করে থাকে, সেখানে একজন কি পারে স্বার্থপরের মত তিনখানা ঘর দখল করে থাকতে?

আচ্ছা, কাপড় কম আছে বলে তুমি তোমার মায়ের কাপড়খানা কেড়ে নিয়ে পরতে পার?

পারি না। কিন্তু এ-সব অবান্তর প্রশ্ন দিয়ে এখন কি হবে? আমার প্রশ্নের জবাব দাও পটলদা।

সুনন্দা, যে-গাড়িটা এইমাত্র গেল, তার উপর একটা বৌয়ের কোলে একটা গয়নার বাক্স ছিল। যদি কেড়ে নিতাম?

ছি!

তবে তোমার প্রশ্নের তো তুমি জবাব পেয়ে গেলে সুনন্দা। আমার নীতি কেড়ে-নেওয়ার নীতি—কিন্তু সে তো তস্করের নীতি নয়। যে আমারই মত দুঃস্থ, অত্যাচারিত, তার থেকে কি আমি কেড়ে নিতে পারি? আমি

রাখতেও ভরসা হয়নি, যদি বাঁধন কেটে পালায়। তাই রবি ছিল পাহারায়।

রবি যখন অনুমান করতে পারল, সবাই নিরাপদ-দূরত্বে চলে গিয়েছে, ওদের বাঁধন খুলে দিল।

তোমাদের উপর আমাদের কোন রাগ নেই। তোমরা যাও। শুধু এইটুকুন দেখো, তোমাদের দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি না হয়!

তারা চলে গেলে রাজাবাহাদুরের বাগানবাড়ি পড়ে রইল যেন কালান্তকের হাতে একখানা শবদেহ।

পনেরো মাস আগে যে-মানুষগুলো এসেছিল আজ তারা আবার পথে নামল! এ ক' মাসের হাসি-কান্নার ইতিহাস, তাদের বিরাট বিপুল অভিজ্ঞতা পড়ে রইল পিছনে। সুখের কথা এই যে, যে-মানুষগুলো এসেছিল, ঠিক সেই মানুষগুলিই ফিরে গেল না। এই কয় মাসের দুঃখের আগুনে পুড়ে তারা খাঁটি সোনা হয়ে গিয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা তারা জেনেছে, তাই আর তাদের ভয় নেই। তারা যেখানে যেখানে যাবে, সেখানেই বন্ধ্যা মাটিতে নতুন জীবনের অঙ্কুর গজাবে। তারা আজ নিঃসংশয়ে জেনেছে, অনায়াস দুঃখের জীবন কেউ হাতে ধরে তুলে দেয় না। জীবনের প্রিয় বস্তুকে অর্জন করতে হয় কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। আর সেই জন্যই তা এত মূল্যবান। শক্তি দিয়ে, সামর্থ দিয়ে, বহু চেষ্টায় জীবনের মালাগাছটি রচনা করতে হয় তিল তিল করে।

সকালবেলা চা খেতে খেতে অন্ততঃ পাঁচ সাতখানা খবরের কাগজ পড়তে হয় অমলেন্দুবাবুকে। অল্প সময়ের মধ্যে এ কাজটা সারতে হয় বলে যথেষ্ট মনঃসংযোগ দরকার। কেউ এ সময়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে তিনি খুব বিরক্তি বোধ করেন।

সেদিন তাঁর নিজের মনই ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিল। মনটা নানা কারণে বিচলিত। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন, খবরের কাগজ পড়াটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলে বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু তাড়াতাড়ির বদলে সময় লাগছিল বেশী। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন দেখে নিজের উপর রাগ হচ্ছিল প্রচণ্ড।

এমন সময় মেসের একটি চাকর এসে খবর দিল : বাবু, ফোন এসেছে।

কোন্ উপকারী কুটুম আবার এই সাত সকালে অমলেন্দুকে ফোন করতে বসেছে? জ্বালাতন!

নীচের তলায় ম্যানেজারের ঘরে ফোন। অমলেন্দু গায়ে খদ্দরের মোটা চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে স্লিপারের মধ্যে পা-টা ঢুকিয়ে একটু অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গে নিচে নেমে গেলেন।

শীত প্রায় বিদায় নিয়েছে। কাল রাত্রে তো রীতিমত দক্ষিণের ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিল। আকাশে বাতাসে আসন্ন বসন্তের পদধ্বনি। এখন সকালবেলায় অবশ্য একটু শীতের আমেজ রয়েছে। একটু বেলা হলে আর থাকবে না।

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে অমলেন্দু ফোন ধরলেন। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে কথা বলছিলেন পত্রিকার সম্পাদক।

হ্যালো। অমলেন্দুবাবু?

কথা বলছি।

শুনুন, আপনার সঙ্গে একটু জরুরি আলোচনার দরকার আছে। কতক্ষণে আসতে পারবেন?

অমলেন্দু সম্পাদকের দক্ষিণ হস্ত। জরুরী আলোচনার প্রয়োজন অনেক সময়েই ঘটে। হয়তো আজকের সম্পাদকীয় নিবন্ধ অমলেন্দুকে লিখতে হবে। হয়তো কোন বিশেষ প্রবন্ধ লিখতে হবে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে।

কিসের আলোচনা? ফোনেই বলুন না।

সে অনেক কথা। ফোনে হবে না। কখন আসছেন বলুন।

তা হলে হাতের দু'একটা কাজ সেরে দশটা এগারোটা নাগাদ যাচ্ছি।

তাই আসুন। আর শুনেছেন, রিফিউজিরা নাকি এক সাংঘাতিক কুকীর্তি করেছে? দারোগাকে নাকি খুন করেছে?

কিছু শুনিনি তো। কোথায়?

আমি এইমাত্র শুনলাম। ডিটেলস্ কিচ্ছু জানি না। নিশ্চয়ই যাদবপুরে ঘটেছে ব্যাপারটা। ওদিকেই তো রিফিউজিরা জমি জবর দখল করছে। পুলিশের সঙ্গে হয়তো ঠোকাঠুকি হয়েছে।

তবে তো চিন্তার কথা।

খুব চিন্তার কথা। আপনি যদি যাদবপুরের দিকে যান, খবরটা ভাল করে নিতে চেষ্টা করবেন তো।

করব।

আমি অবশ্য থানায় ফোন করে এদের বক্তব্যটা জেনে নিচ্ছি। তা হলে আপনি দশটা এগারোটায় আসছেন?

হ্যাঁ।

ফোন ছেড়ে দিয়ে অমলেন্দু আবার নিজের ঘরে ফিরে এলেন। খবরের কাগজগুলো এলোমেলো ছড়ান রয়েছে দেখে তিনি সেগুলো ভাঁজ করে তুলে রাখলেন। এখন আর পড়া সম্ভব নয় কাগজগুলো। প্রতিদিনকার রুটিনের কাজে অমলেন্দু কখনও অবহেলা করেন না। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। আজকে কেন কে জানে মনটা বড় চঞ্চল।

রিফিউজিরা যদি সত্যিই কোন দারোগাকে খুন করে থাকে তবে খুব অন্যায় কাজ করেছে। উত্তেজনার মাথায় কোন কিছু করার আগে তাদের অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে খোঁজ খবর তদারক করার জন্য এই সাত সকালে অমলেন্দু যাদবপুর যাবেন না।

এই সকালটা অমলেন্দুর নিজের। কাউকে, কোন কাজকে, তিনি এই সকালের ভাগ দেবেন না। যাদবপুরের কাজটা খুবই জরুরী, আর তার সঙ্গে অনেকের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু অমলেন্দুর কাজটা তার চেয়েও জরুরী, যদিও সেটা নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপার।

তাঁর বন্ধুরা যদি শুনতে পায়, নিছক একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি একটি জরুরী কর্তব্যের ডাককে উপেক্ষা করেছেন, তবে তারা খুব বিরক্ত হবে। কিন্তু সুধার কাছে আজ সকালে যেতেই হবে তাঁকে। যাওয়ার জরুরী প্রয়োজনটা যে কী তা তিনি নিজেও ভাল করে জানেন না। শুধু মনের একটা দুর্নিবার তাগিদকে তিনি উপেক্ষা করতে পারছেন না।

সেদিন তটিনীর মৃত্যু উপলক্ষ্যে তিনি রাজা বাহাদুরের বাগান-বাড়িতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাগান বাড়ির লোকেদের সান্ত্বনা দেওয়া, প্রবোধ দেওয়া। কিন্তু সারাটা সময় তিনি সুধার ঘরে কাটিয়েছিলেন। ফেরার সময়ও আর কারও খোঁজ-খবর না নিয়ে সোজা চলে এসেছিলেন। একটা কাজ করব বলে বেরিয়ে সে কাজ না করে অন্য কিছু করা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ।

এমন কাজ সেদিন তিনি করেছিলেন এবং সে-জন্য পরে অনুতাপ বোধ করেন নি।

কিন্তু সুধার ঘরে সেদিন অতক্ষণ থেকেও তার সঙ্গে সব কথা আলোচনা করা হয়নি। কী যেন বলবে বলে সুধা তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কথাটা শেষ পর্যন্ত আর বলা হয়ে ওঠে নি। কী যেন শুনবেন বলে সুধার ঘরে তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। কথাটা তবু তাঁর শোনা হয়নি। সেই না-বলা না-শোনা কথাটার জন্য সুধার কাছে আজ তাঁকে যেতে হবে। যেতেই হবে।

সুধাকেও তাঁর একটা কথা বলার রয়েছে। সে-কথাটা এই যে সুধাকে তাঁর বড় প্রয়োজন। সুধার কাছ থেকে তিনি নতুন করে জীবনের পাঠ নিতে চান। এ-কথা শুনে সে হয়তো হেসে অস্থির হবে, বিস্ময়ে অভিভূত হবে। হয়তো ভেবেই ঠিক করতে পারবে না তার মত সামান্য-শিক্ষিত মেয়ের কাছে অমলেন্দুর মত পণ্ডিত মানুষের কী শেখার থাকতে পারে।

কিন্তু সত্যিই সুধার কাছ থেকে অমলেন্দু শিখতে চান। অনেক দিন ধরেই তাঁর মনে হচ্ছে, তাঁর সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তার মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে। নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়ে তিনি বহু যত্নে অনেক সাধনায় একটি নিরেট বুদ্ধির জগৎ তৈরী করেছেন। হৃদয়কে উপবাসী রেখে তিনি শুধু বুদ্ধি আর তত্ত্বচিন্তা দিয়ে মানুষের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। কিন্তু মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলেছেন, তারা তাঁর ভাষা বুঝতে পারে নি, তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ তারা অনুভব করেনি।

কিন্তু সুধার কাজের পদ্ধতি আলাদা। হৃদয় আর মস্তিষ্ককে একসঙ্গে করে কাজ করার কৌশল সুধা জানে। সে হয়তো ভুল করে, দুঃখ পায়, অনুতাপ করে; কিন্তু সব সময় সে একটি সম্পূর্ণ সত্তা। সে দেহ দিয়ে চিন্তা করে, মন দিয়ে দর্শন স্পর্শন ইত্যাদি কাজ করে। দেহ আর মন তার আলাদা নয়।

অথচ অমলেন্দু অসম্পূর্ণ, বিভক্ত। জীবনের কামনা বাসনাগুলোকে তিনি উপবাসী রেখেছেন; কোনদিন কারও সঙ্গে গভীর হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করেন নি। এইভাবে সুখ-দুঃখের আবেগ-অনুভূতির জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি চেয়েছেন মানুষের সুখ-দুঃখের জীবনকে সুন্দরতর করতে।

কিন্তু তা কি সম্ভব? তা কি তিনি পেরেছেন? জীবনকে যে চিনল না জানল না, সে কি পারে জীবনকে সুন্দর করতে?

নিজেকে বঞ্চনা করে অপরের বঞ্চনার প্রতিকার করা যায় না। সে-সব ফাঁকা আদর্শবাদে অমলেন্দু আর আস্থা স্থাপন করবেন না। তিনি হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করতে চান। মহাপুরুষ হয়ে তিনি মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনে বসতে চান না। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে মানুষের হৃদয়ের একটি ছোট্ট কোণে একটি ছোট্ট আসন পেলেই তিনি খুশী হবেন। তখন হয়তো তিনি হৃদয় আর মস্তিষ্ককে এক সঙ্গে করে কী করে চিন্তা করা যায় তার কায়দাটা জানতে পারবেন।

সুধা আশ্চর্য। তার পাশে যে আসে, তার সঙ্গেই সে সম্পর্ক স্থাপন করে। হয়তো সে সম্পর্ক রাগের, ঘৃণার; তবু সেটা সম্পর্ক। মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে সুধার সেই অবিস্মরণীয় প্রথম সাক্ষাৎ। অপরিচিত অমলেন্দুকে দু'চারটে মামুলী ভদ্রতার বুলি বলে সুধা বিদায় দিতে পারত। তা না করে সুধা রাগ করল, বিরক্তি প্রকাশ করল, তাঁকে অবজ্ঞা করতে চাইল। সুধা যেন প্রকারান্তরে এই কথাই বলতে চেয়েছিল, হয় তুমি আমার বন্ধু হও, আর নয় আমার শত্রু হও। অমনি অমনি নিঃসম্পর্কিত তোমাকে আমি ফিরে যেতে দেব না।

সুধার সেই অপরূপ ব্যবহারের জন্য আজও সুধাকে ভুলতে পারলেন না অমলেন্দু। একমাত্র সুধাই পারবে তাঁর নিঃসঙ্গ বুদ্ধি আর অহঙ্কারের দুর্গটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে। ভেঙ্গে পড়ুক সেই দুর্গটা, আর অমলেন্দুর জীবনের ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে নেমে আসুক সূর্যের আলো। জীবনের আনন্দকে ভোগ করার জন্য যদি জীবনের দুঃখকেও স্বীকার করতে হয়, তা তিনি করবেন।

ঘরের কাজ শেষ করে নিঃসঙ্গ ঘরখানাকে তালাচাবীর হাতে সমর্পণ করতে করতে অমলেন্দুর মনে হল, এখনও কত সময় লাগবে সুধার কাছে পৌছতে। এই মুহূর্তেই সুধার সঙ্গে যদি দেখা করা যেত! এক মিনিট দেরীও যেন অসহ্য মনে হচ্ছে। ক'দিন ধরে একটা বোবা যন্ত্রণা ভোগ করে আজ মনটা শান্ত হয়েছে। আজ তিনি জানতে পেরেছেন, সুধার ঘরে তিনি সেদিন গিয়েছিলেন সুধার প্রয়োজনে নয়, নিজেরই প্রয়োজনে। এই কথাটা সুধাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যই এখন তার কাছে যেতে হচ্ছে। সুধার মুখোমুখি

দাঁড়িয়ে কোন ভূমিকা না করে তিনি শুধু একটা কথা বলবেন: সুধা, তোমাকে আমার বড্ড দরকার।—তারপর কী বলতে হবে তা সুধা জানে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অমলেন্দু ভাবলেন, আর কতক্ষণে কথাটা তিনি বলতে পারবেন সুধাকে? এক একটি মিনিট যেন এক এক ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছে! ইচ্ছা করা মাত্র পৌঁছে যাওয়া যায় না যে কোন জায়গায়?

আবছা আবছা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে গলিটা পার হয়ে ট্রামের রাস্তায় বেরিয়ে এসে অমলেন্দু দেখলেন অমলিন সূর্যের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। আর বেশী দেরী হবে না সুধার কাছে পৌঁছুতে।

কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছিল।

বাগান-বাড়ির গেটে অমলেন্দুবাবুকে গ্রেপ্তার করলেন পুলিশ অফিসার।

আসুন! আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। দারোগাকে হত্যার দায়ে আপনাকে এ্যারেস্ট করলাম।

কিন্তু ব্যাপার যে কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার?

ন্যাকামী না করলেই পারবেন। কালকে সন্ধ্যেয় বাড়ির মধ্যে দারোগাকে খুন করে রেখে গিয়েছিলেন, এর মধ্যেই কি ভুলে গেলেন?

অনুমানে খানিকটা-খানিকটা বুঝলেন অমলেন্দুবাবু। সকালবেলায় শোনা খবরটার সঙ্গে ঘটনাটাকে মিলিয়ে নিলেন। মোলায়েম করে হাসলেন।

বাড়ির আর সব লোকেরা কোথায়?

পালিয়েছে। সবগুলোই তো জাত ক্রিমিন্যাল। অপরাধ করে কি আর জায়গায় বসে থাকে? তারা তো জানে না, হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত তারা যেখানেই যাক, ভারত সরকার সহস্র চোখ দিয়ে তাদের অনুসরণ করবেন, আর সহস্র বাহু দিয়ে তাদের জাপ্টিয়ে ধরবেন।

তার মানে, হে উদ্ধত রাজপুরুষ, হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত তাদের দীর্ঘ যাত্রা-পথের প্রতিটি মোড়ে সহস্রলোচন সহস্রবাহুকে উদ্বেগ আর বিপর্যয়ের মধ্যে বিনিদ্র রাত যাপন করতে হবে।

কী ভেবে অমলেন্দুবাবু আবার হাসলেন।

একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন অমলেন্দু আজ সকালবেলা। সে স্বপ্নটা

ভেঙে গেল। ঠিক যেমন করে আড়াই শো লোকের নীড় বাঁধার স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে কাল রাত্রে।

স্বপ্নভঙ্গের গভীর দুঃখটা তিনি মনে মনে অনুভব করলেন। খানিকটা আনন্দের সঙ্গে দুঃখও তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন। আনন্দটা না মিলুক, দুঃখটা তীব্রভাবে বুকে বাজল।

সুধার সঙ্গে আর কি কোন দিন দেখা হবে? যদি হয়ও, তবু কাল হয়তো ইতিমধ্যে তাদের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলবে।

এমনি জীবনের নিয়ম। মানুষ যা কামনা করে তার সামান্যই সে পায়। সেইজন্যই তো সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মানুষের ছুটাছুটির বিরাম নেই। তার প্রতিটি পদক্ষেপে জীবন সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে ওঠে। অমলেন্দুর দল বার বার পরাজিত হন, কিন্তু জীবনের পরাজয় নেই।

কিন্তু যে পরাজিত তারও কিছু সান্ত্বনা থাকে। সে যদি অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করে থাকে, তবে সে বুক ফুলিয়ে বলতে পারে: আমি মূল্য দিয়েছি, সেইজন্য আমাকে কোথাও মাথা নত করতে হয়নি। আমিই আমার প্রভু; আর কোন লোক আমার মালিক নয়।

অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে, নিজের আত্মাকে বিকিয়ে দিয়ে অনেক সময় সুখী হওয়া যায়। মানুষের আত্মার সবচেয়ে বড় সম্পদ স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে দুঃখ বরণের জন্য তৈরী থাকতে হয়।

একটু পরিশিষ্ট আছে। উপরের ঘটনার মাস তিনেক পরে একদিন রাজাবাহাদুরের বাগান বাড়িতে একজন পিওনকে একখানা রেজিস্টারী চিঠি নিয়ে খুব ভুগতে হয়েছিল। প্রাপকের জায়গায় নাম ছিল—কল্যাণ সেন। পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সংস্থা। চিঠির ভিতরে খবর ছিল, কল্যাণবাবুদের দরখাস্ত যথারীতি পঞ্জীকৃত হয়েছে এবং যথাসময়ে তা বিভাগীয় সুবিবেচনা লাভ করবে।

রাজাবাহাদুরের বাগানবাড়িতে এখনও লোক বাস করছে। সরকারের আনুকূল্য পেয়ে এখন যারা আছে তারাও উদ্বাস্তু, তবে একটু অন্য ধরণের। নীচে অনেকগুলো কাঁচা-বেড়ার অস্থায়ী গ্যারেজ উঠেছে, তাতে চার-পাঁচখানা গাড়ি থাকে। অনেক পদস্থ অফিসারকে সরকারের গাড়ি এসে নিয়ে যায়

অফিসের সময়। ঘরগুলি শোভন কাঠের পার্টিশনে ভাগ হয়ে ড্রয়িং-রুম, বেড-রুম প্রভৃতি তৈরী হয়েছে। সামনের চত্বরটা এখন টেনিস লন। ঘরে ঘরে রেডিও। সকালবেলা শোনা যায় শপথ বাণী: ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

উপরে নীচে পিওন অনেকবার ঘোরাঘুরি করল। কল্যাণ সেন নামের কাউকে কেউ চেনে না। কোন দিন থাকত বলেও কেউ জানে না!